তিনবন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ

পেতলের মতো পীত বর্ণের আকাশ, এখনও চিমনির ধোঁয়ায় আকাশের মুখ ঢাকা পড়েনি। কারখানার পিছন দিকে যতটুকু দেখা যায় আকাশটা জ্বলজ্বল করছে। বোধ করি সূর্য উঠছে, তারই আভা! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এখনো আটটা বাজেনি, আরো মিনিট পনেরো দেরি করা চলত।

তবু গিয়ে গেট্ খুলে দিলুম, পেট্রল পাম্প ঠিকঠাক করে রাখলুম। এই সকাল বেলাতেও এক-আধখানা গাড়ি রোজ আসে তেল ভরে নিতে।

হঠাৎ পিছন দিক থেকে অত্যন্ত কর্কশ এবং বিকট একটা শব্দ কানে এল। খুব পুরোনো মরচে-পড়া কলকব্জা সশব্দে চালু করে দিলে যেমনটা হয় তেমনি, শব্দটা আসছে যেন মাটির তলা থেকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিলাম। তারপরে উঠোনটা পার হয়ে কারখানা-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম, অতি সন্তর্পণে দরজাটি খুললুম।

ওরে বাবারে, অন্ধকারে, ওটা কী ঘুরে বেড়াচ্ছে! ভূতটুত নয় তো? মাথায় একটা শাদা রঙের ময়লা কাপড় জড়ানো, স্কার্ট হাঁটু অবধি টেনে তোলা, গায়ে নীল রঙের ঢিলে আলখাল্লা, পায়ে ইয়া পুরু স্লিপার, ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দিচ্ছে। দেহ-খানা বিরাট—ওজন কম-সে-কম চোদ্দ স্টোন—ও হরি, এ যে আমাদের ম্যাটিল্ডা সুন্দরী—আমাদের চাকরানি ম্যাটিল্ডা হস্!

চুপ করে দাঁড়িয়ে কাণ্ডখানা দেখছিলুম। ছোটখাট একটি হিপোপটামাসের মতো হেলে-দুলে থপথপ করে ঘরের মধ্যে হাঁটা-চলা করছে আর গলা ছেড়ে গান ধরেছে—একেবারে লড়াইয়ের গান। জানালার ধারের বেঞ্চটাতে দুটি কোনিয়াক-এর বোতল, একটি প্রায় শূন্য। কাল রাত্তিরে দুটিই ভর্তি ছিল। যাবার সময় বাক্সবন্দি করে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম।

বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে ডাক দিলুম—'ফ্রাউ হস্!' গান তৎক্ষণাৎ থেমে গেল,

ঝাঁটাটি হাত থেকে খসে পড়ল। মুখের অতি মধুর হাসিটি কোথায় গেল মিলিয়ে। এবার আমাকেই যেন ও ভূত ঠাউরেছে। ঘোলাটে চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি? এই এত ভোরে আপনি আসবেন ভাবিনি তো!'

'সে কথা হচ্ছে না, বলি আস্বাদটা লাগল কেমন?'

'সে আর বলতে, তা বেশ লাগল। কিন্তু কি কাণ্ড, বলুন তো হের্ লোকাম্প্।' হাত দিয়ে একবার মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে—'

'থাক-থাক, আর বলতে হবে না···বেশ একটু নেশায় ধরেছে দেখছি—একেবারে পেটে যদ্দুর ধরে তদ্দুর গিলেছ বুঝি?'

পা দুটি টলছে, অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে আর প্যাঁচার মতো মিটমিটে চোখে তাকাচ্ছে। ক্রমে যেন নেশাটা কাটছে, চেষ্টা করে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'হের্ লোকাম্প্, শত হলেও মানুষ তো মানুষই, দেবতা তো নয়। এই আমি প্রথমটায় তো কেবল একবার নাকের কাছে নিয়ে একটু শুঁকে দেখলুম, তারপরে বেশি নয় এই এক ঢোঁক মাত্র···কিন্তু শেষটায় কি যে দুর্মতি হল কি বলব, শয়তান মাথায় চাপলে কি করা যায়। কিন্তু তাও বলি, আপনারই কি উচিত হয়েছে এই মুখ্যু বুড়িকে এমনি ভাবে লোভ দেখানো, হাতের কাছে এমন ভালো-ভালো বোতল রেখে দেওয়া!'

এর আগেও এমনি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। রোজ সকাল বেলায় ও আমাদের কারখানা-ঘর ঝাঁট দিতে আসে। ঘণ্টা দু-এক কাজ করে চলে যায়। টাকা পয়সা যেমন খুশি ছড়িয়ে রেখে যাও—ও তা ছোঁবেও না, কিন্তু মদ?

যেখানেই লুকিয়ে রাখ না ও ঠিক খুঁজে বের করবে, ইঁদুর যেমন অনেক দূর থেকেই মাংসের গন্ধ পায় ঠিক তেমনি।

বোতল দুটি তুলে ধরলুম। 'হুঁ, যা ভেবেছি তাই। খদ্দেরদের জন্যে কেনা কোনিয়াকের বোতলটি ঠিক আছে, কিন্তু ঐ ভালো বোতলটি—হের্ কোষ্টার নিজের জন্য কিনেছিলেন—সেটি দেখছি বিলকুল সাফ করে দিয়েছ।'

বুড়ির কোচকানো মুখে হাসি দেখা দিল। 'বলেন কেন, হের্ লোকাম্প্, ভালো মাল চিনতে আমার কখনো ভুল হয় না। কিন্তু তাই বলে, বলে দেবেন না যেন —গরিব মানুষ, বিধবা বুড়ি।'

মাথা নেড়ে বললুম, 'উহুঁ, এবার আর তোমায় ছাড়ছিনে।'

হাঁটুতে তোলা স্কার্ট টেনে নামিয়ে দিল, 'তবে আমি চললুম। এখন হের্ কোষ্টার

এসে আমাকে ধরলেই হয়েছে—বাপরে!' হাত নেড়ে অসহায় ভঙ্গি করল।

দেরাজ টেনে খুললুম। ডাকলুম—'ম্যাটিল্ডা।' বুড়ি থপথপ করে এগিয়ে এল। ব্রাউন রঙের একটা চৌকোনা বোতল তুলে ধরতেই বুড়ি একেবারে চোখ কপালে তুলে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও আমি করিনি দিব্যি করে বলছি, হের্ লোকাম্প্, আমি নই। ও আমি শুঁকেও দেখিনি।'

গ্লাশে ঢালতে-ঢালতে বললুম, 'এটা কি পদার্থ তুমি বোধহয় জানো না।'

'জানিনে আবার।' ততক্ষণে বুড়ির জিভে জল এসে গেছে। 'এ যে রাম্ গো, খাঁটি জ্যামাইকার মাল।'

'বাঃ ঠিক বোল্ দিয়া। তবে আর কি, এক গ্লাশ হোক, কি বল?'

'আমি? বলেন কি!' বুড়ি ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল। 'সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হবে, হের্ লোকম্প্। এ যে বোঝার ওপর শাকের আঁটি। অমনিতেই তো আপনাদের কোনিয়াক-এর বোতল খুঁজে পেতে সব সাফ করে দিয়েছি। তার উপর আবার রাম্—না, না, সে হয় না। অবিশ্যি আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি নইলে কি আর সাধাসাধি করেন। কিন্তু আর এক ফোঁটা খেয়েছি কি বুড়িকে আর জ্যান্ত দেখবেন না।'

'তাই নাকি? আচ্ছা তবে—' বলে নিজেই গ্লাশে চুমুক দিতে যাচ্ছিলুম। বুড়ি ছোঁ মেরে গ্লাশটা হাত থেকে নিয়ে বলল, 'তা দিন, দিন, দিচ্ছেন যখন। ভালো জিনিস ছাড়তে নেই, খেয়ে নিই যা থাকে কপালে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আজকে আপনার জন্মদিন-টিন নয় তো? সে রকম যেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ম্যটিলডা, আন্দাজটা ঠিকই করেছ।'

'অ্যাঁ সত্যি? আহা বেঁচে থাকুন, শত বচ্ছর পরমাই হোক। ভারি আনন্দ হচ্ছে যাই বলুন···দয়া করে আর এক গ্লাশ দিন, জন্মদিনটা ভালো করেই পালন করা যাক। জানেন তো, আমি আপনাকে নিজের ছেলের মতো দেখি।'

'বেশ-বেশ!' আর এক গ্লাশ ওকে ভর্তি করে দিলুম। বুড়ি ঢক্‌ঢক্ করে তাই গিলে পঞ্চমুখে আমার প্রশংসা করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোতলটা সরিয়ে রেখে টেবিলের কাছে এসে বসলুম। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে আমার হাতের উপর পড়েছে। আজকে আমার জন্মদিন, ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগছে। এ দিনটার বিশেষ অর্থ আমার কাছে আর নেই। তিরিশ বছর হল··· অথচ এমন একদিন ছিল যখন কেবলই ভাবতুম কুড়ি বছর বুঝি আর হবেই না · মনে হত কত দূরে। কিন্তু তারপরে···

দেরাজ থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে নিয়ে, হিসেব-নিকেশ শুরু করলুম। ছেলেবেলা···ইস্কুল, কত সব হিজিবিজি ছোটখাটো ঘটনা—কতদূরের, মনে হয়, আর একটা জগৎ, যেন তার সত্যিকারের অস্তিত্বই নেই। সত্যিকারের জীবন শুরু হয়েছে ১৯১৬ সন থেকে। সবে আর্মিতে যোগ দিয়েছি···আঠারো বছর বয়স, রোগা-পট্‌কা চেহারা। আর সেই ব্যাটা সার্জেণ্ট-মেজর—ব্যারাকের পিছনে চষা জমিটায় কাদামাটির মধ্যে আমাদের নানান রকম কুচকাওয়াজ করাতো। একদিন সন্ধ্যায় মা এসেছিলেন ব্যারাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু ঘণ্টাখানেকের বেশি তাঁকে বসে থাকতে হল। সেদিন আবার কিট্‌ব্যাগ আমি কায়দামাফিক গোছাতে পারিনি, সেই অপরাধে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল -নিজহাতে পায়খানা সাফ করতে হবে। মা বললেন, তিনি আমার কাজে সাহায্য করতে চান। কিন্তু তাঁকে সে অনুমতি দেওয়া হল না। মা কান্নাকাটি করলেন, কাজকর্ম সেরে যখন এলুম তখন আমি এত ক্লান্ত যে মায়ের পাশে বসতে না বসতেই ঘুমে এলিয়ে পড়েছিলুম।

১৯১৭। ফ্লাণ্ডার্স। মিটেন্‌ডর্ফ আর আমাতে মিলে ক্যান্টিন থেকে এক বোতল মদ কিনে এনেছি···ভেবেছিলুন বেশ ফুর্তি করা যাবে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না, সকালবেলা থেকেই ইংরেজের গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে। দুপুরের কাছাকাছি কোষ্টার আহত হল। বিকেল নাগাদ মেয়ার আর ডেটার্স দুইজনেই গেল মারা। সন্ধ্যের পর ভাবলুম, এবার একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে। বোতলটি নিয়ে সবে ছিপি খুলতে যাচ্ছি এমন সময়ে রব উঠল, গ্যাস ছেড়েছে। দেখতে-দেখতে গ্যাসে ট্রেঞ্চ ভর্তি হয়ে গেল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে মাস্ক পরে নিলুম। কিন্তু মিটেন্‌ডর্ফ-এর মাস্কটাতে কোথায় কি খুঁত ছিল। যখন টের পেল তখন দেরি হয়ে গেছে। মাস্কটা টেনে খুলে ফেলল, কিন্তু নতুন আর একটা যোগাড় না হতেই অনেকখানি গ্যাস নাকে মুখে ঢুকেছে—ততক্ষণে ও রক্তবমি করতে শুরু করেছে। পরদিন সকালবেলায় ও মারা গেল! কেমন চেহারা হয়ে গিয়েছিল—মুখের খানিকটা সবুজ খানিকটা কালো!

১৯১৮। তখন আমি হাসপাতালে। এই কদিন আগে একটা কন্‌ভয় এসে পৌঁচেছে। কাগজের ব্যাণ্ডেজ। সাংঘাতিক সব জখমি রোগী। চারদিকে কাতরানির শব্দ। সারাদিন ট্রলির আনাগোনা। আমার পাশের বেড্‌-এ আছে জোসেফ ষ্টোল্। ওর দুটো পা-ই উড়ে গিয়েছে, ও কিন্তু তা জানে না। নিজে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ, বিছানার ঢাকনাটা একটা দোলনার উপরে চড়িয়ে

দেওয়া। পায়ের যন্ত্রণাটা এখনো রয়েছে কিনা, তাই বোধকরি বললেও ও বিশ্বাস করত না। কাল রাত্তিরে আমাদের ঘরেরই দুটি ছেলে মারা গেল। একটি ছেলে বড্ড কষ্ট পেয়ে মরেছে, ধীরে-ধীরে, প্রাণটা যেন বেরুতেই চায় না।
১৯১৯। বাড়ি ফিরে এসেছি। দেশে বিপ্লব, খাদ্যাভাব। রাস্তায়-ঘাটে মেশিন-গানের আওয়াজ। সৈন্যদলেই গোলমাল, নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়েছে।
১৯২০। বিপ্লবের চেষ্টা। কার্ল ব্রোগারকে গুলি করে মারা হয়েছে। কোষ্টার এবং লেন্‌ত্‌স গ্রেপ্তার হয়েছে। মা হাসপাতালে, ক্যানসারে ভুগছেন।
১৯২১।...
খানিকক্ষণ বসে-বসে ভাবলুম। কই কিছুই তো মনে পড়ছে না। ও-বছরটা যেন জীবন থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। ১৯২২ সনে থুরিঙ্গায়াতে রেল-লাইন-মিস্ত্রির কাজ করেছিলুম। ১৯২৩ সনে ছিলুম এক রবার ব্যবসায়ীর অ্যাডভারটাইজিং ম্যানেজার। সেটা হল গিয়ে সেই মুদ্রাস্ফীতির বছর—টাকার ছড়াছড়ি। এমনও দিন গেছে যখন মাসে প্রায় দুশো বিলিয়ন মার্ক রোজগার করেছি। দিনে দু-বার করে মাইনে দেওয়া হত। প্রত্যেকবার মাইনের পর আধঘণ্টা ছুটি। লোকজন সব ছুটত দোকানে, এলোপাথাড়ি জিনিস কিনত। পরবর্তী ডলার বিনিময়ের হার বেরোবার আগেই কেনাকাটা সাঙ্গ করতে হবে – কে জানে মার্কের দাম তখন হয়তো অর্ধেক হয়ে যাবে।
তারপরে? এর পরের বছর কটা কি ভাবে কেটেছে! পেন্সিল রেখে দিলুম, কি হবে অত হিসেব করে? কিছু মনেও পড়ছে না, সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। গেল বছর এই জন্মদিনে ছিলুম 'কাফে ইন্‌টারন্যাশনাল'এ, আমি ছিলুম ওদের পিয়ানো-বাজিয়ে। কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌স-এর সঙ্গে ওখানেই দেখা। সেই থেকে এখানে আছি—কোষ্টার অ্যাণ্ড কোং-এর মোটর মেরামত কারখানায়। ব্যবসাটা আসলে ষোলো আনা কোষ্টারের, লেন্‌ত্‌স আর আমি শুধু এ কোং কথাটার মালিক। সেই ইস্কুলে পড়বার সময় থেকে ওর সঙ্গে জানাশোনা, আর্মিতে ও ছিল আমাদের দলের ক্যাপ্টেন। পরে হয়েছিল বিমানচালক। লড়াই থেকে ফিরে এসে কিছুকাল আবার পড়াশোনাও করেছে। শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এই ব্যবসা। লেন্‌ত্‌স কিছুদিন এ-ও-তা নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোরাঘুরি করেছে। সে-ই এসে আগে এই ব্যবসায় যোগ দেয়, তারপরে আসি আমি।
পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করলুম। মোটামুটি ভালোই আছি বলতে হবে। খারাপ তো কিছু দেখছিনে। চাকরি করছি, শরীরে শক্তি আছে, খাটতে

পারি, দেহটি দিব্যি সুস্থ…থাক, এসব কথা বেশি না ভাবাই ভালো, বিশেষ করে যখন একলা থাকি। রাত্তির বেলায় তো কোনো মতেই নয়। বলা নেই কওয়া নেই, অতীতটা যেন হঠাৎ কোত্থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর মৃত নিষ্পলক চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই জন্যই হাতের কাছে একটি জিন্-এর বোতল রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

ক্যাঁচ করে ফটক খোলার শব্দ হল। তাড়াতাড়ি তারিখ সমেত কাগজটা ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলুম। সশব্দে দরজাটা খুলে গেল, দরজার মুখে এসে দাঁড়াল গট্‌ফ্রিড্ লেন্‌ত্‌স—লম্বা, রোগাটে চেহারা, এক মাথা সোনালী রঙের চুল, নাকটা মুখের সঙ্গে বেমানান, মনে হয় যেন অন্য কারো নাক। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ববি, কি হাঁদার মতো বসে আছ! উঠে দাঁড়াও, কায়দামাফিক গোড়ালি একত্তর কর। তোমার উপরওয়ালা যে তোমার সঙ্গে কথা বলছে।'
বাপরে বাপ! উঠে দাঁড়ালুম। 'হের গট্। ভেবেছিলুম তোমরা দিব্যি ভুলে-টুলে …যাকগে এ নিয়ে আর মিথ্যে হৈচৈ কর না।'
গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'খালি তোমার কথা ভাবলেই তো চলবে না।' টেবিলের উপরে একটা পার্শেল নামিয়ে রাখল, ভিতরে একটু ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ হল। ওর পিছন পিছন কোষ্টারও এসে ঢুকল। লেন্‌ত্‌স আমার কাছ ঘেঁষে এসে বলল, 'আচ্ছা, আজ সকালে উঠে সবার আগে কি নজরে পড়েছিল বল তো?'
কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললুম, 'এক বুড়িকে দেখেছি নাচতে।'
'এই-রে! তবে তো লক্ষণটা ঠিকই দেখছি, তোমার কোষ্ঠীর সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। গতকাল তোমার একটা কোষ্ঠী করেছি। দেখছি ধনু রাশিতে তোমার জন্ম-সে জন্যই তুমি অত দুর্বলচিত্ত, একেবারেই নির্ভরযোগ্য নও। শনির অবস্থানটিও খারাপ, তার উপরে আবার বৃহস্পতি এ-বছরটাতে ভালো ফল দিচ্ছে না। দেখ, আমি আর কোষ্টার হলুম গিয়ে তোমার স্থানীয় অভিভাবক, কাজেই আমি বলি কি—আপদ-বিপদ যখন আছেই তখন এই মাদুলিটি ধারণ করা তোমার পক্ষে উচিত হবে। এই মাদুলি কোথায় পেয়েছি জানো? সেই পেরুর বিখ্যাত ইন্‌কা-বংশোদ্ভূতা এক নারীর কাছ থেকে। অসাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্না সেই নারী!
'সে আমাকে বলে কি জানো? কত রাজা মহারাজা এই মাদুলি ধারণ করেছে।

চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী তো বটেই, আরো কত গ্রহ উপগ্রহের শক্তি এর মধ্যে নিহিত আছে—বেশি চাইনে, জিন্ কেনবার জন্যে একটি ডলার যদি দাও তাহলেই এ জিনিসটি তোমাকে দিয়ে দিই। সেই মহামূল্য জিনিসটি আজ তোমাকে দিচ্ছি। এতে তোমার ভালো হবে, চাই কি বৃহস্পতির কুফলটাও কেটে যেতে পারে।' এই বলে সরু চেন-এ বাঁধা ছোট্ট একটি কালো মূর্তি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল। 'যাক্ এ তো গেল বড়-বড় আপদ-বালাই কাটাবার ব্যবস্থা…নিত্য তিরিশ দিনের জন্যেও ব্যবস্থা রইল·· এই নাও ছ-বোতল রাম্। অটোর দেওয়া বাছাই মাল, এর প্রত্যেকটি ফোঁটার বয়েস তোমার বয়সের দ্বিগুণ।'

পার্শেলটা খুলে একটি-একটি করে বোতল সাজিয়ে রাখতে লাগল। সূর্যের আলো পড়ে বোতলগুলি অ্যাম্বারের মতো চিক্‌চিক্ করছিল। বললুম, 'চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু। এ সব কোথায় পেলে ভাই, অটো?'

কোষ্টার মৃদু হেসে বলল, 'সে অনেক কথা। ওসব এখন থাক, আগে বল তো কেমন লাগছে? বয়েস সত্যি-সত্যি তিরিশ হল বলে মনে হচ্ছে?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'উঁহুঁ, একদিক থেকে মনে হচ্ছে ষোলো আর একদিক থেকে পঞ্চাশ। কেমন যেন ঘুনধরা কাঠের মতো…'

লেন্‌ত্‌স বলে উঠল, 'বল কি হে! আমি বলি এই তো মজা। একাধারে ষোলো আর পঞ্চাশ—বয়েসকে আচ্ছা জব্দ করেছ, এক সঙ্গে দু-দুটো জীবন যাপন করছ।'

কোষ্টার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'থাক্, থাক্, ওকে আর ঘাঁটিয়ো না, গট্‌ফ্রিড্। জন্মদিনটা মানুষের আত্মসম্মানে বড্ড ঘা দেয়, বিশেষ করে এই সকাল-বেলায়। আর একটু বেলা হলে ও আপনি চাঙা হয়ে উঠবে।'

লেন্‌ত্‌স ভুরু কুঁচকে বলল, 'যে মানুষ নিজের কথা যত কম ভাবে সে মানুষ তত ভালো। কি বল, বব, ঠিক বলিনি?'

'মোটেই না। আমি বরং বলি যে যত ভালো মানুষ, ভালোর মর্যাদা রাখবার জন্য সে তত বেশি চেষ্টা করে। সেইটেই প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে, জীবন দুর্বহ হতে চলেছে।'

'তোফা! তোফা! আরে ভাই অটো, ও যে দেখছি একেবারে তত্ত্বকথা আওড়াতে শুরু করেছে। নাঃ, ওর ফাঁড়া কেটে গেছে বলতে হবে। জন্মদিনের আসল সঙ্কট মুহূর্তটা ও কাটিয়ে দিয়েছে। যখন মানুষকে ক্ষণকালের জন্য হলেও একবার নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়, বুঝতে পারে যতই আস্ফালন করুক আসলে জীবনটা

কিছুই না।...যেতে দাও, এস এবার নিশ্চিন্দি হয়ে কাজ শুরু করা যাক্। পুরোনো ক্যাডিলাকটাকে একটু তেল খাওয়ানো দরকার।'

সন্ধ্যে অবধি একটানা কাজ চলে, তারপরে চান-টান করে সাফ হয়ে কাপড় জামা বদলে নিই। লেন্‌ত্‌স বোতলগুলোর দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বলল, 'একটা বোতল ভেঙে দেখলে হত—কি বলো অটো?'

কোষ্টার বলল, 'আমি বলবার কে, ও তো এখন বব্‌-এর সম্পত্তি। একটা জিনিস কাউকে দিয়ে ও ভাবে বলা কি ভদ্র ব্যবহার?'

বোতলের ছিপি খুলতে-খুলতে লেন্‌ত্‌স বলল, 'আর বব্‌-এর ব্যবহারটাই বুঝি বড় ভদ্র ব্যবহার হল! দেখছ না যে তেষ্টায় আমাদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে!'

গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করে উঠল। গট্‌ফ্রিড্‌ চেঁচিয়ে উঠল, 'আহা মরি মরি!' তিনজনেই গন্ধটা নাকে টেনে নিচ্ছি। বললুম, 'সত্যি অটো, এর আর তুলনা নেই। এর বর্ণনা কবির মুখেই সাজে, আমাদের মুখে মানায় না।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'এ জিনিস ভাই, সত্যি বলছি—ঘরে বসে খেলে এর মান থাকে না। আমি বলি কি, চল বেরিয়ে পড়া যাক। শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাবে, বোতলটি সঙ্গে নিই। ব্যস্‌, একেবারে ভগবানের খোলা নীল আকাশের নিচে বসে এর সদ্ব্যবহার করা যাবে।'

অতি উত্তম প্রস্তাব, তাই হোক। সারাদিন যে ক্যাডিলাক্‌ গাড়িটার উপর খাটুনি গেছে সেটাকে ঠেলে এক ধারে সরিয়ে রেখে তার পিছন থেকে উদ্ধার করা গেল একটা চার-চাকাওয়ালা অদ্ভুত যন্ত্র...কোষ্টার-এর রেইসিংকার, কারখানার সব চেয়ে বড় গর্বের বস্তু।

কোষ্টার এই গাড়িখানা কিনেছিল নিলামে, নামমাত্র দামে—কিম্ভূতকিমাকার পুরোনো এক মোটর-যন্ত্র। গাড়ি নিয়ে যারা এক-আধটু কাজ কারবার করে তারা হেসে বলেছিল, তা জিনিসটা দেখবার মতোই বটে, মিউজিয়মে রেখে দিলে হয়। মেয়েদের পোশাকবিক্রেতা বলউইজ্‌ গম্ভীর ভাবে পরামর্শ দিয়েছিল, ওটাকে ভেঙে-চুরে দিব্যি একটা সেলাই-এর কল বানিয়ে নিতে! এত কথাতেও আমাদের কোষ্টার দমেনি। কয়েক মাস ধরে রাতের পর রাত কোষ্টার এই গাড়ির পিছনে খেটেছে। তারপরে একদিন সে হঠাৎ সেই গাড়ি নিয়ে এসে হাজির, রোজ সন্ধ্যায় যে পানশালায় আমরা আড্ডা জমাতুম ঠিক সেইখানে। বলউইজ্‌ তো দেখে হেসে লুটোপুটি, বাস্তবিক গাড়ির চেহারাটি দেখলে হাসি না পেয়ে যায় না। তামাশা করবার জন্যে অটোকে সে রেস্‌-এ আহ্বান করল। বলল, তার নতুন কেনা

গাড়িটাকে দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারলে সে অটোকে দেবে দুশো মার্ক, আর অটো যদি হারে তাকে দিতে হবে মাত্র কুড়ি মার্ক। দশ কিলোমিটার দৌড়, অটোকে এক কিলোমিটার স্টার্ট দেওয়া হবে। অটো তক্ষুনি রাজী। আবার কেরদানি দেখ না, বলে, 'হ্যাণ্ডিকাপ চাইনে আর বাজির টাকাও বাড়াতে হবে। তুমি হারলে হাজার মার্ক দেবে, আমি হারলেও হাজার মার্ক দেব।' বলউইজ তো শুনে অবাক! বলল, 'তোমাকে এক্ষুনি পাগলা গারদে দিয়ে আসা দরকার।' সবাই হেসে উঠল। কোষ্টার মুখে জবাব না দিয়ে এঞ্জিন চালু করে দিল। কালবিলম্ব না করে দুজনেই বেরিয়ে গেল বাজি মাত করতে। বলউইজ্ যখন ফিরে এল তার মুখের চেহারা দেখে মনে হল সে হাতির পাঁচ পা দেখেছে। তক্ষুনি চেক কেটে বাজির টাকা দিয়ে দিল, সঙ্গে-সঙ্গে আর একখানা চেক কেটে বলল, 'ঐ গাড়িটা আমার চাই।' কোষ্টার সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিল, বলল, 'উঁহু, লাখ টাকা হলেও না।' বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ওটা একটা ভগ্নস্তূপ ছাড়া কিছুই না, কিন্তু ভিতরে এঞ্জিনটি নতুন কেনা পিনের মতো তক্তকে ঝক্ঝকে। নিত্য ব্যবহারের জন্য আমরা বেছে-বেছে অত্যন্ত পুরোনো একটা গাড়ির খোল ওর গায়ে বসিয়ে নিয়েছিলুম। তার রঙ চটে গিয়েছে, মাডগার্ড ভাঙা আর বনেটটা কম্সে কম দশ বছরের পুরোনো। ইচ্ছে করলে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে করেই তা করিনি। আমরা ওর নাম দিয়েছিলুম কার্ল—পান্ত-ভূত বললেও চলে।

ভূতের মতন চেহারা, কুকুরের মতো রাস্তা শুঁকতে-শুকতে কার্ল চলেছে। আমি অটোকে বললুম, 'ঐ একটি আসছে হে, ওকে একটু ঘোল খাইয়ে দাও তো।' প্রকাণ্ড একটা বুইক্ গাড়ি আমাদের পিছনে অনবরত হর্ন দিতে-দিতে আসছে, আমাদের এসে ধরল বলে। দেখতে-দেখতে গাড়িটা এসে গেল, এখন রেডিয়েটর দুটো পাশাপাশি। যে লোকটি গাড়ি চালাচ্ছে সে এক নজর আমাদের দিকে তাকাল। কার্লের বদখদ চেহারাটা দেখে খুবই একটা অবজ্ঞা হয়েছে। মুখ ফিরিয়ে আপন মনে গাড়ি চালাতে লাগল, বোধ করি আমাদের কথা ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই ফিরে তাকাতে হল। কার্ল ওর সঙ্গে ঠিক সমান তালে চলেছে প্রায় গলাগলি হয়ে। লোকটি একটু নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল, আমাদের দিকে একবার তাকাল, মুখে একটু কৌতুকের আভাস। তারপরে অ্যাকসিলারেটরটা চেপে গতি দিল বাড়িয়ে। কিন্তু কার্ল কি ছাড়বার পাত্র, ও ঠিক সমান-সমান চলছে। ছোট্ট একটা টেরিয়ার কুকুর মস্ত একটা ডালকুত্তার

সঙ্গে সমান-সমান দৌড়লে যেমনটা হয় এও তেমনি। চক্‌চকে নতুন আর ঝক্‌ঝকে বার্নিশওয়ালা গাড়িটার পাশে কার্লকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।
লোকটি ষ্টিয়ারিং আরো একটু কষে ধরল। ও এখনো পুরোপুরি আঁচ করতে পারেনি, আমাদের দিকে আর একবার তাকাল খুব অবজ্ঞার সঙ্গে, ভাবটা যেন আচ্ছা এস তবে আমার গাড়ির বাহাদুরিটা একবার দেখিয়েই দিই। এমন জোরে অ্যাকসিলারেটর চেপে দিলে যে এঞ্জিনটা সশব্দে ধোঁয়া ছেড়ে গর্জন করে উঠল। কিন্তু হলে কি হবে? ও কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারল না, কার্ল আঠার মতো ওর সঙ্গে লেগেই আছে।
লোকটা ক্রমেই অবাক হচ্ছে, গোল-গোল চোখ করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। ও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অ্যাঃ, ষাট মাইলের উপরে স্পীড্ দিয়েছে, তাতেও ঐ মান্ধাতার আমলের ছিঁচকে গাড়িটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না! উদ্‌ভ্রান্তের মতো বারেবারে স্পীডোমিটারের দিকে তাকাচ্ছে—ওটা ঠিক আছে তো, না কিছু বিগড়ে গেছে?
সোজা রাস্তা—গাড়ি দুটো ঠিক পাশাপাশি ছুটছে। হঠাৎ দেখা গেল উল্টো দিক থেকে একটা লরি আসছে, বুইক্ গাড়িটা একটু রাশ টেনে পিছিয়ে পড়ল, লরিটা তো চলে যাক, তারপরে দেখা যাবে। পিছন থেকে এসে যেই আবার আমাদের ধরেছে অমনি সামনের দিকে আর একটা গাড়ি দেখা দিল। শবাধার নিয়ে যাচ্ছে, ফিতে বাঁধা ফুলের মালা বাতাসে দুলছে। ওকে রাস্তা দেবার জন্য বুইক্ গাড়িকে আবার পিছতে হল। সামনে আর বাধা নেই, এবার খোলা সড়ক। ততক্ষণে লোকটার খানিকটা চৈতন্য হয়েছে, হামবড়া ভাবটা একটু কেটেছে কিন্তু মনে-মনে চটেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে ষ্টিয়ারিং-এ। রেস-এর জেদ চেপে গেছে, যেন ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে আজকের হারজিতের উপর, এই নেড়িকুত্তাটার কাছে কিছুতেই হার মানা চলবে না।
এদিকে আমরা চুপচাপ বসে আছি আমাদের সিটে, যেন কিছুই হয়নি, বুইক্-গাড়িটার অস্তিত্বই আমরা জানিনে। কোষ্টার সোজা রাস্তার দিকে চোখ রেখে চলেছে, আর কোনো দিকে তার নজর নেই। লেন্‌ত্‌স ভিতরে-ভিতরে খুব উত্তেজিত, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, দিব্যি একখানা খবরের কাগজ খুলে বসে আছে যেন পড়ায় কতই মনোযোগ। কয়েক মিনিট বাদে কোষ্টার আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার চোখ ঠারল। খুব আস্তে গাড়ির বেগ কমিয়ে আনল, বুইক্‌টাও ক্রমে এসে আমাদের ধরে ফেলল। ইয়া চওড়া চক্‌চকে

মাডগার্ডগুলো আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল, আমাদের মুখে চোখে খানিকটা নীল ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। ও এখন আমাদের ছাড়িয়ে গেছে—এই আন্দাজ কুড়ি গজ হবে। তারপর ঠিক যা ভেবেছিলুম তাই, গাড়ির জানালা দিয়ে মালিকের মুখখানা দেখা দিল, লাল, ঘর্মাক্ত কিন্তু আহ্লাদে আটখানা। বিজয়গর্বে খুব একচোট হাসছে। ও ভেবেছে ও জিতে গিয়েছে।

কিন্তু শুধু ঐটুকুতেই সে সন্তুষ্ট নয়, আমাদের উপর এবার সে শোধ তুলবে, তবে ছাড়বে। হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে, ভাবটা এবার এসে ধর দেখি বাছাধন, দেখি তোমার বাহাদুরি কদ্দুর।

লেন্‌ত্‌স ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অটো!' চেঁচাবার কিচ্ছু দরকার ছিল না। কার্ল সে মুহূর্তে একেবারে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়েছে সুমুখের দিকে, এঞ্জিনটা বিকট গর্জন করে উঠেছে। মুহূর্তে বুইক্ গাড়ির জানালা দিয়ে হাতটি অপসারিত হল। কার্ল এমন নেমন্তন্নটা ছাড়বার পাত্র নয়। আমরা যেটুকু পিছিয়ে পড়েছিলাম সেটুকু সেরে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। এই প্রথম আমরা অপরিচিত গাড়ির মালিকটির দিকে ভালো করে তাকালাম। নেহাত ভালোমানুষি ভাব দেখিয়ে তাকাচ্ছি—কেন ডেকেছেন, কোনো দরকার ছিল নাকি? কিন্তু ভদ্রলোক কি আর আমাদের দিকে তাকায়? জোর করে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। এদিকে ধুলোকাদা মাখা মাডগার্ডে খটাখট্ শব্দ তুলে কার্ল তো চ্যাংড়া ছোঁড়ার মতো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

লেন্‌ত্‌স বলল, 'সাবাস্ অটো, সাবাস্! আহা, ঐ বেচারার আজকে রাত্তিরে আর আহারে রুচি থাকবে না।'

মাঝে মাঝে এ রকম দৌড়ের মজা দেখবার জন্যেই আমরা কার্লের গায়ের খোলটা বদলাইনি। ও রাস্তায় বেরুলেই কেউ না কেউ ওকে চটিয়ে দেবেই। খোঁড়া কাক দেখলে বেড়ালের দল যেমন তাকে পেয়ে বসে এও তেমনি। সাতে নেই পাঁচে নেই, বড়লোকের ঘরোয়া গাড়ি পর্যন্ত ওকে দেখলে পিছনে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কার্ল যখন তার বদখদ মূর্তি নিয়ে রাস্তায় তিড়বিড় করে চলতে থাকে কখনো সামনে, কখনো বা পিছনে, তখন দেখেছি নিতান্ত শান্তশিষ্ট প্রৌঢ় বয়স্ক ড্রাইভারকেও যেন রেস্-এর বাতিকে পেয়ে বসে। ওর বাইরের মূর্তি দেখে কে জানবে ও ভিতরে-ভিতরে অতখানি তেজিয়ান। লেন্‌ত্‌স বলত, কার্লের মধ্যে মস্ত বড় একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বাইরের চেহারাটা যেমনই হোক ভিতরে ক্ষমতা থাকলে কি হতে পারে—এটা তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

ছোট একটি সরাইখানার সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল, সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। চমৎকার সন্ধ্যাটি, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঢেউখেলানো চষা মাঠে একটি লালচে আভা, ক্ষেতের আলগুলো কোথাও বেগুনী, কোথাও জলজলে লাল। টুকরো-টুকরো মেঘ ফ্লেমিংগো পাখির মতো নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, তারই ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কাস্তের মতো চিলতে একটু চাঁদ। নিষ্পত্র একটি হেজল গাছের মূর্তি নতুন পত্রোদ্গমের আভাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সন্ধ্যার আবছায়ায় দেখাচ্ছে স্বপ্নের মতো। সরাইখানার ভিতর থেকে দিব্যি রান্নার গন্ধ আসছে—ভাজা মেটুলির গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ। আঃ, গন্ধেই মন নেচে উঠছে!

লেন্‌ত্‌স ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আহ্লাদে ডগমগ, ফিরে এসে বলল, 'আরে ভাই খাসা জিনিস। শিগগির এস, নইলে গরম-গরম ভাজাগুলো সাবাড় হয়ে যাবে।' ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ফিরে দেখি সেই বুইক্ গাড়িটা। ঘ্যাচাং শব্দ করে গাড়িটা ঠিক কার্লের পাশে এসে থামল। গাড়ির মালিক বেরিয়ে এল। ইয়া লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা, গায়ে উটের লোমে তৈরি বাদামী রঙের কোট। হাত থেকে হলদে রঙের পুরু দস্তানা খুলতে-খুলতে এগিয়ে এল। খুব বিরক্তভাবে কার্লের দিকে একবার তাকাল, তারপর কোষ্টরকে জিগগেস করল. 'তোমাদের এ পদার্থটা কিহে? এটা কি গাড়ি?' আমরা তিনজনেই কোনো জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। লোকটা নিশ্চয় ভেবেছে আমরা মোটর মিস্ত্রি, রবিবারের পোশাক পরে সেজেগুজে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি। অটো নেহাত নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে বলল, 'কিছু বলছিলেন নাকি?' ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় সেটা ওকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠল। আগের মতোই ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, 'ঐ গাড়িটার কথাই জিগগেস করছিলাম।'

লেন্‌ত্‌স তিড়বিড় করে জলে উঠল। ওর নাক ফুলে-ফুলে উঠছে, কারো অভদ্র ব্যবহার ও একেবারে সইতে পারে না। কিন্তু ও মুখ খোলবার আগেই, হঠাৎ যেন অদৃশ্য হাতের ঠেলায় বুইক্ গাড়ির অন্য দরজাটি গেল খুলে। প্রথমে দেখা দিল ছোট্ট একখানি পা, সুশ্রী একখানি পা হাঁটু অবধি, তারপরেই জলজ্যান্ত একটি মেয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে, আস্তে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। গাড়ির ভিতরে যে দ্বিতীয়

একটি প্রাণী ছিল, আমরা আগে লক্ষ্যই করিনি। মুহূর্তে লেন্‌ত্‌স-এর ভাবভঙ্গি একেবারে বদলে গেল। সারা মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। ও একলাই নয়, আমরাও সবাই হাসছি—কেন হাসছি, ভগবান জানেন।

মোটা লোকটি খুব অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে। কি বলবে, কি করবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না। শেষটায় নমস্কার করে বলল, 'বিন্‌ডিং'—যেন নিজের নামটা উচ্চারণ করা ছাড়া আর কোনো কথাই তার মুখে যোগাল না। মেয়েটি ততক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন ওদের সঙ্গে ভাব করতে ব্যগ্র। লেন্‌ত্‌স তাড়াতাড়ি কোষ্টারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অটো, যাও না, গাড়িটা ওঁদের দেখিয়ে দাও।'

অটোর চোখে মুহূর্তের জন্য হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' বিন্‌ডিংও বলল, 'হ্যাঁ, গাড়িটা একবার দেখলে হত।' ওর গলার স্বর এরই মধ্যে একটু নরম হয়ে এসেছে। 'আপনাদের গাড়ির দেখছি অদ্ভুত স্পীড্, আমাকে তো বেদম হারিয়ে দিল।'

ওরা দুজনে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কোষ্টার কার্লের বনেট্‌টা খুলে ফেলল। মেয়েটি গেল না, আমি আর লেন্‌ত্‌স যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলুম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম গট্‌ফ্রিড্ এমন স্বর্ণ সুযোগ ছাড়বে না, কথায়বার্তায় এক্ষুনি জমিয়ে নেবে। এসব ব্যাপারে সে খুব মজবুত। কিন্তু আজকে লেন্‌ত্‌স-এর মুখেও কথা যোগাচ্ছে না। সাধারণত দেখেছি মেয়েদের সঙ্গে সে প্রায় মোরগের মতো ঘেঁষাঘেষি করতে পারে। সেই লেন্‌ত্‌স এখন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীটির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কথাটি নেই।

শেষটায় আমিই কথা বললুম, 'মাপ করবেন, আপনি যে গাড়িতে ছিলেন তা আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের ব্যবহারটা মোটেই ভদ্রোচিত হয়নি, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে।'

মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'কেন? কই, কিচ্ছু অন্যায় তো হয়নি।' মেয়েটির গলার স্বর খুব স্থির, গম্ভীর।

'হ্যাঁ তা অন্যায় না হলেও ঠিক এমনটা করা উচিত হয়নি। আমাদের ঐ গাড়ির স্পীড্ ঘণ্টায় প্রায় দুশো কিলোমিটার।'

মেয়েটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কোটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিল, 'অ্যাঁ, বলেন কি, দুশো কিলোমিটার!'

'একেবারে ঠিকঠাক বলতে গেলে ১৮৯·২ কিলোমিটার।' এতক্ষণে লেন্‌ত্‌স-এর মুখ থেকে কথা বেরুল একেবারে পিস্তলের আওয়াজের মতো।
মেয়েটি হেসে বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম বড় জোর ষাট-সত্তর হবে।'
আমি বললুম, 'তা আপনারা কেমন করে জানবেন, দেখে তো কিছু বোঝবার জো নেই।'
'না, আমরা কিছু বুঝিনি। ভেবেছিলাম বুইকটা ওর চাইতে অন্তত দ্বিগুণ বেগে যেতে পারবে।'
গাছের একটা ভাঙা ডাল পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আমি বললুম, 'তা আপনাদের পক্ষে ওরকম ভাবা স্বাভাবিক, তবে আমরা জানতুম—আচ্ছা, হের্ বিন্‌ডিং বোধ করি আমাদের ওপর মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন।'
মেয়েটি হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, তা একটু হয়েছেনই। তা এক-আধবার এমন হারতে হয়ই।'
'ঠিক বলেছেন—'
খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। আমি লেন্‌ত্‌স-এর দিকে তাকাচ্ছি, তার মুখে একটি অর্থহীন হাসি লেগে আছে, আর নাকটা অকারণে ফুলে-ফুলে উঠছে।
বার্চের পাতায় হাওয়ার শিরশিরানি। বাড়িটার পিছন থেকে একটা মুর্গি ডেকে উঠল।
নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললুম, 'খাসা রাত্তিরটি কিন্তু।'
মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, চমৎকার।'
লেন্‌ত্‌স বলল, 'আর ভারি মোলায়েম আবহাওয়া।'
আমি বললুম, 'এমনটা বড় একটা দেখা যায় না।'
আবার সবাই চুপচাপ। মেয়েটি নিশ্চয় আমাদের দুজনকে দুটি আস্ত উজবুক ঠাউরেছে, কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও বলবার মতো কোনো কথাই আর খুঁজে পেলুম না। লেন্‌ত্‌স বাতাসে যেন কিসের গন্ধ শুঁকছে, খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'আপেলের চাটনি হে! আঃ, মেটুলির সঙ্গে জমবে ভালো।'
'সে আর বলতে!' কথাটা বলে মনে-মনে নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করতে লাগলুম।
কোষ্টার আর বিন্‌ডিং ফিরে এল। এই ক'মিনিটের মধ্যেই বিন্‌ডিং একেবারে নতুন মানুষটি হয়ে গেছে। কোষ্টার যে রীতিমতো একজন মোটর বিশারদ তাই বুঝতে পেরে সে আহ্লাদে আটখানা, মুখে চোখে খুশি উপচে পড়ছে।

আমাদের বলল, 'আসুন না, আপনারাও আমাদের সঙ্গে খাবেন, অবশ্যি যদি আপত্তি না থাকে।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'কিচ্ছু মাত্র না।'

সবাই ভিতরে ঢুকছি। দরজার কাছে এসে লেন্‌ত্‌স চোখের ইশারায় মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সেই সকালবেলা উঠেই অপয়া বুড়িটাকে দেখেছিলে না! তা এমন একটি মেয়ে ওরকম দশটা ডাইনির ফাঁড়া কাটিয়ে দিতে পারে—'

বললুম, 'পারে তো ভালো—কিন্তু তাই যদি হয়, নিজে চুপটি করে থেকে আমাকে দিয়ে অমন বোকার মতো কথা কওয়ালে কেন?'

লেন্‌ত্‌স হেসে উঠল, 'আর কতদিন কচিখোকাটি থাকবে চাঁদ, এবার নিজে একটু সাঁতার কাটতে শেখ।'

'থাক, আর শিখে কাজ নেই, ঢের শিখেছি।'

ওদের পিছন-পিছন আমরাও গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ওরা ততক্ষণে টেবিলে বসে গিয়েছে। হোটেলওয়ালি মেটুলি আর আলুভাজা নিয়ে হাজির। তার সঙ্গে এক বোতল রাই হুইস্কি।

বিন্‌ডিং-এর মুখে খই ফুটছে। মোটর সম্পর্কে কেন বৃত্তান্ত নেই সে না জানে, শুনে আমরা অবাক। অটো মোটর-দৌড়ে ঢের বাজিমাত করেছে শুনে তার ভক্তিশ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল

আমি লোকটাকে আরো খুঁটিয়ে দেখছি। মোটা হোঁতকা চেহারা, লাল টকটকে মুখের উপরে বিষম পুরু ভুরু। লোকটার অজস্র বকুনির মধ্যে একটু হামবড়া ভাব আছে, খুব চেঁচিয়ে কথা কয় মনটা সরল বলেই বোধহয় এরকম। সংসারে যারা কিছু করে নিয়েছে, সে ধরনের লোক যেমনটা হয় এও তেমনি। আমি বেশ বুঝতে পারছি এ সব লোকই রোজ ঘুমুতে যাবার আগে হৃষ্টচিত্তে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটি দেখে-দেখে নিজেই নিজেকে তারিফ করে।

লেন্‌ত্‌স আর আমার মাঝখানে বসেছে মেয়েটি। গায়ের কোটটি খুলে ফেলেছে, তলায় ছাই রঙের ইংরিজি পোশাক। গলায় একটি স্কার্ফ জড়ানো। মাথায় বাদামী রঙের রেশমি চুল, ল্যাম্প-এর আলো পড়ে একটু হলদে আভা দিয়েছে। দু'কাঁধ খুব সোজা করে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছে। সরু পাতলা হাত দুটি লম্বা ধাঁচের। নরম তুলতুলে নয় বরং একটু শক্ত। মুখখানি লম্বা ছুঁচলো, বোধ করি একটু ফ্যাকাশে, কিন্তু বড়-বড় চোখ দুটিতে অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস আছে। মোটের উপর মেয়েটি দেখতে বেশ ভালো, এ বিষয়ে কোনো

সন্দেহই নেই। তবে এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। ওদিকে লেন্‌ত্‌স-এর ভিতরে বাইরে একেবারে আগুন ধরে গেছে। এই খানিকক্ষণ আগে ও যা ছিল এখন একেবারে অন্য মানুষটি। মাথাভরা হলদে রঙের চুল হুপু পাখির ঝুঁটির মতো চকচক করছে। মুখ থেকে অনর্গল চম্‌কা চম্‌কা সব বুলি বেরোচ্ছে। ও আর বিন্‌ডিং দুজনে মিলেই টেবিল মাত করে রেখেছে। আমি চুপটি করে বসে আছি, কিছু করবার নেই—মাঝে-মাঝে এর ওর দিকে প্লেট এগিয়ে দিচ্ছি কিম্বা সিগারেট সাধছি। আর বিন্‌ডিং-এর সঙ্গে পানপত্র ঠোকাঠুকি করছি, সেটা খুব ঘন-ঘনই হচ্ছিল।

হঠাৎ লেন্‌ত্‌স কপাল চাপড়ে উঠল, 'ঐ দেখ, আমাদের রাম্ রয়েছে যে। বব্, যাও-যাও, শিগগির আমাদের জন্মদিনের রাম্ নিয়ে এস।'

'জন্মদিন!' মেয়েটি বলল, 'আপনাদের কারো জন্মদিন নাকি আজ?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আমারই জন্মদিন। তাই নিয়ে আজ সারাদিন ওরা আমাকে জ্বালাতন করছে।'

'জ্বালাতন! বাবাঃ, তাহলে তো দেখছি আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোও নিরাপদ নয়!'

বললুম, 'না, না, শুভেচ্ছা তো আলাদা কথা।'

'বেশ, তাহলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন।'

মুহূর্তের জন্য দুজনে হাতে হাত মেলালুম, ওর উষ্ণ হাতের চাপটুকু বেশ লাগল। তারপরে বেরিয়ে গেলুম রাম্ আনতে। ছোট্ট বাড়িটিকে ঘিরে রাত্রির অন্ধকারটা কি বিরাট, কি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। গাড়ির সিটগুলি ঠাণ্ডায় ভিজে-ভিজে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলুম। বহুদূরে শহরের আলোগুলি আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে। বাইরে ওখানটায় এত ভালো লাগছিল, ভিতরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ওদিকে যে লেন্‌ত্‌স হাঁক দিতে শুরু করেছে।

রাম্ জিনিসটা বিন্‌ডিং-এর ঠিক ধাতে সয় না। দ্বিতীয় গ্লাশের পরেই সেটা বেশ বোঝা গেল। টেবিল ছেড়ে যখন বাগানের দিকে উঠে গেল তখন সে রীতিমতো টলছে। লেন্‌ত্‌স বার্-এ ঢুকে এক বোতল জিন্ চাইল। আমি ওর সঙ্গে-সঙ্গে গিয়েছি। আমার দিকে ফিরে বলল, 'খাসা মেয়ে, কি বল?'

'কি জানি ভাই, আমি অত খুঁটিয়ে দেখিনি।' লেন্‌ত্‌স বেশ খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, 'আচ্ছা,

খোকাবাবু, কি জন্যে তুমি বেঁচে আছ আমাকে বল তো?' বললুম, 'আমি নিজেই তো কতদিন ধরে সে কথাটার জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

লেন্‌ত্‌স হেসে উঠল, 'সে জবাবটা ইচ্ছে করলে আমি দিতে পারি। থাকগে, এখন বলব না। তার চেয়ে বরং ঐ হোঁতকার সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্কটা কি তাই আঁচ করতে পারি কিনা দেখি গে।' বিন্‌ডিং-এর খোঁজে সে বাগানের দিকে চলে গেল। খানিক বাদে দুজনেই আবার বার্‌-এ ফিরে এল। ভাব দেখে মনে হল যেটুকু হদিস্ মিলেছে সেটুকু বেশ আশাজনক। কারণ, গট্‌ফ্রিড রাস্তা খোলসা দেখে এরই মধ্যে ফুর্তিসে বিন্‌ডিং-এর সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়েছে। দুজনে মিলে আর এক বোতল জিন্ নিঃশেষ করল। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল একজন আর একজনের পিঠ চাপড়াচ্ছে, যেন কতকালের বন্ধু। লেন্‌ত্‌স এমনিতেই দিল্‌দরিয়া মানুষ তার উপরে মেজাজ খুশি থাকলে ওকে আর সামলায় কে? নিজেই নিজেকে সামলাতে পারে না। বিন্‌ডিংকে ও একেবারেই বগলদাবা করে ফেলেছে। বাগানে গিয়ে দুজনে মিলে গলা ছেড়ে গান ধরল। বলা বাহুল্য মেয়েটি ইতিমধ্যে লেন্‌ত্‌সকে বিলকুল ভুলেই গেছে।

আমরা তিনজন সরাইখানার বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি। হঠাৎ চারিদিকটা খুব নীরব হয়ে গেছে। ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছে। হোটেলওয়ালি এসে টেবিল সাফ করে চলে গেল। বাদামী রঙের একটা কুকুর স্টোভের সুমুখে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ঘুমের মধ্যে কুকুরটা মাঝে-মাঝে কি্‌য়ে কেঁদে উঠছে। জানালার বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। থেকে-থেকে ওদের দুজনের গানের সুর ভেসে আসছে। সবটা মিলিয়ে ভারি অদ্ভুত লাগছে, মনে হচ্ছে এই ছোট্ট ঘরটা যেন আমাদের তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে অন্ধকার রাত্রি ভেদ করে, কত দীর্ঘদিনের স্মৃতি বিস্মৃতিকে পিছনে ফেলে।

ভারি অদ্ভুত একটা অনুভূতি। কালের প্রবাহ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এতকাল সময়কে দেখেচি নদীর স্রোতের মতো—নিবিড় তমসা থেকে নির্গত হয়ে আবার কোন তিমিরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে এ যেন একটি হ্রদ—জীবনের শান্ত প্রতিচ্ছবিটি বুকে করে পড়ে আছে। হাতের গ্লাশটা তুলে ধরলুম, তরল মদিরাটুকু চক্‌চক্ করে উঠল। সকালবেলায় কারখানায় বসে জীবনের যে হিসেব-নিকেশটা করেছিলুম সে কথা মনে পড়ে গেল। তখন মনটা বড় দমে গিয়েছিল, এখন মন হালকা হয়ে গেছে। ওদিকে কোষ্টার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে, কী বলছে শুনবার ঔৎসুক্য ছিল না। আমার সবে একটু নেশার ঘোর লেগেছে, রক্ত

চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অ্যাডভেঞ্চারের মোহে অতিমাত্রায় রঙিন বোধ হচ্ছে। বাইরে লেন্‌ত্‌স আর বিন্‌ডিং তখনো গান করছে। আমার পাশে বসে মেয়েটি কথা বলে যাচ্ছে—খুব আস্তে, নিচু গলায়, গলার স্বর একটু যেন ভাঙা-ভাঙা। ধীরে-ধীরে আমি গ্লাশটি নিঃশেষ করলুম।

ওরা দুজন ফিরে এল। খোলা হাওয়ায় ওদের মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। এবার আসর ভঙ্গ করা দরকার। মেয়েটির কোট পরিয়ে দেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালুম। মেয়েটিও কোট পরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘাড়টি এক দিকে কাত করা, মুখে একটু মৃদু হাসি, সেটা বিশেষ করে কারো উদ্দেশে নয় কারণ ও তাকিয়ে আছে সিলিং এর দিকে। কোট পরাতে গিয়ে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য আমি থমকে দাঁড়ালুম। আরে, আমি এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ বুঝতে পারলুম লেন্‌ত্‌স-এর ফুর্তির কারণটা।

মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। তাড়াতাড়ি কোটটা তুলে পরাতে গেলুম। বিন্‌ডিং-এর দিকে এক নজর তাকালুম। টেবিলের পাশে ও দাঁড়িয়ে, মুখখানা চেরি ফলের মতো টকটকে লাল, চোখের দৃষ্টি এখনও ঘোলাটে। বললুম, 'উনি গাড়ি ঠিকমতো চালাতে পারবেন মনে করেন?'

'তা পারবেন বোধহয়—'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তেমন নিরাপদ যদি বোধ না করেন, বলেন তো আমরা কেউ যেতে পারি আপনার সঙ্গে।'

পাউডার-এর কৌটো খুলতে-খুলতে মেয়েটি বলল, 'না, ঠিক আছে। বরং পেটে কিছু পানীয় পড়লে ও গাড়ি আরো ভালো চালায়।'

'ভালো চালাতে পারেন, কিন্তু সাবধানে চালান কিনা সেটাই বিবেচ্য।' মেয়েটি কিছু না বলে আয়না থেকে মুখ সরিয়ে একবার আমার দিকে তাকাল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'আশা করি রাস্তায় কোনো বিপদ আপদ ঘটবে না।' বোধকরি একটু অনাবশ্যক উদ্বেগ প্রকাশ করছিলুম। কারণ বিন্‌ডিং তো দিব্যি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পা টলছে না তো। আসল কথা আমি চাচ্ছিলুম আজকের দেখাটাই যেন শেষ দেখা না হয়, একটু যোগসূত্র রাখা দরকার। বললুম, 'আপনার আপত্তি না থাকলে সকালবেলায় একবার টেলিফোন করে জানতে চাই নিরাপদে পৌছলেন কিনা।'

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

আমি আবার বললুম, 'দেখুন আমাদেরও দোষ আছে, মদের মাত্রাটা একটু

বেশি হয়ে গেছে কিনা। বিশেষ করে আমারই দোষ। আমার ঐ জন্মদিনের রাম্‌টাতেই সব মাটি করেছে।'

মেয়েটি হেসে উঠল, 'আচ্ছা, আপনার ইচ্ছে হলে টেলিফোন করবেন— ওয়েস্টার্ণ ২৭৯৬।'

বাইরে বেরিয়ে এসেই নম্বরটা টুকে নিলুম। ওদের তুজনকে রওনা করে দিয়ে আমরা আর এক দফা গ্লাশ নিয়ে বসলুম। এবার আমরাও বেরিয়ে পড়লাম কার্লকে নিয়ে। মার্চ মাসের পাতলা কুয়াশা ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে কার্ল। শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে, আমাদের নিশ্বাস ঘন-ঘন উঠছে পড়ছে। শহরের আলোগুলি যেন আমাদের দিকে ছুটে এগিয়ে আসছে। ক্রমে দেখা দিল আমাদের পানসত্রের আলোকোজ্জ্বল সাইন বোর্ড 'দি বার্‌।' দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন আলোর মালা পরা একটি বিচিত্র জাহাজ। দোকানের এক পাশ ঘেঁষে কার্ল নোঙর ফেলল। তারপরে শুরু হল আরেক দফা—গেলাশে-গেলাশে কোনিয়াকের সোনালি আভা উপছে পড়তে লাগল, তরল জিন্‌ নীলা পাথরের মতো চক্‌চক্‌ করে উঠল, আর রাম্‌ দেহে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার এনে দিল। বার্‌-এর উঁচু টুলগুলিতে আমরা সোজা হয়ে বসে আছি। ওদিকে বাজনা বাজছে আর আমাদের বুকে জীবনের স্পন্দন দ্রুততালে নেচে উঠছে। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া নিরানন্দ গৃহের কথা, জীবনের হতাশার কথা সব এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছি। বার্‌-এর কাউন্টারকে মনে হচ্ছিল যেন জাহাজে কাপ্তেনের ব্রিজ, আমরা যেন আবার অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিনটা ছিল রবিবার। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলুম, বিছানায় রোদ এসে পড়াতে জেগে গেলুম। ধড়মড়িয়ে উঠে জানালাটা ভালো করে খুলে দিলুম। দিব্যি পরিষ্কার দিনটি। আস্তে-আস্তে জানালার ধারে স্পিরিট-স্টোভটি জালিয়ে কফির কৌটোটি নিয়ে বসলুম। আমার ল্যাণ্ড-লেডি ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে বলে নিজের ঘরেই কফি করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। ওর পানসে কফিতে আমার মন ওঠে না, বিশেষকরে আগের রাত্রে পান-ভোজটা যদি একটু বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। গত দু'বছর যাবৎ এই বোর্ডিং-এ আছি। জায়গাটা আমার ভালো লেগে গেছে। একটা না একটা কিছু এখানটায় লেগেই আছে। কারণ কাছেই রয়েছে শ্রমিক সভার আস্তানা, শান্তি-সেনার ব্যারাক আর কাফে ইন্টার-ন্যাশনাল। বাড়িটার ঠিক সুমুখেই একটা পুরোনো কবরস্থান, অবিশ্যি এখন আর সেটা ওকাজে ব্যবহার হয় না। বড়-বড় কতকগুলি গাছ থাকাতে জায়গাটা পার্কের মতো হয়ে গেছে, নির্জন রাত্রে মনে হবে ঠিক যেন পাড়াগাঁ। ওদিকে আবার অনেক রাত্তির পর্যন্ত হৈ-হল্লা চলে। কারণ কবরস্থানটার ওপাশেই একটা অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক রয়েছে, সেখানটায় নাগরদোলা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। গোরস্থানটা থাকাতে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ব্যবসার যথেষ্ট সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। ঘর ভাড়া দেবার সময় বলত, 'দেখুন না কি চমৎকার হাওয়া আর কেমন খোলা জায়গা।' কাজেই সেই বাবদে কিঞ্চিৎ বেশি ভাড়া দাবি করবেই। আরেকটা বাঁধা বুলি ওর ছিল, 'একবার মশাই, ঘরের পোজিশনটা ভেবে দেখুন তো।'

আস্তে-আস্তে কাপড় জামা পরতে লাগলুম। ছুটির একটা বিলাস। মুখ হাত ধুয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলুম। কফি ভিজিয়ে দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিলুম। রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে, জানালায় দাঁড়িয়ে তাই

খানিকক্ষণ দেখলুম। গোরস্থানের বড়-বড় গাছগুলিতে পাখি ডাকছে। বেশ লাগছে, ছোট-ছোট পাখির কণ্ঠে যেন বিধাতার বাঁশি বেজে উঠেছে—ঐ আনন্দমেলার বাজনার করুণ সুরে সুর মিলিয়ে। সব মিলিয়ে মোট গুটি ছয় সাত শার্ট আর মোজা আমার সম্বল, কিন্তু তাই নিয়ে এমন বিষম বাছাবাছি শুরু করে দিলাম যেন ঘরভর্তি আমার জামা কাপড়। শিস দিতে-দিতে পকেট হাতড়ে জিনিসপত্র বের করলুম—কিছু খুচরো পয়সা, একটি ছোট ছুরি, চাবির গোছা, সিগারেট, আর সেই সঙ্গে এক টুকরো কাগজ—তাতে লেখা রয়েছে সেই মেয়েটির নাম আর টেলিফোন নম্বর। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান—অদ্ভুত নাম প্যাট্রিসিয়া, সচরাচর শোনা যায় না। কাগজের টুকরোটা টেবিলের উপরে রাখলুম। এই মোটে গতকাল রাত্তিরের ব্যাপার, অথচ মনে হচ্ছে যেন কতকাল আগের ঘটনা! মদের নেশা টুটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ভুলে যাবার উপক্রম। মদের ঐ তো মজা—একেবারে অচেনা লোকের সঙ্গেও কত তাড়াতাড়ি ভাব জমে যায়। কিন্তু তারপরে রাত্রি আর প্রভাতের মাঝখানে ব্যবধানটুকু মনে হয় যেন কত যুগ যুগের ব্যবধান।

কাগজের টুকরোটা কতগুলো বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে রাখলুম। মেয়েটিকে টেলিফোন করব নাকি? করলেও হয়, না করলেও হয়। এসব ব্যাপার রাত্তিরেই এক রকম, সকাল বেলায় আরেক রকম মনে হয়। ভালোই হল, এতদিনে মনে আমার একটু শান্তি এসেছে। গত ক'বছর ধরে মেলাই হাঙ্গামা গেছে। কোষ্টার সব সময় বলে, মিছামিছি হাঙ্গামা বাড়িও না হে। কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানেই হচ্ছে তুমি সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবে সংসারে কিছুই ধরে রাখা যায় না।

ওদিকে এরই মধ্যে পাশের ঘরে নিত্য নৈমিত্তিক ঝগড়া বেধে গেছে। কালকে রাত্তিরে এসে কোথায় যে টুপিটা রেখেছি তাই খুঁজছি আর ওদের কথাবার্তা শুনছি। হেসি আর তার স্ত্রীতে ঝগড়া বেধেছে। গত পাঁচ বচ্ছর ধরে স্বামী স্ত্রীতে ঐ ছোট্ট ঘরটিতে বাস করছে। ওরা আসলে লোক খারাপ নয়। বেশি কিছু না, তিন ঘরওয়ালা একটি ফ্ল্যাট্, একটি রান্নাঘর আর একটি বাচ্চা যদি থাকত তাহলে বোধ করি ওদের বিবাহিত জীবন কিছু অ-সুখের হত না। কিন্তু একটি ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিতে গেলেই তো অনেক টাকা, আর এই দুর্দিনে বাচ্চা!—তবেই হয়েছে। কাজেই দুটিতে কামড়াকামড়ি লেগেই আছে। স্ত্রীর মেজাজ তিরিক্ষি, আর স্বামী? পাছে তার সামান্য চাকরিটি যায় সেই ভয়েই জড়সড়।

চাকরি গেলে আর উপায় নেই। বয়েস হয়েছে পঁয়তাল্লিশ। এই কাজটি গেলে আর নতুন চাকরিতে কেউ ওকে নেবে না। এই তো এ যুগের বিপদ—আগে লোকের ডুবতে-ডুবতেও সময় লাগত, আর একবার ডুবলেও ভেসে উঠবার আশা থাকত। কিন্তু এখন, চাকরিটি একবার গেল তো বাকি জীবনে আর চাকরি পাবার আশা নেই।

ভেবেছিলাম চুপচাপ বেরিয়ে পড়ব, হঠাৎ দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে এসে হেসি ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল। ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষটি, সাতে নেই পাঁচে নেই। সামান্য কেরানি, কিন্তু কাজে খুব পাকা। হলে কি হয়, সংসারে এসব লোকের কদর নেই। শুধু আজ নয়, এরা কোনো কালেই আমল পায়নি। শান্ত শিষ্ট ভালোমানুষের বরাত ফিরতে কেবল গল্প উপন্যাসেই দেখেছি।

হেসি বললে, 'জানেন মশাই অফিসে আরো দুজনের চাকরি গেল, এর পরেই আমার পালা, সত্যি কিনা দেখবেন।'

এ মাসের মাইনের দিন থেকে পরের মাসের মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত ও সারাক্ষণ এই ভয়ে-ভয়ে থাকে। একটা গ্লাশে খানিকটা জিন্‌ ঢেলে ওকে দিলুম। লোকটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। ও একদিন হঠাৎ পড়বে আর মরবে, দেখলেই বেশ বোঝা যায়। ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তার উপরে দেখুন বাড়িতে এই গঞ্জনা।'

স্ত্রী ভাবে স্বামীর জন্যই তার যত দুর্গতি, সারাক্ষণ স্বামীকে কথা শোনায়। স্ত্রীর বয়েস হয়েছে বিয়াল্লিশ, ট্যাপসা মতন চেহারা, মুখের রঙ ফ্যাকাশে। অবিশ্যি স্বামীর মতো অতটা ও নেতিয়ে পড়েনি, তবে ইদানীং স্বামীর ভয়টা ওকেও পেয়ে বসেছে।

এসব ঝগড়াঝাঁটিতে মাথা গলানো কোনো কাজের কথা নয়। বললুম, 'হেসি, আমাকে তো ভাই এখন বেরুতে হচ্ছে। তুমি বরং এখানটায় বস, যতক্ষণ খুশি থাকতে পার। ঐ কাপড়ের আলমারিটায় কোনিয়াক আছে, ইচ্ছে হয় খেয়ো, না হয় তো ওখানটায় রাম্‌ আছে। আর এই রইল খবরের কাগজ। হ্যাঁ এক কাজ কোরো, আজ বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও একটু বেড়িয়ে এসো, যেখানে হোক। ঘরে বসে থেকো না, সিনেমায় যাওনা ঘণ্টা দুই সময় দিব্যি কেটে যাবে। ওসব কথা ভুলে থাকাই ভালো, বসে-বসে ভেবে কি লাভ?' উৎসাহ দেবার জন্য ওর পিঠ চাপড়ে দিলুম, কিন্তু নিজের মনেই তেমন উৎসাহ

পাচ্ছিলাম না। যাই বল, সিনেমা বেশ জায়গা—ওখানে বসে-বসে আর কিছু না হোক একটা কিছু স্বপ্নের জাল বোনা যায়।

ওদের ঘরের দরজাটা খোলা। দরজার সুমুখ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম ওর স্ত্রী কাঁদছে। ওদের পাশের ঘরের দরজাটা ভেজানো। কাছে দিয়ে যেতেই খুব উগ্র একটা সুগন্ধ নাকে এসে ঢুকল। ওঘরে থাকে আবুনা বোনিগ, কার যেন প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করে। মাইনে বেশি নয়, কিন্তু সেজেগুজে খুব কায়দামাফিক থাকে। সপ্তাহে একদিন নাকি ওর আপিসের কর্তা রাতভর ওকে চিঠি ডিকৃটেট্ করে। তার ফলে পরদিন বেচারীর মেজাজ বিষম খিঁচড়ে থাকে। সেটা পুষিয়ে নেবার জন্য রোজ সন্ধ্যায় ও কোনো না কোনো নাচঘরে চলে যায়। বলে, ওটি আছে বলেই বেঁচে আছি। যেদিন নাচবার শক্তি যাবে সেদিন আর বেঁচে থাকতে চাইনে। দুটি বন্ধু জুটিয়েছে। তার একজন ওকে ভালোবাসে, নিত্য ফুল দিয়ে যায়। অপরটিকে ও নিজেই ভালোবাসে, নিত্য টাকা যোগায়। ওর পাশের ঘরে থাকে কাউণ্ট অরলফ, লড়াইয়ের সময় অশ্বারোহীদলের ক্যাপ্টেন ছিল। জাতে রাশিয়ান, এখন দেশ ছাড়া। হরেক রকমের কাজ করে বেড়ায়। কখনো নাচের পার্টনার, কখনো হোটেলের ওয়েটার, সুযোগ পেলে চলচ্চিত্রে ছুটাছাটা অভিনয় করে, গিটারে বেশ হাত আছে। কপালের কাছে চুলে পাক ধরেছে। রোজ রাত্তিরে মেরি মাতার কাছে প্রার্থনা জানায় যেন একটি ভালো হোটেলে কেরানির কাজ পায়। আবার কখনো-কখনো মদ খেয়ে কান্না জুড়ে দেয়।

এর পাশের ঘরে ফ্রাউ বেগুার, অনাথ চিকিৎসালয়ের নার্স, বয়েস পঞ্চাশ। স্বামী মারা গিয়েছে লড়াইতে। দুটি সন্তান ছিল, সে দুটিও মরেছে আধপেটা খেয়ে ১৯:৮ সনে। একটি বেড়াল পুষেছে, সংসারে এখন এইটিই একমাত্র সম্বল। তার পাশে মুলার—ছিল অ্যাকাউন্টেণ্ট, এখন এক স্ট্যাম্প-সংগ্রাহক সমিতির পত্রিকা সম্পাদনা করে। লোকটি স্ট্যাম্প সংগ্রহের একটি জীবন্ত বিগ্রহ। ঐ নিয়েই মেতে আছে, আর কোনো খেয়াল নেই। বেশ সুখে আছে।

ওদিকের শেষ দরজাটায় গিয়ে ধাক্কা দিলুম। 'কিহে জর্জ, কিছু জুটল?' জর্জ মাথা নেড়ে বলল, না। ও বেচারি কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। কোনো রকমে শেষ পর্যন্ত কলেজের পড়াটা চালিয়ে নেবার জন্য ছেলেটা মাঝখানে দু'বছর এক খনিতে কাজ করে এসেছে। তাতে যা কিছু জমিয়েছিল এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আর বড় জোর মাস দুই চলতে পারে। আবার যে খনিতে গিয়ে

চাকরি নেবে তারও জো নেই। খনির শ্রমিকরাই বিস্তর বেকার বসে আছে। সামান্য কিছু রোজগারের জন্যে বেচারি অনেক ফিকির ফন্দি দেখেছে। হপ্তাখানেক তো এক মাখনের কারবারের বিল বিলি করে বেড়ালো, পরে দেখা গেল কারবার ফেল পড়েছে। ক'দিন বাদে পেল খবরের কাগজ ফিরি করবার কাজ, ভাবল এবার একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। তিনদিন না যেতেই দুই ফিরিওয়ালা ওকে পাকড়াও করে বলল, কোথায় বাপু তোমার লাইসেন্স? আমাদের ব্যবসায় তোমার নাক গলানো কেন? ওর হাত থেকে খবরের কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। ওকে খুব করে ধমকে দিল, আমাদের পুরোনো লোকরাই কত বেকার বসে আছে, আবার তুমি এসে জুটেছ! সেদিনের কাগজগুলো তো সব নষ্ট হল, বেচারিকে মিছিমিছি তার দাম দিতে হল। ও কিন্তু দমেনি, পরদিন আবার গেল কাগজ বিক্রী করতে। কিন্তু এমনি কপাল, সেদিন এক মোটর-সাইকেলওয়ালা পড়বি তো পড় একেবারে ওরই ঘাড়ের উপর, কাগজপত্র সব গেল ছিট্‌কে পড়ে কাদায়, মাটিতে। সেদিনও আবার দু মার্ক আন্দাজ গচ্চা গেল। তবু ছাড়েনি, তারপরেও আবার গিয়েছে। কিন্তু ফিরল যখন তখন তার কোট টুকরো-টুকরো করে ছেঁড়া আর কিল ঘুঁষি খেয়ে চোখ মুখ এই ফুলে উঠেছে। এর পরে আর ও কাজে যায়নি। এখন সারাদিন ঘরে বসে থাকে মুখ গোমড়া করে, সারাক্ষণ পড়ছে, যেন পড়াশুনা করে কতই তার লাভ হবে। সারাদিনে একটিবার মাত্র খায়। এত কষ্ট করে যে পড়ছে, যদি পাশও করে তাতেই বা কি লাভ? কোনো রকমের একটা চাকরি পেতে হলেও অন্তত দশটি বছর এখন বসে থাকতে হবে।

এক প্যাকেট সিগারেট ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। বললুম, 'জর্জ, এক কাজ কর, পড়াশুনা এখন ছেড়ে দাও। আমিও তো ছেড়ে দিয়েছিলুম। ইচ্ছে করলে পরেও আবার পড়াশুনা করতে পারবে।'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, একবার ছেড়ে দিলে পড়াশোনায় আর মন থাকে না। মাঝে খনির কাজে গিয়ে সেটা আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।'

বাপরে বাপ, ঐ তো চেহারা, ফ্যাকাশে মুখ, খাড়া-খাড়া কান, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, বুকটি সরু, রোগা প্যাঁকাটির মতো চেহারা! 'আচ্ছা, তবে সেই ভালো জর্জি, ভগবান করুন, তোমার যেন কপাল ফেরে।'

এর পরেই রান্নাঘর। দেয়ালে একটি বহুকালের পুরোনো বুনো শুয়োরের মাথা ঝুলছে। এটি মৃত জালেওয়াস্কির একটি স্মৃতিচিহ্ন। এক কোণে টেলিফোন,

ঘরটা আধ অন্ধকার। কিছুটা বা গ্যাস, কিছুটা বা পচা চর্বির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! দরজার কাছে যেখানটায় বেল টেপবার বোতাম, সেখানটায় কয়েকটি ভিজিটিং কার্ড ঝুলছে। আমার নামের কার্ডও রয়েছে—রবার্ট লোকাম্প্—দর্শনের ছাত্র দু'বার বোতাম টিপতে হবে। অনেক কালের কার্ড, নোংরা হয়ে গেছে, কাগজটা হলদেটে হয়ে এসেছে। দর্শনের ছাত্র!—বাবাঃ সে কি আজকের কথা! সিঁড়ি বেয়ে নেমে কাফে ইন্টারন্যাশনাল-এর দিকে এগুলাম।

লম্বা একটা বাড়ি, ভিতরটা অন্ধকার আর ধোঁয়াটে। পিছনের দিকে সারি-সারি কয়েকটা ঘর। যেখানটায় মদ বিক্রী হয় সেখানটায় দরজার একধারে একটা পিয়ানো। যন্ত্রটা বে-মেরামত হয়ে আছে, বেসুরো বাজে। তারটারগুলো ঠিক নেই, চাবিগুলোর মাথা ন্যাড়া, আইভরিটুকু খোয়া গেছে। কিন্তু তাহলেও যন্ত্রটা আমার বড় প্রিয়। ও যেন অনেক কালের পোষা ঘোড়া, এখন খোঁড়া হয়ে আছে। জীবনের একটি বছর অন্তত ও আমার নিত্যসঙ্গী ছিল। কারণ, এখানে আমি পিয়ানো বাজিয়েের কাজ করেছি।

পিছনদিকের ঘরগুলোতে মাঝে-মাঝে গোয়ালারা এসে জমা হত, অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক থেকেও লোকজন আসত, আর বেশ্যা মেয়ের দল দরজার কাছে বসে থাকত।

আমি যখন এলুম তখন বার্ একদম খালি। ওয়েটার এলয়স্ একলা বসে আছে কাউণ্টারের পিছনে। আমাকে দেখে বলল, 'আপনি বরাবর যা নিয়ে থাকেন তাই দেব তো?'

'হ্যাঁ।' পোর্ট আর রাম্ মিশিয়ে আমাকে এনে দিল। একটি টেবিলে বসে শূন্যদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছি। উপরের একটা জানালা দিয়ে খানিকটা আলো ত্যারছাভাবে এসে ঘরের ভিতর পড়েছে। র‍্যাকে সাজানো জিন্ আর ব্র্যাণ্ডির বোতলগুলো মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। এলয়স্ বসে-বসে গ্লাশ ধুয়ে পরিষ্কার করছে। হোটেল-কর্ত্রীর আদুরে বেড়ালটি পিয়ানোর উপরে বসে মিউমিউ করছে। আমি আপনমনে ধূমপান করছি। চারদিক এমন চুপচাপ, ঘুম পেয়ে যাবার মতো···কালকের সেই মেয়েটির গলার স্বরটি বড় অদ্ভুত, একটু ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু বেশ মিষ্টি। এলয়স্‌কে ডেকে বললুম, 'খবরের কাগজটাগজ থাকলে দিয়ে যাও তো।'

ক্যাঁচ করে দরজার আওয়াজ হল। ঢুকল রোজা, ও ঐ কারখানার কাছে থাকে, বেশ্যা মেয়ে। খুব দুর্দান্ত গোছের মেয়ে, সেজন্য সবাই ওর নাম দিয়েছে

লোহার ঘোড়া। বরাবরকার অভ্যাসমতো এই রবিবার সকালে ও এসেছে এক কাপ কোকো খেতে। কোকো খেয়ে যাবে বার্নডর্ফে ওর মেয়েকে দেখতে।

'নমস্কার, রবার্ট।'

'আরে রোজা যে! বাচ্চা কেমন?'

'এক্ষুনি যাচ্ছি দেখতে। এই দেখ না—ওর জন্য কি নিয়ে যাচ্ছি।' কাগজে জড়ানো পুঁটলি থেকে একটা ডল্ বের করলে। গাল দুটো টুকটুকে লাল, পেটটা একটু টিপে দিতেই ডলটা 'মা-মা' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বললুম, 'বাঃ, খাসা জিনিস তো।'

'আরে রোসো, এই দেখ।' পিছন দিকে চিত করে ধরতেই ডল্‌টা দুই চোখ দিব্যি বুজে ফেললে।

'তাই তো, এ তো ভারি আশ্চয্যি!'

রোজা খুব খুশি। যত্ন করে ডল্‌টিকে আবার কাগজে জড়াতে লাগল। 'হ্যাঁ রবার্ট, তুমি দেখছি সব জিনিসের কদর বোঝ। তুমি একদিন আদর্শ বাপ হবে, বলে রাখছি।'

বললুম, 'তাই নাকি? কে জানে!'

রোজা বেচারি মেয়ে-অন্ত প্রাণ। তিনমাস আগেও, মেয়েটা হাঁটতে শেখা পর্যন্ত, ও তাকে নিজের কাছেই রেখেছিল। নিজের ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট্ট কুঠুরি আছে তারই সাহায্যে সে ওকেও রেখেছে, নিজের ব্যবসাও চালিয়েছে। রাত্তিরে কোনো প্রণয়ীকে নিয়ে ঘরে এলে, ও কোনো অছিলায় লোকটিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকত। তাড়াতাড়ি প্যারামবুলেটারটা ঠেলে পাশের কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। তারপরে ফিরে এসে প্রণয়ীকে ঘরে নিয়ে যেত। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের শীতে বারবার বাচ্চাটাকে ঐ ঠাণ্ডা কুঠুরিতে ঢুকিয়ে রাখায় মেয়েটির ঠাণ্ডা লেগে যায়। এমনও অনেক সময় হয়েছে, ঘরে লোক রয়েছে, ওদিকে মেয়েটা শীতে ককিয়ে কেঁদে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে, যদিও সেটা রোজার পক্ষে মর্মান্তিক বলতে হবে। রীতিমতো পয়সা খরচ করে একটি শিশু প্রতিষ্ঠানে মেয়েকে রেখেছে। সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবা বলে নিজের পরিচয় দিতে হয়েছে। আসল কথা জানলে ওখানকার কর্তৃপক্ষ কক্ষনো মেয়েকে ওখানে জায়গা দিত না।

রোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'শুক্রবার দিন আসছ তো?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জন্য বলছি, বুঝেছ তো?'

'নিশ্চয়।'

আসলে কিন্তু আমি মোটেই বুঝিনি, তবু ওকে কিছু জিগগেস করলুম না। আমি কারো কোনো কথায় থাকি না, এখানে যখন পিয়ানো-বাজিয়ের কাজ করতুম সেই থেকেই এই নিয়ম মেনে আসছি। এর চাইতে ভালো পন্থা আর কিছু হতে পারে না। ফলে হয়েছে, সব মেয়ের সঙ্গেই আমার সমান বন্ধুত্ব। তা না হলে এখানে টিঁকে থাকাই মুশকিল হত।

'আচ্ছা রবার্ট, আসি তবে।'

'এসো, রোজা।'

আরো খানিকক্ষণ ওখানটায় বসে রইলুম। এই কাফেটি ছিল আমার রবিবারের বিশ্রামাগার। এখানটায় এলেই মনের মধ্যে ভারি একটি শান্তিপূর্ণ ঘুমপাড়ানি ভাব দেখা দিত। কিন্তু কেন জানি না, আজকে কিছুতেই মনে সে ভাবটা আসছিল না। বসে-বসে আর এক গ্লাস রাম্ পান করলুম, বেড়ালটাকে একটু আদর করলুম, তারপরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

সারাদিন শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম। মনটা ভারি অস্থির হয়েছে; দুদণ্ড স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারছিলুম না। অথচ কারণ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। বিকেলের দিকে একবার কারখানায় ঢুঁ মারলাম, দেখি কোষ্টার ক্যাডিলাকটা নিয়ে পড়েছে। এই কিছুদিন আগে গাড়িটা আমরা নামমাত্র দামে নিলামে কিনেছিলুম। এরই মধ্যে ওটার খোল নল্চে বদলে গাড়িটির ভোল ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবই হয়ে গেছে, এখন কোষ্টার শুধু এখানে ওখানে একটু অদল-বদল করছে। এই গাড়িটা দিয়ে আমাদের একটু দাঁও মারবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আদৌ কোনো খদ্দের মিলবে কিনা। এই দুর্দিনে এসব বড় গাড়ির চাহিদা তেমন নেই, সবাই চায় ছোট-ছোট গাড়ি। অটোকে বললুম, 'আমার তো ভাই, ভয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এটাকে নিয়ে আমরা বিপদেই পড়ব।'

কোষ্টার কিন্তু নিশ্চিন্ত। বলল, 'উঁহুঁ, ঐ বড়ও নয় ছোটও নয়, মাঝারি গোছের গাড়ি নিয়েই মুশকিলে পড়তে হয়। সস্তা গাড়ির যেমন চাহিদা রয়েছে, দামী গাড়িরও তেমনি চাহিদা আছে। টাকাওয়ালা লোক এখনও ঢের আছে হে, অন্তত এমন লোক আছে যারা দেখাতে চায় যে তাদের টাকা আছে।'

জিগগেস করলুম, 'গট্‌ফ্রিড্‌ কোথায় ?'

'বোধ করি কোনো পলিটিক্যাল মিটিং-এ গিয়েছে।'

'লোকটা পাগল নাকি! ওসব জায়গায় ওর কি দরকার ?'

কোষ্টার হেসে বলল, 'ও নিজেই কি আর তা জানে ? এই গায়ে একটু বসন্তের হাওয়া লেগেছে আর কি! আর ওকে তো জানোই, একটা নতুন কিছু পেলেই হল, অমনি তার পিছনে ছুটবে!'

বললুম, 'তা হবে। আচ্ছা কিছু করবার থাকে তো বল, আমিও হাত লাগাই।' দুজনে মিলেই এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। খানিকক্ষণ পরেই একেবারে অন্ধকার হয়ে এল, চোখে আর ভালো দেখা যায় না। কোষ্টার বলল, 'এই ঢের হয়েছে, এটা এখন দিব্যি চলে যাবে।' ঝুলকালি ধুয়ে হাত পরিষ্কার করে নিলাম। পকেট থেকে ব্যাগটি বের করে কোষ্টার বলল, 'এর ভিতরে কি আছে বল দেখি ?'

'কি জানি, বলতে পারছিনে।'

'আজকে রাত্তিরে কুস্তির লড়াই হবে, তারই টিকিট। দুখানা আছে। যাবে নাকি, চল।'

যাব কি যাব না, ইতস্তত করছিলুম। ও অবাক হয়ে বলল, 'ষ্টিলিং আর ওঅকারের লড়াই। খুব জমবে, দেখো।'

না যাওয়াটা ভালো দেখাচ্ছে না। তবু বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্‌কে নিয়ে যাও।' কেন যেন যেতে ইচ্ছেই করছিল না।

'বিশেষ কিছু কাজ আছে নাকি ?'

'না, না।'

কোষ্টার খুব কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বললুম, 'ভাবছি এখন বাড়ি ফিরে যাব। চিঠিপত্র কিছু লিখতে হবে। তা ছাড়া মাঝে-মাঝে একটু—' কোষ্টার হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে জিগগেস করল, 'অসুখ-বিসুখ করেনি তো তোমার ?'

'না, না, কিছু না। আমারও একটু বসন্তের হাওয়া লেগেছে আর কি।'

'আচ্ছা তবে তোমার যা ইচ্ছে।'

ওর কাছে বিদায় নিয়ে ঘরমুখো রওনা হলুম। কিন্তু ঘরে ফিরে এসেও করবার মতো কিছুই খুঁজে পেলুম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলুম। কেন যে ঘরে ফেরবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলুম এখন তো ভেবেই পাচ্ছি না। শেষটায় ভাবলুম যাই একবার জর্জের সঙ্গে দেখা করে আসি। যেতে-যেতে

মাঝখানে একেবারে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বুড়ি চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে কি, আপনি এখানে?'
মনে-মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'দেখতেই পাচ্ছেন।'
মাথার পাকা চুল দুলিয়ে বলল 'আজকে তাহলে বেরোননি, অ্যাঁ! অবাক করলেন যে।'
জর্জের ঘরে বেশিক্ষণ বসা হল না। মিনিট পনেরো পরেই ফিরে এলুম। ভাবছিলুম কিঞ্চিৎ পানীয় গ্রহণ করলে হত। অথচ ভিতর থেকে তেমন তাগিদ বোধ করছিলুম না। জানালার কাছে বসে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে লাগলুম।
সন্ধ্যার অন্ধকারে কবরখানাটায় বাদুড় ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছে। ট্রেডস হলের পিছনটাতে আকাশের খানিকটা দেখা যায়—কাঁচা আপেলের মতো সবুজ রঙ। রাস্তার আলো জ্বলছে। আবছা আলো, দেখলে মনে হয় শীতে জমে আছে। বইএর তলায় যেখানটায় টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজের টুকরোটা রেখেছিলুম সেখানটায় হাতড়ে দেখতে লাগলুম। এই যে পাওয়া গেছে, একবার ডেকে দেখতে দোষ কি? ফোন করব বলে ওকে তো একরকম কথাই দিয়েছিলুম। আসল কথা ওকে বোধহয় পাওয়াই যাবে না। এখন কি আর ঘরে বসে আছে?
প্যাসেজের এক ধারে যেখানটায় টেলিফোন রয়েছে সেখানটায় উঠে গেলাম। রিসিভারটা তুলে নিয়ে নম্বর বলতেই আগ্রহে, আনন্দে, আশায় আমার মনটা দুলে উঠল কালো রিসিভারটা যেন আমার জন্য কতই আনন্দের বার্তা নিয়ে আসছে। আরে মেয়েটি তো ঘরেই আছে দেখছি। ফ্রাউ জালেওয়াস্কির রান্নাঘর থেকে চর্বির গন্ধ আর থালা বাসনের আওয়াজ আসছে। তারই মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল মেয়েটির গলার আওয়াজ ঈষৎ ভাঙা-ভাঙা। খুব আস্তে কথা বলছে—যেন প্রত্যেকটি কথা ভেবে-ভেবে। আঃ, আমার মনের সব অস্থিরতা এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। পরশু দিন ওর সঙ্গে দেখা করব বলে স্থান কাল স্থির করে নিলুম, তারপর রিসিভার রেখে দিলুম। জীবনটা সারাদিন যতটা অর্থহীন ঠেকেছে এখন ততটা নিরর্থক মনে হচ্ছে না। নিজের মনেই বললুম, 'আচ্ছা পাগল বটে!'
তারপরে রিসিভার তুলে নিয়ে কোষ্টারকে ডাকলুম. 'অটো, তোমার টিকিট দুটো এখনও আছে?'
'আছে বৈকি।'

'ভালোই হল। আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে কুস্তির লড়াই দেখতে।'

কুস্তি দেখে সেদিন অনেক রাত অবধি আমরা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরলুম। রাস্তায় আলো আছে, লোকজন নেই। দোকানের কাচ-দেওয়া জানালায় বৃথাই আলো জ্বলছে। একটা দোকানে মোমের নগ্নমূর্তি রয়েছে, মুখে মাথায় নানারকম রঙ করা। রাত্রিবেলায় ওগুলোকে দেখাচ্ছে প্রেতমূর্তির মতো। পাশে একটা গয়নার দোকান, নানান রকম অলঙ্কারের ঝলমলানি দেখা যাচ্ছে। তারপরে একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর আলোয় আলোময়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে শাদা একটা গির্জা দাঁড়িয়ে আছে। শো-কেস্‌গুলিতে নানা রঙের সিল্কের ঢেউ লেগেছে। একটা সিনেমাগৃহের বাইরে কতগুলি রুগ্ন ক্ষুধার্ত মূর্তি জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। পাশে একটা মাংসর দোকান, তারও জাঁকজমক কম নয়। ফলভর্তি টিন উঁচু-করে রেখে টিনের টাওয়ার তৈরি হয়েছে। তুলো দেওয়া বাক্সতে পিচ ফল যত্ন করে রাখা হয়েছে। ধবধবে শাদা হাঁস লাইন বেঁধে দড়িতে ঝোলানো, শুকোতে দেওয়া কাপড়ের মতো দেখতে। লাল আটার পাউরুটি আর সেই সঙ্গে টিনের মাংস আর মাঝখানটায় দিব্যি সাজিয়ে রেখেছে লালচে কিম্বা হলদে রঙের মেটুলির প্যাটি আর টুকরো করে কাটা স্যামন মাছ।

পার্কের কাছে একটা বেঞ্চিতে আমরা বসলুম। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বাড়িগুলোর ছাদের উপর দিয়ে সরু চাঁদের ফালিটুকু দেখা যাচ্ছে। মাঝরাত হয়ে গেছে। কুলির দল ট্রাম লাইন মেরামত করছে। ফুটপাথের এক পাশে তারা তাঁবু খাটিয়েছে। হাপরের শব্দ হচ্ছে। তার চারদিক ঘিরে কতগুলো মনুষ্যমূর্তি ঝুঁকে বসে আছে। আগুনের ফুলকি এসে তাদের গায়ে ছিটকে পড়ছে। পাশে একটা প্রকাণ্ড আলকাতরার কড়া। তাই থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া উঠছে।

চুপচাপ বসে আছি। দুজনেই আপন চিন্তায় মগ্ন। বললুম, 'ভারি অদ্ভুত এই রবিবারগুলো, কি বল অটো?'

অটো মাথা নেড়ে বলল. 'হুঁ!'

আবার বললুম, 'ছুটির দিনটা শেষ হলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

কোষ্টার একটু অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'তার কারণ বোধহয় আমরা বড্ড বেশি রুটিনগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, এখন রুটিন থেকে মুক্তি পেলেই অস্বস্তি বোধ হয়।' গলার কলারটা উল্টে দিয়ে বললুম, 'আমরা যে জীবন যাপন কচ্ছি, তোমার কথায় তার গৌরব তেমন বাড়ে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে অটো একটু হাসল, বলল, 'বব, ক'বছর আগে যে জীবন যাপন করতাম তার মধ্যেই বা কি গৌরব ছিল ?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবু…'

অটোকে জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা মঙ্গলবার নাগাদ ক্যাডিলাক্‌টাকে খাড়া করা যাবে তো ?'

কোষ্টার বলল, 'মনে তো হচ্ছে। কেন বল তো ?'

'এই ভাবছিলুম…'

বাড়ি ফিরবার জন্য দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, 'আজকে আমার মেজাজটা বড্ড খারাপ হয়ে আছে, অটো।'

কোষ্টার বলল, 'ওরকম সবারই মাঝে-মাঝে হয়। যাও, বেশ করে ঘুমোও গিয়ে। গুডনাইট।'

ঘরে ফিরেও খানিকক্ষণ বসেই কাটিয়ে দিলুম। হঠাৎ কেন যেন মনে হল ঘরটা একেবারেই পছন্দসই নয়। বিদ্‌ঘুটে একটা আলো জ্বলছে, বিষম চমকা আলো চোখে লাগে। ভাঙাচোরা ছেঁড়া গদিওয়ালা চেয়ার, মেঝের সতরঞ্চিটা জঘন্য দেখতে। হাতমুখ ধোবার পাত্রটিও তেমনি। বিছানার দিকটাতে ওয়াটার্লুর যুদ্ধের একখানা ছবি দেয়ালে টাঙানো। নাঃ, কোনো ভদ্রলোককে এ ঘরে ডেকে আনা যায় না, মেয়েদের তো নয়ই। আনতে হলে বড় জোর ঐ ইন্‌টারন্যাশনাল কাফে থেকে কোনো বেশ্যা মেয়েকে আনা যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঙ্গলবার দিন সকালবেলায় কারখানার উঠোনে বসে আমরা প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম। ক্যাডিল্যাকটার কাজ শেষ হয়েছে। লেন্ৎস-এর হাতে একখানা কাগজ আর চোখে মুখে খুব উল্লাসের ভাব।

আমাদের বিজ্ঞাপন লেখবার ভার ওর উপর। ক্যাডিল্যাকটা বিক্রির জন্য যে বিজ্ঞাপন লিখেছে এইমাত্র তাই আমাদের পড়ে শোনাচ্ছিল। আরম্ভ করেছে এইভাবে: 'শৌখিন লোক গাড়ির শখ মেটাতে চান তো এই গাড়ি নিন। ছুটিছাটায়—রৌদ্রালোকিত দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করতে হলে'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। খুব একচোট কবিত্ব ঝেড়েছে, কিছুটা প্রেমের কবিতার মতো, কিছুটা শোনাচ্ছে একেবারে ধর্ম-সঙ্গীতের মতো।

কোষ্টার আর আমি দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। অতখানি কবিত্বের ধাক্কা সামলাতে একটু সময় দরকার বৈকি। লেন্ৎস ভেবেছে আমরা বুঝি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছি। খুব গর্বের সঙ্গে বলল, 'কবিত্বও আছে আবার ঝাঁঝও আছে, কি বল? নেহাত বাস্তব কথা বলতে গেলেও একটু কবিত্ব করে বলতে হয়, সেইটেই হল কায়দা। দুই বিপরীত জিনিসেই ভালো খাপ খায়।'

আমি বললুম, 'উঁহু, টাকা পয়সার ব্যাপারে ওসব খাটে না হে।'

গট্‌ফ্রিড্ একটু মাতব্বরি চালে বলল, 'আরে বাপু, লোকে টাকা বাঁচাবার জন্য গাড়ি কেনে না, টাকা খাটাবার জন্য কেনে। ব্যবসাদার লোকের রোম্যান্স ওখানেই শুরু, অবশ্য অনেকের আবার ওখানেই শেষ। কি বল অটো?

কোষ্টার কথাবার্তায় সাবধান, বলল, 'হ্যাঁ, তা তুমি তো জানোই—'আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কেন বাজে কথা বলে মিথ্যে সময় নষ্ট করছ, অটো। আমি বলছি ওটা স্বাস্থ্য-নিবাসের বিজ্ঞাপন হতে পারে, কিম্বা প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন হতে

পারে, কিন্তু মোটরের বিজ্ঞাপন কখনই নয়।' লেন্‌ত্‌স কি বলতে যাচ্ছিল। বললুম, 'আমাকে ভাই কথাটা শেষ করতে দাও। তুমি হয়তো ভাবছ আমাদের মতটা একপেশে। বেশ, তাহলে আমি বলি কি জাপ্‌কে ডেকে জিগগেস করা যাক। ওর কথা থেকেই সাধারণ লোকের মতামত জানা যাবে।'

জাপ্‌ আমাদের একমাত্র কর্মচারী, বছর পনেরোর এক ছোকরা। আমাদের এখনটায় অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ করে। ও পেট্রল পাম্পের কাজ দেখে। আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে, রাত্তিরে আবার থালা বাসন ধুয়ে মুছে রাখে। ছোট্টখাট্ট মানুষটি, মুখভর্তি দাগ আর ইয়া লম্বা খাড়া-খাড়া কান। কোষ্টার বলত, জাপ্‌ যদি দৈবক্রমে কোনো দিন এরোপ্লেন থেকে পড়ে যায় তাহলেও ওর কিচ্ছু হবে না। ঐ কানের জোরে ও দিব্যি আলগোছে এসে মাটিতে পড়বে।

জাপ্‌কে ডেকে আনলুম। লেন্‌ত্‌স ওকে বিজ্ঞাপনটা পড়ে শোনালো। কোষ্টার বলল, 'কেমন জাপ্‌ শুনলে তো, এখন বল তো এ ধরনের গাড়ি তোমার পছন্দসই কিনা।'

জাপ্‌ বলল, 'অ্যাঁ, গাড়ির কথা বলছেন?'

আমি হেসে উঠলুম।

লেন্‌ত্‌স ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, গাড়ি নয় তো কি? তুমি কি ভেবেছিলে, হিপোপটেমাস নাকি?'

জাপ্‌ বিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে জানতে চাইল গাড়িটার গিয়ার, ফ্লাই হুইল, ব্রেক ইত্যাদি কি ধরনের।

লেন্‌ত্‌স রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে গাধা, আমাদের ক্যাডিল্যাক্‌টার কথা বলছি।'

জাপ্‌ আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলল, 'তাই নাকি? আমি বুঝতেই পারিনি।'

কোষ্টার বলল, 'এখন দেখলে তো, গট্‌ফ্রিড্‌, এ যুগে কবিত্বের কদর কতখানি।'

'যা ব্যাটা যা পাম্প ত্থাখ্‌গে। হ্যাঁ, বিংশ শতাব্দীর ছেলে বটে, ধন্যি ছেলে।'

রাগে গজগজ করতে-করতে লেন্‌ত্‌স আপিস ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিজ্ঞাপনটা একটু অদল বদল করতেই হবে। কবিত্ব যথাসম্ভব বজায় রেখে এক-আধটু কলকব্জার কথা না ঢোকালে আর চলবে না।

কয়েক মিনিট পরেই গেট দিয়ে ঢুকলেন ইন্‌স্পেক্টর বারসিগ্‌। আমরা সসম্মানে ওঁকে অভ্যর্থনা করলাম। উনি হচ্ছেন ফিনিক্স মোটর ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির এঞ্জিনিয়ার। এঁর মারফতে মোটর মেরামতের ঢের কাজ পাওয়া যায়, এজন্য ওঁর

সঙ্গে আমরা খুব ভাব করে নিয়েছি। এঞ্জিনিয়ার হিসাবে উনি বিষম কড়া লোক, ওঁকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ওদিকে উনি আবার একজন প্রজাপতি সংগ্রাহক। প্রজাপতির বেলায় ওঁর মন একেবারে মাখনের মতো নরম। ওঁর প্রজাপতির সংগ্রহ সত্যি দেখবার মতো। একবার আমরা ওঁকে একটা মথ্ উপহার দিয়েছিলাম। ওটা একদিন রাত্তির বেলায় আমাদের কারখানায় এসে ঢুকেছিল। এ ধরনের মথ্ সচরাচর দেখা যায় না, অন্তত ওঁর সংগ্রহে তখনো এ জাতীয় জিনিস ছিল না। পেয়ে তিনি বিষম খুশি। আমাদের সে উপকার তিনি কখনো ভোলেননি। সেই থেকে আমরা যাতে মেরামতের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে পাই সে ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আমরাও যে-কোনো মথ্ হাতের কাছে পেলেই ধরে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিই।

লেন্ত্স ততক্ষণে আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। খুব বিনীতভাবে বলল, 'হের্ বার্সিগ্ একটু ভারমুথ্ ইচ্ছে করুন।'

বারসিগ্ বললেন, 'না, সন্ধ্যের আগে আমি কখনো পান করি না, এটি আমার বরাবরকার নিয়ম।'

লেন্ত্স এক গ্লাশ ঢেলে নিয়ে বলল, 'মাঝে-মাঝে নিয়মভঙ্গ না করলে নিয়ম পালনের আনন্দটা ঠিক বোঝা যায় না। আসুন, আমাদের সেই মথ্ আর প্রজাপতির স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

বারসিগ্ সামান্য ইতস্তত করে গ্লাশটি টেনে নিলেন। 'অমন করে বললে আর নিষেধ করা চলে না,' একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, 'তাহলে আমাদের ছোট্ট অক্স-আই মথ্টির স্বাস্থ্যও পান করতে হয়। আপনারা শুনে খুশি হবেন ইতিমধ্যে আমি একটি নতুন জাতের মথ্ আবিষ্কার করেছি—চিরুনির মতো শুঁড়ওয়ালা।'

লেন্ত্স সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপস্, তবে আর কি, এ বিষয়ে তো আপনি অগ্রদূত, ইতিহাসে আপনার নাম থেকে যাবে।'

উক্ত পতঙ্গের স্বাস্থ্য কামনা করে আরেক দফা পানীয় পরিবেশন করা হল। পানান্তে গোঁফ জোড়াটি সযত্নে মুছে নিয়ে বারসিগ্ বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাদেরও সুখবর আছে। ঐ ফোডগাড়িটা গিয়ে নিয়ে আসুন। কর্তৃপক্ষ আপনাদের দিয়েই মেরামত করাবেন স্থির করেছেন।'

কোষ্টার বলল, 'তা বেশ, কিন্তু আমরা যে খরচের এষ্টিমেট দিয়েছিলাম?'

'ওঁরা তাতেই রাজী হয়েছেন।'

'কিছু কাটছাঁট করেননি তো ?'

বারসিগ্ স্বভাবমতো একটি চোখ বুজলেন, 'হ্যাঁ, প্রথমটায় একটু মোড়ামুড়ি করেছিলেন বৈকি—তা শেষ পর্যন্ত—'

লেন্ত্স বলল, 'ব্যস্ তাহলে ফিনিক্স ইন্সিওরেন্সের নাম করে আরেক গ্লাশ হোক।' বলে গ্লাশে ঢালতে লাগল।

বারসিগ্ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। যেতে-যেতে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মেয়েটির কথা মনে আছে তো যে ফোর্ড গাড়িটাতে ছিল ? দুদিন আগে মেয়েটি মারা গেল। তেমন সাংঘাতিক আঘাত কিছুই লাগেনি, কয়েক জায়গায় কেটে গিয়েছিল মাত্র। রক্তপাতের দরুনই অবশ্য মারা গিয়েছে।'

কোষ্টার জিগগেস করল, 'মেয়েটির বয়স হয়েছিল কত ?'

'চৌত্রিশ বছর। চার মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল। বিশ হাজার মার্কের ইন্সিওরেন্স।'

আমরা তক্ষুনি গাড়ি আনতে বেরোলাম। গাড়িটা হচ্ছে একটি পাঁউরুটি ব্যবসায়ীর। লোকটা মাতাল অবস্থায় অন্ধকারে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে দেওয়ালের গায়ে পড়েছিল। স্ত্রী বেচারী আহত হল, কিন্তু ওর নিজের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি। আমরা গাড়িটা নিয়ে আসবার উদ্যোগ করছি এমন সময় লোকটা গ্যারাজে এসে হাজির। ষাঁড়ের মতো ইয়া মোটা ঘাড়, মাথাটা সামনের দিকে হেলানো। কথাবার্তা না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

পাউরুটিওয়ালাদের যেমনটা হয়ে থাকে—ওর মুখে একটা ফ্যাকাশে অস্বাস্থ্যকর ভাব আছে। আস্তে-আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে এসে জিগগেস করল, 'কদ্দিন লাগবে এটা মেরামত করতে ?'

কোষ্টার বলল, 'এই সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

লোকটা গাড়ির হুডটা দেখিয়ে বলল, 'এইটে সুদ্ধ তো ?'

অটো বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে। ওটা তো ঠিক আছে, ভাঙে-চোরেনি।'

পাঁউরুটিওয়ালা একটু অসহিষ্ণু ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, 'আমি তো বলিনি ভেঙেছে। আমি শুধু বলছি আমার একটি নতুন হুড্ চাই। এদিকে তো খুব দাঁও মেরেছেন। আরে ভাই, আপনারাই বা আমার কাছে কি লুকোবেন, আমিই বা আপনাদের কাছে কি লুকোব। কথাটা বুঝতেই তো পারছেন।'

কোষ্টার বলল, 'কই কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে।' আসলে খুবই বুঝেছে। লোকটা আমাদের কাছ থেকে ফাঁকতালে একটা নতুন হুড্ আদায় করে নিতে

চায়, কারণ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি হুড্‌ বদলে দিতে বাধ্য নয়। খানিকক্ষণ এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হল। লোকটা এখন ভয় দেখাচ্ছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে অন্য ফার্মের সঙ্গে সে মেরামতের ব্যবস্থা করবে। কোষ্টারকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল। অবিশ্যি রাজী সে হত না, কিন্তু তখন আমাদের এমন টানাটানি চলছে, কাজটা কিছুতেই হাতছাড়া করা চলে না।

মুখে ধূর্ত হাসি, লোকটা বলল, 'দেরি করে আর কি হবে? আমি এর মধ্যে একদিন গিয়ে জিনিসটা বেছে দিয়ে আসব। রঙটা ভালো হওয়া চাই—হালকা বাদামী হলে বেশ হয়।'

আমরা চলে এলাম। ওখান থেকে বেরিয়েই লেন্‌ত্‌স দেখালে গাড়ির সিটে বড় বড় কালো দাগ। বলল, 'ওর স্ত্রীর রক্ত। ব্যাটা জোচ্চুরি করে আমাদের কাছ থেকে একটা হুড্‌ আদায় করে নিচ্ছে। শখ দেখ না, ভালো রঙ চাই—হালকা বাদামী রঙ! বাহাদুর ছেলে বটে! আমার তো মনে হয় ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি থেকে দুজনের টাকা দাবি করবে। বারসিগ্‌ বলছিল না মেয়েটি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল।'

কোষ্টার ঘাড় নেড়ে বলল, 'কে জানে, তবে লোকটা ব্যবসাদার। ও হয়তো বলবে ব্যবসাতে কারো সঙ্গে খাতির-টাতির নেই। অবিশ্যি আমাদের কাছে আদায় করছে বলেই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি থেকেও আদায় করবে এমন কোনো কথা নেই।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু এক ধরনের লোক আছে কিনা, তারা অতি বড় দুর্ঘটনা থেকেও খানিকটা সুবিধে আদায় করে ছাড়ে। যাকগে, আমাদের যা সামান্য লাভ হত তার থেকে পঞ্চাশ মার্ক তো ওর সেবাতেই লাগছে।'

বিকেলবেলায় কোনো একটা অজুহাতে আমি বাড়ি চলে এলুম। পাঁচটা নাগাদ প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করবার কথা, কিন্তু সে কথা কারখানায় কাউকে বলিনি। ব্যাপারটা ওদের কাছ থেকে লুকোবার খুব যে একটা ইচ্ছে ছিল এমন নয়, তবে বলবার মতোও এমন কিছু নয়।

মেয়েটি একটা কোন কাফের ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে দেখা করবার কথা। আমি সে কাফে চিনি না, শুধু শুনেছি ওটা নেহাত ছোটখাটো রকমের একটা জায়গা। অতশত কিছু না ভেবে আমি তো কাফেতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ঢুকেই চক্ষু স্থির। ঘরটা একেবারে লোকে ঠাসা, বেশির ভাগ মেয়ে, আর সবাই

চেঁচাচ্ছে। মেয়েদের দোকান বললেই হয়। একটা টেবিল তক্ষুনি খালি হল, কোনোরকমে সেটা দখল করে গিয়ে বসলুম। চারিদিকে তাকাচ্ছি আর খুব অস্বস্তি বোধ করছি। আমি ছাড়া আর দুটি মাত্র পুরুষমানুষ দেখলুম এবং তাদেরও রকমসকম বড় ভালো ঠেকল না।

ওয়েটার এসে জিগগেস করলে, 'চা না কফি না কোকো?' টেবিলের উপরে কেক্-এর টুকরো-টাকরা পড়ে ছিল। ন্যাকড়া দিয়ে ঝেড়ে-ঝেড়ে আমারই গায়ে সব ফেলতে লাগল।

বললুম, 'এক গ্লাশ কোনিয়াক দাও।' ওয়েটার তক্ষুনি নিয়ে এল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এল একদল মেয়ে। ওরা জায়গা পাচ্ছে না, কফি খেতে এসেছে। ওদের দলপতি হচ্ছে জোয়ান গোছের একটি মেয়ে। কুস্তিগির-এর মতো দেখতে, মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা কঠিন। মাথায় একটা অদ্ভুত ধরনের টুপি। ওয়েটার আমার টেবিল দেখিয়ে বললে, 'এই যে আপনারা চারজন তো? আসুন, এই টেবিলে আসুন।'

আমি বললুম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই টেবিলটা আমি নিয়েছি, আমার একজন বন্ধু আসবার কথা, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি।'

ওয়েটার বললে, আজ্ঞে না, সে হয় না। সিট্ রিজার্ভ করতে হলে আগে করতে হয়, এখন তা সম্ভব নয়।'

জোয়ান মেয়েটি তখন টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ারের হাতল ধরে। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলুম বাধা দিয়ে কিছু লাভ হবে না। যা চেহারা ঐ মেয়ের—হাউইট্জার কামান দিয়েও ওকে ঠেকানো যাবে না। ওয়েটারকে চেঁচিয়ে বললুম, 'আচ্ছা বাপু, আরেক গ্লাশ কোনিয়াক তো এনে দাও।'

'আচ্ছা তাই এনে দিচ্ছি, বড় পেগ্ দেব?'

'হ্যাঁ, বড় পেগ্।'

ওয়েটার সেলাম করে বলল, 'তাই দিচ্ছি হুজুর,' একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'কি করব বলুন, ওটা ছ'জনের টেবিল কিনা।'

'তা বেশ তো। এখন কোনিয়াক নিয়ে এস।'

এদিকে ঐ কুস্তিগির মেয়েটি দেখছি শুধু কুস্তিই করে না, মদ্যপান নিবারণী সমিতির সভ্যও বটে। পচা মাছ দেখলে লোকে যেমন নাক সিটকায়, ও আমার পানপাত্রের দিকে তাকিয়ে তেমনি করছে। ওকে আরো চটিয়ে দেবার জন্য আমি আরেক পেগ্ হুকুম করলুম। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, তাই তো এ কি

পাগলামো করছি। এখানটায় আমার কি কাজ, সেই মেয়েটির সঙ্গেই বা আমার কি দরকার। এই চেঁচামেচি হৈ-চৈ-এর মধ্যে মেয়েটিকে বোধকরি আমি চিনতেই পারব না।

নিজের উপরেই রাগ হচ্ছিল। রাগের মাথায় ঢক-ঢক করে গ্লাশ খালি করে দিলুম। পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আরে এই যে।' হঠাৎ চমকে ফিরে দেখি ও পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'এসেই আরম্ভ করে দিয়েছ যে।'

গ্লাশটা তখনও আমার হাতে, তাড়াতাড়ি টেবিলে নামিয়ে রাখলুম। সব যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। মেয়েটির চেহারা একেবারে অন্য রকম ঠেকছে। সেদিন যেমন দেখেছিলুম সে রকম নয়তো। ঘর ভর্তি কেক-পুডিং-খাওয়া মোটাসোটা নাদুসনুদুস মেয়ের দল, তার মধ্যে ওকে দেখাচ্ছে ছিপছিপে আঁটসাঁট শক্ত সমর্থ মেয়েটি। চুপচাপ স্বভাব, দেখলে মনে হয় ওর কাছে ঘেঁষা বড় সহজ নয়। মনে-মনে ভাবলুম, এ মেয়ের সঙ্গে আমাদের তেমন খাপ খাবে না। মুখে বললুম, 'আরে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দেখা দিলে নাকি ? আমি তো সারাক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে বসেছিলুম।'

আঙুল দিয়ে ডানদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওদিকটায় আরেকটা দরজা আছে। কিন্তু আমার আসতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, তুমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছ নাকি ?'

'না, না, জোর দু'তিন মিনিট হবে। আমিও এইমাত্র এলাম।'

আমার টেবিলের কফির দল ততক্ষণ চুপ মেরে গেছে। জন চারেক বয়স্কা মেয়ে যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে তা বেশ বুঝতে পারছি। ওকে জিগগেস করলুম, 'এখানেই বসবে না আর কোথাও যাবে ?'

মেয়েটি এক নজরে টেবিলের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিলে। মুখে কৌতুকের হাসি, বলল, 'সব কাফেই এক রকম।'

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, 'দোকানটা খালি থাকলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু এ যে একেবারে নরক কুণ্ড। ভারি অস্বস্তি লাগছে। এর চাইতে কোনো বার্-এ গেলে ভালো হত।'

'বার্ ? দিনের বেলায়ও বার্ খোলা থাকে নাকি ?'

বললুম, 'আমার জানা বার্ আছে। আর যাই হোক, ওখানটায় অত শোরগোল নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

'আপত্তি ?—'

ওর মুখ দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ও কি বলতে চায়! ও আমাকে নিয়ে তামাশা করছে কিনা কে জানে!

পরমুহূর্তেই মেয়েটি বলে উঠল, 'বেশ, চল যাওয়া যাক।'

ওয়েটারকে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। লোকটা অলক্ষুণে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তিন পেগ্ কোনিয়াক—তিন মার্ক, তিরিশ ফেনিগ্।'

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, 'তিন মিনিটে তিন পেগ্! বাবাঃ, খুব যে চালিয়েছ!'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, কালকের দু পেগের দাম বাকি ছিল কিনা।'

পিছন থেকে কুস্তিগির মেয়েটি বলে উঠল, 'কত বড় মিথ্যাবাদী!' বেচারি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, আর পারল না।

তৎক্ষণাৎ ওদের দিকে ফিরে অভিবাদন করলুম, 'ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।' বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। বাইরে বেরিয়েই মেয়েটি জিগগেস করল, 'ওদের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে নাকি?'

'না, ঝগড়া কিছু নয়। তবে কিনা এই সব ধনীর দুলালীদের দেখলেই আমার মেজাজ কেমন বিগড়ে যায়।'

মেয়েটি বলল, 'আমারও তাই।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালুম। মনে হচ্ছে ও যেন অন্য এক জগতের লোক। ও কে, কোথাকার, কেমন ওর জীবনযাত্রা কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।

বার্-এ এসে অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলুম। ওদের ওয়েটার ফ্রেড্ কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে কোনিয়াকের বোতল সাফ করছে। আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করল যেন আগে কখনো দেখেনি। ওর ভাব দেখে কে বুঝবে যে মাত্র দুদিন আগেই রাত্তির বেলায় ও আমাকে ধরাধরি করে বাড়ি পৌছে দিয়েছে। বিষম হুঁশিয়ার লোক, বহুদিন ধরে কাজ করে-করে ও পাকা হয়ে গেছে।

ঘরটা বলতে গেলে খালি, শুধু একটি টেবিলে বসে আছে ভ্যালেন্টিন্ হসার্। ও জায়গাটি তার বাঁধা। সেই লড়াইয়ের সময় থেকে ওর সঙ্গে জানাশোনা। আমরা একই রেজিমেন্টে ছিলুম। একবার আমার একখানা চিঠি ও একেবারে ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে আমাকে পৌছে দিয়েছিল। ও ভেবেছিল ওটা আমার মায়ের চিঠি। কিছুদিন আগে মায়ের একটা অপারেশন হয়েছিল, সেজন্য চিন্তায় ছিলাম, ও তা জানত। আসলে বেচারির ভুল—ওটা মায়ের চিঠি নয়, খুলে দেখি একটা বাজে বিজ্ঞাপন—ট্রেঞ্চে পরবার জন্য গরম টুপির বিজ্ঞাপন। কিন্তু চিঠি দিয়ে ফিরে যাবার সময়—বেচারির পায়ে এসে গুলি লাগে।

লড়াইয়ের পরে ভ্যালেনটিন্-এর হাতে কিছু টাকা-পয়সা এসেছিল। ও তা মদ খেয়েই উড়িয়ে দিচ্ছে। লড়াই থেকে যে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছে, ও মনে করে সেটা তার পিতৃপুরুষের পরম ভাগ্যি। সেই আনন্দেই হরদম মদ খেয়ে যাচ্ছে। যদি বলা যায়, ও সব তো অনেক দিনের ব্যাপার হয়ে গেল, আর কদ্দিন তাই নিয়ে ফুর্তি করবে? ও বলে, আরে, এ কি যেমন তেমন বাঁচা—এ ফুর্তি কি কখনো শেষ হয়? লড়াইয়ের সম্বন্ধে ওর স্মৃতিশক্তি আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ। আমরা সবাই কত কথা এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছি, ও কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তের খুঁটিনাটি সব মনে রেখেছে।

চুপচাপ ওর জায়গাটিতে বসে আছে। বেশ প্রচুর পরিমাণে পান করেছে। মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায় মদে একেবারে চুর হয়ে আছে। হাত তুলে বললুম, 'নমস্কার ভ্যালেন্‌টিন্।'

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, বলল, 'নমস্কার, বব্।' আমরা আমাদের কোণটিতে বসে আছি। ওয়েটার কাছে আসতেই মেয়েটিকে জিগগেস করলুম, 'কি খাবে বল।'

ও বলল, 'মার্টিনি হলে মন্দ হয় না।'

বললুম, 'ফ্রেড্ ও জিনিসটি খাশা তৈরি করে।' ফ্রেড্-এর মুখে ঈষৎ হাসির আভা দেখা দিল। 'আমার বরাবর যা বরাদ্দ তাই দাও।'

বার্-এর ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা, একটু অন্ধকার। ঘরের মধ্যে জিন্ আর কোনিয়াক পড়ে-পড়ে কেমন একটা গন্ধ হয়ে গেছে—রুটি আর বেরি মেশালে যেমনটা হয় তেমনি। ঘরের ছাদ থেকে একটা কাঠের তৈরি জাহাজের মডেল ঝুলছে। বার্-এর পিছনের দেওয়ালটা পেতলের পাত দিয়ে মোড়া। লণ্ঠনের মৃদু আলো তার উপরে পড়ে একটা লালচে আভা দিয়েছে। দেখলে মনে হয় মাটির তলাকার কোনো জ্বলন্ত আগুনের ছায়া বুঝি ওখানটাতে পড়েছে। দেওয়ালে লোহার ব্রাকেটে ঝোলানো আলোগুলির মধ্যে দুটি মাত্র জ্বলছে—ভ্যালেন্‌টিন্ যেখানটায় বসেছে সেখানে, আর আমাদের কাছে। ওগুলোতে হলদে পার্চমেন্ট কাগজের শেড্ দেওয়া। পুরোনো মানচিত্রের কাগজ দিয়ে তৈরি, শেড্‌গুলোকে দেখাচ্ছে যেন পৃথিবীর ছোট-ছোট আলোকিত অংশ।

মেয়েটির সঙ্গে কি নিয়ে যে আলাপ শুরু করব ভেবে উঠতে পারছিনে, কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। বলতে গেলে ওকে চিনিই না। ওর দিকে যত বেশি তাকাচ্ছি তত ওকে অচেনা মনে হচ্ছে। কতকাল মেয়েদের সঙ্গে মিশিনি, এখন

আর অভ্যাস নেই বললেই চলে। পুরুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই অভ্যাস হয়ে গেছে। কাফেতে বসে মনে হচ্ছিল ওখানে বড্ড বেশি হৈ-চৈ আর এখানটায় মনে হচ্ছে বড্ড বেশি নিরালা। ঘরটা এত নীরব, কথা বলতেই ভয় করে ; মনে হয় প্রত্যেকটা কথার যেন বিশেষ একটা অর্থ আছে, মূল্য আছে। ভাবছিলুম এর চাইতে কাফতেই ছিল ভালো।

ফ্রেড্ দুজনকে দু-গ্লাশ দিয়ে গেল। আঃ, রামটা যেমন টাটকা, তেমনি কড়া ঠিক যেন চমকা রোদের আমেজ-মাখানো। এখানটায় এসে এইটুকুই যথার্থ লাভ। গ্লাশটি নিঃশেষ করে তক্ষুনি আরেক গ্লাশ অর্ডার দিলুম। মেয়েটিকে জিগগেস করলুম, 'কেমন, এখানটায় ভালো লাগছে ?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।'

'ঐ কেক-বিস্কুটের দোকানটার চাইতে তাইলে ভালো ?'

'কেক-এর দোকান আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তাহলে এত জায়গা থাকতে আমরা ওখানটায় গিয়েছিলুম কেন ?'

মেয়েটি মাথার টুপিটা খুলে নিয়ে বলল, 'কি জানি. আর কোনো জায়গার কথা আমার মনেই হয়নি।'

'যাকগে, এ জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে জেনে খুশি হলাম। এখানটায় আমরা হামেশাই আসি, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায়। এটা এক রকম আমাদের বাড়ি-ঘরের মতো হয়ে গেছে।'

ও হেসে বলল, 'সেটা কি খুব সুখের কথা ?'

বললুম, 'অ-সুখেরও নয়, যে যুগের যেমন রীতি।'

ফ্রেড্ দ্বিতীয়বারে গ্লাশ ভর্তি করে নিয়ে এল। টেবিলে একটি হাভানা চুরুট রেখে বলল, 'ের্ হুসার দিলেন।' ভ্যালেন্‌টিন্ তার ঐ কোণ থেকে গ্লাশটি তুলে ধরে ভারি গলায় বলল, '১৯১৭ সনের ৩১শে জুলাইকে স্মরণ করে—'

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে আমিও আমার গ্লাশ তুলে ধরলুম। মদ খেতে হলেই ও কারো না কারো নাম করে খাবে। একদিন রাত্রিরে এক গ্রাম্য সরাইখানায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখলুম চাঁদের স্বাস্থ্য কামনা করে মদ খাচ্ছে। ট্রেঞ্চে যে সব দিন খুব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কেটেছে এবং কোনোরকমে ফাঁড়া কাটিয়ে ও বেঁচে গেছে সে সব তারিখ ও ঠিক মনে করে রেখেছে। সেই দিনগুলিকে স্মরণ করে ও মদ খায়। মেয়েটিকে বললুম, 'ও আমার অনেক কালের বন্ধু, সেই

লড়াইয়ের সময়কার। এই একটি মাত্র লোককে আমি জানি যে একটা বিরাট সর্বনাশের আবর্তে থেকেও খানিকটা আনন্দ নিঙড়ে নিতে পেরেছে। নিজের জীবনটাকে নিয়ে কি করবে সে জানে না। স্রেফ্ বেঁচে যে আছে এই আনন্দেই ফুর্তি করে বেড়ায়।'

মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। মুখে নিবিষ্ট ভাব, আলোর রেখা এসে পড়েছে ওর কপালে, মুখে। বলল, 'হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারছি ওর অবস্থাটা!' ওর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, তুমি কেমন করে বুঝবে?' ও একটু হাসল। চোখ দুটি হাসছে; কিন্তু মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। বলল, 'নেহাত ছেলেমানুষ! বলছ কি? আজকাল কি আর কেউ ছেলেমানুষ আছে! সবাই বৃদ্ধ।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। পরে বললুম, 'তা দুদিকেই ঢের বলবার আছে।' ফ্রেড্‌কে ইশারা করে বললুম, আরো কিছু পানীয় দিয়ে যেতে। মেয়েটি দেখছি ভিতরে-ভিতরে বেশ শক্ত, নিজস্ব মতামত আছে। ওর তুলনায় আমি নিতান্তই হাবা। কেবলি ভাবছি, একটা কোনো হাল্কা বিষয় নিয়ে দিব্যি রসাল গল্প জুড়ে দেব, কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। বরাবর দেখেছি পরে যখন কেউ থাকে না তখন একলা-একলা বসে নানা হাসির কথা মনে পড়ে যায়। লেন্‌ত্‌স এসব বিষয়ে ওস্তাদ; আমার কিন্তু ওসব একেবারে আসে না, কথা বলতে গলদঘর্ম হতে হয়। গট্‌ফ্রিড্‌ ঠাট্টা করে বলে, ফুর্তিবাজ সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে আমি নাকি পোস্টমাস্টারদের সমতুল্য। তা, ও কিছু মিথ্যা বলে না।

হ্যাঁ, ফ্রেড্‌ লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। বারবার ঐটুকু-ঐটুকু করে না এনে একেবারেই বেশ বড় একটি গ্লাশ ভর্তি করে এনেছে। ওকেও বারবার হাঁটাহাটি করতে হয় না, আর আমিও কি পরিমাণ পান করছি সেটা সকলের নজরে আসে না। ভেবে দেখলাম বেশ কিছু পরিমাণ পেটে না পড়লে আমার ঐ অরসিক ভাবটা কাটবে না, মনটা চাঙা হবে না!

মেয়েটিকে বললুম, 'আর এক গ্লাশ মার্টিনি হোক না।'

'ও জিনিসটা কি, তুমি যেটা খাচ্ছ?'

'এটা? এটা হচ্ছে রাম্।'

আমার গ্লাশের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'ওখানটায়ও তুমি এই জিনিসই খাচ্ছিলে।'

বললুম, 'হ্যাঁ, আমি রাম্ই বেশির ভাগ খাই।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'দেখলে তো মোটেই মনে হয় না এটা খেতে ভালো হবে।'
'আস্বাদ-টাস্বাদ-এর কথা এখন আর ভাবিই না।'
ও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তবে ও জিনিস খাও কেন?'
'রাম্?' মনে-মনে খুশি হলাম, এতক্ষণে একটা কথা বলবার মতো বিষয় পাওয়া গেল। বললুম, 'রাম্ এমন জিনিস—ওর বেলায় আস্বাদের প্রশ্নই ওঠে না। এ তো কেবলমাত্র পানীয় নয়—ও হচ্ছে আমাদের বন্ধু, মিত্র। বন্ধুর মতো জীবনটাকে সরস করে, দুনিয়ার চেহারাই বদলে দেয়। সেই জন্যই তো রাম্ খাই।' শূন্য গ্লাশটি সরিয়ে রেখে বললুম, 'কিন্তু তোমাকে আরেক গ্লাশ মার্টিনি দিতে বলব?'
ও বলল, 'তাহলে রাম্ই দিতে বল, একবার খেয়েই দেখি।'
'ভালো কথা, কিন্তু আজকে থাক। কড়া জিনিস—আস্তে-আস্তে অভ্যাস করতে হয়।' ফ্রেড্‌কে হাঁক দিয়ে বললুম—'বাকার্ডি কক্‌টেল্ নিয়ে এস।'
ফ্রেড গ্লাশ নিয়ে এল। একটা ডিশ-এ করে কিছু নুন দেওয়া বাদাম ভাজা আর কাফ বীন্ এনেছে। ওকে বললুম, 'বোতলটা এখানেই রেখে যাও।'
আস্তে-আস্তে সব যেন বদলাচ্ছে। অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেছে, বেশ সহজ ভাবে কথা বলতে শুরু করেছি। এতক্ষণ যেন প্রত্যেকটি কথা ভেবে-ভেবে বলতে হচ্ছিল। এক-এক চুমুক খাচ্ছি আর মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে একটি অতি শীতল ঢেউ এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। অন্ধকারের মধ্যে নানা রকমের ছবি ফুটে উঠছে, রুক্ষ ঊষর জীবনভূমির'পর দিয়ে রঙিন স্বপ্নের একটি নিঃশব্দ মিছিল ভেসে চলেছে। দোকানের দেয়ালটা কোথায় দূরে সরে গিয়েছে। হঠাৎ মনে হল, এটা একটা সামান্য মদের দোকানমাত্র নয়, এটি যেন পৃথিবীর একটি নিভৃত কোণ—একটি নিরাপদ আশ্রয়। চারিদিকে সংসারের নিরন্তর নিষ্ঠুর সংগ্রাম চলছে, তারই মাঝখানে এটি একটি ট্রেঞ্চ। আমরা দুটিতে তারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি—জানি না কেমন করে সময়ের স্রোতে দুজন দু'দিক থেকে ভেসে এসে এক জায়গায় মিলেছি।
মেয়েটি দেহটিকে সঙ্কুচিত করে চেয়ারটিতে বসে আছে। অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীমূর্তি—যেন পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ছিটকে এসে এখানটায় পড়েছে। আমি কথা বলে যাচ্ছি। নিজের কথা নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকছে—যেন আমি কথা বলছিনে, অপর কোনো ব্যক্তি আমার মুখ দিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। সে মানুষটা আমার কল্পনার 'আমি'। তার ভাষাটা মিথ্যা, কথাগুলি রঙিন কল্পনার

জাল দিয়ে বোনা—বাস্তবজীবনের সঙ্গে কোথাও তার সঙ্গতি নেই। বেশ বুঝতে পারছি কথাগুলি সত্যি নয়—অবাস্তব, মিথ্যা; কিন্তু তাতে কি এসে যায়? সত্য যখন এমন নীরস, এমন বিরস—তখন স্বপ্নই সত্য, স্বপ্নই সত্যিকারের জীবন।

কাউণ্টারের উপর মস্ত একটা পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। মাঝে-মাঝে ভ্যালেন্‌টিন্ তার গ্লাশ তুলে ধরছে আর বিড়-বিড় করে কোনো একটা দিন-তারিখের নাম উল্লেখ করছে। বাইরে থেকে রাস্তার অস্পষ্ট কলরব এসে ঘরে ঢুকছে, মাঝে মাঝে কেউ হঠাৎ দরজা খুললে মোটরের তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি কানে এসে লাগে। মোটরের কর্কশ শব্দটা অনেকটা যেন হিংস্রুটে বুড়ি ডাইনির গলার আওয়াজের মতো।

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিলাম, তখন রীতিমতো অন্ধকার হয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে চলেছি। হঠাৎ এমন নিঃসঙ্গ একলা মনে হতে লাগল কি বলব! ঝিরঝির করে একটু বৃষ্টি পড়ছে। একটা দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। বড্ড বেশি মদ খেয়েছি, নিজেই বেশ বুঝতে পারছি। হাঁটতে পাচ্ছিনে, পা টলছে—এমন নয়—কিন্তু মাত্রাটা সত্যি একটু বেশি হয়ে গেছে।

গরম লাগছে। কোট খুলে ফেললাম, মাথার টুপিটা পিছন দিকে ঠেলে দিলাম। ধ্যেৎ, কি সব মাথামুণ্ডু যে এতক্ষণ বকেছি ছাই মনে করতেও পারছিনে। বার্-এর মধ্যে আধ-অন্ধকারে ছিল এক রকম, আর এখন বাইরে রাস্তায় বাস-মোটরের ভিড়ের মধ্যে সমস্তই অন্য রকম ঠেকছে। আমি একটা আস্ত বোকা। মেয়েটি না জানি আমাকে কি মনে করেছে। সে তো সবই লক্ষ্য করেছে, কারণ আমার মতো বেসামাল তো হয়নি, খুব সামান্যই ও পান করেছিল। আমি বিদায় নিয়ে আসবার সময় এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল কি বলব—ছি-ছি-ছি! বলে যেই মোড় ঘুরতে যাচ্ছি অমনি বেঁটে খাটো মোটা একটি লোকের সঙ্গে এক ধাক্কা।

খুব বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ও কি?—'

মোটা লোকটা ততোধিক চেঁচিয়ে বলল, 'চোখ মেলে চলতে পার না, হাভাতে কোথাকার!'

আমি একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। লোকটা আবার বলল, 'আহা, জন্মে যেন মানুষ দেখনি, না?'

বললুম, 'হ্যাঁ মানুষ তো দেখেছি, কিন্তু বিয়ারের পিঁপেকে তো কখনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখিনি।'

লোকটা বলল, 'মর্‌ বেটা মর্‌।'

আমিও বললুম, 'দূর বেটা—মোট্‌কা—হাঁদা!'

লোকটা তক্ষুনি মাথায় টুপি তুলে গম্ভীরভাবে বলল, 'যাও ভাই, যাও।' আর বাক্যব্যয় না করে দুজন দুদিকে চলে গেলাম।

লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে মনটা একটু চাঙা হয়েছে, কিন্তু মনের বিরক্তিটা যায়নি। এবং নেশার ঘোর যত কাটছে মনটা তত মুষড়ে পড়ছে। ভিজে গামছার মতো হয়ে আছে মনের ভিতরটা। এতক্ষণ কেবল নিজের উপরে বিরক্ত ছিলাম, এখন রাগ হচ্ছে সারা দুনিয়ার উপর—ঐ মেয়েটা সুদ্ধ। ওর জন্যেই তো অতটা মদ গিলতে হল। কোটের কলারটা তুলে দিলাম। যাকগে, ও যা ইচ্ছে তাই ভাবুকগে আমার সম্বন্ধে—থোড়াই কেয়ার করি। আমার স্বরূপ তো সে দেখেই নিয়েছে। আমিও আর ওসব কথা ভাবছিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে—ল্যাটা চুকে গেছে, ব্যাস। আর—ভালোই হয়েছে একদিক থেকে।

আবার বার-এ ফিরে গেলাম। বাকি রেখে লাভ কি, আরো কিছু গলাধঃকরণ করে পুরোপুরি মাতাল হওয়াই ভালো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতটা কমে গেছে, কদিন ধরে কেবল বৃষ্টি চলছিল। এখন মেঘ কেটে গিয়ে রোদ দেখা দিয়েছে কিন্তু সঙ্গে একটা ভ্যাপসা গরম। শুক্রবার সকালবেলায় কারখানায় ঢুকেই দেখি আমাদের ম্যাটিল্ডা ইস্ ঝাঁটা বগলে করে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানে—ঠিক যেন একটি হিপোপটামাসকে কেউ মন্ত্রবলে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

'হের্ লোকাম্প, এই দেখুন কি চমৎকার, ঠিক যেন ভূতুড়ে কাণ্ড, এঁ্যাঃ!'

আমিও অবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে গেছি। আমাদের পেট্রল পাম্প-এর ধারে যে বুড়ো প্লাম্ গাছটা, সেটা যেন রাতারাতি ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে।

সারা শীতকাল পাতা-টাতা ঝরে গিয়ে গাছটা যেন কুঁকড়ে-মুকড়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ওর ডালে পুরোনো টায়ার ঝুলিয়ে রাখতুম, তেল ঝরাবার জন্য ক্যানেস্তারাগুলো উপুড় করে ঝুলিয়ে দিতুম। গাছটাকে আমরা দিব্যি একটি র‍্যাক্ হিসেবে ব্যবহার করছিলুম—আমাদের মাজা-ঘষার ন্যাকড়া থেকে শুরু করে এঞ্জিনের বনেট পর্যন্ত সবই ঐ গাছের ডাল থেকে ঝুলতে থাকত, এই সেদিনও ঝুলছিল। কালকে অবধিও তেমন কিছু নজরে পড়েনি আর আজকে হঠাৎ এক রাত্তিরের মধ্যে যেন সমস্ত চেহারাটা মন্ত্রবলে বদলে গেছে—লালচে আর শাদায় মেশানো একটা মেঘের পুঞ্জ যেন এই গাছের ডালে নেমে এসেছে। আমাদের এই তেল-চিটচিটে কারখানা ঘরের উপরে কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক প্রজাপতি পাখা মেলে এসে বসেছে।

উৎসাহে চোখ বড়-বড় করে বুড়ি বলছে, 'আর গন্ধটা! মরি-মরি—ঠিক যেন রাম্-এর গন্ধ।' আমি গন্ধ-টন্ধ কিচ্ছু পাচ্ছি না কিন্তু ওর মনের ভাবটা বেশ বুঝতে পারলুম, বললুম, 'আমার তো মনে হচ্ছে কোনিয়াকের গন্ধের মতো।'

ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, হের্ লোকাম্প, আপনার নিশ্চয় সর্দি

হয়েছে, সবারই হচ্ছে কিনা আজকাল। না, আমায় ভুল হতে পারে না, বুড়ি হাঁসের যা নাক একেবারে ডালকুত্তার নাক। আমার কথা শুনে রাখুন, ও ঠিক রাম্-এর গন্ধ, পুরোনো রাম্।'

'বেশ, তবে তাই, ম্যাটিল্‌ডা।'

এক গ্লাস রাম্ ঢেলে নিয়ে বাইরে পেট্রল পাম্পটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জাপ্ ওখানটায় বসে আছে। পাশে একটি মরচে-পড়া জ্যাম্-এর টিনে কয়েক গুচ্ছ ফুল।

অবাক হয়ে বললুম, 'ওটা দিয়ে কি হচ্ছে?'

জাপ্ বলল, 'এ সব মহিলাদের জন্য। যাঁরা পেট্রল নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের এক-এক গুচ্ছ বিনি পয়সায় দিচ্ছি। এরই মধ্যে অন্যদিনের চাইতে নব্বুই লিটার বেশি বিক্রি হয়েছে। দেখছেন তো গাছটিতে সোনা ফলে। গাছটি অমনিতে না থাকলে যেমন করে হোক হাতে-নাতে একটি বানাতে হত।'

বললুম, 'বাপু তুমি যে দেখছি পাকা ব্যবসাদার হয়ে উঠেছ।'

জাপ্ দাঁত বের করে হাসল। ওর খাড়া-খাড়া কানে রোদ্দুর এসে পড়েছে, কান দুটো দেখাচ্ছে ঘষা কাঁচের জানালার মতো। বলল, 'গাছটার পাশে দাঁড় করিয়ে এরই মধ্যে দুবার আমার ফটো নেওয়া হয়ে গেছে।'

'ভালোই তো। তোমার দেখছি ফিল্ম-স্টার হবার সম্ভাবনা আছে।' হঠাৎ দেখি কাছেই একটা ফোর্ড গাড়ির তলা থেকে লেন্‌ত্‌স হামাগুড়ি দিয়ে বেরুচ্ছে। ওর দিকে এগিয়ে যেতেই ও বলল, 'বব্, একটা কাণ্ড হয়েছে। বিন্‌ডিং-এর সঙ্গে সেই যে মেয়েটি না? —তার একটু খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালুম। তার মানে?'

'মানে যা বলছি তাই। অমন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছ কেন?'

'চোখ পাকাচ্ছি কোথায়?'

'পাকাচ্ছ না তো কি! যাকগে, কি যেন মেয়েটির নাম—প্যাট্—হ্যাঁ, প্যাট্ কি যেন।'

'আমি জানিনে তো।'

ও নিজেকে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'জানো না! বলছ কি? তুমি না ওর ঠিকানা লিখে নিলে। আমি তো তোমাকে লিখতে দেখলুম।'

বললুম, 'সেই কাগজের টুকরোটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'হারিয়ে ফেলেছ!' দুহাতে মাথার হলদে চুলগুলো ধরে সজোরে টানতে লাগল।

'পুরো একটা ঘণ্টা বিন্‌ডিং-এর সঙ্গে-সঙ্গে কাটালাম, এদিকে তুমি হারিয়ে ফেললে! কি কাণ্ড! যাক, অটো বোধ করি জানে।'

বললুম, 'উঁহু, অটো জানে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তোমার মতো অমন নিষ্কম্মা অপদার্থ কক্ষনো দেখিনি। এমন চমৎকার মেয়েটা চোখে দেখলে না? হা ভগবান!' বলে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'অমনিতে সারা জন্মে তো আমাদের জোটে না কিছু, যদি বা বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বার উপক্রম হয়েছিল তাও তুমি—নিষ্কম্মার ধাড়ি—ঠিকানাটি ফেললে হারিয়ে।'

বললুম, 'কই আমার কাছে তো তোমার ঐ মেয়েকে এমন কিছু অত্যাশ্চর্য ঠেকেনি।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'তা ঠেকবে কেন? তুমি যে একটি আস্ত গাধা। চেনবার মধ্যে তো চেন ওই কাফে ইন্‌টারন্যাশনাল-এর পেশাদার মেয়ে। পিয়ানো-বাজিয়ে এর বেশি আর কি হবে। আরে, তোমাকে বলছি শোনো, মেয়েটা যা জুটেছিল একেবারে হাতে স্বর্গ্‌গ পাওয়ার মতো। হুঁ, তুমি তার কি কদর বুঝবে। চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিলে? তা দেখবে কেন? তোমার তো নজর ছিল মদের গেলাশের ওপর—'

ধমকে বললুম, 'বাজে বোকা না, থামো।' মদের কথা বলতেই আমার বড্ড আঁতে লেগেছে।

আমার কথায় কর্ণপাত না করে ও বলে যেতে লাগল, 'আর হাত দুখানা দেখেছ? আঃ মুলাট্টো মেয়েদের মতো সরু লম্বা হাত। আরে তোমরা কি তার মর্ম বুঝবে, বোঝে এই গট্‌ফ্রিড্‌। যাই বল, এতদিনে একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল যাকে সত্যিকারের সুন্দরী বলা চলে, আর তার চাইতেও যা বেশি, ও নিজের চারধারে বিশেষ একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে! বুঝছো তো আবহাওয়া কাকে বলছি!'

আমি বললুম, 'হাওয়া? বুঝব না কেন, ঐ যে জিনিস তুমি টায়ারে পাম্প করে দাও।'

আমার প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব দেখিয়ে বলল, 'আরে হাওয়া কি শুধু হাওয়া, ওর মধ্যে অনেক জিনিসের সন্নিবেশ—যাকে বলি ধূম-জ্যোতি-মরুত-সন্নিবেশ, অর্থাৎ আলো আছে, উষ্ণতা আছে, ধোঁয়াও আছে অর্থাৎ কিনা ঘন রহস্য আছে। সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বই ঐখানে, এসব নইলে রূপ কি? কিন্তু তোমাকে বলে

লাভ কি ? এক রাম্-এর গন্ধ ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু তুমি বুঝলে তো!'
এবার আমি সত্যি-সত্যি রেগে উঠে বললুম, 'থামো বলছি, নইলে কিছু একটা তোমার মাথায় ছুঁড়ে মারব।'
গট্‌ফ্রিড্ কিছু গ্রাহ্যই করল না, কথা বলেই চলল। আমিও চুপচাপ শুনে গেলাম। ইতিমধ্যে কি যে ঘটেছে ও তো জানে না, ওর প্রত্যেকটি কথা আমাকে খোঁচা মারতে লাগল, বিশেষ করে মদ খাওয়ার কথাটা। আমি কোনো রকমে যদিবা ওটা কটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছিলাম, ও আবার খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ঘা করতে এসেছে। ও পঞ্চমুখে মেয়েটির প্রশংসা করে যাচ্ছে। শুনে-শুনে আমারও কেমন যেন মনে হতে লাগল. সত্যি একটা মহামূল্য রত্ন হাতে পেয়ে হারিয়ে ফেলেছি।

সন্ধ্যা ছ'টায় গেলাম কাফে ইন্‌টারন্যাশনাল-এ । মনটা তখনও খিঁচড়ে আছে। এ-জায়গাটা বহুদিন থেকে আমার একটা আশ্রয়। লেন্‌ত্‌স ওকথাই বলছিল, কিচ্ছু মিথ্যা বলেনি।
ওখানটায় ঢুকেই আমি তো অবাক। খুব একটা হৈ-হৈ কাণ্ড চলছে। কাউণ্টারে গুচ্ছের প্লাম্ কেক্ সাজানো। ওদের খোঁড়া ওয়েটার এলয়স্ ট্রে-ভর্তি কফির কাপে ঠকাঠক্ শব্দ তুলে পিছনের ঘরের দিকে ছুটছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাপ-ভর্তি অত কফি কেন, অ্যাঁ ? যত সব মাতালের দল ঐ টেবিলের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে না তো ?
হোস্টেস্ স্বয়ং এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। রোজার বন্ধু লিলির বিদায় উপলক্ষে পিছনের ঘরটাতে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। হঠাৎ এসে পড়ে অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম।
'না, না, তাতে কি হয়েছে তুমি তো নিমন্ত্রিতের মধ্যে।' রোজা বিশেষ করে বলল, 'অবশ্য পুরুষের মধ্যে বলতে গেলে তুমি একলাই--ঐ ন্যাকাবাবু কিকি রয়েছে বটে, তা ও তো গুনতির মধ্যেই নয়।'
আমি তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গিয়ে একটি ফুলের তোড়া, একটি আনারস, বাচ্চার জন্য একটা খেলনা আর এক চাকতি চকোলেট নিয়ে এলাম।
রোজা খুব জাঁদরেল মহিলার মতো আমাকে অভ্যর্থনা করল। খুব ভারি রকমের একটা বুক-কাটা পোশাক পরে ও টেবিলে প্রধান স্থানটি নিয়ে বসেছে। সোনার দাঁত চকচক করছে। বাচ্চা কেমন আছে জিগ্গেস করলুম। সেলুলয়েড-এর ঝুমঝুমি আর চকোলেটের চাকতিটা বাচ্চার জন্য দিলুম। রোজা বেজায় খুশি।

ফুলের তোড়া আর আনারসটি লিলিকে দিয়ে বললুম, 'আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

রোজা আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ও বরাবরের শৌখিন ব্যক্তি, মেয়েদের খাতির করতে জানে। এস, বব্, আমাদের দুজনের মাঝখানটায় বসো।'

লিলি হচ্ছে রোজার সব চাইতে বড় বন্ধু। এদের মধ্যে ওর পোজিশনটাই সব চাইতে উঁচুদরের। প্রত্যেক পেশাদার স্ত্রীলোকের কাম্য—খুব কমের ভাগ্যেই যা জোটে—ও তাই হতে পেরেছিল। ও হোটেলে চাকরি করত। হোটেলে চাকরি করলে সাধারণ বেশ্যা স্ত্রীলোকের মতো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। হোটেলেই নতুন-নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিতে পারে। এদের মধ্যে খুব কমেরই এই সৌভাগ্য হয়—কারণ হোটেলে কাজ করবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে জামা-কাপড় থাকে না, হাতে এমন টাকা নেই যে প্রণয়ী জোটাবার জন্যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারে। অবিশ্যি লিলি একটা মফঃস্বল শহরের হোটেলে কাজ করত ; কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ও প্রায় চার হাজার মার্ক জমিয়ে ফেলেছে। এখন ঠিক করেছে বিয়ে করবে। ওর ভাবী স্বামী মিস্ত্রীর কাজ করে। লিলির সব ইতিহাসই তার জানা, তবু বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। ভবিষ্যতের কথা ও মাথা ঘামাচ্ছে না। এ সব মেয়ে একবার বিয়ে করলে আর কখনো ও পথে পা বাড়ায় না, অবিশ্বাসের কাজ করে না। দুনিয়ার হালচাল দুঃখকষ্ট ওরা ভালো করেই দেখে নিয়েছে কিনা।

সোমবার দিন লিলির বিয়ে। রোজা তার বিদায় উপলক্ষে তাকে কফি পার্টি দিচ্ছে। আজকে ওরা শেষবারের মতো সবাই এসে লিলির সঙ্গে মিলেছে। বিয়ে হয়ে গেলে ওর আর এখানে আসা হবে না। রোজা আমাকে কফি ঢেলে দিল। এলয়স্ খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বিরাট এক কেক্ এনে টেবিলে রাখল—বাদাম কিসমিস দেওয়া মস্ত বড় কেক্। রোজা বেশ বড় একটি টুকরো কেটে আমাকে দিল। এমন অবস্থায় ঠিক যেমনটি করলে মানায় তাই করলুম। এক কামড় মুখে দিয়েই খুব বিস্ময়ের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আরে, এ যে খাসা জিনিস। এ জিনিস কখনো দোকানের কেনা নয়—'

রোজা খুব খুশি হয়ে বলল, 'ও আমি নিজে তৈরি করেছি।' ও বাস্তবিক রান্না করে ভালো, আর কেউ সে কথা বললে খুব খুশি হয়। বিশেষ করে প্লাম্ কেক্ তৈরিতে ওর জুড়ি মেলা ভার। বহিমিয়ার মেয়ে কিনা, ওখানকার মেয়ে রান্না-বাড়ায় ওস্তাদ না হয়ে যায় না।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। টেবিল ঘিরে ওরা সবাই বসেছে—রূপোপজীবিনীর দল, বিধাতার প্রমোদোদ্যানে এরাই প্রধান উপকরণ আর মানবচরিত্রে এদের যেমন অভিজ্ঞতা এমন আর কার। কেউ বাদ নেই—ঐ তো ওয়ালি—বেশ সুন্দরী মেয়ে, কদিন আগে এক রাত্তিরে ট্যাক্সি করে বেরিয়েছিল, ওর শাদা খেঁক-শেয়ালের চামড়াটা সেদিন কে চুরি করে নিয়ে গেল। লীনা রয়েছে - ওর একটা পা কাঠের, তা হলেও ওর প্রণয়ীর অভাব হয় না। আর আছে ফ্রিত্‌সি—খুব ফূর্তিবাজ মেয়ে—ঐ খোঁড়া এলয়সকে ও ভালোবাসে, নইলে নিজের বাড়িতে অন্য কারো সঙ্গে গুছিয়ে থাকতে পারত! মারগট্‌ বলে মেয়েটার গাল দুটো লাল টুকটুকে। ও চালাকি করে বনেদি ঘরের পরিচারিকার পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, তাই করেই ও ফ্যাশানদার ছোকরা প্রেমিক জুটিয়ে নেয়। মিরিয়ম্‌ এদের মধ্যে সব চাইতে কম বয়েসী--ও মেয়েটাও খুব ফুর্তিবাজ। হ্যাঁ, কিকিও এসেছে—ওকে তো ওরা পুরুষ বলে গ্রাহ্যই করে না, সারাক্ষণ মেয়েদের মতো সেজেগুজে থাকে বলে। আর মিমি বেচারির বয়স হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশ, ব্যবসা প্রায় অচল। জন দুই বারমেইড, তা ছাড়া আরো কয়েকজন ছিল, তাদের আমি চিনিনে। আর ছিল এক বুড়ি, তাকে সবাই মা বলে ডাকে। লিলির পরে বলতে গেলে ও-ই আজকের দ্বিতীয় মাননীয় অতিথি। ছোট্টখাট্ট পাকাচুল মানুষটি—শীতকালের আপেলের মতো শুকনো তোবড়ানো চেহারা। বিপদে-আপদে এই বুড়ি-মা'র কাছে ওরা পরামর্শ নেয়। বুড়ি ওদের মস্ত ভরসা। নিকোলাইস্ট্রাস-এ বুড়ির সসেজ-এর দোকান আছে। রাত্তির বেলায় দোকানটা একটা ছোটোখাটো হোটেলে পরিণত হয়। তার ফ্রাঙ্কফোর্ট সসেজ-এর সঙ্গে সিগারেট এবং লুকিয়ে কিছু-কিছু রবারের জিনিসও বিক্রি করে। আর তেমন দরকার পড়লে বুড়ির কাছে অল্পবিস্তর ধারও পাওয়া যায়। আজকে ওদের ওই বিশেষ দিনটিতে ব্যবহারটা একটু মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। তা আমি গোড়াতেই ভেবে নিয়েছিলুম। মামুলি কথা একটিও বললুম না, বাজে ইয়ার্কির ধার দিয়েও নয়। রোজা যে এমন মহিষমর্দিনী মেয়ে, তাকে যে সবাই 'লোহার ঘোড়া' নাম দিয়েছে সে সব কথা যেন ভুলেই গিয়েছি। আর ফ্রিত্‌সি আমাদের স্টেফান্‌ গ্রিগলিট্‌-এর সঙ্গে—ঐ যে লোকটা গরু ছাগলের ব্যবসা করে—তার সঙ্গে প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে ইতিপূর্বে যে সব আলাপ আলোচনা করেছে সে কথাও ভুলে থাকাই শ্রেয় মনে করলুম। কাজেই আজকে আমাদের কথাবার্তা এমন বিশুদ্ধ রকমের হচ্ছিল যে তেমন-তেমন গিন্নিবান্নিরাও

এর মধ্যে আপত্তির কিছু খুঁজে পেতেন না। লিলিকে বললুম, 'কেমন ওদিককার আয়োজনপত্র সব ঠিক তো?'
লিলি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, বিয়ের পোশাক তো সেই কবে কেনা হয়ে গেছে।'
রোজা বলল, 'ওয়েডিং-গাউনটি যা হয়েছে, চমৎকার। তা ছাড়া চেয়ারের ঢাকনা-টাকনা সব তৈরি।'
আমি বললুম, 'চেয়ারের ঢাকনা? তা দিয়ে কি হবে?'
'সেকি বব্‌?' রোজা এমন রুষ্টভাবে আমার দিকে তাকাল আমি থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, তা বুঝেছি বৈকি।' আসল কথা, ভালো আসবাবপত্র, লেসের ঝালর দেওয়া ঢাকনা—এসব হল মধ্যবিত্ত জীবনের প্রধান অঙ্গ, ভদ্র বিবাহিত জীবনের ছাপ এরই মধ্যে। এরা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করলে কি হবে, আসলে মনে প্রাণে রুচিতে ওরা বেশ্যা নয়। ওদের বলা যেতে পারে ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভগ্নাবশেষ। নিজেদের পাপজীবনের প্রতি ওদের সত্যিকারের স্পৃহা নেই, ওদের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটি হচ্ছে বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি। যদিও মুখে ওরা এ-কথা কখনো স্বীকার করবে না।
আমি পিয়ানোয় গিয়ে বসলুম। রোজা এরই অপেক্ষায় ছিল। ওদের আর সবার মতো রোজাও গান বাজনা বড় ভালোবাসে। বিদায়ের কথা স্মরণ করে লিলি এবং রোজার যত প্রিয় গান সবই একে-একে বাজিয়ে গেলুম। দু-একটা গান স্থান কালের সঙ্গে তেমন খাপ না খেলেও ওদের পছন্দসই বলেই বাজাতে হল। বিশেষ করে সুরগুলি বেশ চমকা বলেই ওগুলো ওদের খুব পছন্দ। সবার শেষে বাজালুম—'হোম সুইট হোম।' এই গানটি রোজার বিশেষ প্রিয়। বেশ্যা মেয়েদের দেখেছি একদিকে এরা যেমন কঠোর প্রাণ অপরদিকে তেমনি আবার ভাবপ্রবণ। শেষ গানটা বাজাবার সময় ওরা সবাই মিলে গান ধরল, কিকিও গলা ছেড়ে গাইতে লাগল।
লিলি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। ওকে গিয়ে এখন ওর ভাবি বরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।
রোজা তাকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুম্বন করল। বলল, 'তোর ভালো হোক লিলি —এই চাই। দেখিস মন খারাপ করিসনি যেন।'
লিলি মেলাই সব উপহার পেয়েছে, সবগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। সত্যি বলতে কি, ওর চেহারা এরই মধ্যে অনেকটা বদলে গিয়েছে। মানুষের পশুবৃত্তি নিয়ে যাদের কারবার তাদের চেহারায় সাধারণত যে রুক্ষ ভাবটা থাকে, ওর মুখ

থেকে সে ভাবটা কেটে গেছে। মুখের ভাবটি কোমল হয়ে এসেছে—অনেকটা যেন কুমারীর মুখের মতো।

আমরা সবাই দরজায় দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে লিসিকে বিদায় দিচ্ছিলুম, মিমি বেচারি একেবারে কেঁদেই ফেলল। ওর দিব্যি বে-থা হয়েছিল। লড়ায়ের সময় স্বামী মারা গেল নিউমোনিয়া হয়ে। ও বলে, স্বামী যদি লড়াইতে মারা যেত তাহলেও সামান্য কিছু পেন্সন মিলত, হয়তো বা ওকে এমনি এসে রাস্তায় নামতে হত না।

রোজা ওর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'আরে, মিমি, কাঁদিস কেন? কাঁদবার কি হল। আয়, আয় আর একটু করে কফি খাই গে।'

আবার সব্বাই গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল-এর ভিতরে ঢুকল, মুরগির দল যেমন গিয়ে খাঁচায় ঢোকে তেমনি। কিন্তু পার্টি আর তেমন জমে উঠল না, সবাই কেমন মুষড়ে গেছে। রোজা বলল, বব্, নতুন একটা কিছু বাজাও তো, মনটা একটু চাঙ্গা করা যাক্।'

খানিক পরে আমিও বিদায় নিয়ে উঠলাম। রোজা আরো কিছু কেক্ আমার পকেটে গুঁজে দিল। পথে আসতে দেখি সেই বুড়িমায়ের ছেলেটা রাস্তার মোড়ে সসেজ-এর স্টল্ সাজাচ্ছে। কেক্‌গুলো ওকেই উপহার দিয়ে দিলুম।

এখন কি করব তাই ভাবছিলুম। আজকে আর বার্-এ যাবার ইচ্ছে নেই, সিনেমায়ও না। আচ্ছা, কারখানার দিকে গেলে কেমন হয়? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আটটা বাজে।

কোষ্টার এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরেছে, আর কোষ্টার ওখানটায় থাকলে লেন্‌ত্‌স সেই মেয়েটার সম্বন্ধে আর সকালবেলার মতো বকর-বকর করতে পারবে না।

কারখানার দিকেই গেলুম। গিয়ে দেখি কারখানার ভিতরে আলো জ্বলছে, শুধু ভিতরে নয় উঠোনটাও আলোয় আলোময়। কোষ্টার একলা দাঁড়িয়ে আছে। জিগগেস করলুম, 'অত আলো দিয়ে কি হচ্ছে? ক্যাডিলাক্‌টা বিক্রি হল নাকি?' কোষ্টার হেসে বলল, 'না, গট্‌ফ্রিড্-এর ফ্লাড্‌লাইট দেবার শখ হয়েছিল, তাই।'

ক্যাডিলাক্-এর মাথার আলো দুটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়িটাকে ঠেলে এনেছে—সামনের দিকে। তাতে জানালা দিয়ে আলোটা এসে পড়েছে উঠোনে আর ঠিক ঐ প্লাম্ গাছটার উপরে। চমৎকার দেখাচ্ছে গাছটাকে, একেবারে ধবধবে শাদা। আর অন্ধকারটা যেন হ্রদের কালো জলের মতো ওকে চারদিক

থেকে ঘিরে রয়েছে। বললুম, 'বেশ দেখতে হয়েছে বটে। কিন্তু কোথায় গেল ও?'
'ও গেছে খাবার আনতে।'
'ভালোই হল। আমারও কেমন কিচ্ছু ভালো লাগছিল না, বোধকরি খিদের জন্যেই হবে।'
কোষ্টার মাথা নেড়ে বললে, 'আরে বব্, যদ্দিন পার খেয়ে নাও। সৈনিকদের ওটাই হল প্রথম কথা। আমারও আজকে বিকেলবেলাটায় কি যে হল—গিয়ে কার্লের নাম দিয়ে এলুম রেস্-এ।'
'অ্যাঃ, এই আসচে ছ তারিখের রেস্ তো? করেছ কি অটো? যত সব হোমরা-চোমরার দল যে এ রেস্ এ যোগ দেবে।'
কোষ্টার মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ, ব্রাউমূলারের সঙ্গে, স্পোর্টস্‌কার ক্লাশ।'
আমি আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে বললুম, 'তাহলে, অটো, আর কালক্ষেপ নয়। আমাদের বাছাধনকে বেশ করে একটু তেল খাওয়ানো যাক।'
ঠিক সে মুহূর্তে লেন্‌ত্‌স-এর প্রবেশ, 'রোসো এই এক মিনিট, আগে খাওয়াটা তো চুকিয়েনি।' বলে ঠোঙা খুলে খাবার বের করলে—রুটি, চিজ, ইঁটের মতো শক্ত সেঁকা মাংস আর কিছু মাছ। ভালো দেখে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বিয়ার বের করে নিলুম। সবারই খিদে পেয়েছিল, খেলুমও মজুরের মতো। তারপরে তিনজনেই কার্লকে নিয়ে পড়লুম। ঘণ্টা দুই ধরে নেড়ে চেড়ে কলকব্জা সব দেখে বেশ করে তেল মাখালুম। কাজকর্ম সেরে লেন্‌ত্‌স আর আমি আরেক দফা খেতে বসে গেলুম। গট্‌ফ্রিড্ ফোর্ড গাড়ির হেডলাইটটাও জ্বালিয়ে দিল। কলিশনে ওর একটা লাইট ভেঙ্গে গেছে, আর একটা ঠিক আছে।
লেন্‌ত্‌স চারিদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে বেশ খুশি হয়ে বলল, 'নাও, এবার বের কর দেখি বোতল। আমাদের ঐ ফুলন্ত গাছের উৎসবটা একবার না করলে নয়।' কোনিয়াক, জিন্, আর দুটি গ্লাশ টেবিলের উপরে রাখলুম। গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'তোমার গ্লাশ?'
বললুম, 'আমি এখন আর খাচ্ছিনে।'
'অ্যাঃ, কেন খাবে না শুনি?'
'কি জানি, মদে আমার অরুচি হয়ে গেছে।'
লেন্‌ত্‌স কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কোষ্টারকে বলল, 'অটো, আমাদের খোকাটি দেখছি দিনে-দিনে মোমের পুতুল হয়ে উঠছে।'
কোষ্টার বলল, 'থাক, ও খেতে চায় না যখন, মিছিমিছি জোর করা কেন?'

লেন্‌ত্‌স নিজের গ্লাশটি ভর্তি করে নিয়ে বলল, 'কদিন ধরেই দেখছি—ছেলেটার মাথায় যেন কি পোকা ঢুকেছে।'

বললুম, 'হবেও বা।'

ফ্যাক্টরি-বাড়ির উপর দিয়ে প্রকাণ্ড লালচে চাঁদটা উঁকি মারছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। শেষটায় আমি বললুম, 'আচ্ছা গট্‌ফ্রিড্‌, প্রেমের ব্যাপারে তুমি তো নিজেকে একজন ওস্তাদ মনে কর।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'ওস্তাদ ? হ্যাঁ পাকা ওস্তাদই বলতে পার।'

'বেশ তাহলে প্রেমে পড়লে কি লোকে সত্যি নেহাত বোকার মতো ব্যবহার করে ?'

'অ্যাঁঃ, বোকার মতো, মানে ?'

'এই ধর মদ খেয়ে মাতাল হলে লোকে যেমনটা করে তেমনি।'

লেন্‌ত্‌স হো-হো করে হেসে উঠল, 'আরে বাপু, সমস্ত ব্যাপারটাই তো ছলনা। প্রকৃতি ঠাকুরুন স্বয়ং এই ছলনার ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন। এই প্লাম্‌ গাছটিই দেখ না—দিব্যি রূপসীটি সেজে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দুদিন পরে কেমন দেখতে হবে ভাব তো। আরে, প্রেমের সঙ্গে যদি সত্যের কোনো যোগ থাকত তবে তো সর্বনাশ হত। খুব ভাগ্যি যে দুনিয়াটা সব সময় আমাদের ঐ নীতিবাগীশদের কথামতো চলে না।'

আমি একটু নড়ে-চড়ে বসে বললুম, 'তাহলে তুমি বলছ এক-আধটু ছলনা ছাড়া ও জিনিসটা চলতেই পারে না।'

'একেবারে না।'

বললুম, 'কিন্তু প্রেম এমনি জিনিস শেষ পর্যন্ত গিয়ে বোকা বনতেই হয়।'

লেন্‌ত্‌স হেসে বলল, 'বাপু হে, এই একটি কথা মনে রেখো—মেয়েদের মন পাবার জন্য পুরুষমানুষ যাই করুক না কেন সেটা মেয়েদের চোখে কখনো হাস্যকর হয় না—নেহাত ছেলেমানষি হলেও না। যেমন খুশি কর—ঠ্যাং দুটো উপরে তুলে মাথায় হাঁটো, হাবাগোবার মতো কথা বল, ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচ, প্রিয়ার জানালার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে গান কর—যেমন তোমার খুশি। কেবল একটি কাজ কোরো না—বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা কোরো না, বুদ্ধিমানের মতো কথা কোয়ো না।'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'কি বল, অটো, তোমার কি মত ?'

কোষ্টার হেসে বলল, 'বোধকরি ও ঠিকই বলেছে।' বলেই উঠে গিয়ে কার্লের

মাথার ঢাকনাটা তুলে দিল। আমিও গিয়ে রাম্-এর বোতল এবং একটি গ্লাশ এনে টেবিলে বসলুম। অটো গাড়ির এঞ্জিনটা চালু করে দিল—এঞ্জিনের গম্ভীর জোরালো আওয়াজ হতে লাগল। লেন্‌ত্‌স জানলায় পা তুলে দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে বসে আছে। চেয়ারটা ওর কাছে টেনে নিয়ে বসলুম, বললুম, 'আচ্ছা ভাই, মেয়েদের সামনে তুমি কখনো মদ খেয়ে বেসামাল হয়েছ?' লেন্‌ত্‌স যেমন বাইরে তাকিয়ে বসেছিল তেমনিভাবেই জবাব দিল, 'অনেক—অনেক বার।'

'তারপরে?'

লেন্‌ত্‌স এবার আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'তারপরে আবার কি? তুমি বলতে চাও, মদের ঝোঁকে হয়তো আবোল-তাবোল বকতে পার, বোকার মতো কিছু করে ফেলতে পার। বেশ তো তাতেই বা কি? যাই কর, কক্ষনো ক্ষমা চেয়ো না। ফুল পাঠিয়ো, চিঠি নয়, স্রেফ ফুল। ফুল হচ্ছে মহৌষধি, তাতেই সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়—এমন কি কবরও।'

ওর দিকে তাকালুম। যেমন বসেছিল তেমনি বসে আছে। বাইরের শাদা আলোয় ওর চোখ দুটো চকচক করছে। মৃদু গর্জনে এঞ্জিনটা তখনও চলছে, মনে হচ্ছে আমাদের পায়ের তলায় মাটিটা যেন কাঁপছে। খানিক বাদে বললুম, 'আচ্ছা তাহলে না হয় একটু খাই, কি বল?' বলে রাম্-এর বোতলটি খুললুম।

কোষ্টার এঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'গট্‌ফ্রিড্‌, যার-যার গেলাশ খুঁজে নেবার পক্ষে তো চাঁদের আলোই যথেষ্ট। এবার আমাদের আলোকসজ্জাটা বন্ধ করতে দোষ কি? বিশেষ করে তোমার ঐ ফোর্ডের আলোটি? ওর ঐ ট্যারচামতো সার্চলাইটটা দেখে আমার লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রাত্তিরবেলায় তোমার এরোপ্লেনের ওপর যখন নিচে থেকে সার্চলাইট এসে পড়ত তখন কেমন লাগত ভেবে দেখ তো?'

লেন্‌ত্‌স ঘাড় নেড়ে বলল, 'আর ঐ আলোটা দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? থাকগে—দরকার কি?' লেন্‌ত্‌স উঠে গিয়ে সবগুলো হেড্‌লাইট বন্ধ করে দিল।

চাঁদটা এখন ঠিক ফ্যাক্টরি-বাড়ির উপরে। দেখলে মনে হয় প্লাম্ গাছটার উঁচু ডাল থেকে একটি হলদে রঙের চীনা লণ্ঠন ঝুলছে। ঈষৎ হাওয়া দিয়েছে তাতে গাছের ডালগুলো খুব আস্তে-আস্তে দুলছে। লেন্‌ত্‌স হঠাৎ বলে উঠল, 'আশ্চর্য, মানুষের বেলায়—যেমন-তেমন লোকের নাম করে আমরা স্মৃতিস্তম্ভ কিম্বা

ঐরকম কিছু তৈরি করে ফেলি—কিন্তু এমন চাঁদের আলো কিম্বা এমন ফুলন্ত গাছের বেলায় তা হয় না কেন তাই ভাবি—'

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলুম। হলঘরের দরজা খুলতেই গানের শব্দ কানে এল। সেই সেক্রেটারী আন্না বোনিগ-এর গ্রামোফোন বাজছে। বেশ মিষ্টি সুরের গান হচ্ছে কোনো মেয়ের গলায়। গানের ফাঁকে বেহালা আর গিটারের স্বর কেঁপে কেঁপে বাজছে। তারপরেই আবার মেয়েটির গলা খুব উঁচু পর্দায় গেয়ে উঠছে, কিন্তু খুব মিষ্টি। মনের আনন্দ যেন গানের সুরে ঝরে পড়ছে। গানের কথাগুলি ধরবার জন্য কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলুম। অন্ধকার করিডরে একদিকে ফ্রাউ বেণ্ডার-এর সেলাই-এর কল আর একদিকে হেসি পরিবারের বাক্স-টাক্স—তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির মৃদুকণ্ঠের গানটা শুনতে আশ্চর্য রকম ভালো লাগছিল। রান্নাঘরের দরজার উপরে যে শুয়োরের মাথাটা ঝুলছে সেটার দিকে একবার নজর পড়ল। ভিতর থেকে থালা-বাসনের শব্দ আসছে। কয়েক হাত দূরেই গান হচ্ছে। গানের কথাগুলি এখন বেশ স্পষ্ট—তোমা বিনে কেমন করে দিন কাটবে। তাই তো! কেমন করে কাটবে—ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। পাশের ঘরে কি একটা ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্ক চলেছে। কয়েক মিনিট পরেই দরজায় ধাক্কা, সঙ্গে-সঙ্গে হেসি ঢুকল।

'তোমা'কে বিরক্ত করছি না তো?' গলার স্বর খুব ক্লান্ত।

'না, না, কিছুমাত্র না। বসো, তোমাকে কিছু একটু পানীয় দিই।'

'না, তার দরকার নেই। আমি শুধু একটু বসব।' সুমুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। হঠাৎ বলল, 'তুমি ভাই বেশ আছ একলা মানুষ কিনা—'

আমি বললুম, 'ওসব বাজে কথা। সারাক্ষণ একলা-একলা থাকা—সে যে কি বিষম দুর্দায় সে আমিই জানি—'

আরাম কেদারায় শরীরটিকে ডুবিয়ে দিয়ে ও বসে আছে। রাস্তার আলো খানিকটা এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে, ওর চোখ দুটো জলজল করছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'জীবনটাকে একেবারে অন্যরকম কল্পনা করেছিলাম।'

আমি বললুম, 'আমরা সবাই তাই করেছি।'

আধ-ঘণ্টাখানেক বসে ও চলে গেল বোধকরি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে। যাবার সময় ওকে কয়েকখানা খবরের কাগজ আর আধ বোতলটাক ক্যুরসাও দিয়ে দিলাম। জিনিসটা কিছুদিন থেকে আমার

আলমারিতে পড়ে আছে। খেতে মিষ্টি হলেও আস্বাদটা তেমন ভালো নয়। কিন্তু ওর পক্ষে এই ভালো, এসব জিনিসের মর্ম ও তেমন বোঝে না।

খুব আস্তে, নিঃশব্দে ও বেরিয়ে গেল; ছায়া যেমন ছায়ায় মিলিয়ে যায়। লোকটাকে দেখলে মনে হয় যেন একেবারে নিবে গেছে। ও বেরিয়ে যাবার পর দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে দিলুম। খানিকটা বাজনার সুর আবার ভেসে এল—বেহালা আর ব্যাঞ্জোর সুর।

জানালার ধারে গিয়ে বসলুম। সুমুখে চাঁদের আলোতে কবরখানাটা দেখা যাচ্ছে। গাছপালা আর কবরখানার স্মৃতিফলকগুলোর সার ছাপিয়ে উঠেছে ইলেকট্রিকের পোস্ট। এখন আর এ জায়গাটা ভীতির উদ্রেক করে না। মোটরগাড়ি হুস্ করে এর গা ঘেঁষে চলে যায়। হেড্‌লাইটের তীব্র আলোতে স্মৃতিফলকের গায়ে লেখা বহু পুরাতন অক্ষরগুলো লেপে-পুছে একাকার হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ বসে-বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবলুম—বিশেষ করে কি অবস্থায় লড়াই থেকে ফিরে এসেছিলুম সে সব কথা। একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা হয়ে গেলে পরে খনির মজুররা যে ভাবে ফিরে আসে এও তেমনি। তখন বয়স অল্প কিন্তু সংসারের সব মোহ এরই মধ্যে ঘুচে গিয়েছে। কেবল নিজেদের উপরে তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস হারাইনি। আমরা ভেবেছিলুম লড়াই করছি মিথ্যার বিরুদ্ধে, স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে, মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে—যা আমাদের সকল দুঃখের মূলে। সকল কিছুর উপরে আস্থা হারিয়ে মন আমাদের কঠোর হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস হারাইনি কেবল আমাদের সাথীদের উপরে আর এই আকাশ বাতাস, গাছপালা, মাটি, রুটি আর আমাদের সিগারেটের উপরে, কারণ এরা কখনো মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু এত করেও কি হল? সব আশা ভূমিসাৎ হয়েছে, আদর্শ বিকৃত হয়েছে কিম্বা বেশির ভাগ লোক ভুলেই গিয়েছে। আর আমরা যারা ভুলিনি তাদের জন্য রয়েছে শুধু অক্ষমতা আর হতাশার বেদনা আর রয়েছে জিন্-এর বোতল। ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন এক নিমেষে গিয়েছে মিলিয়ে। শেষ পর্যন্ত জিতল গিয়ে যত স্বার্থান্বেষী আর ফোপরদালালের দল। মিথ্যার হল জয়, মানুষের দুঃখ হল চিরস্থায়ী।

হেসি বলছিল আমি বেশ আছি কারণ আমি কিনা একলা। তা একরকম ভালোই তো। যে মানুষ একলা থেকে অভ্যস্ত সে তো কখনো নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করে না। কিন্তু তবু দেখেছি মাঝে-মাঝে রাত্তিরবেলায় মনে হয় জীবনের

মনগড়া ভিত্তিটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, জীবনটা গুমরে-গুমরে কেঁদে ওঠে, শততন্ত্রী জীবনবীণা সহস্র অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনায় আর্তনাদ করতে থাকে। মুক্তির জন্য প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে। এই মুহূর্তে এর থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে—যেখানে হোক, যেই চুলোয় হোক। আঃ, আর কিছু নয়, একটু শুধু উষ্ণ স্পর্শ—কিসের? বোধকরি দুখানি নরম হাতের কিম্বা একখানি মুখ আমার মুখে ছোঁয়ানো। কে জানে হয়তো বা ছলনা, অদৃষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার, হয়তো আপন মনের পলায়নীবৃত্তি। তাহলে বুঝি এর থেকে মুক্তি নেই, একলা থাকাই অদৃষ্টের লিখন।

জানালাটা বন্ধ করে দিলুম। নাঃ, মুক্তি নেই, মুক্তি নেই। পায়ের তলা থেকে মাটি গেছে সরে। দাঁড়াব যে এমন স্থান কোথায়?

পরদিন খুব ভোরে উঠে গেলাম এক ফুলের দোকানে। খুব ভালো দেখে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া বেছে দোকানীকে বললুম তক্ষুনি সেটা পাঠিয়ে দিতে। কার্ড নিয়ে যখন নাম ঠিকানা লিখলুম—প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান—নিজের মনেই ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ঠেকতে লাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুরনো ছেঁড়াছাঁড়া জামাকাপড় পরে কোষ্টার গিয়েছে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স আপিসে আমাদের ট্যাক্স কিছু কমানো যায় কিনা তারই চেষ্টায়। লেন্‌ত্‌স আর আমি রয়েছি কারখানায়। ওকে বললুম, 'চল, ক্যাডিলাক্‌টাকে একটু ঘষে-মেজে রাখি।'

কালকে আমাদের বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে, কাজেই আজকে খদ্দের আশা করা যায়। অবশ্য আদৌ খদ্দের জুটবে কিনা তাই সন্দেহ। তবু গাড়িটা ঠিকঠাক করে রাখতেই হবে। প্রথমে তো গিয়ে বেশ করে বার্নিশ লাগালুম। দেখতে-দেখতে গাড়িটা একেবারে চক্‌চকে হয়ে উঠল, কেউ দেখলে মনে করবে আবার শ'খানেক মার্ক বার্নিশে ব্যয় করা হয়েছে। তারপরে এঞ্জিনে খুব ভালো দেখে তেল ভর্তি করলাম। পিস্টনগুলো এখন আর তেমন ভালো অবস্থায় নেই, একটু ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল কিন্তু ভালো তেলের দরুন সেটা বেশ শোধরানো গেছে। এঞ্জিনটা এখন দিব্যি মোলায়েম ভাবে চলছে। গিয়ারগুলোতেও যথেষ্ট তেল মাখানো হয়েছে যেন কোথাও এতটুকু না বাধে।

একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাছেই খানিকটা রাস্তা খুব খারাপ। তারই উপর দিয়ে গাড়ি চালালুম পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে। গাড়িটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে আর শব্দ হচ্ছে। টায়ার থেকে খানিকটা হাওয়া বের করে দিলুম, তাতে কিছুটা উন্নতি হল। আর একটু বের করে দিলুম, ব্যস্ এবার আর শব্দ নেই।

গাড়ি নিয়ে আবার ফিরে এলুম। মাথার ঢাকনাটায় সামান্য একটু আওয়াজ দিচ্ছিল। ঢাকনাটা তুলে মাঝখানটায় একটু রবার চেপে দিলুম, তাতে আওয়াজটা বন্ধ হল। রেডিয়েটারে একটু গরম জল ঢেলে দিলুম আর তল'টা পেট্রল দিয়ে মুছে সাফ করে নিলুম। এখন ওখানটাও চক্‌চকে হয়ে উঠেছে।

গট্‌ফ্রিড্‌ দু-হাত আকাশে তুলে প্রার্থনা জানায় : 'দোহাই ভগবান, মনের মতো একটি খদ্দের পাঠিয়ে দাও, পকেটে যার যথেষ্ট পয়সা আছে। বর যেমন কনের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে আমরা তেমনি খদ্দেরের অপেক্ষায় বসে আছি।'

কিন্তু কনে আর আসে না। কী করি, সেই পাঁউরুটিওয়ালার গাড়িটা গর্তের কাছে ঠেলে নিয়ে কাজ শুরু করলুম। সামনের দিকের এ্যাক্সলটা খুলে ফেলতে হবে। দুজনে চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছি কারো মুখে কথা নেই। বোধ করি কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে, হঠাৎ পেট্রোল পাম্পের দিক থেকে জাপ্‌-এর শিস শুনতে পেলুম—'দেখে যান তো কে যেন আসছে।'

গর্ত থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখি একটি বেঁটে খাটো লোক ক্যাডিলাক্‌টার চার পাশে ঘুরে-ঘুরে দেখছে। ফিসফিস করে বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্‌ দেখ তো, কনে এসেছে বলে মনে হচ্ছে?'

লেন্‌ত্‌স এক নজর তাকিয়েই বলল, 'হ্যাঁ, কনে নয়তো কি? দেখ না মুখের ভাবখানা? খুব সন্দিগ্ধভাবে দেখছে। যাও, যাও আর দেরি কোরো না। আমি এখানটায় চুপচাপ থাকি। তুমি গিয়ে আগে কথা বলে দেখ, অসুবিধে দেখলে আমাকে পরে ডেকো। আমাদের কৌশলগুলো মনে রেখো।'

'আচ্ছা,' বলে এগিয়ে গেলুম।

ভদ্রলোক কেমন একটা নিস্পৃহ শুষ্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

প্রথমেই গিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম, বললুম, 'লোকাম্প্‌।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ব্লুমেন্‌থল্‌।'

ওটি হল গট্‌ফ্রিড্‌-এর প্রথম কৌশল—নিজের পরিচয়টি আগে দিয়ে পরে অন্য কথা। এতে গোড়া থেকেই বেশ একটি আপনা-আপনি ভাব জমে যায়। ওর দ্বিতীয় কৌশল হল নিজে চুপ করে থেকে খদ্দেরকে কথা বলতে দেওয়া, সুযোগমতো পরে নিজে কথা বলা।

জিগেস করলুম, 'আপনি বোধহয় ক্যাডিল্যাক্‌টা দেখতে এসেছেন?'

ভদ্রলোক শুধু মাথা নাড়লেন। আমি গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বললুম, 'ঐ যে রয়েছে।'

ব্লুমেন্‌থল্‌ বলল, 'হ্যাঁ, তা দেখেছি।'

আমি আর এক নজর ওর দিকে তাকালুম। এ্যাঁ, বেশ ঝানু খদ্দের মনে হচ্ছে। দুজনেই কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। গাড়ির দরজা খুলে এঞ্জিনটা চালু করে দিলুম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, ব্লুমেন্থল্ দেখে শুনে যা বলবার বলুক। এক-আধটা খুঁত নিশ্চয় ধরবে, তখন যা বলবার হয় বলব।

কিন্তু ব্লুমেন্থল্ খুঁটিয়ে কিছুই দেখল না, খুঁত ধরবারও চেষ্টা করল না। আমার মতো সেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল যেন একটি ভ্যাবাগঙ্গারাম। নাঃ, এমনি করে তো হবে না, অন্য কিছু চেষ্টা করতে হবে।

আস্তে-আস্তে ক্যাডিলাক্-এর আদ্যোপান্ত বর্ণনা শুরু করে দিলুম, মা যেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে ছেলের কথা বলতে থাকে। দেখা যাক লোকটা শুনতে-শুনতে যদি একটু উৎসাহ প্রকাশ করে—ওর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় কিনা আগে তাই দেখা যাক। যদি দেখি লোকটা গাড়ির ব্যাপারে নেহাত আনাড়ি নয় তবে এঞ্জিন আর কলকব্জা সম্বন্ধেই বেশি বলব, আর তা যদি না হয় তবে আরাম এবং ব্যবস্থার দিকটাই বেশি করে বলা উচিত।

কিন্তু লোকটা কিছুই বলছে না, আমিই একতরফা কথা বলে যাচ্ছি, ভারি অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বললুম, 'আচ্ছা আপনি গাড়ি কি উদ্দেশ্যে কিনতে চান বলুন তো—শহরে ব্যবহারের জন্য না ভ্রমণের উদ্দেশ্যে?'

ব্লুমেন্থল্ বলল, 'সব কিছুর জন্যই।'

'আচ্ছা! আপনি নিজে গাড়ি চালাবেন না শোফার রাখবেন?'

'সে দেখা যাবে।'

দেখা যাবে! লোকটি দেখছি একটি তোতা পাখি, পড়ানো বুলি ছাড়া বলে না কিম্বা মৌনীবাবা বললেও অত্যুক্তি হয় না। লোকটাকে কিছুতেই তাতানো যায় না। জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করে দেখলে তবে খদ্দেররা ক্রমে পথে আসে। আমার একতরফা কথা শুনতে-শুনতে এ লোকটা ঘুমিয়েই না পড়ে।

বললুম, 'এত বড় গাড়ির পক্ষে হুড্‌টা আশ্চর্য রকম হালকা। দেখুন না ধরে, ইচ্ছে করলে এক হাতেই তুলতে পারেন নামাতে পারেন।'

কিন্তু ব্লুমেন্থল্ ধরে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। ভাবটা যেন হ্যাঁ, ও তো দেখাই যাচ্ছে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। হ্যাণ্ডেল নেড়ে-চেড়ে দেখলাম, খুব আঁটসাঁট শক্ত, নড়বড়ে কিছু নেই—'দেখুন না একবার।' ব্লুমেন্থল্ এবারও দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। ভাবটা যেন—ও আর দেখবার কি দরকার। লোকটা দেখছি আচ্ছা ঝানু।

জানালাগুলো দেখালুম। 'পাখির পালকের মতো হাল্কা, যেমন ইচ্ছে নাড়ুন, যদ্দুর ইচ্ছে তুলে রাখুন।'

লোকটা একবার নড়লও না, এদিকে আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছি। তবু বললুম, 'আর কাঁচ দেখুন, এ কাঁচ কক্ষনো ভাঙে না। এটা একটা মস্ত বড় সুবিধে। ঐ তো আমাদের কারখানায় একটা ফোর্ড গাড়ি পড়ে আছে—' সেই পাঁউরুটি ব্যবসায়ীর স্ত্রীর কাহিনীটি ওকে বললুম—ব্যাপারটা একটু অতিরঞ্জিত করবার জন্য বললুম, 'স্ত্রীটি তো মারা গেলই, সঙ্গে একটি শিশু পর্যন্ত'—ঐ শিশুর কথাটাই অনাবশ্যক বাড়ানো।

লোকটার মনটা দেখছি একটি লোহার সিন্দুকের মতো, চোর ডাকাতেরও কর্ম নয় তালা ভাঙা। আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'আজকাল সব গাড়িতেই তো এই কাঁচ, এটা এমন কিছু একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়।'

এবার আমি সামান্য একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলুম, 'বলেন কি, সব গাড়িতেই এ ধরনের কাঁচ? বিশেষ-বিশেষ গাড়িতেই শুধু এই রকম কাঁচ দেখবেন—তাও কেবল উইণ্ডস্ক্রিন-এর বেলায়। জানালার কাঁচ কোথাও এমনটি পাবেন না।' হর্নটা বাজিয়ে দেখালুম, তারপরে একে-একে ভিতরের সুবিধেগুলোর কথা বলতে লাগলুম—সিট্, পকেট, সুইচবোর্ড, ল্যাগেজ্-ক্যারিয়ার ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব কিছু বললুম। একটি সিগারেট নিয়ে ওঁকে দিতে গেলুম। ভদ্রলোক সিগারেট নিলেন না। একটু যেন বিরক্তির সুরেই বললেন, 'আমি ও সব খাইনে।' লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে হঠাৎ আমার মনে হল, বোধহয় ও আদৌ গাড়ি কিনতে আসেনি। বেরিয়েছিল অন্য কিছু কিনতে—সেলাই-এর কল কিম্বা রেডিও নয়তো আর কিছু; বোধকরি পথ ভুলে এখানটায় ঢুকে পড়েছে, এসে যখন পড়েছে এ ও তা বলে খানিকক্ষণ সময় কাটাতে হবে তো।

লোকটাকে কিছুতেই বাগানো গেল না। শেষ পর্যন্ত বললুম, 'হের ব্লুমেন্থল্, আসুন না একবার গাড়িটা চালিয়েই দেখুন।'

খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'ট্রায়াল রান্?'

'হ্যাঁ, ট্রায়াল রান্ দিয়ে দেখা দরকার গাড়িটার চলতি কেমন। এমন স্বচ্ছন্দে চলে, মনে হবে রেল লাইনের উপর দিয়ে চলছে। খাশা এঞ্জিন, এমন যে ভারি বডি একেবারে পাখির পালকের মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়—'

লোকটা আমার কথা বেমালুম উড়িয়েই দিল—'না! ট্রায়াল রান্ দিয়ে কি হবে? ওতে গাড়ির কিছু বোঝা যায় না। কিছুদিন ব্যবহার করলে তবে বোঝা যায় কোথায় কি গলদ।'

ভয়ানক রাগ হল। মনে-মনে বললুম, 'বাপু তুমি কম ঘুঘু নও। তুমি বুঝ

ভেবেছ আমি নিজেই কোথায় গলদ তাই বাতলে দেব।' এবার আশা ছেড়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা তবে ট্রায়াল দিয়ে কাজ নেই।' বুঝলুম লোকটার ট্রায়াল দেবার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ ফিরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটার দাম কত ?' আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে বললুম, 'সাত হাজার মার্ক।' লোকটা দেখুক যে দামটা নিক্তিতে ওজন করা, দাম বলতে ভেবে চিন্তে কইতে নেই। এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে দাম থেকে হাজার মার্ক খসে যেত। আর একবার জোর দিয়ে বললুম, 'পুরোপুরি সাত হাজার মার্ক।' মনে-মনে বললুম, পাঁচ হাজার দিলেই গাড়িটি পেতে পার।

ব্লুমেন্থল্ কিন্তু দরদস্তুর কিছুই করল না। শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, 'বড্ড বেশি দাম।'

আমি নির্বিকার মুখ করে বললুম, 'তা তো বটেই।'

'তা বটেই !—মানে ?' হঠাৎ ব্লুমেন্থল্-এর গলার স্বরটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

বললুম, 'হের্ ব্লুমেন্থল্, দরে যদি না বনে তবে এ ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন।' এতক্ষণে একটু যেন হাসির আভা ওর মুখে দেখা দিল। 'তা ঠিকই বলেছেন ; কিন্তু দামটা সত্যি খুব বেশি ঠেকছে।'

ওর গলার স্বরটা এখন অনেকখানি বদলেছে। এ রকম কথা শুনলে একটু আশা হয়। গাড়িটা বোধকরি ওর মনে ধরেছে। কিম্বা কে জানে এ হয়তো আর একটা ভাঁওতা।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সুসজ্জিত যুবক ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকল। পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করে বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখলে, তারপরে আমার দিকে এগিয়ে এল। 'আপনারা একটা ক্যাডিলাক্ বিক্রি করছেন ?' মাথা নেড়ে জানালুম, 'হ্যাঁ।' হাতে হলদে রঙের বাঁশের ছড়ি আর শুয়োরের চামড়ার দস্তানা—আমি নির্বাক বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি।

নির্বিকার ভাবে বলল, 'গাড়িটা একবার দেখতে পারি ?' বললুম, 'এই যে এই গাড়িটাই। কিছু যদি মনে না করেন তো দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমার একটু কাজ বাকি আছে। আসুন, ভেতরে গিয়ে একটু বসবেন।' ছোকরা মতো লোকটি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এঞ্জিনের ঝকঝকানি শব্দটা শুনল। প্রথমটায় একবার ভ্রূকুঞ্চিত করল, তারপরে মুখের ভাব প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমি

ওকে আপিসের দিকে নিয়ে গেলুম। দরজায় ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললুম, 'ইডিয়ট্ কোথাকার!' বলেই তাড়াতাড়ি ব্লুমেন্থল্-এর কাছে ফিরে এলুম। বললুম, 'গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখলে আর দাম সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি থাকত না। আপনার যতক্ষণ খুশি ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন। কিম্বা বলেন তো আপনার সুবিধে মতো একদিন সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে আপনাকে সঙ্গে করে ট্রায়াল দিতে পারি।'

কিন্তু ওর মধ্যে সামান্য যে দুর্বলতাটুকু এসেছিল তা এরই মধ্যে সে কাটিয়ে উঠেছে। গ্র্যানাইট পাথরের মূর্তির মতো ব্লুমেন্থল্ দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'যাকগে, আজকে আমি যাচ্ছি। ট্রায়ালের প্রয়োজন হলে টেলিফোন করেই জানাতে পারব।'

আমার যদ্দুর করবার করেছি, আর কিছু করবার নেই। লোকটা কথায় ভুলবার পাত্র নয়। বললুম, 'বেশ তাই হোক! কিন্তু আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে গেলে হত না। আর কেউ কিনতে চাইলে আপনাকে জানাতে পারতুম।' ব্লুমেন্থল্ স্থিরদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাল। বলল, 'কিনতে চাওয়া আর কেনা এক কথা নয়।'

সিগার কেস্ বের করে একটি আমার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটা তাহলে ধূমপান করে! বাপরে—এ যে 'করোনা'—টাকার কুমির দেখছি। কিন্তু তাতে আমার যে আসল কাজে লাভ হল না। হাত বাড়িয়ে সিগারটি নিলুম।

বন্ধুভাবে করমর্দন করে ব্লুমেন্থল্ বিদায় নিল। ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে ঝাল মিটিয়ে গাল দিলুম। তারপরে গিয়ে কারখানায় ঢুকলুম।

ছোকরাটি অর্থাৎ কিনা আমাদের গট্‌ফ্রিড্ লেন্‌ত্‌স লাফিয়ে উঠে বলল, 'তারপরে? কেমন অভিনয়টি করলুম বল তো? তুমি ওর হাতে নাকানি চুবোনি খাচ্ছ দেখে ভাবলুম একটা চাল দেওয়া যাক। ভাগ্যিস অটো ইন্‌কাম ট্যাক্স আপিসে যাবার সময় এখানে কাপড়জামা বদলে গিয়েছিল, দিব্যি ভালো স্যুটটি ঝুলছে, পরে নিলুম তক্ষুনি। তারপরে জানালা দিয়ে নিষ্ক্রমণ এবং সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ—মস্ত জাঁদরেল খরিদ্দার। ফন্দিটা কিছু খারাপ হয়নি, কি বল?' বললুম, 'বোকা আর কাকে বলে। আরে ও বেটা যা ধড়িবাজ, আমাদের দুজনকে একত্র করলেও ওর সমান হয় না। সিগারটি দেখছ তো? এক-একটির দাম দেড় মার্ক। কোটিপতি হে কোটিপতি—তোমার বোকামিতে ক্রোড়পতি হাত ছাড়া হয়ে গেল।'

গট্‌ফ্রিড্‌ হাত থেকে সিগারটি ছিনিয়ে নিয়ে শুঁকে দেখল। গম্ভীর ভাবে সিগারটি জ্বালিয়ে বলল, 'কোটিপতি না হাতি। জুয়াচোরের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি। কোটিপতিরা এ সিগার কক্ষনো খায় না। ঐ যে এক মার্ক-এ চব্বিশটি করে পাওয়া যায় তাই খায়।'
'আরে, জুয়াচোর যদি হত তাহলে নাম জিগগেস করলে কক্ষনো বলত না ব্লুমেন্‌থল্‌, বলতো কাউন্ট ব্লুমেনো বা অমনি একটা কিছু।'
লেন্‌ত্‌স সহজে হাল ছাড়ে না। বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলল, 'ও আবার আসবে দেখো।' বলে দিব্যি আরামে আমার সিগার থেকে আমারই মুখে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।
বেশ জোর দিয়েই বললুম, 'সে আশা ছেড়ে দাও, ও আর আসছে না। যাকগে, ঐ বাঁশের ছড়ি আর দস্তানা কোত্থেকে বাগালে শুনি।'
'ধার করে নিলুম। ঐ যে রাস্তার মোড়ে ওখানটায় রেন্‌ এণ্ড্‌ কোং—তাদেরই কাছ থেকে। ওদের সেলস্‌ গার্লের সঙ্গে চেনা আছে কিনা। ভাবছি ছড়িটা রেখেই দেব। খাসা ছড়িটি।' মনের খুশিতে হাতের ছড়ি ঘোরাতে লাগল।
আমি বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্‌, তুমি এখানে থেকে নিজেকে মাটি করছ। আমি বলি কি তুমি থিয়েটারে যাও, ওটাই তোমার আসল স্থান।'

লাঞ্চের ছুটিতে বাড়ি এসেছিলুম, কখনো বড় একটা আসি না। ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ট্যারা মতো ঝি ফ্রিডা এসে বলল, 'আপনাকে কে একজন টেলিফোনে ডাকছিলেন।'
খুব অবাক হয়ে বললুম, 'কখন ?'
'এই আধ-ঘণ্টা খানেক আগে। একজন ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন।'
'কী বললেন তিনি ?'
'বললেন সন্ধ্যেবেলায় আবার ফোন করবেন। আমি বলে দিয়েছি, ফোন করে লাভ হবে না, কারণ সন্ধ্যেবেলায় উনি কখনো বাড়িতে থাকেন না।'
ওর কথা শুনে আমি হতভম্ব। 'অ্যাঁ, তাই বললে নাকি ? কি কাণ্ড, এ্যাদ্দিনেও টেলিফোনে কথা কইতে শিখলে না।'
ফ্রিডা চোক পাকিয়ে বলল, 'খুব শিখেছি, আপনাকে আর শেখাতে হবে না। আপনি কবে সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে থাকেন তাই বলুন।'
আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললুম, 'থাকি না থাকি তাতে তোমার কি ? এর পরে

কেউ টেলিফোন করলে বোধকরি আমার মোজার কোনখানটা ছেঁড়া তাও তাকে বলতে যাবে।'

ফ্রিডাও চোখ রাঙিয়ে বলল, 'তা দরকার হলে তাও বলব।'

ওর সঙ্গে কোনো কালে আমার বনে না। ইচ্ছে করছিল ঝোলের গামলার মধ্যে ওকে চুবিয়ে দিই। কিন্তু রাগটা সামলে গেলুম। পকেট হাতড়ে একটি মার্ক বের করে ওর হাতে গুঁজে দিলুম। ভাব করবার জন্য একটু খোসামুদির সুরে বললুম, 'ভদ্রমহিলা নিজের নাম-টাম বললেন না?'

'না।'

'আচ্ছা গলার স্বরটা কি রকম বল তো? একটু ভাঙা-ভাঙা নয়?'

ফ্রিডা নেহাত নির্লিপ্তভাবে বলল, 'অত শত আমি বলতে পারব না।'

আশ্চর্য, এই যে এক্ষুনি পুরো একটি মার্ক ওকে বকশিশ দিলাম তাও গ্রাহ্যই নেই।

'বাঃ, বেশ আংটিটি পরেছ তো। দিব্যি মানিয়েছে তোমাকে···আচ্ছা, এখন ভেবে দেখ তো মনে করতে পার কিনা।'

না, না, আমার কিছু মনে নেই।' ফ্রিডার মুখে জেদের হাসি। আমাকে আমলই দিতে চায় না।

আমিও রেগে উঠে বললুম, 'যা, তুই মরগে যা।' রেগে চলে এলুম।

ঠিক ছ'টার সময় আবার ঘরে ফিরে এলুম। দরজা খুলেই দেখি এক বিচিত্র ব্যাপার। প্যাসেজ-এর মাঝখানটায় ফ্রাউ বেগুার দাঁড়িয়ে আছে। আর বোর্ডিং-এর যত সব মেয়ে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখেই ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'একবার এদিকটায় আসুন না।' কাছে গিয়ে দেখি একটি মাস ছয়েকের শিশুকে কেন্দ্র করে এত বড় একটি উৎসুক জনতার সমাগম হয়েছে। ফ্রাউ বেগুার প্যারামবুলেটরে করে শিশুটিকে নিয়ে এসেছে অনাথাশ্রম থেকে। ঐটুকু বাচ্চা যেমন সচরাচর হয়ে থাকে এও তাই। কিন্তু এতগুলি মেয়ে একেবারে গদগদ স্নেহে এমন ভাবে ওর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, দেখলে মনে হবে সংসারে এই প্রথম মানবশিশুর জন্ম হয়েছে। বাচ্চাটার কৌতুক উৎপাদনের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চলছে। কেউ ওর চোখের কাছে নিয়ে হাত ঘোরাচ্ছে, কেউ বা জিব দিয়ে ঠোঁট দিয়ে নানারকম শব্দ করছে, আদর করছে। এমন কি কিমোনো গায়ে আমাদের আর্না বোনিগ পর্যন্ত এই পোশাকি মাতৃত্বের অভিনয়ে যোগ দিয়েছে।

ফ্রাউ জালেওয়াস্কির চোখে আনন্দাশ্রু। 'আহা, চমৎকার দেখতে না বাচ্চাটি?' টেলিফোনটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললুম, 'তা এখন কেমন করে বলি? আরো বছর কুড়ি-পঁচিশ বাদে ঠিক বলা যাবে।' বাবাঃ, এরা যা হল্লা করছে। এই গোলমালের মধ্যে আবার টেলিফোনের ডাক আসেনি তো?

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি হেসে বলল, 'একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না।'

দেখলুম। বাচ্চারা যেমনটা হয় তেমনি, অসাধারণ কিছুই নজরে পড়ল না। ক্ষুদে ক্ষুদে ঐটুকু হাত। আমি নিজেও একদিন ঐটুকু ছোট্ট ছিলুম। ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগে। বললুম, 'আহা বেচারি, কি কঠিন সংসারে এসেছে তা জানে না তো! ওকে আবার কোন লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হবে কে জানে?'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলে উঠল, 'ছি-ছি, কি সব অলক্ষুণে কথা। তোমার একটুও দয়া-মায়া নেই বুঝি?'

'খুব আছে। দয়া-মায়া আছে বলেই তো ও কথা বললুম।' আর বাক্যব্যয় না করে গিয়ে ঘরে ঢুকলুম।

মিনিট দশেক পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। আমার নাম শুনে বেরিয়ে এলুম। ওরা এখনও ওখানে হল্লা করছে। আমি রিসিভার কানে তুলে নিলুম তা দেখেও যদি একটু গলা খাটো করত! হ্যাঁ, প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানের গলা বটে। ফুল পাঠানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ঐ দলের মধ্যে বাচ্চাটারই তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান ছিল। কিন্তু ওদের জ্বালায় উত্যক্ত হয়ে সেও এখন তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে। আমি টেলিফোনে যথাসাধ্য চেঁচিয়ে বললুম, 'মাপ করবেন, আপনার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে। এখানে একটা বাচ্চার হঠাৎ ফিট শুরু হয়েছে, তাই নিয়ে ভয়ানক চেঁচামেচি চলছে। বাচ্চাটা অবশ্যি আমার নয়—' ছেলেটাকে শান্ত করবার জন্য উক্ত রমণীর দল এক যোগে সবাই শশ-শশ শব্দ শুরু করেছে, মনে হচ্ছে কয়েক গণ্ডা গোখরো সাপ এক সঙ্গে ফোঁস-ফোঁস করতে শুরু করেছে। ওদের ঐকতান চেষ্টার ফলে বাচ্চাটা স্বর একেবারে পঞ্চমে তুলে দিল। এখন বেশ বুঝতে পারলুম ছেলেটা অসাধারণ বটে, ওর ফুসফুসটা নিশ্চয় বুক থেকে শুরু করে হাঁটু অবধি পৌঁছেচে নইলে অতটুকু যন্ত্র থেকে অত শব্দ হতেই পারে না। আমি বিষম বিপদেই পড়েছি। একদিকে ঐ মাতৃত্বের বিচিত্র অভিনয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, ওদিকে আবার টেলিফোনে যথাসাধ্য মোলায়েম গলায় কথা বলবার চেষ্টা করছি। রাগে আমার অন্তরাত্মা জ্বলছে, তবু মুখে হাসি টেনে কথা বলছি। কেমন করে যে সেই তাণ্ডবের মধ্যেও

পরদিন সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা স্থির করে নিলুম ভেবে আমিই অবাক হয়ে যাই।

ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে বললুম, 'এখানে একটা সাউণ্ড-প্রুফ টেলিফোন বক্স না বসালে আর চলছে না।'

জবাবটা তার মুখে তৈরিই ছিল। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'কেন শুনি? এত কি তোমার গোপন কথা?'

কথার জবাব না দিয়েই সরে পড়লুম। মাতৃভাব যার উথলে উঠেছে তার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। সারা দুনিয়াই ওর পক্ষ নেবে, আমার হয়ে কেউ একটি কথা বলবে না।

ঠিক ছিল সেদিন সন্ধ্যায় আমরা গট্‌ফ্রিড্-এর ওখানে সবাই জড়ো হব। একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাওয়া সেরে নিলাম। মনটা খুব খুশি ছিল। পথে একটা হাল ফ্যাসানের পোশাকের দোকানে ঢুকে খুব জমকালো একটা টাই কিনে ফেললুম। এত সহজে কার্যোদ্ধার হল দেখে আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। যাক, সুযোগ পাওয়া গেছে কালকে আর ছ্যাবলামো নয়, বিষম গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে।

গট্‌ফ্রিড্-এর ঘরটি দেখবার মতো। সাউথ আমেরিকা থেকে বহু দ্রষ্টব্য জিনিস এনে সে ঘর ভর্তি করেছে। রঙিন মাদুর দিয়ে দেয়াল ঢাকা। কিছু মুখোশ, একটা মানুষের মাথার খুলি, অদ্ভুত চেহারার সব পাত্র, কয়েকটা বর্শা—তাছাড়া একধারের দেয়াল অসংখ্য ফটোগ্রাফে ভর্তি—যত রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ের ছবি, কিছু বা বর্ণসঙ্করীর দল—কি তাদের রূপের বাহার আর কেমন তেজিয়ান মূর্তি! লেন্‌ত্‌স আর কোষ্টার ছাড়া উপস্থিত ছিল ব্রাউমুলার আর গ্রাউ। ব্রাউমুলার-এর রোদে-পোড়া চেহারা, মুখের রঙ তামাটে। সোফার হাতায় বসে খুব মনোযোগ দিয়ে ফটোগুলো দেখছে। কোষ্টার-এর সঙ্গে তার অনেক কালের বন্ধুত্ব। এক মোটরের কারখানায় কাজ করে। মোটর রেস্-এ খুব উৎসাহী। ৬ই তারিখের রেস্-এ সেও যোগ দিচ্ছে, অটো তো আগেই কার্লের নাম পাঠিয়ে দিয়েছে। ওদিকে ইয়া লম্বা-চওড়া ধুমশো চেহারার ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ টেবিলে বসে আছে। তার এখনই অর্ধমাতাল অবস্থা। আমাকে দেখেই তার প্রকাণ্ড হাত বাড়িয়ে দিলে। মোটা গলায় বলল, 'বব্, এখানে কি করতে এসেছ বদলোকের আড্ডায়—এটা তোমার স্থান নয়। যাও, নিজের ভালো চাও তো সময় থাকতে পালাও।'

লেন্‌ত্‌স-এর দিকে তাকালাম। ও চোখ ঠেরে বলল, 'ফার্ডিনাণ্ড খুব মৌজে আছে হে। আজ দুদিন ধরে যত মৃত বন্ধুদের স্মরণ করে গ্লাশের পর গ্লাশ মদ খেয়ে যাচ্ছে। একটা ছবি বিক্রি করেছে, টাকাও পেয়ে গেছে।'
ফার্ডিনাণ্ড ছবি আঁকে। এক ধরনের ছবিতে নাম করেছে নইলে এতদিনে না খেয়ে মরত। ফটোগ্রাফ দেখে ও চমৎকার পোর্ট্রেট আঁকতে পারে! কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার শোকার্ত পরিজনবর্গ ওকে দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নেয়। এতেই ওর চলে যাচ্ছে, বেশ ভালোই চলছে। ও ল্যাণ্ডস্কেপও চমৎকার আঁকে কিন্তু সে সব কেউ কেনে না। এজন্য ওর মনে একটা তিক্ততা আছে, কথাবার্তায় সেটা প্রকাশ পায়।
আমাকে বলল, 'এবার এক হোটেলওয়ালাকে পাকড়াও করেছি! পয়সাওয়ালা খুড়ি কিম্বা জ্যেঠি মারা গেছে, তারই ছবি। বিচ্ছিরি কাণ্ড, যাই বল।'
লেন্‌ত্‌স বাধা দিয়ে বলল, 'ফার্ডিনাণ্ড, অমন ক'রে বলা তোমার উচিত নয়। ভেবে দেখ মনুষ্যচরিত্রের খুব একটা বড় গুণের জোরেই তুমি জীবিকা অর্জন কর যেটাকে বলা যায় মানুষের ধর্মবুদ্ধি।'
ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'হুঁ, ধর্মবুদ্ধি না ছাই বরং পাপবুদ্ধি বল। আরে, পাপের ভয় না থাকলে কারো ধর্মে মতি হয়? বেঁচে থাকতে আমরা যার সর্বনাশ চিন্তা করি সেই আত্মীয়টি মারা গেলে হঠাৎ তার প্রতি আমাদের প্রেম উথলে ওঠে, আসলে ওটা হল কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।' কপালের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার এই হোটেলওয়ালার কথাই ভেবে দেখ না। কতকাল ধরে ঐ বুড়ি খুড়ির মৃত্যু কামনা করে আসছে। আর আজ যেই বুড়ি মরেছে অমনি মস্ত বড় পোর্ট্রেট করে সোফার ওপরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। ধর্মবুদ্ধি বল একে! ধর্ম, দয়া-দাক্ষিণ্য—এসবের জন্য মানুষ থোড়াই কেয়ার করে। বরং চায় এসব গুণ অপরের থাক যাতে নিজের সুবিধেটুকু ভোগ করতে পারে।'
লেন্‌ত্‌স হেসে বলল, 'সমাজ যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তুমি যে সে সব জিনিসকেই আক্রমণ করছ।'
গ্রাউ তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমার সমাজ তো দাঁড়িয়ে আছে লোভ, হিংসা আর নষ্টামির উপর। প্রত্যেকটি মানুষ আছে নিজ-নিজ কুমতলব নিয়ে। সে চায় অপরে ভালো হোক—তা হলেই সুবিধেটা তার।'
লেন্‌ত্‌স তার গ্লাশ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও হয়েছে, এখন আমার গ্লাশে একটু ঢেলে দাও তো। সারা সন্ধ্যেটা বকর-বকর করে নষ্ট করো না।'

সোফার ওপাশে কোষ্টার দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল আসাতে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'অটো, তোমাকে ভাই একটা কাজ করতে হবে। কাল সন্ধ্যেয় আমাকে ক্যাডিলাকটা খানিকক্ষণের জন্য দিতে হবে।'
ব্রাউমুলার এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে একটি অর্ধনগ্ন নর্তকীর ছবি দেখছিল। মুখ তুলে বলে উঠল, 'তুমি তো কোনো রকমে সোজা গাড়ি চালিয়ে যেতে পার, রাস্তার বাঁক ঘোরাতে পারবে?'
ওকে বললুম, 'সে নিয়ে তোমাকে বাপু মাথা ঘামাতে হবে না। দেখ না ছ' তারিখের রেস-এ তোমার কি দশা করি।' ব্রাউমুলারের হাসতে হাসতে বিষম খাবার যোগাড়। অটোর দিকে ফিরে বললুম, 'কই বললে না, ক্যাডিলাকটা নেব?'
কোষ্টার বলল, 'গাড়িটা যে ইন্‌সিওর করা হয়নি।'
'আমি খুব আস্তে খুব সাবধানে চালাব। বাসের মতো হর্ন বাজাতে-বাজাতে এগুব। আর বেশি দূর তো নয়। শহর ছেড়ে কয়েক মাইল মাত্র গাঁয়ের দিকে যাব।'
অটো চোখ বুজে এক মিনিট কি ভাবল। তারপরে বলল, 'বেশ তাই হবে।'
ইতিমধ্যে ওদিক থেকে লেন্‌ত্‌স আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
বলল, 'ঐ গাড়িটা না হলে বুঝি তোমার নতুন টাই-এর সঙ্গে মানাবে না!'
ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললুম, 'তুমি চুপ কর তো!'
কিন্তু ওকে কি সহজে দমানো যায়?
'লক্ষ্মী ছেলে, একবার দেখাও না টাইটা।' হাত বাড়িয়ে টাইটা ধরে সিল্কটা পরীক্ষা করে দেখল। 'চমৎকার জিনিস। আমাদের খোকাটির দেখছি শখ আছে পুরোদমের। কোথাও বিয়ের নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন আছে নাকি?'
ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ মাথা তুলে বলল, 'বিয়ে? তা বেশ তো বিয়েতে যাবে না কেন?' খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার দিকে ফিরে বলল, 'যাও বব্ যাও, যাওয়া দরকার। ভালোবাসার ব্যাপারে মনটি সরল থাকা দরকার, তোমার তা আছে। ভগবানের দান, যত্ন করে রক্ষা করতে হয়। একবার নষ্ট হলে ও আর ফিরে পাবে না।'
লেন্‌ত্‌স হাসতে-হাসতে বলল, 'ওর কথায় রাগ কোরো না। বোকা হয়ে জন্মানোতে কিছু লজ্জা নেই। বোকার মতো না মরলেই হল।'
গ্রাউ বলল, 'গট্‌ফ্রিড্‌ তুমি চুপ করো বাপু।' তার প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে ওকে

সরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমাকে আবার এর মধ্যে কথা বলতে বলেছে কে তোমার সস্তা কাব্যিয়ানা শুনতে পারি না।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'বেশ, ফার্ডিনাণ্ড, বল তুমিই বল। যত ইচ্ছে কথা কও। কথা বলতে পারলে মনটা একটু হালকা হয় কিনা।'

গ্রাউ বলল, 'তুমি তো পয়লা নম্বরের ফাঁকিবাজ। বাস্তবজীবনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা তোমার অভ্যেস।'

লেন্‌ত্‌স হেসে বলল, 'শুধু আমি কেন? আমরা সবাই তাই। মোহ আর অনিশ্চিতের আশা নিয়েই আমাদের জীবন।'

গ্রাউ আমাদের সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, 'তা এক রকম ঠিকই বলেছ। অতীতের মোহ আর ভবিষ্যতের আশা—এই নিয়েই তো কারবার। কিন্তু বব্‌, আমি যে সরলতার কথা বলছিলাম, হিংসুটেরাই তাকে বলে নির্বুদ্ধিতা। ওদের কথা শুনে তুমি মন খারাপ কোরো না। সরলতা কক্ষনো দুর্বলতা নয়, ওটা ভগবানের মস্ত দান।'

লেন্‌ত্‌স বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড ওকে আমল না দিয়ে বলে চলল, 'আমার কথা বুঝতে পারছ তো. আমি সেই সরলতার কথা বলছি—অতি বুদ্ধিমান সংসারী ব্যক্তির সংশয়ী মন যাকে গ্রাস করেনি। সংসারী অর্থে পার্সিফাল ছিল বোকা। বেশি বুদ্ধিমান হলে হোলি গ্রেল জয় করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। জীবনযুদ্ধে বোকারাই জয়লাভ করবে। অতিবুদ্ধিমানের দল পদে-পদে বাধা আর সঙ্কটের কল্পনায় কেবলই পিছিয়ে যাবে। সঙ্কটকালে সরলতার মতো গুণ আর নেই। বিপদের মুখে সেই তার রক্ষাকবচ। অথচ অতি সাবধানী ব্যক্তি অন্ধের মতো ঐ বিপদের গহ্বরেই মুখ থুবড়ে পড়ে।'

এক চুমুকে অনেকখানি মদ গলাধঃকরণ করে বড়-বড় নীল চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। 'বব্‌, কক্ষনো বেশি জানতে চেয়ে না। যে যত কম জানে তার জীবন তত বেশি সহজ, সরল। জ্ঞান মনকে মুক্তি দেয় কিন্তু সুখ দেয় না। এস ঐ সরলতার নাম করে এক পাত্র পান করা যাক—তাকে যদি মূর্খতা বলতে চাও তো বল, কিন্তু আমাদের প্রেম বল, বিশ্বাস বল, সুখস্বপ্ন বল, স্বর্গ বল সব কিছুর জন্ম ঐ মূর্খতা থেকে—'

তার বিশাল বপু নিয়ে ফার্ডিনাণ্ড বসে আছে—অর্ধমাতাল অবস্থায় আপন চিন্তায় আপনি মগ্ন। দেখলে মনে হয় একটি বিষাদের শিলাস্তূপ। সে জানে তার জীবন শতধা বিদীর্ণ—ভাঙা টুকরাগুলো কোনোদিন আর জোড়া লাগবে না।

স্টুডিওতেই থাকে। যে স্ত্রীলোকটি ওর ঘরদোর দেখে তারই সঙ্গে একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। রূপগুণের বালাই নেই, অত্যন্ত হীনরুচির স্ত্রীলোক। ওদিকে গ্রাউ-এর বপুটি বিশাল হলে কি হবে, মনটা বড় কোমল, একটু অস্থিরচিত্ত বৈকি। ঐ মেয়েটার মায়া সে কাটাতে পারছে না, বোধকরি কাটাতে চায় না। ওর বয়স এখন বিয়াল্লিশ। ওকে নেশায় ধরেছে, অর্ধমাতাল অবস্থা। দেখে কেমন ভয় লাগছে। ও আমাদের আড্ডায় বড় একটা আসে না। নিজের স্টুডিওতে বসেই মদ খায়—একলা-একলা মদ খেলে অল্পেতেই নেশায় ধরে। আমার হাতে এক পাত্র মদ তুলে দিয়ে বলল, 'খাও বব্ খাও। যা বললুম তা ভেবে দেখো। নিজেকে বাঁচাও, নইলে ডুবে মরবে।'

'ঠিক বলেছ, ফার্ডিনাণ্ড।'

লেন্‌ৎস উঠে গিয়ে গ্রামোফোন চালিয়ে দিল। ওর কাছে গুচ্ছের নিগ্রো রেকর্ড আছে, তাই বাজাতে লাগল। মিসিসিপির গান—তুলোর চাষীদের গান—গ্রীষ্মাঞ্চলে নীল নদীর তীরে স্তব্ধ-বায়ু গ্রীষ্মপীড়িত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড় রাস্তার উপরে হলদে রঙের মস্ত একটা বাড়ি, তারই একটা ফ্ল্যাটে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান থাকে। বাড়ির সুমুখে সামান্য একটু ঘাসের জমি। বাড়িতে ঢুকবার পথেই একটি ল্যাম্প জ্বলছে, ঠিক তারই নিচে ক্যাডিলাক্‌টাকে দাঁড় করালুম। অস্পষ্ট আলোতে গাড়িটাকে দেখাচ্ছে যেন কালো রঙ-করা পেতলের তৈরি মস্ত একটা হাতি।

আমার পোশাকের জৌলুসটা আর একটু বাড়িয়েছি। নতুন টাই-এর সঙ্গে পরেছি নতুন হ্যাট, হাতে নতুন দস্তানা। আর লেনত্‌স-এর কাছে ধার করে নিয়েছি তার ওভারকোট—চমৎকার জিনিসটা, শেট্‌ল্যাণ্ড উলের কোট। যথাসাধ্য ভদ্রবেশে সুসজ্জিত হয়ে ভেবেছিলাম প্রথমদিনের মাতলামির কলঙ্কটা একেবারে মুছে ফেলব।

গাড়ির হর্ন বাজাতেই মুহূর্তে একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত পর-পর আলো জ্বলে উঠল। লিফ্‌ট চালু হবার শব্দ শোনা গেল। জানালার ফাঁকে লিফ্‌টটা দেখা যাচ্ছে, যেন আকাশ থেকে একটা আলোর টুকরি নেমে আসছে। দরজা খুলে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতপদে নেমে এল। বাদামী রঙের আঁটসাট স্কার্ট পরা, গায়ে ফার-এর খাটো জ্যাকেট।

'এই যে!' বলে হাত বাড়িয়ে দিল।

'বাবাঃ, বাইরে এসে বাঁচলুম, সারাদিন ঘরে বসে আছি।'

খুব হৃদ্যতার সঙ্গে জোর-হাতে হাত ঝাঁকুনি দিল। উষ্ণ হাতের চাপটুকু বেশ লাগল। মরা মাছের মতো নির্জীব হাতে যারা হ্যাণ্ডশেক্ করে তাদের আমি দেখতে পারিনে। বললুম, 'আমাকে আরো আগে আসতে বললেই পারতে। আমি দুপুর বেলায়ই আসতে পারতুম।'

ও হেসে বলল, 'তোমার হাতে অতই সময় নাকি?'

'তা অবশ্য নয়, তবে সে রকম ব্যবস্থা করা যেত।'

খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আঃ, চমৎকার হাওয়াটি দিয়েছে, বসন্তের গন্ধ লেগেছে বাতাসে।'

বললুম, 'যত ইচ্ছে হাওয়া খেতে পার। এস না, শহরের বাইরে একটু যাওয়া যাক— ঐ বনের দিকটাতে। সঙ্গে আমার গাড়ি রয়েছে।' খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ক্যাডিল্যাক্‌টা নির্দেশ করলুম যেন ভাঙাচোরা ফোর্ড বই নয়।

'আরে, ক্যাডিল্যাক্ যে!' খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। 'এ গাড়ি তোমার নাকি?'

'তা আজকের সন্ধ্যের জন্য আমারই বলতে পার। আসলে আমাদের কারখানার সম্পত্তি। খেটেখুটে এটিকে দাঁড় করানো গেছে, এখন এটা দিয়ে বেশ বড় রকমের দাঁও মারবার ইচ্ছে আছে।' গাড়ির দরজা খুলে দিলুম। 'চল আগে "বাঞ্চ অফ গ্রেপস্"-এ কিছু খেয়ে নিই।'

'হ্যাঁ, খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু "বাঞ্চ অফ গ্রেপস্"-এ কেন?'

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললুম, 'ওটা ছাড়া আর কোনো ভালো রেস্তোরাঁ আমি জানিনে। আর তাছাড়া ক্যাডিলাক্‌টারও তো মান রক্ষা করা দরকার।'

ও হেসে বলল, 'মান রক্ষার দায় বড় বিষম দায়। "বাঞ্চ অফ গ্রেপস্"-এ আদব-কায়দার ভড়ং বড্ড বেশি, ওখানটায় ভালো লাগবে না। তার চাইতে অন্য কোথাও চল।'

কি করি! ভেবেছিলুম গুরুগাম্ভীর্য বজায় রেখে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেব, সে বুঝি আর হয় না।

বললুম, 'তাহলে তুমিই বল কোথায় যাওয়া যায়। অন্য যে সব জায়গা আমার জানা আছে, সেগুলোতে বড্ড বেশি হৈচৈ, সে তোমার ভালো লাগবে না।'

'ভালো লাগবে না, তুমি কেমন করে জানো?'

'অমনিতেই বুঝতে পারি।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ, একবার গিয়েই দেখি।'

'আচ্ছা তবে তাই।' মনে-মনে যা ভেবে এসেছিলুম সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল। 'চল, আমার জানা একটা জায়গা আছে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। আলফন্‌স-এর দোকানে যাব।'

'আলফন্‌স? নামটা তো বেশ। আজকের মতো সন্ধ্যায় কোথাও যেতে আমার আপত্তি নেই, কোথাও আমার খারাপ লাগবে না, বলতে পারি।'

'আলফন্‌স আমাদের লেন্‌ত্‌স-এর বন্ধু। ওর বিয়ারের দোকান আছে।'
ও হেসে বলল, 'লেন্‌ত্‌স-এর বুঝি সর্বত্র বন্ধু?'
'হ্যাঁ, ও খুব সহজে লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতে পারে, সেদিন বিনডিং-এর বেলাতেই দেখেছ।'
'তা দেখেছি। প্রায় বিদ্যুৎগতিতে দুজনের বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল।'
গাড়িতে স্টার্ট দিলুম।
আলফন্‌স লোকটা ইয়া ভারি জোয়ান। চোয়াল দুটি উঁচু, চোখ দুটি ছোট। হাতের আস্তিন গোটানো, গরিলার মতো লোমশ হাত। তার রেস্তোরাঁয় সে যাকে-তাকে আমল দেয় না, অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দেয়। এমন কি ফাদারল্যাণ্ড স্পোর্টস ইউনিয়ন-এর সদস্যরাও ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। আর তেমন-তেমন বেয়াড়া লোকদের জন্য কাউণ্টারের তলায় রেখেছে একটি হাতুড়ি। দোকানটিও করেছে বেশ জায়গায়, কাছেই একটা হাসপাতাল, সময়ে অসময়ে—
লোমশ হাত দিয়ে চকচকে টেবিলটি মুছে নিয়ে আলফন্‌স বলল, 'কী দেব? বিয়ার?'
বললুম, 'না জিন্‌, আর সঙ্গে কিছু খাবার।'
আলফন্‌স জিগগেস করলে, 'মহিলাটির জন্য কী চাই?'
প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান নিজেই জবাব দিল, 'মহিলাটির জন্যও জিন্‌।'
আলফন্‌স বলল, 'তা খাসা জিনিস বটে। আর পর্কের চপ আর কপি আছে, বলেন তো দিই।'
আমি জিগগেস করলুম, 'নিজেই মেরেছ নাকি?'
'নিশ্চয়।'
'তাহলেও ভদ্রমহিলার জন্য অন্য কিছু—একটু হাল্কা গোছের জিনিস হলে ভালো হত।'
আলফন্‌স বাধা দিয়ে বললে, 'না, না, তা কেন? একবার উনি নিজেই দেখুন না জিনিসটা।' ওয়েটারকে ডেকে বলে দিলে চপ এনে দেখাতে। 'সত্যি বলছি চমৎকার ছিল শুওরটা।'
প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান বলে উঠল, 'যা বলেছেন, খাসা জিনিস না হয়ে যায় না।'
আমি তো অবাক। এমন নির্বিকার ভাবে বলছে যেন এ ধরনের পানাহারে সে বহুকাল ধরে হাত পাকিয়েছে।
আলফন্‌স আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারল। 'তাহলে দু-পিস দিতে বলি?'

'হ্যাঁ,' প্যাট্রিসিয়া মাথা নাড়ল।

'বেশ, আমি নিজেই গিয়ে বেছে নিয়ে আসি।' আলফন্‌স উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি বললুম, 'জায়গাটা সম্বন্ধে গোড়ার দিকে যেটুকু সংশয় ছিল এখন তা দূর হয়ে গেছে। আলফন্‌সকে তো তুমি হাত করে নিয়েছ। নইলে নিতান্ত পুরোনো খদ্দের না হলে ও নিজের হাতে কখনো জিনিস বেছে দেয় না।' আলফন্‌স ফিরে এসে বলল, 'গরম-গরম সসেজ্ করতে বলে এলুম।'

বললুম 'খুব ভালো করেছ।'

আলফন্‌স খুশি হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। অবিলম্বে জিন্ এসে গেল। তিন গ্লাশ - এক গ্লাশ আলফন্‌স-এর জন্য। গ্লাশে-গ্লাশে ঠোকাঠুকি করে বলল, 'আমাদের সন্তানের পিতারা ধনে পুত্রে সুখী হোক।' মেয়েটি আস্তে-আস্তে চুমুক না দিয়ে সমস্তটা এক ঢোঁকে গলাধঃকরণ করল। আলফন্‌স বলল, 'শাবাশ! এই তো চাই!' উঠে কাউন্টারে গিয়ে বসল।

সঙ্গিনীকে জিগগেস করলুম, জিন কেমন লাগে?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'একটু বেশি ঝাঁঝ। কিন্তু কি করি, আলফন্‌স বেচারিকে তো নিরাশ করতে পারিনে।'

পর্ক চপগুলো সত্যি চমৎকার। আমি বেশ বড়-বড় দু-পিস খেয়ে নিলুম, প্যাট্রিসিয়া হোল্‌মান আমার খাওয়া দেখে তারিফ করতে লাগল। ও এত সহজে এই অপরিচিত জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে দেখে আমি সত্যি অবাক হলুম। আর শুধু কি তাই? আফন্‌স-এর সঙ্গে আর এক গ্লাশ জিন্ দিব্যি নিঃশেষ করে দিলে। ওর অলক্ষ্যে আলফন্‌স একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারল। ভাবটা, বেশ মেয়েটি জুটিয়েছ হে, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। আলফন্‌স এ বিষয়ে সমঝদার ব্যক্তি, অবশ্য রূপগুণের দিকটা তত নয় রক্ত-মাংসের দিকটা যত।

সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এই যে আলফন্‌সকে দেখছ—এরও দু-একটা মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতা আছে।'

'থাকা তো উচিত. কিন্তু দেখলে মনে হয় ওর কোনো দুর্বলতা নেই।'

'খুব আছে,' বলে ওপাশের একটা টেবিলের দিকে নির্দেশ করলুম, 'ঐ যে —'

'কি, গ্রামোফোনের কথা বলছ?'

'গ্রামোফোন ঠিক নয়, ঐকতান সঙ্গীতের কথা বলছি। আলফন্‌স কোরাস গানের বড় ভক্ত। নাচ নয়, ওস্তাদি সঙ্গীত নয়, স্রেফ্ কোরাস গান। ছেলেদের

কোরাস, ছেলে-মেয়ের মিলিত কোরাস—যত রকমের কোরাস হতে পারে সব ঐখানে গাদা করা আছে! ঐ যে সঙ্গীতবিলাসী আসছেন।'

আলফন্‌স এসে জিগগেস করল, 'কেমন লাগল চপ?'

বললুম, 'চমৎকার, মায়ের রান্না চপের মতো।'

'আর মহিলাটির কি মত?'

ভদ্রমহিলা সোৎসাহে জবাব দিলেন, 'এত ভালো পর্ক চপ জীবনে খাইনি।' আলফন্‌স মহা খুশি। 'আচ্ছা, তবে একটা নতুন রেকর্ড তোমাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি, শুনে তোমাদের তাক লেগে যাবে।'

গ্রামোফোনের কাছে গিয়ে রেকর্ড চালিয়ে দিল। প্রথমটায় পিনের একটু খচ-খচ শব্দ তারপরেই পুরুষকণ্ঠে মিলিত সঙ্গীত। গানটার কথায় আছে—বনে-বনে নীরবতা। তা এমনি রব তুলেছে, নীরবতার ভুত ভাগিয়ে ছেড়েছে। গান শুরু হতেই আমরা সবাই একেবারে চুপ মেরে গিয়েছি। আমি জানি গানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে রক্ষে নেই, আলফন্‌স মারমুখো হয়ে উঠবে। থুতনিতে হাত রেখে কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। গরিলার মতো লোমশ দুটি হাত। গানের আবেশে চোখ-মুখের ভাব কোমল হয়ে এসেছে। নিবিষ্ট ভাব—যেন একটি মহিলা স্বপ্ন দেখছে। কোরাস গান ওর উপরে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। শান্ত শিষ্ট বাছুরটির মতো চুপ করে থাকে। বয়স যখন কম ছিল আর মেজাজ ছিল আরো গরম তখন ওর স্ত্রী সারাক্ষণ একটি রেকর্ড গ্রামোফোনে চড়িয়েই রাখত। কোনো কারণে ক্ষেপে গিয়ে হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেই পিন চালিয়ে দিত। ব্যস, মুহূর্তে হাত থেকে হাতুড়িটি নেমে আসত, মন্ত্রমুগ্ধের মতো গান শুনত, রাগ কোথায় যেত মিলিয়ে। এখন আর তার দরকার হয় না। স্ত্রী গেছে মরে। তার ছবি দেয়ালে ঝুলছে। ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ-এর আঁকা ছবি। সেই খাতিরে ফার্ডিনাণ্ড যখনই আসে, বিনি পয়সায় খেয়ে যায়। তাছাড়া আলফন্‌সও আর আগের মতো নেই। এখন বয়স হয়েছে, মেজাজও অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

রেকর্ড থেমে যেতেই আলফন্‌স এগিয়ে এল। আমি বললুম, 'চমৎকার!' প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান বলল, 'বিশেষ করে একজনের গলা!' আলফন্‌স-এর আবেশের ভাবটা এতক্ষণে পুরোপুরি কেটেছে। বললে, 'ঠিক বলেছেন। আপনি তো দেখছি গানের একজন সমঝদার। ঐ গায়কটি একেবারে আলাদা স্তরের।'

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছি। এক ধারে একটা মস্ত বড় গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে। রাস্তার আলোগুলি থেকে কিছু আলো কিছু ছায়া গাছটার উপরে এসে পড়েছে। ডালে-ডালে সামান্য সবুজের আভাস দিয়েছে। অস্পষ্ট আলোকে গাছটাকে দেখাচ্ছে বিরাট বড়, অন্ধকারে কোথায় ওর মাথা মিলিয়ে গেছে দেখা যায় না। আকাশ ছোঁবার বিপুল আগ্রহে ও যেন দু বাহু তুলে দিয়েছে অসীম শূন্যে।

হঠাৎ প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর দিকে তাকিয়ে মনে হল ওর গায়ে যেন শীতল শিরশিরানি লেগেছে। জিগগেস করলুম, 'তোমার শীত করছে নাকি ?' কলার তুলে দিয়ে জ্যাকেটের হাতার ভিতরে ও হাত ঢুকিয়ে দিলে। বলল, 'ও কিছু নয়। ভিতরে ওখানটায় বেশ গরম ছিল কিনা, তাই '

বললুম, 'তুমি বড্ড পাতলা জামা-কাপড় নিয়ে বেরিয়েছ। রাত্তিরে এখনও বেশ শীত পড়ে।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ভারি, মোটা, কাপড়-জামা পরতে পারিনে। এখন শীতটা গেলে বাঁচি, শীত আমার সয় না, বিশেষ করে তোমাদের এই শহরে শীত।'

বললুম, 'এস গাড়িটার ভিতরে গরম হবে।' আর ভেবে-চিন্তে আমি একখানা কম্বলও সঙ্গে এনেছিলুম। গাড়ির দরজা খুলে ওকে ভিতরে বসিয়ে দিলুম, তারপরে কম্বলটি বিছিয়ে দিলুম ওর হাঁটুর উপরে। ও সেটাকে আর একটু টেনে নিলে। 'ব্যস, চমৎকার ! এখন দিব্যি আরাম ! বাবাঃ, শীত বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার, মেজাজই খারাপ করে দেয়।'

'শুধু কি শীতেই মেজাজ খারাপ করে ?' স্টীয়ারিং-এ বসে বললুম, 'আচ্ছা, এখন তবে একটু বেড়ানো যাক, কি বল ?'

ও মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'খুব ভালো।'

'কোথায় যাব ?'

'যেখানে হয়, আস্তে-আস্তে গাড়িটি চালিয়ে যেদিকে খুশি।'

'বেশ তাই হবে।'

গাড়ি চলেছে শহরের ভিতর দিয়ে। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় এই সময়টাতে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার খুব ভিড়। আমরা তারই ভিতর দিয়ে পথ করে চলে যাচ্ছি। গাড়িটা চমৎকার চলছে, মোলায়েম নিঃশব্দ গতি। রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে, দুধারে আলোকিত গৃহ আর সারি-সারি রাস্তার আলো। সায়াহ্নের নগরী

সুধারসে উচ্ছলিত, আলোকমালায় লীলায়িত, তার গ্রীবা আর মস্তকোপরি ধূসরবর্ণ আকাশের অসীম বিস্তৃতি।

মেয়েটি চুপচাপ আমার পাশে বসে আছে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে আলো ছায়ার খেলা চলছে ওর মুখে। আমি মাঝে-মাঝে আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছি। সেই যেদিন ওকে প্রথম দেখি সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ছে। আজকে ওর মুখের চেহারাটা আরো গম্ভীর, আরো যেন দূরত্বব্যঞ্জক, কিন্তু তাতেই যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। এরই জন্য সেই প্রথম দিনেও আমার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, আর সেইজন্যই মন থেকে ওকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে ওর মধ্যে এমন একটি নীরব প্রশান্তি আছে যা একমাত্র প্রকৃতি দেবীর দান—যে প্রশান্তি দেখতে পাই—বৃক্ষলতায়, আকাশের মেঘে, বনের পশুতে, আর কদাচিৎ কখনো কোনো দুর্লভ নারীতে।

শহর ছাড়িয়ে আমরা শহরতলীতে এসে পৌঁচেছি। রাস্তাগুলি ক্রমেই জনহীন হয়ে আসছে। বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়াটা যেন রাত্তিরটাকে ঠেলে সুমুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বিস্তৃত পার্ক মতো জায়গা, সেখানটায় গাড়ি দাঁড় করালুম; আসে-পাশের ছোট-ছোট বাড়িগুলো বাগানের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান একটু নড়ে-চড়ে বসল, যেন সবে ঘুম থেকে জেগে উঠছে। একটু পরে বলে উঠল, 'চমৎকার লাগল। আমার একটি গাড়ি থাকলে রোজ সন্ধ্যায় এমনি করে বেরোতাম—খুব ধীরে খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে। কেমন স্বপ্নের মতো লাগছিল—এত আস্তে, এত নিঃশব্দে—যেন জেগেও আছি, স্বপ্নও দেখছি। আমার মনে হয় এমনটি পেলে সন্ধ্যাবেলায় আর কোনো মানুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয় না—'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলুম। 'সন্ধ্যেবেলায় তাহলে একটা কিছুর প্রয়োজন হয় বলছ?'

ও মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা হয় বৈকি। সন্ধ্যে হয়ে এলেই মনের অবস্থাটা কেমন হয়ে যায়।'

প্যাকেটটা খুলে বললুম, 'এগুলো আমেরিকান সিগারেট; এ সিগারেট তোমার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, অন্য সিগারেটের চাইতে এগুলো ঢের ভালো।'

ওকে দেশলাই ধরিয়ে দিলুম। দেশলাইয়ের আলোয় মুহূর্তের জন্য ওর মুখ আর আমার হাত এক যোগে দেখলুম। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগছে। মনে হচ্ছে কতকাল থেকে ও আমার আর আমি ওর।

ধোঁয়াটা বের করে দেবার জন্য জানালাটা টেনে নাবিয়ে দিলুম। ওকে বললুম, 'তুমি নিজে একটু গাড়ি চালিয়ে দেখবে? বেশ লাগবে, দেখ।' আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'খুব তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমি জানিনে যে।'

'সত্যি জানো না?'

'না, আমি কখনো শিখিইনি।'

আমি দেখলুম এবার একটা সুযোগ জুটেছে। বললুম, 'বিনডিং তো বহুকাল আগেই তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারত।'

ও একটু হাসল। বলল, 'বিনডিং একেবারে গাড়ি-অন্ত প্রাণ। ও কাউকে গাড়ির কাছে ঘেঁষতেই দেয় না।'

'ছ্যাঃ, বোকা আর কাকে বলে!' সুবিধে পেয়ে হোঁৎকাটার উপরে আমি দিব্যি এক হাত নিয়ে নিচ্ছি। 'এস, আজকে তুমিই আমার গাড়ি চালাবে।'

কোষ্টারের এত সব সাবধান বাণী কোথায় গেল উড়ে। গাড়ি থেকে নেমে ওকে বললুম স্টীয়ারিং-এ বসতে। আনন্দে উত্তেজনায় ও অস্থির হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু সত্যি বলছি আমি ড্রাইভ করতে জানিনে।'

আমি বললুম, 'খুব জানো। তুমি কি পার আর না পার তাই জানো না।'

কেমন করে গিয়ার বদলাতে হবে, পায়ে ক্লাচ্ চেপে ধরতে হবে তাই মোটামুটি ওকে দেখিয়ে দিলুম। 'ব্যাস, এবার চালাও তো দেখি।'

ওদিক থেকে একটা বাস আসছে, তাই দেখিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, ওটা আগে পার হয়ে যাক।'

'কিচ্ছু দরকার নেই।' তাড়াতাড়ি গিয়ার টেনে দিলুম।

হোল্ম্যান চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে, গাড়ি যে চলতে শুরু করেছে।'

'চলবে না তো কি? চলবার জন্যেই তো গাড়ি তৈরি হয়েছে। কিচ্ছু ঘাবড়িয়ো না আমি তো রয়েছি।'

ও প্রাণপণে ষ্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরে আছে আর রাস্তার দিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

'আমরা রীতিমতো জোরে চলছি, না?'

আমি স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ঠিক পঁচিশ কিলোমিটার। দূর-পাল্লার দৌড়ে মানুষের পক্ষে ওটাই ঠিক স্পীড্ !'

'আমার তো মনে হচ্ছে এখন কমসে কম আশি স্পীড্ হবে।'

কয়েক মিনিট না যেতে-যেতেই গোড়ার দিকের ভয়টা কমে এল। আমরা বেশ একটা সোজা চওড়া রাস্তায় যাচ্ছি। ক্যাডিলাক্‌টা মাঝে-মাঝে রাস্তার এপাশে ওপাশে টলতে-টলতে যাচ্ছে যেন মদের ঝোঁকে—দেখলে মনে হবে গাড়ির ট্যাঙ্কে পেট্রলের বদলে কোনিয়াক পুরে দেওয়া হয়েছে। মাঝে-মাঝে যাচ্ছে একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে। কিন্তু ক্রমে হাত ঠিক হয়ে এল। এখন আমাদের সম্পর্কটা হয়েছে ছাত্র-মাস্টারের সম্পর্ক। আমি যতদূর পারছি মাস্টারি করে নিচ্ছি। বললুম, 'দেখো, সামনে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে।'

'থামব নাকি ?'

'এখন আর থামবার সময় নেই।'

'যদি ধরে তো কি হবে ? আমার তো লাইসেন্স্ নেই।'

'ধরলে দুজনকেই জেলে যেতে হবে।'

'অ্যাঁ, কি সর্বনাশ !' ও পা দিয়ে ব্রেক খুঁজছে। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে।

'গ্যাস,' চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'গ্যাসে জোরে পায়ের চাপ দাও। কোনো দিকে না তাকিয়ে জোরসে চলে যাও। আইন ভাঙতে হলে সাহস করে ভাঙতে হয়।'

ট্রাফিক পুলিস আমাদের দিকে তাকিয়েই দেখল না। সস্নিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পুলিসটিকে যখন কয়েকশো গজ পিছনে ফেলে এসেছি তখন বললে, 'বাবাঃ, পুলিশকে দেখলে যে রীতিমতো ড্র্যাগন বলে ভয় হতে পারে এ ধারণা আমার কোনোকালে ছিল না।'

বললুম, 'ওদের পাশ দিয়ে ড্রাইভ করতে গেলেই অমনি মনে হয়।' আস্তে ব্রেক চাপলুম। 'এই যে এদিকটাতে একটা আলাদা রাস্তা গেছে, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় নেই। ড্রাইভিং-এর হাতেখড়িটা ও রাস্তাতে ভালো চলবে। কেমন করে স্টার্ট দিতে হয়, থামাতে হয়, সেইটে আগে শিখে নাও।'

প্যাট্রিসিয়া হোলম্যান একবার গাড়ি থামায় তো আর স্টার্ট নিতে পারে না। কোটের বোতাম খুলে দিয়ে বলল, 'রীতিমতো ঘেমে উঠছি, কিন্তু শিখতেই হবে, সহজে ছাড়ছিনে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল আমি কি ভাবে কি করছি। তারপরে যেই না সাহস করে নিজের চেষ্টায় একবার বাঁক ঘুরতে

পেরেছে—তখন তার ফুর্তি দেখে কে! ওদিকে আবার সুমুখ থেকে গাড়ি আসতে দেখলে ভয়ে জড়সড়, যেন একেবারে দৈত্যের মুখে পড়েছে। কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে ভাবে খুব বাহাদুরি হল। সেই স্বল্প পরিসর স্বল্পালোকিত স্থানটিতে পাশাপাশি বসে, অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্তা, বিশেষ করে কল-কব্জার কথার ফাঁকে-ফাঁকে আমরা দুজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে একে অন্যের খুব কাছে এসে গিয়েছিলুম। আধ-ঘণ্টা পরে গাড়ি ঘুরিয়ে যখন নিজেই ড্রাইভ করে ফিরে চললুম, তখন মনে হল আমাদের দুজনের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—একে অন্যের কথা কিছুই আর জানতে বাকি নেই।

নিকোলাইস্ট্রাস-এর কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে গাড়ি থামালাম। আমাদের ঠিক মাথার উপরে সিনেমার ধরনে চলন্ত বিজ্ঞাপনের ছবি দেখানো হচ্ছে। আমি বললুম, 'বেশ পরিশ্রম হয়েছে, এর পরে এক গ্লাশ পানীয় না হলে আর চলবে না। কোথায় যাওয়া যায় বল তো?' প্যাট্রিসিয়া এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'চল, সেই জাহাজের সাইনবোর্ড দেওয়া বারটিতে যাওয়া যাক।' শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কারণ ঠিক এই সময়টাতে আমাদের রোমান্টিক-প্রবর লেনত্‌স নির্ঘাত ওখানটায় বসে আছে। আমি স্পষ্ট ওকে দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি বললুম, 'আরে কত তো ভালো জায়গা আছে।'
'অত জানিনে, তবে ঐ জায়গাটি আমার কাছে বেশ লেগেছে।'
আমি অবাক হয়ে বলে বললুম, 'তাই নাকি? খুব ভালো লেগেছে?'
ও হেসে বললে, 'হ্যাঁ খুব—'
ওকে নিবৃত্ত করবার জন্য আর একবার বললুম, 'কিন্তু এ সময়টাতে ওখানে বড্ড ভিড় হবার কথা।'
'তা একবার গিয়েই দেখা যাক না।'
কি আর করি? অগত্যা বললুম, 'আচ্ছা তবে গিয়েই দেখা যাক।'
ওখানটায় পৌঁছে তড়াক করে গাড়ি থেকে নেমে বললুম, 'আমি একবার উঁকি মেরে দেখে আসি অবস্থাটা। এই এলুম বলে।'
গিয়ে দেখি এক ভ্যালেনটিন্ ছাড়া আমার চেনা জানা আর কেউ নেই! ওকে জিগগেস করলুম, 'ওহে গট্‌ফ্রিড্‌কে দেখেছ? এসেছিল এখানটায়?'
ভ্যালেনটিন্ মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, অটো সুদ্ধু এসেছিল। এই আধ ঘণ্টাখানেক আগে দুজনেই বেরিয়ে গেছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম কিন্তু মুখে বললুম, 'আহা, ওদের সঙ্গে দেখা হলে হত।' গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, যাওয়া যেতে পারে, আজকে তেমন ভিড় নেই।' তবু সাবধানের মার নেই ভেবে ক্যাডিলাক্‌টাকে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় পার্ক করে রাখলুম।

ভিতরে গিয়ে বসেছি, বোধ করি দশ মিনিটও হয়নি। হঠাৎ দেখি এক-মাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে লেন্‌ত্‌স এসে কাউন্টার-এর কাছে দাঁড়িয়েছে। এইরে! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই—কিন্তু ভাব দেখে মনে হল লেন্‌ত্‌স এক্ষুনি আবার বেরিয়ে যাবে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাব এমন সময় দেখি ভ্যালেন্‌টিন্‌ ওকে ডেকে আমার দিকে দেখিয়ে দিচ্ছে। খুব জব্দ, যেমন মিথ্যে কথা বলতে গিয়েছিলুম!

আমাদের দেখে গট্‌ফ্রিড্‌-এর মুখের যা চেহারা হল সেটা যে কোনো ওস্তাদ ফিল্ম-স্টারের পক্ষেও শিক্ষণীয় ব্যাপার। চোখ দুটি কপালে উঠে গিয়েছে, সিদ্ধ করা ডিমের মতো দেখতে হয়েছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। সে সময়টাতে ভাগ্যক্রমে যদি কোনো সিনেমা প্রযোজক উপস্থিত থাকত তবে তক্ষুনি লেন্‌ত্‌স-এর একটা চাকরি হয়ে যেত। ধর, সিনেমার কোনো দৃশ্যে জাহাজডোবা নাবিককে হাঁ করে গিলতে এসেছে রাক্ষুসে কোনো সামুদ্রিক জানোয়ার—তখন তার মুখের চেহারাটি কেমন হওয়া উচিত? ঠিক আমাদের লেন্‌তস্‌-এর মতো!

গট্‌ফ্রিড্‌ খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। আমি খুব করুণভাবে একবার ওর দিকে তাকালুম, ইচ্ছেটা ও যেন দয়া করে চলে যায়। কিন্তু ব্যাটা সে ইঙ্গিতের ধার দিয়েও গেল না। দিব্যি এক গাল হেসে, কোটটি টেনেটুনে ঠিকঠাক করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

কপালে কি আছে তা আমার জানাই ছিল। আমিই বা ছাড়ি কেন? গোড়াতেই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য বললুম, 'ফ্রাউলিন্‌ বম্‌লাটকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছ?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'হ্যাঁ।' ফ্রাউলিন্‌ বম্‌লাট এর নাম ও যে জন্মে কখনো শোনেনি সে কথাটা ওর চোখে মুখে এতটুকু যদি প্রকাশ পেত। বললে, 'উনি তোমাকে নমস্কার জানিয়েছেন; আর সকালে উঠেই ওঁকে ফোন করতে বলেছেন।'

যেমন টিস তেমন পাটকেল। আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'তা করব। আমার মনে হয় উনি গাড়িটা কিনবেন।'

লেন্‌ত্‌স তক্ষুনি আবার কি বলতে যাচ্ছিল। আমি এমন চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকালুম ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থেমে গেল।

পানীয় আনতে বললুম। পর-পর কয়েক গ্লাশ পান করা গেল। আমি প্রচুর পরিমাণে লেমন্‌ মিশিয়ে জিনিসটাকে নির্দোষ করে নিচ্ছিলাম। আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছি, সেবারের মতো অতিরিক্ত পান করে কেলেঙ্কারি করা চলবে না।

গট্‌ফ্রিড্‌-এর ফুর্তি ক্রমেই বাড়ছে। আমাকে বলল, 'এক্ষুনি তোমার ওখান থেকে আসছি। তোমাকে আনতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে গেলুম অ্যামিউজমেণ্ট পার্কে। ওখানটায় চমৎকার একটা নতুন নাগরদোলা এসেছে।' প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন না, যাবেন ওখানে?'

ও খুশি হয়ে বলে উঠল, 'এই মুহূর্তে।'

আমি বললুম, 'তাহলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক।' বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। খোলা জায়গায় এসে ব্যাপারটা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এল।

অ্যামিউজমেণ্ট পার্কে ঢুকবার পথেই ব্যারেল-অর্গ্যান বাজছে। করুণ-সুরের একঘেয়ে মিষ্টি আওয়াজ। অর্গ্যানগুলোর গায়ে শতচ্ছিন্ন ভেলভেটের ঢাকনা, তার উপরে হয় একটি টিয়াপাখি নয়তো লাল জ্যাকেট পরানো একটি ছোট্ট বাঁদর বসে আছে। ফেরিওয়ালাদের কর্কশ কণ্ঠের ডাক—কেউ বিক্রি করছে চীনেমাটির বাসনপত্র, কাঁচ কাটবার যন্ত্র, টার্কিশ মেঠাই, কেউবা বেলুন, কেউবা স্যুট-এর কাপড়। গ্যাস-লাইটের নীলচে আলো আর কার্বাইডের গন্ধ। কোথাও জ্যোতিষীর দল, হাত দেখে অদৃষ্টলিপি বলে দিচ্ছে। কোথাও আহার্যের দোকান, একধারে নানারকম ক্রীড়ামোদের ব্যবস্থা। বাজনায়, কলরবে, ফুর্তিতে সব চেয়ে বেশি জমেছে নাগরদোলাগুলো। আলোক সজ্জিত এক-একটি নাগর-দোলাকে দেখাচ্ছে এক-একটি রাজপ্রাসাদের মতো।

তারই একটায় গিয়ে আমরা চেপে বসলুম। একটা বিরাটকায় রাজহাঁস—তার পিঠে আমরা বসেছি। সেটা ক্রমাগত উঠছে নামছে ঘুরছে ড্রাম বাজনার তালে তালে। ঘুরে-ঘুরে ঢুকে পড়ছে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। বেরিয়ে এলেই আলোকিত পৃথিবী দুলে উঠছে চোখের সামনে।

ওটা থেকে নামতেই গট্‌ফ্রিড্‌ আমাদের নিয়ে চলল আরেকটা নাগরদোলায়—সেটাতে কয়েকটা উড়োজাহাজ বাঁধা। আমরা গিয়ে ঢুকলুম একটা জেপ্‌লিনের

মধ্যে। তিন চক্কর খেয়েই দম আটকে আসতে লাগল, তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম ওখান থেকে। লেন্‌ত্‌স বলল, 'এবার উঠতে হবে ডেভিলস্ হুইল-এ,' অর্থাৎ কিনা শয়তানের চাকায়।

ডেভিলস্ হুইল জিনিসটা প্রকাণ্ড একটা চ্যাপ্টা থালার মতো, মাঝখানটা একটু উঁচু। প্রথমটায় আস্তে-আস্তে, ক্রমে সেটা বিষম জোরে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সেটার উপরে চড়নদারকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আরো জন কুড়ি লোক সমেত গট্‌ফ্রিড্ ওটাতে গিয়ে চড়ে বসল। উঠবার সময় পাগলের মতো অঙ্গভঙ্গি করতে-করতে উঠছিল, তাই দেখে আর সবাই ফুর্তিতে হাততালি দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমাদের লেন্‌ত্‌স আর একটি রাঁধুনি মেয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, বাকি সবাই ইতিপূর্বেই ধরাশায়ী হয়েছে। ওস্তাদ মেয়েটি ঠিক মাঝখানটায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আর লেন্‌ত্‌স বোঁ-বোঁ করে ওর চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত লেন্‌ত্‌স-এরও পতন হল; আর পড়বি তো পড় একেবারে মেয়েটির প্রসারিত বাহুবন্ধনের মধ্যে। গড়াতে-গড়াতে দুজনে কণ্ঠলগ্ন হয়ে একেবারে মাটিতে। বাহুলগ্ন অবস্থাতেই দুজনে আমাদের কাছে এসে হাজির। জানা নেই শোনা নেই লেন্‌ত্‌স দিব্যি ওকে লিনা বলে ডাকতে লাগল। লিনার মুখে একটু সলজ্জ হাসি। লেন্‌ত্‌স বলল, 'কিছু একটু পান করা প্রয়োজন।' লিনা বললে, 'তা, একটি বিয়ার হলে শুকনো গলা ভিজানো যেত।' দুজনে মিলে পানসত্রের উদ্দেশে চলে গেল।

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপরে? আমরা যাব কোথায়?'

'আমরা যাব ঐ ভূতুড়ে গোলকধাঁধায়।' হাত দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলুম। গোলকধাঁধাটার পথে-পথে মোড়ে-মোড়ে নানা রকমে ভয় দেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েক পা এগুলেই মাটিটা কাঁপতে থাকবে, অন্ধকারে অদৃশ্য হাত এগিয়ে আসবে তোমাকে ধরবার জন্য। কোনো মোড়ে হঠাৎ মুখোশপরা মূর্তি দেখা দেবে, কোথাও বা প্রেতের কান্না শুরু হবে। বেশ মজা—আমরা খুব হাসতে-হাসতে এগুচ্ছি। হঠাৎ সুমুখে একটা মড়ার খুলি দেখে আমার সঙ্গিনীটি তো ভয়ে পিছিয়ে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের জন্য ও আমার বক্ষলগ্ন হয়েছিল, ওর নিঃশ্বাস লাগছে আমার গালে, চুলের গুচ্ছ এসে আমার মুখ ঢেকেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য মাত্র—পরমুহূর্তেই ও হেসে উঠল, তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিল।

ওকে আমার বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে দিলুম। কিন্তু ছেড়ে দিলেও মনে হচ্ছিল কিছু তার থেকে গেছে। গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার পরেও বহুক্ষণ ওর কাঁধের স্পর্শ যেন আমার গায়ে লেগে ছিল, ওর নরম চুলের স্পর্শ, দেহের একটি অতি মৃদু সৌরভ··

ওর চোখে-চোখে তাকাতে পারছিলাম না। হঠাৎ ও আমার কাছে একেবারে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে।

ওদিকে লেন্‌ত্‌স আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখি ও একা, জিগগেস করলুম, 'লিনা কোথায় গেল ?'

মাথা নেড়ে পানসত্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'খুব একচোট মদ খেয়ে এক কামারের সঙ্গে খুব জমে গেছে।'

আমি বললুম, 'আহা তোমার হাত থেকে ফস্‌কে গেল।'

ও বলল, 'আরে দূর ! দূর ! এস এখন একটু পুরুষমানুষের উপযুক্ত কিছু কবার চেষ্টা দেখা যাক্।'

এক স্টলে গিয়ে ঢুকলুম। সেখানটায় রবারের রিঙ ঠিকমতো তাক করে আংটায় ছুঁড়ে মারতে পারলে হরেক রকম পুরস্কার মিলবে। লেন্‌ত্‌স মাথার টুপিটি পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন, দেখি আপনার জন্য একটা বিয়ের পোশাক সংগ্রহ করতে পারি কিনা।' ও-ই প্রথম রিঙ ছুঁড়ল। ঠিক মেরেছে, একটা অ্যালার্ম ঘড়ি পেয়ে গেল। এবার আমার পালা। আমি পেলুম একটা খেলনা—ভালুক। স্টলের মালিক খদ্দের জোটাবার জন্যে খুব একচোট চেঁচিয়ে সব্বাইকে দেখিয়ে জিনিসগুলো আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। গট্‌ফ্রিড্ হেসে বলল, 'রোসো না বাপু, এই তো সবে শুরু। তোমার ফুর্তি বেরিয়ে যাবে—' বলতে-বলতে আবার জিতে গেল একটা রান্নার বাসন। আমিও মারলুম, এবারও পেলুম খেলনা-সেই ভালুক। বুথ-এর মালিক আমাদের প্রাপ্য জিনিস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাদের ভাগ্য খুলে গেছে।'

ব্যাটা তো জানে না কার পাল্লায় পড়েছে ! লেন্‌ত্‌স ছিল আমাদের রেজিমেন্টে সবচেয়ে ওস্তাদ বোমা-ছুঁড়িয়ে। শীতকালে যখন আমাদের কাজ কম থাকত তখন মাসের পর মাস আমরা হাতের টিপ ঠিক করতাম। মাথার টুপি নিয়ে যত সম্ভব অসম্ভব জায়গায় হুক লাগিয়ে তাই তাক করে ছুঁড়তাম। সেই তুলনায় এই রিঙ-এর খেলা নেহাত ছেলেমানুষি বলতে হবে। এর পরের বারে গট্‌ফ্রিড্

অনায়াসেই একটি কাঁচের ফুলদানি আদায় করলে। আমি পেলাম খান ছয়েক গ্রামোফোন রেকর্ড। মালিক জিনিসগুলো আমাদের হাতে দিয়ে দিল। এবার আর মুখে কথা নেই, আংটাগুলো একবার টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখল।
লেন্‌ত্‌স আর একবার তাক করলে, পেল একটি কফি সেট্‌। এটা ওদের সেকেণ্ড প্রাইজ। ইতিমধ্যে ওখানটায় বহু দর্শক জমে গিয়েছে। আমি পর-পর তিনটে রিঙ একই হুক্‌-এ আটকে দিলাম। এবার পেলাম সোনার ফ্রেমে বাঁধাই সেণ্ট ম্যাগডালিন-এর একখানি ছবি।
মালিকের মুখের যা চেহারা হয়েছে, ঠিক যেন ডেণ্টিস্ট-এর কাছে গিয়েছে দাঁত তোলাতে। বলছে আমাদের আর ছুঁড়তে দেবে না। আমরা থেমেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু দর্শকরা মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিল। বলতে লাগল এদের আরো খেলতে দিতে হবে। ওদের ইচ্ছে ওর দোকান খালি হয়ে যাক। গোলমালটা খুব যখন পাকিয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ লিনা এসে হাজির, সঙ্গে সেই কামার ব্যাটা। মেয়েটা টিপ্পনি কেটে বলল, 'কেউ তাক করতে পারবে না কখনো ? সব সময়ই হারবে সবাই, না ?' কর্মকারটিরও খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করল।
শেষটায় লেন্‌ত্‌স বলল, 'আচ্ছা তবে আমরা দুজনে আর একবার করে রিঙ ছুঁড়ি, তাহলেই শেষ।'
আমিই প্রথম ছুঁড়লুম ; পেলুম একটি হাত ধোবার গামলা, সঙ্গে জগ্‌ আর সাবানের কেস্‌। এবার লেন্‌ত্‌স পাঁচটি রিঙ নিয়ে একে-একে চারটি রিঙ একই হুকে ছুঁড়ে মারল। শেষ রিঙটি ছুঁড়বার আগে একটু থেমে বেশ কায়দা করে একটি সিগারেট বের করলে। কে কার আগে ওর সিগারেট ধরিয়ে দেবে তাই নিয়ে লোকের হুড়োহুড়ি ; কর্মকার আনন্দে ওর পিঠ চাপড়ে দিলে, লিনা উত্তেজনায় রুমাল চিবোতে শুরু করে দিয়েছে। গট্‌ফ্রিড্‌ এবার বেশ তাক করে শেষ রিঙটি ছুঁড়ে মারল—খুব সাবধানে পাছে ওটা লাফিয়ে উঠে পড়ে যায়। রিঙটা ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল। বাকি চারটের সঙ্গে আংটায় দিব্যি আটকে রইল। চারিদিকে করতালির ধুম পড়ে গেল। প্রথম পুরস্কারটাও আমরাই পেয়ে গেলাম—একটি প্যারামবুলেটর—কমলা রঙের ঢাকনা আর লেস্‌-এর ঝালর দেওয়া বালিশ সমেত।
মালিক রাগে গরগর করতে-করতে প্যারামবুলেটরটি ঠেলে বের করে দিল। আমরা বাকি সব জিনিস ওটাতে বোঝাই করে নিয়ে চললাম। লিনা প্যারামবুলেটরটা ঠেলে নিয়ে চলেছে। কামার ব্যাটা তাই নিয়ে আবার এমন

রসিকতা শুরু করে দিয়েছে যে আমাকে বাধ্য হয়ে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে নিয়ে দুপা পিছিয়ে পড়তে হল।

এর পরের দোকানটায় রিঙ ছোঁড়া হচ্ছে মদের বোতলের উপরে। ঠিক একটি বোতলের উপরে ফেলতে পারলেই বোতলটি পাওয়া যাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছটি বোতল সংগ্রহ করা গেল। লেন্‌ত্‌স বোতলের লেবেলগুলো একবার দেখে নিয়ে সবগুলো কর্মকারকে দিয়ে দিল।

রিঙ খেলার আর একটা স্টল ছিল। তার মালিক এরই মধ্যে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে। আমরা কাছে আসতেই বললে, 'দোকান বন্ধ।' কর্মকার তাই নিয়ে গোলমাল বাধাবার যোগাড় করছিল। বেচারি আগে থেকে দেখে গিয়েছিল ওখানটায় বিয়ারের বোতল রয়েছে, তাই ভারি নিরাশ হল। যাক আমরাও আর খেলতে রাজী হলাম না। দোকানের মালিক বেচারির অমনিতেই একটি হাত নেই—কী দরকার। সমস্ত দলবল নিয়ে আমরা ক্যাডিলাক্‌-এর কাছে এসে দাঁড়ালাম। লেন্‌ত্‌স মাথা চুলকে বললে, 'তাই তো, এখন কি করা যায়? প্যারামবুলেটরটা পিছনে বেঁধে নিলে হয়।'

আমি বললুম, 'সেই ভালো। কিন্তু তোমাকেই গাড়ি চালাতে হবে খুব সাবধানে ওটা যা ত উল্‌টে না যায়।'

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাধা দিলে। ওর ভয় হয়েছে লেন্‌ত্‌স ঠিক প্যারামবুলেটরটি উল্‌টে দেবে। লেন্‌ত্‌স বললে, 'আচ্ছা, তবে জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক। এই নিন ভালুক দুটি আপনার, গ্রামোফোন রেকর্ডগুলোও। আর এই প্যান্‌টা?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ।'

'আচ্ছা তবে ওটা কারখানাতেই যাক। এই নাও বব্‌, ডিমের পোচ্‌ করতে তুমি সিদ্ধহস্ত। এবার কফি সেট্‌?'

আমার সঙ্গিনী ইঙ্গিতে লিনাকে দেখিয়ে দিল। সভায় যেমন পুরস্কার দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভঙ্গি করে গট্‌ফ্রিড্‌ কফি সেট্‌ ওর সামনে ধরল। লিনা লজ্জায় লাল। হাত ধোবার গামলাটা টেনে বের করে বলল, 'এটা কাকে দেওয়া যায়? আমাদের এই বন্ধুকে? নাঃ, ওর ব্যবসায় এটা কোনো কাজে লাগবে না। অ্যালার্ম ঘড়িটাও না। কর্মকাররা একেবারে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়।'

ফুলদানিটা গট্‌ফ্রিড-এর হাতে তুলে দিলাম। ও সেটা বাড়িয়ে দিলে লিনার দিকে। লিনা আমতা আমতা করতে লাগল, আসলে ওটা তার নেবার ইচ্ছে

নেই। তার চোখ পড়েছে ম্যাগডালিন-এর ছবিটির উপরে। ওর ভয়, ফুলদানিটা নিলে ছবিটি যাবে কর্মকারের ভাগে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলে উঠল, 'আমি খুব ছবির ভক্ত।'

লেন্‌ত্‌স খুব সসম্ভ্রম ভঙ্গিতে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর দিকে ফিরে বলল, 'এ বিষয়ে আপনার কি মত?'

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান ছবিটি ওর হাত থেকে নিয়ে লিনার হাতে দিয়ে দিল। হেসে বলল, 'ছবিটা ভারি সুন্দর—লিনা।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'বিছানার ধারে টাঙিয়ে রেখ।' ছবিটা পেয়ে লিনার কি আনন্দ, চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা উপছে পড়ছে।

লেন্‌ত্‌স গম্ভীরমুখে গ্র্যামটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবারে এইটি?'

ছবি পেয়ে যদিও লিনা খুব খুশি হয়েছে, তবু দেখা গেল এটির প্রতিও তার যথেষ্ট লোভ রয়েছে। কর্মকার বলল, 'এ বড় মূল্যবান জিনিস, কখন কার দরকার হয়ে পড়বে বলা যায় না।' নিজের রসিকতায় নিজেই এমন জোরে হাসতে লাগল যে হাসির ধমকে একটি মদের বোতল হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার।

লেন্‌ত্‌স হঠাৎ বলল, 'এই এক মিনিট, আমি এক্ষুনি আসছি।' বলেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে কিছু না বলে কয়ে প্যারামবুলেটরটি নিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে কোথায় চলল। আবার যখন ফিরে এল তখন শূন্য হাত। বলল, 'ওটার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

ক্যাডিলাক্ এ উঠে বসলাম। লিনা বলল, 'বেশ হল কিন্তু। ঠিক ক্রিসমাসের মতো।' অতি কষ্টে সমস্ত জিনিসপত্তর সামলে একটি লালচে হাত বের করে হাত ঝাঁকুনি দিল। বলল, 'বিদায়।'

কর্মকার আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে বলল, 'শুনুন মশাই, যদি কোনোদিন কাউকে ডাণ্ডা মারতে হয়—আমি থাকি ১৬নং লেবনিজস্ট্রাস্-এ। বাঁ দিকে দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই পাবেন। ওরা যদি দলে ভারি হয় তো আমিও আমার দলবল নিয়ে আসতে পারব।'

আমরা বললাম, 'বেশ তাই কথা রইল,' বলেই গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

অ্যামিউজমেণ্ট পার্কের মোড় ঘুরবার সময় গট্‌ফ্রিড্ একটি জানালার দিকে দেখিয়ে দিল। চেয়ে দেখি আমাদের প্যারামবুলেটরটি ঐখানে। একটি বাচ্চা ওর মধ্যে শুয়ে আছে, একটি রুগ্ন স্ত্রীলোক পাশে বসে।

গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'কি হে ভালো করিনি?'

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান বলে উঠল, 'এক কাজ করুন, এ ভালুক দুটোও ওকে দিয়ে আসুন। এগুলো ওখানে থাকলেই ঠিক কাজে লাগবে।'
লেন্‌ত্‌স বলল, 'আচ্ছা তবে একটা দিয়ে আসি। আর একটা আপনিই রাখুন।'
'না, না, দুটোই।'
'আচ্ছা তবে তাই।' লেন্‌ত্‌স একলাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলনা দুটো একেবারে স্ত্রীলোকটির হাতে ছুঁড়ে দিলে। সে বেচারি কিছু বলবার আগেই ও এমন ছুটে পালিয়ে এল যেন কে ওকে তাড়া করেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'বাপরে, এত উদারতা কি সয়? আমার রীতিমতো শরীর খারাপ লাগছে। আমাকে ইনটারন্যাশন্যাল-এ নামিয়ে দিয়ে যাও। একটু ব্রাণ্ডি না খেলে আর চলছে না।'
ও নেমে গেল। আমি মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলুম। এবার ঠিক আগেরবারের মতো নয়। একটুক্ষণের জন্যে ও দরজার মুখে দাঁড়াল। ল্যাম্প-এর আলো ওর মুখে এসে পড়েছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। একবার ইচ্ছে হল ওর সঙ্গে ভিতরে যাই। কিন্তু বললুম, 'গুড্‌ নাইট। ভালো করে ঘুমোও।' ও করমর্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। 'গুড্‌ নাইট' বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত বসে রইলুম। উপরের আলো যখন নিবে গেল তখন ক্যাডিলাকটা নিয়ে রওনা হলুম। ভারি অদ্ভুত লাগছে। অন্য সব রাত্তিরে কোনো মেয়েকে নিয়ে যখন খুব হুটোপুটি করেছি, এ ঠিক তেমন নয়। মনটা কেমন যেন নরম, একেবারে তরল হয়ে গেছে। ওসব ক্ষেত্রে মনের বালাই-ই ছিল না।

লেন্‌ত্‌স-এর কাছে ইন্‌টারন্যাশন্যাল-এ ফিরে এলুম। দোকান প্রায় খালি। এক কোণে ফ্রিত্‌সি বসে আছে, তার পাশে হোটেলের ওয়েটার এলয়স্‌। দুজনে ঝগড়া করছে। গট্‌ফ্রিড্‌ একটি সোফাতে মিমি আর ওয়ালিকে নিয়ে বসেছে। দুজনের সঙ্গেই খুব জমিয়ে নিয়েছে, বিশেষ করে মিমির সঙ্গে।
মেয়ে দুটো খানিক পরেই বেরিয়ে গেল, শিকারের সন্ধানে। এই তাদের সময়। আমি গট্‌ফ্রিড্‌-এর পাশে বসে বললুম, 'ব্যাস, এবার যা বলবার আছে বলে ফেল।' আমাকে অবাক করে দিয়ে ও বলল, 'কেন বব্‌, তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ।' ব্যাপারটা ও অত সহজভাবে নেবে এ আমি ভাবিইনি। মনে-মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। বললুম, 'তোমাকে আগে একটু আভাস দেওয়া আমার উচিত ছিল।' ও হাত নেড়ে বলল, 'কি বোকার মতো কথা বলছ।'

আমি রাম্‌-এর ফরমাশ দিয়ে বললুম, 'দেখ, ও যে কে, কি বৃত্তান্ত আমি কিচ্ছু জানি না। বিনডিং-এর সঙ্গে ওর যে কি সম্পর্ক তাই বা কে জানে! সে তোমাকে কিছু বলেছিল?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই নিয়ে তোমার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছে নাকি?'

'না।'

'হুঁ, দেখে তো মনে হয় না। বেশ তো মানিয়ে নিয়েছ তুমি।'

আমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

'তোমার লজ্জা পাবার তো কিছু নেই। তুমি ঠিকই করেছ। পারলে আমিও করতুম।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। তারপর বললুম, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না, গট্‌ফ্রিড্‌।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বব্‌, সংসারে এই একটি জিনিস, আর সবই বাজে। এ যুগে কোনো কিছুর দাম নেই। ফার্ডিনাণ্ড কালকে কি বলেছিল মনে আছে তো? মরা মানুষের ছবি আঁকলে কি হবে, লোকটা কথা যা বলেছে ঠিকই বলেছে। যাকগে, এসব আলোচনায় কি হবে। তার চাইতে ঐ ভাঙা ক্যানেস্তারাটা নিয়ে বস, দু-একটা লড়াইয়ের গান হোক।'

পিয়ানোয় গিয়ে বসলুম। আমাদের অতি প্রিয় দুটি গান বাজালুম। শূন্য ঘরে বাজনাটা ভূতের কান্নার মতো শোনাতে লাগল। এসব গান একদিন যখন গেয়েছি তার স্থানকালপাত্র ছিল আলাদা, আজকে এর সঙ্গে তার যোগ কোথায়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিন দুই পরে কোষ্টার আপিস-ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'বব্, ব্লুমেন্থল্ এইমাত্র ফোন করেছিল, এগারোটার সময় ক্যাডিলাকটা নিয়ে যেতে হবে। ও একবার গাড়িটা চালিয়ে দেখতে চায়।'

স্ক্রুড্রাইভার আর স্প্যানারটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। 'অটো, এবার যদি লেগে যায়।'

লেন্‌ত্‌স ছিল ফোর্ড গাড়িটার তলায়। বললে, 'কেমন, আগে বলিনি যে ও আবার আসবে? গট্‌ফ্রিড্ ফ্যালনা কথা বলে না।'

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'তুমি চুপ করতো বাপু, এদিকে অনেক কথা ভাববার আছে। আচ্ছা অটো, দাম কতটা কমানো যেতে পারে?'

'প্রথমে দুহাজার। তারপর দুহাজার দুশো। তাতেও যদি না লাগে তো দুহাজার পাঁচশো। আর যদি দেখ লোকটি বদ্ধ পাগল তাহলে দুহাজার ছশো। কিন্তু ওকে বলে দেবে যে তাহলে ওকে সারাজীবন শাপান্ত করব।'

'বেশ।' পালিশ দিয়ে গাড়িটাকে আর একবার চকচকে করে তোলা গেল। ভিতরে ঢুকে বসলুম। কোষ্টার আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বব্, তুমি হলে গিয়ে যোদ্ধা। প্রয়োজন হলে নিজের রক্ত দিয়েও তোমাকে কারখানার সম্মান রাখতে হবে। ব্লুমেন্থল্-এর মানিব্যাগটি হাত করবার জন্য দরকার হয় তো জান্ কবুল করবে।'

হেসে বললুম, 'তাই সই।'

লেন্‌ত্‌স পকেট থেকে একটা ছোট্ট মেডেল মতো জিনিস বের করে আমার নাকের সামনে ধরে বলল, 'এই মাদুলিটি সঙ্গে রাখ।'

'আচ্ছা,' বলে জিনিসটা পকেটে চালান করে দিলুম।

গট্‌ফ্রিড্ বিড়বিড় করে দেবতার নাম স্মরণ করতে থাকে। 'হে ভগবান, এই

হাঁদা লোকটিকে শক্তি দাও, সাহস দাও। হ্যাঁ, ভালো কথা, তিনবার থুতু ফেল তো।'

'এই নাও,' বলে ওর পায়ের কাছে থুতু ফেলে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলুম। পেট্রল পাম্প্-এর কাছে জাপ্ দাঁড়িয়ে। পেট্রলের নলটা তুলে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমাকে সেলাম করল।

গাড়িতে কাঁচের ফুলদানি লাগানো আছে। রাস্তা থেকে কিছু গোলাপী ফুল কিনে দিব্যি সাজিয়ে নিলুম। ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্-এর কথাটাও তো ভাবতে হবে!

দুঃখের বিষয় গিয়ে দেখি ওটা ব্লুমেন্থল্-এর বাড়ি নয়, অফিস। মিনিট পনেরো বসে আছি, ব্লুমেন্থল্-এর দেখা নেই। ভাবলুম, হুঁ, তোমার চালাকি আমি বুঝি না! তুমি ভেবেছ এইভাবে আমাকে নরম করবে, আমার ধৈর্য অত সহজে নষ্ট হবার নয়। পাশের ঘরে একটি সুন্দর মতো টাইপিস্ট মেয়ে কাজ করছে। নিজের বাটন্‌হোল থেকে গোলাপী ফুলটি ওকে দিয়ে দিব্যি আলাপ জমিয়ে নিলুম। কিছু-কিছু খবর সংগ্রহ করা গেল। উলের ব্যবসা—ব্যবসার অবস্থা ভালো। অংশীদার একজন আছে, সে টাকা দিয়ে খালাস। ব্যবসা দেখে না। বাজারে সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হল মেয়ার অ্যাণ্ড সন। মেয়ারের ছেলে লাল রঙের টু-সিটার এসেক্স হাঁকিয়ে বেড়ায়। এ পর্যন্ত খবর সংগ্রহ করা গেছে—এমন সময় ব্লুথেন্থল্-এর ঘরে আমার ডাক পড়ল।

আমার দিকে দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলল, 'দেখুন মশাই, আমার সময় অল্প। সেবারে আপনারা যে দাম হেঁকেছিলেন সেটা আপনাদের মন-গড়া দাম। এবার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ঠিক-ঠিক কত দাম পড়বে?'

'সাত হাজার মার্ক।'

ব্লুমেন্থল্ তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তবে আর কথা বলে কি হবে?'

বললুম, 'হের্ ব্লুমেন্থল্, আপনি আর একবার গাড়িটা দেখুন—'

ও বাধা দিয়ে বলল, 'আমার যা দেখবার সেদিনই দেখেছি।'

বললুম, 'দেখার তো রকম আছে। আসুন সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখুন। এর বার্নিশটা দেখুন, বাজারের সেরা বার্নিশ—ভল্ অ্যাণ্ড রুরবেক্ থেকে কেনা, দাম পড়েছে আড়াইশো মার্ক। বিলকুল নতুন টায়ার—ক্যাটালগ মিলিয়ে দাম দেখুন ছশো মার্ক—এতেই তো চলে গেল সাড়ে-আটশো মার্ক। ভিতরের সব ব্যবস্থা—চমৎকার কাপড়ের ঢাকনা—'

লোকটা শুনতেই চায় না। তবু বলে যেতে লাগলুম। 'দেখুন না এসে কি সব

দামী ব্যবস্থা। চমৎকার চামড়া-দেওয়া হুড, ক্রোমিয়ামের রেডিয়েটর, হাল-ফ্যাসানের বাম্পার—প্রতি জোড়া ষাট মার্ক।' ছেলে যেমন মায়ের কোলে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে আমিও তেমনি ব্লুমেন্থল্‌কে ক্যাডিলাক্‌টার কাছে টেনে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলুম। জানতুম এ্যান্টিয়াস-এর মতো একবার মাটির কাছে যেতে পারলেই আমার জোর বাড়বে! খদ্দরের চোখের কাছে জিনিসটা ঠিক মতো ধরে দিতে পারলে দামের অমূলক ভীতিটা আপনিই কমে যায়।

ওদিকে ব্লুমেন্থল্‌ও জানে ঐ ডেস্কের পিছনে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার মধ্যেই ওর জোর। চোখের থেকে চশমা খুলে নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসল। শুরু হল যুদ্ধ—বাঘে অজগরে। ব্লুমেন্থল্‌কেই বলব অজগর। আমি প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবার আগেই দেখি কথার প্যাঁচে ও আমার দাম থেকে দেড় হাজার মার্ক খসিয়ে দিয়েছে।

আমি তো বিপদ গণলুম। ভয়ে তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গট্‌ফ্রিড্‌-এর দেওয়া মাদুলিটি চেপে ধরলুম। কথা কাটাকাটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বললুম, 'হের্‌ ব্লুমেন্থল্‌, একটা বাজল, আপনার লাঞ্চের সময় হয়েছে।' আসল কথা আমি এখন পালাতে পারলে বাঁচি। দাম যে ভাবে তর-তর করে নেমে আসছে তাতে আর ওখানে দাঁড়াবার ভরসা হচ্ছে না।

ব্লুমেন্থল্‌ কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বলল, 'আমি দুটোর আগে লাঞ্চে যাই না। আচ্ছা এসব আলোচনা পরে হবে। আগে একবার গাড়িটা চালিয়ে দেখা যাক।' শুনে আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

গাড়ি নিয়ে দুজনে ওর বাড়ির দিকেই রওনা হলুম। আশ্চর্য, গাড়িতে বসতে না বসতে ওর ভাবভঙ্গি বিলকুল বদলে গিয়েছে। বেশ খোশ মেজাজে কথা কইতে শুরু করেছে। সম্রাট ফ্রান্তস্‌ জোসেফ সম্বন্ধে একটা হাসির গল্প বলল। অবিশ্যি সেই গল্পটা অনেক দিন আগেই আমি শুনেছি। আমিও একটা মজার গল্প বললুম। সেই ট্রাম ড্রাইভারের গল্পটা। তারপরে এমনি চলল। ও বলে একটা আমি বলি আর একটা। ওর বাড়ির সুমুখে এসে যখন গাড়ি থামল তখন দুজনেই হাসি মস্করা থামিয়ে দিব্যি গম্ভীর হয়ে বসলুম। ও বলল, 'একটু বস, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসছি।'

আমি আদর করে ক্যাডিলাক্‌টির পিঠ চাপড়ে বললুম, 'বন্ধু, এত হাসি মস্করার পিছনে কিছু একটা দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি কিচ্ছু ভেব

না। বাপু, তোমার একটা হিল্লে হবেই। ও তোমাকে ঠিক কিনে নেবেই, আমি বলে রাখলুম। ইহুদি খদ্দের যদি একবার ফিরে আসে তো কিনবে বলেই আসে। আর খৃস্টান খদ্দের ফিরে এলেও বিশ্বাস নেই। কমসেকম বার ছয়েক ট্রায়াল দেবে, আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ট্যাক্সিভাড়া বাঁচানো। এতসব তোড়জোড় করে শেষ পর্যন্ত হয়তো গাড়ি না কিনে রান্নার জন্যে একটি তোলা উনুন কিনবে। না, না, সেদিক থেকে ইহুদিরা ঢের ভালো। ওরা কেনবার হলে ঠিক কেনে। কিন্তু বন্ধু, যদি এই অতি-ঝানু ইহুদি-তনয়টির কাছে আর একশো মার্কও দাম কমাতে হয় তবে এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, এ জীবনে আর কখনও রাম্ স্পর্শ করব না।'

ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্ দেখা দিলেন। লেন্ত্স-এর উপদেশ স্মরণ করে আমি মুহূর্তে যোদ্ধভাব ত্যাগ করে একেবারে বিগলিত বশম্বদ মূর্তি ধারণ করলাম। ব্লুমেন্থল্ আমার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছে, মুখে অত্যন্ত কুটিল হাসি। লোকটা যেন পেটানো লোহা দিয়ে গড়া। উলের ব্যবসা না করে কলকব্জা এঞ্জিনের ব্যবসা করলে ওকে মানাত ভালো।

ওকে বসালুম পিছনের সিট-এ আর ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্কে আমার পাশে। মোলায়েম স্বরে ওকে জিগগেস করলুম, 'কোনদিকে যাবেন, বলুন।'

'যেদিকে আপনার ইচ্ছে' মুখে মায়ের মতো মিষ্টি হাসি। গাড়ি চালাতে-চালাতে আমি কথা বলছি। শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ লোকের সঙ্গে কথা বলতে আরাম আছে। আমি খুব আস্তে-আস্তে কথা বলছি, ব্লুমেন্থল্ ভালো করে শুনতেও পাচ্ছে না। সেজন্যেই একটু সহজভাবে কথা বলতে পারছিলুম। ও যে পিছনে বসে আছে তাতেই যা একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

একটা জায়গায় গিয়ে থামলুম। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এবার শত্রুর সম্মুখীন হলুম, 'কেমন হের্ ব্লুমেন্থল্, গাড়ির চলতিটা দেখলেন তো? একেবারে মাখনের মতো, কি বলেন?'

'আরে ভাই, মাখনের মতো বললে কি হবে!' গলার স্বরে খুশির আভাস আছে। 'দামেই সব মেরে দিয়েছে। বড্ড বেশি দাম বলছেন।'

খুব গম্ভীরভাবে বললুম, 'ব্লুমেন্থল্, আপনি হলেন ব্যবসায়ী লোক. আপনাকে খোলাখুলি বলি। এটাকে দাম বলবেন না, এটা হল ব্যবসায় টাকা খাটানোর মতো। আপনিই বলুন না আজকাল ব্যবসাতে লোকে কি চায়? আমার চাইতে আপনি বেশি জানেন। মূলধনের চাইতে আজকাল বেশি দরকার বাজারে প্রতি-

পত্তি। সেই প্রতিপত্তি বাগাতে হলে একটু বাইরের চাকচিক্য চাই। এই ক্যাডিলাকটি হবে তার সহায়। বাইরের সৌষ্ঠব তো আছেই, আরামেরও অন্ত নেই। ব্যবসার দিক থেকে এটা একটা মস্ত বড় বিজ্ঞাপনের কাজ করবে।'

ব্লুমেন্থল্ হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে? এর মাথায় দেখছি একেবারে ইহুদিদের মতো বুদ্ধি।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'ভায়া, আজকাল সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হল ছেঁড়াছোঁড়া পোশাক আর বাস্-এর টিকিট। আমাদের যে টাকা বাজারে বাকি পড়ে আছে তাই যদি থাকত তো শহর সুদ্ধ যত হ্যালফ্যাশানের গাড়ি সবই কিনে ফেলতে পারতুম। আপনাকে বন্ধু ভেবে গোপনে এই কথাটি বলে রাখছি।'

খুব সন্দিগ্ধভাবে ওর দিকে তাকালুম। হঠাৎ এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো কথা বলছে, মতলবটা কি? না কি ওর স্ত্রী কাছে থাকাতে ওর কঠোর ভাবটা দূর হয়ে গেল? ভাবলুম তবে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্রটাই নিক্ষেপ করি। বললুম, 'দেখুন, ক্যাডিলাক্ গাড়ির কথা আলাদা। ওর সঙ্গে কোনো গাড়ির তুলনা হয় না, এমন যে এসেক্স গাড়ি তাও নয়। কি বলেন, ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্?'

উনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'মেয়ার অ্যাণ্ড সন-এর ছোকরা মেয়ার একটা এসেক্স গাড়ি হাঁকায়। তা অমন লাল রঙের বিদ্ঘুটে গাড়ি কেউ বিনি পয়সায় দিলেও আমি নিতে রাজী নই।'

ব্লুমেন্থল্ একটু বিরক্তির স্বরে কি বলতে যাচ্ছিল। ওকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে বললুম, 'কিন্তু এর নীল রঙটি আপনার সোনালী চুলের সঙ্গে কি চমৎকার মানিয়েছে দেখুন। সোনালী রঙের সঙ্গে এই হালকা নীল রঙটা খোলে ভারি ভালো।'

চেয়ে দেখি ব্লুমেন্থল্ খুব হাসছে। বলল, 'হুঁ, মেয়ার অ্যাণ্ড সন! আপনি মশায় আচ্ছা চালাক লোক। আর মেয়েদেরও দেখছি খুব তোয়াজ করতে পারেন।'

ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে আমি হালকা স্বরেই বললুম, 'হের্ ব্লুমেন্থল্, অন্যায় কিছু যদি বলি তক্ষুনি থামিয়ে দেবেন। দেখুন, মেয়েদের বেলায় তোষামোদটা ঠিক তোষামোদ নয়। ঐটুকু প্রশংসা ওঁদের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু আমাদের এই যুগে মেয়েদের ঐ সামান্য পাওনাটুকু দিতেও আমরা কার্পণ্য করি। মেয়েরা তো ইস্পাতের তৈরি আসবাবপত্র নন। ওঁরা হলেন ফুলের মতো। ফুল যেমন চায় সূর্যালোক, মেয়েরা তেমনি চায় মুখের মিষ্টি কথা। সারাজীবন ক্রীতদাসের মতো খেটেও যে স্ত্রীলোকের মন পাওয়া যায় না,

দিনান্তে একটি মিষ্টি কথা বলে তার হৃদয় জয় করা যায়। একথাটি আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন। থাকগে, ওঁকে যা বলেছিলুম সেটা তোষামোদ নয়, খাঁটি সত্যি কথা। সোনালীর সঙ্গে নীলের যেমন মিল অমন আর কিছুতে নয়।'

ব্লুমেন্থল্ একগাল হেসে বলল, 'খাসা বলেছ ওস্তাদ। কিন্তু হের্ লোকাম্প্, ইচ্ছে করলে আমি এখনও হাজারখানেক মার্ক দাম কমিয়ে দিতে পারি—'

আমি ভয়ে দুপা পিছিয়ে গেলুম। কি সর্বনাশ! এর অসাধ্য কিছু নেই। কি আর করি? শিকারির সুমুখে পড়লে হরিণ শিশুর যে অবস্থা হয় তেমনি কাতর মুখ করে ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্-এর দিকে তাকালুম। ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'তা একবার ওদের কথাও—'

ব্লুমেন্থল্ তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভয় নেই তোমার। বলছিলুম ইচ্ছে করলে কমাতে পারি; কিন্তু কমাব না। শত হলে ব্যবসাদার মানুষ তো। খাঁটি ব্যবসাদারের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে। সত্যি ভাই, তোমার বাহাদুরি আছে—বিশেষ করে ঐ মেয়ার অ্যাণ্ড সন-এর কথাটা বলে বেশ ঘাত বুঝে কোপ মেরেছ। আচ্ছা, তোমার মা কি ইহুদি মেয়ে?'

'না।'

'কখনও রেডিমেড জিনিসের ব্যবসা করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক ধরেছি। কথা বলার স্টাইল দেখেই বুঝেছি। কি রেডিমেড জিনিসের ব্যবসা করতে?'

'মানুষের আত্মা। স্কুল মাস্টারি করার কথা ছিল আমার।'

'হের্ লোকাম্প্! তোমাকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কখনো চাকরি-বাকরির দরকার হলে আমার কাছে এস।'

একখানা চেক লিখে আমার হাতে দিল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ যে আগাম টাকা! কি আশ্চর্য! আনন্দে অধীর হয়ে বললুম, 'হের্ ব্লুমেন্থল্, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো গাড়ির সঙ্গে দুটো কাঁচের ছাইদানি আর সুন্দর একটি রবারের ম্যাট্ দিতে চাই।'

'উত্তম কথা। বুড়ো ব্লুমেন্থল্-এর ভাগ্যেও কখনো-সখনো উপহার মেলে দেখছি।'

পরদিন সন্ধ্যায় ওদের ওখানে আমার খাওয়ার নেমন্তন্ন হয়ে গেল। ফ্রাউ ব্লুমেন্থল্ খুব আগ্রহের সঙ্গে নেমন্তন্নে সায় দিলেন। মায়ের মতো আদর করে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবিশ্যি আসবেন। পাইক মাছের দোলমা করব।'

আমি বললুম, 'ও আমার প্রিয় খাদ্য। কালকে একেবারে গাড়ি নিয়ে আসব, সকালবেলাতেই ঝেড়ে-মুছে ফিটফাট করে রাখব।'

ফেরবার পথে বলতে গেলে পাখির মতো উড়ে চলে এলুম। কারখানায় এসে দেখি লেন্‌ত্‌স আর অটো গেছে লাঞ্চ খেতে। জাপ্‌ বসেছিল। বলল, 'বিক্রি হল ?'

'খবরটা জানবার জন্য খুব ব্যস্ত দেখছি। এই নাও এক ডলার বখশিশ। যাও একটা এরোপ্লেন বানাও গে।'

ছোকরা একগাল হেসে বলল, 'তাহলে বিক্রি হয়ে গেছে।'

বললুম, 'আমি এখন খেতে যাচ্ছি। খবরদার, আমি ফিরে আসবার আগে ওদের কাছে একটি কথাও বলবে না।'

ডলারটা উপর দিকে একবার ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে বলল, 'হের্‌ লোকাম্প, আমি থাকব একেবারে কবরখানার মতো নীরব।'

'দেখতে তুমি কবরখানার মতোই বটে।'

ফিরে আসতেই জাপ্‌ ইশারা করে কি বলল। আমি বললুম, 'কি ব্যাপার ?' ও হাসতে-হাসতে বলল, 'সেই ফোর্ড গাড়ির লোকটা এসেছে, ভিতরে বসেছে।' আমি ক্যাডিল্যাকটা উঠোনে রেখে কারখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখি পাঁউরুটিওয়ালা ঝুঁকে পড়ে রঙের ক্যাটালগ দেখছে। গায়ে চেকের ওভারকোট, শোকের চিহ্নস্বরূপ চওড়া কালো ব্যাণ্ড লাগানো। তার পাশে একটি দিব্যি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে, কালো চঞ্চল চোখ, ফার-এর কোট গায়ে, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার জুতো। বার্নিশের রঙ নিয়ে দুজনে কথা কাটাকাটি চলছে। মেয়েটির পছন্দ টকটকে লাল রঙ, কিন্তু লাল রঙটা পাঁউরুটিওয়ালার পছন্দ নয়, এখনও অশৌচের কাল চলছে কিনা। ও চায় একটু হালকা হলদেটে-ছাই রঙ।

মেয়েটি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'ধ্যাৎ, ফোর্ড গাড়ির একটু চম্‌কা রঙ না হলে মানায় ? নইলে চোখেই পড়বে না।'

পাঁউরুটিওয়ালা যতই ঝুঁকে পড়ে রঙের নমুনাগুলি দেখছে মেয়েটি ততই নানারকম মুখভঙ্গি করছে ; আর আমাদের দুজনের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। বেশ মজার মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত দুজনের একটা রফা হল, সাব্যস্ত হল সবুজ রঙ। মেয়েটি এবার জেদ ধরল হুড্‌-এর রঙটা চকচকে হওয়া চাই। কিন্তু পাঁউরুটিওয়ালা তার গোঁ কিছুতেই ছাড়বে না—শোকের চিহ্নটা কোথাও থাকতেই হবে। ও বলল, 'কালো চামড়ার হুড্‌ চাই।' ব্যবসার দিক থেকে এটা মন্দ চাল নয়।

অমনিতেই তো ও বিনিপয়সায় হুড্ আদায় করবে, তার উপরে চামড়ার হুড চেয়ে দামী জিনিস আদায় করবার চেষ্টা।

দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু উঠোনে নেমেই থমকে দাঁড়াল। ক্যাডিল্যাক্‌টা দেখে কৃষ্ণনয়নার চক্ষু স্থির। ছুটে গেল গাড়িটার দিকে। 'পুপ্‌পি, দেখ কেমন গাড়ি! চমৎকার! এমনিটি না হলে হয়?' পরমুহূর্তেই গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে বসল। খুশিতে ডগমগ। 'আঃ, কি চমৎকার সিট্‌গুলো, ঠিক ক্লাবের আরাম-কেদারার মতো। ফোর্ড-টোর্ড কি এর কাছে লাগে?'

পুপ্‌পি বিরক্তির স্বরে বলল, 'হয়েছে, এবার চলে এস।'

লেন্‌ত্‌স খোঁচা দিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছ কি? গাড়িটা ওকেই গছিয়ে দিতে চেষ্টা কর।' আমি গট্‌ফ্রিড্-এর দিকে কট্‌মট্ করে তাকালুম। মুখে কিছু বললুম না। ও আবার খোঁচা মেরে কি বললে। আমি উচ্চবাচ্য না করে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালুম।

পাঁউরুটিওয়ালা অতি কষ্টে নারীরত্নটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল। তারপরে রীতিমতো বিরক্ত মুখে সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ওস্তাদ লোক বাবা! একটু তর সয় না। নতুন গাড়ি—নতুন বউ—তোমার খুরে দণ্ডবৎ!'

ওরা দুজনে সবে রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়েছে অমনি লেন্‌ত্‌স চেঁচিয়ে উঠল, 'আচ্ছা বব্, তুমি একেবারেই লক্ষ্মীছাড়া? এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? মেয়েটিকে দেখলে না? এ তো হাত বাড়ালেই হত।'

বললুম, 'লান্‌স কর্পোরাল লেন্‌ত্‌স, উপরওয়ালা অফিসারের সঙ্গে কথা বলবার সময় সমঝে কথা বলবে। আমাকে তুমি ভাবছ কি? আমি কি দুবার দার পরিগ্রহ করবার মতো লোক?'

গট্‌ফ্রিড্-এর চেহারাটা যদি দেখতে! আমার কথা শুনে ওর চক্ষু ছানাবড়া। খানিক পরে একটু সামলে নিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'যাও এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।'

ওর কথায় আর কান না দিয়ে কোষ্টারের দিকে ফিরে বললুম, 'অটো আর কি, এবার আমাদের সাধের ক্যাডিল্যাক্‌টিকে বিদায় দাও। ও এখন গিয়ে পরের ঘর করুক; আমাদের ঘর ছেড়ে পোশাক ব্যবসায়ীর ঘর আলো করবে। সুখে থাকুক এই চাই। আমাদের কাছে থাকলে ও ঢের দুঃখ কষ্ট পেত। এখন

নিরাপদে থাকবে, আশা করা যায়।' পকেট থেকে চেকখানা বের করলুম। লেন্‌ত্‌স বিস্ময়ে হতবাক। 'এ্যাঁ:, বলছ কি, একেবারে নগদ-নগদ দাম—কি আশ্চার্য !' গলা দিয়ে কথা সরছে না।

চেকটা ওদের নাকের কাছে ঘোরাতে-ঘোরাতে বললুম, 'কত টাকা বল দেখি। দেখি কেমন তোমাদের আন্দাজ।'

লেন্‌ত্‌স চোখ বুজে আন্দাজ করে বলল, 'চার হাজার।'

কোষ্টার বলল, 'সাড়ে-চার।'

পেট্রল পাম্প-এর কাছ থেকে জাপ্‌ চেঁচিয়ে বলল, 'পাঁচ।'

ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললুম, 'সাড়ে-পাঁচ।'

লেন্‌ত্‌স ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে চেকটা নিয়ে বলল, 'অসম্ভব, তাহলে ও চেক নিশ্চয় বাজে, ওটা ভাঙানো যাবে না।'

গম্ভীরভাবে বললুম, 'হের্‌ লেন্‌ত্‌স, তুমি ভেবেছ তুমি যেমন অচল, আমার চেকও তেমনি অচল। ব্লুমেন্‌থল্‌ কি ফ্যালনা লোক ? ইচ্ছে করলে এর কুড়ি গুণ টাকা দিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া আমার বন্ধুলোক ; হ্যাঁ, বন্ধুই তো। জানো, কালকে রাত্তিরে ওর বাড়িতে আমার খাবার নেমন্তন্ন ? পাইক মাছের দোলমা হবে বলে দিয়েছে। এসব দেখে শেখ। একবার খাতির জমাতে পারলে টাকায় টাকা, নেমন্তন্নে নেমন্তন্ন, বুঝলে ? সেল্‌সম্যানের কাজ কি যাকে-তাকে দিয়ে হয় ? কেমন, এখন বিশ্বাস হল তো ?'

গট্‌ফ্রিড্‌ এবার একটু নরম হয়ে এসেছে। তবু স্বভাব যায় না মলে। বলল, 'কেমন বিজ্ঞাপনটা লিখেছিলুম। আর আমার মাদুলি ?'

'মাদুলি ?' পকেট থেকে বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, 'এই নাও তোমার মাদুলি, ভুলেই গিয়েছিলুম ওটা সঙ্গে ছিল।'

এতক্ষণে কোষ্টার বলল, 'বব্‌, তুমি ওস্তাদ বটে, খুব একটি দাঁও মেরেছ। ভগবানের খুব দয়া, গাড়িটা পার করা গেছে। টাকাটাও খুব কাজে লাগবে।'

কেষ্টোরকে বললুম, 'আমাকে ভাই গোটা পঞ্চাশ মার্ক আগাম দিতে পার ?'

'পঞ্চাশ কেন ? একশো দেবো, ও তোমার ন্যায্য পাওনা।'

গট্‌ফ্রিড্‌ আধ-বোজা চোখে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'দেখ আবার আমার নতুন ওভারকোটটি আগাম চেয়ে বস না যেন।'

ওকে ধমকে বললুম, 'দেখ্‌ ব্যাটা বেজন্মা, মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে না চাস তো চুপ করে থাক। বেশি বাজে বকিসনি।'

কোষ্টার বলল, 'তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তো আজকের মতো কারখানা বন্ধ করে দিই। একদিনের পক্ষে ঢের লাভ হয়ে গেছে, বেশি লোভ না করাই ভালো। তার চাইতে বরং কার্লকে নিয়ে একটু রেসের মহড়া দেওয়া যাক।'

জাপ্ আগে থেকেই পেট্রল পাম্পের কাজ চুকিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। হাত মুছতে-মুছতে বলল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে কারখানার চার্জে থাকি?'

অটো হেসে বলল, 'না, তোমাকে থাকতে হবে না। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।'

প্রথমেই গেলাম ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাবার জন্য। চেকটাতে যে কোনো গল্‌তি নেই সেটা না দেখা পর্যন্ত লেন্‌ত্‌স স্থির হতে পারছিল না। তারপরে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ তুলে আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি আর আমার ল্যাণ্ডলেডি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'তারপরে, কি বলতে চাও শুনি।'

'কিচ্ছু না, আমার ভাড়াটা দিতে এসেছি।'

শুনে তো ফ্রাউ জালেওয়াস্কি অবাক, কারণ ভাড়া পাওনা হতে এখনও তিন দিন বাকি।

বলল, 'বুঝেছি, কিছু একটা মতলব আছে।'

'কিছুমাত্র না, শুধু তোমার বসবার ঘরের নক্সা-করা আরাম-কেদারা দুটি আজকে সন্ধ্যের জন্য ধার চাই।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি কোমরে হাত দুটি রেখে একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব করে দাঁড়াল। 'ও, বুঝেছি। কেন, ঘরটি বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?'

'তা কেন? ঘর পছন্দ বৈকি। তবে কিনা এমন সুন্দর কাজকরা চেয়ার দুটি আরো বেশি পছন্দ।'

তারপর ওকে বুঝিয়ে বললুম যে আমার একটি দূরসম্পর্কীয়া বোনের আসবার কথা, সেইজন্যেই ঘরটি একটু ফিটফাট করে রাখতে চাই। আমার কথা শুনে শ্রীমতী তার বিরাট বপু দুলিয়ে বিষম হাসতে লাগল। বললে, 'এ্যাঁ, বোন আসছে? হুঁ! কখন আসছে শুনি?'

আমি বললুম, 'এখনও কিছু ঠিক নেই, তবে আসে যদি তো তাড়াতাড়িই আসবে। রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যাবে। কেন, ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, বোন কি থাকতে নেই?'

ও বলল, 'তা থাকবে না কেন? তবে কিনা বোনের জন্যে কেউ আরাম-কেদারা ধার করতে আসে না।'

'যাই বল, আমি করি। ভাই-বোনের প্রতি আমার সত্যিকারের টান আছে।'

'তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভবঘুরে আর কাকে বলে! যাকগে, চেয়ার নিতে হয় নিও।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কালকেই চেয়ার ফিরিয়ে দেব, কার্পেট সুদ্ধ।'

ও চমকে উঠে বলল, 'কার্পেট? কার্পেটের কথা আবার কখন হল?'

'কেন, বললুম তো, তুমিও তো বললে।'

রেগেমেগে ও কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম, 'কার্পেটের উপরেই চেয়ার থাকে কিনা, কাজেই চেয়ার চাইলেই কার্পেটও চাওয়া হল।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি গম্ভীর হয়ে বলল, 'হের্ লোকাম্প্, বেশি-বেশি করতে যেয়ো না। সব বিষয়ে সংযম চাই। জালেওয়াস্কি সব সময় ঐ কথা বলত। ও কথাটি মনে রাখলে উপকার হবে।'

জালেওয়াস্কির উপদেশটি ভালো। তবে কিনা আমি যতদূর জানি বেচারা মদ খেয়ে-খেয়েই বেঘোরে মারা গেল। ওর স্ত্রীই বহুদিন আমাকে একথা বলেছে। কিন্তু বক্তৃতা করবার বেলায় সে কথা মনে থাকে না। দরকার হলে লোকে যেমন পবিত্র বাইবেল্-এর আপ্ত বাক্য উদ্ধার করে, ও তেমনি স্বামীর মুখ-নিঃসৃত বাণী আওড়াতে থাকে। যতই দিন যাচ্ছে স্বামীটি ততই তার কাছে একটি পয়গম্বর হয়ে উঠছে। যখন-তখন কারণে-অকারণে তার বাক্য উদ্ধার করে।

তাড়াতাড়ি এসে ঘর গোছাতে লেগে গেলুম। বিকেল বেলাতেই প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে টেলিফোন করেছিলুম। সপ্তাহখানেক ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ও নাকি এর মধ্যে অসুখে ভুগে উঠেছে। ওকে বলেছি আটটার সময় ওর ওখানে যাব, রাত্তিরের খাওয়া এখানে সেরে নিয়ে তারপর দুজনে সিনেমায় যাব।

কার্পেট আর আরাম-কেদারা দুটিতে ঘরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে; কিন্তু আলোর ব্যবস্থা নিতান্তই জঘন্য। কাজেই পাশের ঘরে হেসিদের কাছে টেবিল ল্যাম্প-এর যোগাড়ে যেতে হল।

ফ্রাউ হেসি জানালার ধারে চুপটি করে বসে আছে। ওর স্বামী তখনও ফেরেনি। চাকরি যাবার ভয়ে ও ছুটি হবার পরেও আরো ঘণ্টা দুই বসে-বসে আপিসের কাজ করে। স্ত্রীলোকটিকে দেখলে মনে হয় একটি রুগ্ন পাখি। ওর কোচকানো তোবড়ানো ছোট্ট মুখটিতে একটি যেন হতাশ বিষণ্ণ শিশুর ভাব লেগে আছে। আমার অনুরোধটি জানাতেই খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' ল্যাম্পটি

আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এসব কথা যখন ভাবি—'

ভাবনাটা আমার জানা আছে। হেসিকে বিয়ে না করে অপর কাউকে বিয়ে করলে কি হতে পারত না পারত ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা আগেই শুনেছি তবে কিনা হেসির মুখে। ওর তরফের কথা হল বিয়ে না করলে, সংসারী না হলে কি হতে পারত ইত্যাদি। এটাই হল দুনিয়ার সবচেয়ে পুরাতন কাহিনী, এর চেয়ে নিরর্থক কাহিনী আর কিছু হতে পারে না।

খানিকক্ষণ বসে ওর বিলাপ শুনতে হল, দু-একটা মামুলি মন্তব্য করলুম, তারপরে উঠে গেলুম আর্না বোনিগ-এর ঘরে গ্রামোফোনটি চাইতে। ফ্রাউ হেসি ভুলেও আর্না বোনিগ-এর নাম উচ্চারণ করে না, বলে, পাশের ঘরের বাসিন্দে। ওকে সে দেখতে পারে না, কারণ ওকে মনে-মনে হিংসে করে। আমার কিন্তু ওকে বেশ লাগে। জীবন সম্বন্ধে ওর মনগড়া কোনো ধারণা নেই। জানে সুখ চাও তো যা পেয়েছ তাই ভোগ করে নাও। এও জানে সুখ জিনিসটা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে আর তার জন্য দাম দিতে হয় প্রচুর।

গ্রামোফোন বাক্সটার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে আর্না আমার জন্যে কয়েকটা রেকর্ড বেছে দিচ্ছিল। বলল, 'ফক্সট্রট্ আপনার পছন্দ ?'

আমি বললুম, 'না। আমি নাচতে জানিনে।'

খুব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাচতে জানেন না ? রাত্তিরে যখন বেরোন কি করেন তখন ?'

'রসনার রস ছাড়া আমি আর কিছু বুঝিনে। পান ভোজনেই আমার ফুর্তি।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, যে ব্যক্তি নাচতে জানে না তাকে দিয়ে আমার চলবে না।'

আমি বললুম, 'আপনার দাবি বড় কঠিন। কিন্তু আপনার তো আরো অনেক রেকর্ড আছে ? এই কদিন আগে আপনি ভারি সুন্দর একটি রেকর্ড বাজাচ্ছিলেন —একটি মেয়ের গান, সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের বাজনা।'

'ও ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা বড় সুন্দর রেকর্ড। "তোমা বিনে কেমন করে দিন কাটবে" সেই গানটা তো ?'

'ঠিক বলেছেন। বেড়ে গান ! কবিরা এত কথাও বলতে পারে।'

ও হেসে বলল, 'তা বলবে না কেন, বলতে দোষ কি ? দেখুন আজকাল গ্রামোফোনটা হয়েছে একটা এ্যাল্‌বাম্-এর মতো। আগে লোকে এ্যাল্‌বাম্-এ

কবিতা লিখে দিত, এখন একে অন্যকে গ্রামোফোন রেকর্ড উপহার দেয়। আমার পুরোনো দিনের কথা কখনো স্মরণ করতে হলে, আর কিছু না, সে সময়কার রেকর্ডগুলো খুঁজলেই হল—সব স্মৃতি আপনিই মনে পড়ে যাবে।'

মেঝেতে মেলাই সব রেকর্ড ছড়ানো। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'রেকর্ডের সংখ্যা থেকে যদি অনুমান করা যায় তবে আপনার জীবনের স্মৃতির পরিমাণ তো বড় কম নয়।'

ও দাঁড়িয়ে উঠে মাথার লালচে চুলগুলো হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিল। রেকর্ডের স্তূপ পায়ে ঠেলে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলেছেন। তা, অনেক থাকার চাইতে একটি যদি সুখস্মৃতি থাকত—'

খাবার-দাবার কিছু-কিছু কিনে এনেছিলুম। সেগুলো খুলে নিয়ে নিজেই যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলুম। রান্নাঘরের লোকদের দিয়ে কিছুই সাহায্য পাওয়া যাবে না, ফ্রিডার সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু নিজের হাতে যতদূর করেছি কিছু খারাপ হয়নি। আমার ঘরটিকে আর এখন চেনাই যায় না। আরাম কেদারায়, টেবিল-ল্যাম্প-এ, ঢাকনা-দেওয়া টেবিলে ঘরটার ভোল ফিরে গেছে। আর তর সইছে না, মনের চাঞ্চল্য চেপে রাখতে পারছিনে। বেরিয়ে পড়লুম, তখনও পুরো একঘণ্টা সময় বাকি। বাইরে দমকা হাওয়া ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় আলো জ্বলছে। অন্ধকারটা সমুদ্রের মতো নীল আর 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর বাড়িটিকে দেখাচ্ছে একটা ভাসমান যুদ্ধজাহাজের মতো। এক লাফে জাহাজে গিয়ে বসলুম। রোজা বলল, 'হ্যালো রবার্ট!'

আমি বললুম, 'এখানে কি করছ? এখনও বেরোওনি যে?'

'এখনও সময় হয়নি।'

এলয়স্ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ক পেগ?'

'তিন পেগ।'

রোজা বলল, 'পরিমাণটা একটু বেশি হচ্ছে না?'

ঢকঢক করে খানিকটা রাম্ গলায় ঢেলে দিয়ে বললুম, 'একটু কড়া জিনিস না হলে আর চলছে না।'

রোজা বলল, 'একটু কিছু বাজাও না?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'আজকে বাজাতে মন যাচ্ছে না। বড্ড ঝোড়ো হাওয়া। তোমার বাচ্চা কেমন?'

রোজার সোনা-বাঁধানো দাঁতে হাসি ফুটে উঠল। 'ভালোই আছে। কালকে

একবার দেখতে যাব। এ হপ্তাটায় মন্দ কামাইনি। লোকের গায়ে বসন্তের আমেজ লেগেছে কিনা। বাচ্চার জন্য একটি নতুন কোট কিনেছি, লাল উলের।'

'লাল উলের? ওটাই তো আজকাল ফ্যাশান।'

রোজা খুব খুশি। বলল, 'বব্, তুমি মেয়েদের মন রাখতে জানো।'

বললুম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এস এক সঙ্গে একটু পান করা যাক। তোমাকে কি দিতে বলব—আনিসেৎ?'

রোজা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। এলয়স্ দুগ্লাশ এনে দিল, দুজনে গ্লাশে-গ্লাশে ঠোকাঠুকি করলুম।

'আচ্ছা রোজা, ভালোবাসা সম্বন্ধে সত্যি-সত্যি তোমার কি ধারণা? এসব বিষয়ে আমাদের চাইতে তুমি নিশ্চয় বেশি বোঝ।'

রোজা খিলখিল করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসতেই লাগল। তারপরে বলল, 'হুঁ, তুমিও যেমন, এত কথা থাকতে ভালোবাসার কথা জিগগেস করছ? তোমাকে কি বলব—হতভাগা আর্থারের কথা মনে পড়লে এখনও আমার শরীর অবশ হয়ে আসে। একটা কথা তোমাকে বলছি বব্, ভেবে দেখো—জীবনটা বড় দীর্ঘ, আর ভালোবাসা বড় ক্ষণস্থায়ী। আর্থার যখন আমাকে ছেড়ে চলে যায় তখন এ কথাই বলেছিল। কিছু মিথ্যে বলেনি। সত্যি, ভালোবাসার মতো এমন জিনিস আর নেই, কিন্তু কারো-কারো ধাতে বেশিদিন সয় না। ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আর যে পড়ে থাকে, শূন্য মনে গুমরে মরা ছাড়া তার উপায় কি?'

বললুম, 'ঠিকই বলেছ। অপরদিকে আবার ভেবে দেখ, যে ভালোবাসা পায়নি সে বেঁচেও মরে আছে।'

রোজা বলল, 'আমি যা করেছি তাই কর। চাই একটি সন্তান। ব্যস্ আর চিন্তা কি? ভালোবাসার সামগ্রীও পেলে, মনে শান্তিও পেলে।'

'কথাটা মন্দ বলনি, তবে কিনা সে সুযোগ এখনও ঘটেনি।'

রোজা আপন মনে কি ভাবছে। হঠাৎ বলল, 'আর্থারের হাতে কত মার কত লাথি খেয়েছি। তবু এখনও যদি ফিরে আসে, ফেল্ট হ্যাট্‌টি মাথায়—কি বলব তোমায়, ভাবলেই কান্না পেয়ে যায়।'

বললুম, 'বেশ, আর্থারের স্বাস্থ্য কামনা করেই পান করা যাক।'

রোজা হেসে বলল, 'আচ্ছা, মুখপোড়া মিনসের স্বাস্থ্য কামনাই করছি!'

গ্লাশটি নিঃশেষ করে বললুম, 'আসি রোজা। আজকে ভালো রোজগার হোক।'

'এসো বব্।'

দরজায় শব্দ পেয়েই প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান বলে উঠল, 'হ্যালো, তোমাকে যে বড় চিন্তামগ্ন দেখছি!'

'কই না তো। কেমন আছ তুমি, শরীর ভালো তো? কি হয়েছিল?'

'এমন কিছু না, সামান্য সর্দি-জ্বর।'

ওকে দেখে বাস্তবিক রোগা মনে হচ্ছে না। বরং চোখ দুটি আগের চাইতে অনেক বড় এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মুখে ঈষৎ লালচে আভা, আর হাবভাব ভাবেভঙ্গিতে বনের প্রাণীর মতো একটি স্বভাবলালিত্য চোখে পড়ে।

বললুম, 'তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। শরীর তো দিব্যি সেরে গেছে দেখছি। বেশ প্রাণভরে আজ ফুর্তি করা যাবে।'

বলল, 'তা যেত বৈকি। কিন্তু আজ হবে না, আজ আমি পারব না।'

ওর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

'এঁ্যা! পারবে না বলছ?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু আজকে হয় না।'

আমি তখনও ওর কথা বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছিলুম আমার সঙ্গে যেতে ওর আপত্তি নেই তবে ওখানটায় যেতে আপত্তি আছে। 'তুমি মিছামিছি এসে ফিরে যাবে, তাই কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়েছ।'

এতক্ষণে বুঝলুম। বললুম, 'তাহলে সত্যি তুমি আসছ না? সারা সন্ধ্যায় তোমার সময় হবে না?'

'না, আজকে না। একজনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, খুব জরুরী দরকার। আগে জানা ছিল না, মাত্র আধঘণ্টা আগে জানলুম।'

'সেটা কাল পর্যন্ত মুলতুবি থাকতে পারে না? আমার সঙ্গে আগে থাকতে ঠিকঠাক ছিল কিনা?'

ঈষৎ হেসে বলল, 'না, সে হয় না ব্যাপারটা বড্ড জরুরী।'

সব ভণ্ডুল করে দিল। এমন যে ঘটতে পারে আমি ভাবতেই পারিনি। ওর একটি কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। জরুরী কাজ? কই চেহারায় তো জরুরী কাজের কোনো নিশানা নেই। ওটা বোধহয় একটা বাজে ওজর। বোধহয় কেন? নিশ্চয়। সন্ধ্যাবেলায় কখনো কেউ জরুরী দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে? সকালবেলা হল ওসবের প্রশস্ত সময়। তা ছাড়া, আধঘণ্টা আগেও জানা ছিল না, এমন কখনো হয়? আসল কথা ওর যাবার ইচ্ছে নেই, সোজাসুজি বললেই

হয়। মনে-মনে খুবই হতাশ হলুম, নিতান্ত শিশু তার নিজের ইচ্ছায় বাধা পেলে যেমনটা হয় তেমনি। কত আশা করে যে এই সন্ধ্যাটির দিকে চেয়ে ছিলুম এখন তা পুরোপুরি বুঝতে পারছি। মনের হতাশাটা ওর সামনে প্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল না। পাছে ও বুঝে ফেলে এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করছিলুম। বললুম, 'বেশ, তাহলে তো আর কিছু করবার নেই। আসি, পরে দেখা হবে।'

ও একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'অত কিছু আমার তাড়া নেই। ন'টার আগে ওখানে যাচ্ছিনে। ততক্ষণ দুজনে একটু বেড়িয়ে আসতে পারি। পুরো এক হপ্তা ঘর থেকে বেরোইনি।'

একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই বললুম, 'বেশ চল।' মনে একটুও উৎসাহ নেই। রাস্তা দিয়ে দুজনে হেঁটে চলেছি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। সামনেই একটা ঘাসে ঢাকা জমি, অন্ধকারে এখানে-ওখানে গাছ, ঝোপ দেখা যাচ্ছে।

প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'লাইলাক্, না? হ্যাঁ, লাইলাকের গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু কেমন করে হবে? এখন তো লাইলাক্ ফোটবার কথা নয়।'

আমি বললুম, 'আমি গন্ধ-টন্ধ কিছুই পাচ্ছি না।'

রেলিঙের উপরে একটু ঝুঁকে ও বলল, 'আমি ঠিক পাচ্ছি।'

অন্ধকারে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠল, 'আজ্ঞে, ওটা ডাফনে ইণ্ডিকা।' সরকারী তকমা-লাগানো টুপি মাথায় একটা লোক গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সরকারী বাগানের মালি হবে। একটু টলতে-টলতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। পকেট থেকে একটি বোতলের ঘাড় অবধি বেরিয়ে আছে। বলল, 'আজকেই এনে লতাটা এখানে লাগিয়েছি। ঐ যে ওখানটায়—' কথা বলতে বলতে লোকটা ঢেকুর তুলছে।

মালিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান আমার দিকে ফিরে বলল, 'এখনও গন্ধটা পাচ্ছ না?'

আমার মেজাজ তখনও বিগড়ে আছে। বললুম, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি বৈকি, চমৎকার ব্র্যাণ্ডির গন্ধ পাচ্ছি।'

আসলে কিন্তু অন্ধকারে সত্যি চমৎকার একটি মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু তাই বলে ওর কাছে সে কথা স্বীকার করতে কিছুতেই রাজী নই। সঙ্গিনী হেসে গন্ধটা একবার জোরে নাকে টেনে নিল। বলল, 'কয়েকদিন ঘরে বন্ধ থাকলে

বাইরেটা এমন চমৎকার লাগে ! কি মুশকিল, এক্ষুনি আবার ফিরে যেতে হবে।
বিন্‌ডিং লোকটাই এই রকম—সব সময়ে এসে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো লাগাবে।
ও ইচ্ছে করলেই কালকে ব্যবস্থা করতে পারত।'

আমি জিগগেস করলুম, 'ও, বিন্‌ডিং-এর সঙ্গে নাকি তোমার কাজ ?'

'হ্যাঁ, বিন্‌ডিং আর তার সঙ্গে আর একজন আছে। ঐ আর একজনের সঙ্গেই আসল কাজ। কাজটা সত্যিই জরুরী—তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার নাকি ?'

'না, আমি কেমন করে আন্দাজ করব।'

ও একটু হেসে আবার কথা বলতে লাগল। কিন্তু ওর কথা আমার কানেই ঢুকছে না। আমি ভাবছি বিন্‌ডিং-এর কথা। ওর নামটা ইলেকট্রিক শকের মতো আমাকে লেগেছে। অবিশ্যি আমার ভাবা উচিত ছিল যে আমার চাইতে বিন্‌ডিংকেই ও বেশি ভালো করে জানে। বিন্‌ডিং বলতে আমি শুধু ভাবছি তার মস্ত বড় চকচকে বুইক্ গাড়ির কথা, পরনে দামী স্যুট্ আর পকেটে ইয়া মোটা ভারি ওয়ালেট্। হায়রে, আমার পুরোনো নোংরা ঘরটাকে এত করে কার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিলুম। হেসির টেবিল ল্যাম্প্ জালেওয়াস্কির আরাম-কেদারা কার জন্যে ধার করেছিলুম। এই মেয়ে কি কখনো আমার হতে পারে ? কেনই বা হবে ? ধার করা ক্যাডিলাক্ নিয়ে চাল দিলে কি হবে, আসলে তো আমি ভবঘুরে পথিক। গুণের মধ্যে গেলাশের পর গেলাশ রাম উড়িয়ে দিতে পারি। এ ছাড়া আর কি ? আমার মতো লোক এমন কত গণ্ডায়-গণ্ডায় রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পাওয়া যায়। ওদিকে মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ফ্যাসানেবল্ হোটেলের দারোয়ান ঝুঁকে পড়ে বিন্‌ডিংকে সেলাম করছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ, সিগারেটের ধোঁয়া, তকতকে ঝকঝকে স্ত্রীপুরুষের দল। গান বাজনা হাসি তামাশার অন্ত নেই, বোধ করি আমাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা। ভাবলুম যত শিগগির পারি সরে পড়াই ভালো। আশার ছলনে ভুলি—থাক ঢের হয়েছে। গোড়াতেই নিজেকে জড়ানো ভুল হয়েছে। এখন সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান বলল, 'কালকে রাত্তিরে আমাদের দেখা হতে পারে।'

আমি বললুম, 'কালকে সন্ধ্যায় আমার সময় হবে না।'

'তাহলে পরশু কিম্বা এ সপ্তাহের যে কোনোদিন। আসচে কদিন আমার হাতে কোনো কাজ নেই।'

বললুম, 'নাঃ, সে হবার জো নেই। আজকেই আমরা একটা জরুরী কাজ পেয়েছি। এই গোটা সপ্তাহটা তাই নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে।'

আসলে সবই মিথ্যে, তবু মিথ্যে না বলে পারলুম না। ভিতরে-ভিতরে রাগ আর অপমানের লজ্জা কিছুতেই চাপতে পারছিলুম না।

ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললুম। রাস্তাটা সোজা কারখানার দিকে চলে গেছে। দূর থেকে দেখলুম 'ইনটারন্যাশনাল' থেকে বেরিয়ে রোজা আমাদের দিকেই আসছে। একবার ভাবলুম আর একদিকে ঘুরে যাই, অন্যদিন হলে বোধকরি তাই করতুম। কিন্তু আজকে তা না করে ওর দিকেই এগিয়ে গেলুম। রোজা সম্পূর্ণ অপরিচিত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাল। এটাই ওদের দস্তুর। সঙ্গে কেউ থাকলে ওরা কখনো দেখাবে না যে আপনাকে চেনে। আমিই কথা বললুম, 'নমস্কার রোজা।' থতমত খেয়ে ও একবার আমার দিকে তাকাল, একবার প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান-এর দিকে। তারপর কোনো রকমে প্রতি-নমস্কার করে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। তার কয়েক পা পিছনেই ঠোঁটে রঙ মেখে কোমর দুলিয়ে একটা হাতব্যাগ ঝোলাতে-ঝোলাতে আসছিল ফ্রিত্সি। সেও নির্বিকার চোখে একবার আমার দিকে তাকাল। আমি এবারও গায়ে পড়ে বললুম, 'এই, যে ফ্রিত্সি।'

ও গম্ভীরভাবে একটু মাথা নাড়ল। খুব যে অবাক হয়েছে ভাবে ভঙ্গিতে তা একটুও প্রকাশ করল না। কিন্তু আমাদের পাশ কাটিয়ে গিয়েই খুব দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলো। বেশ বুঝতে পারলুম আমার বিষয় নিয়ে রোজার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ইচ্ছা করলেই পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়তে পারতুম। কারণ এদের দলের বাকি সবাইও এখন এই পথেই আসবে। ওদের রাস্তা সফরের এই আসল সময়। কিন্তু আমার কেমন জেদ চেপে গেল—সোজা রাস্তাতেই চলতে লাগলুম। এদের মিছিমিছি এড়াতে যাব কেন? আমার এই সঙ্গিনীটির চাইতে ওদেরই তো আমি বেশি করে জানি। ও তা দেখুক, বুঝুক।

ঐ তো লাইট-পোস্ট্‌গুলোর পাশ দিয়ে সার বেঁধে ওরা আসছে—সুন্দরী ওয়ালী ছিমছাম ছিপছিপে চেহারা; কাঠের পা লাগানো লীনা; ছেলেমানুষ মতো ম্যারিয়ন্; মার্গট—গালদুটি টুকটুকে লাল; সঙ্গে-সঙ্গে ফুলবাবু কিকি। সবার পিছনে আসছে বুড়ি মিমি প্যাঁচার মতো দেখতে। কাছে আসতে ওদের প্রত্যেকের সঙ্গেই এক-আধটা কথা বলে আলাপ করলুম। শেষটায় সেই বাড়িউলি বুড়ি মা'র খাবারের দোকানে এসে খুব খাতির করে তার সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করলুম। প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান বলল, 'এদিকটাতে দেখছি তোমার অনেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে।'

আমি নির্বিকার ভাবে বললুম, 'হ্যাঁ, তা আছে বই কি।'

ও একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। খানিক পরে বলল, 'এবার ফিরলে হয়।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলুম।'

ফিরে এসে ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়ালুম। বললুম, 'আচ্ছা তবে আসি। আশা করি রাত্তিরটা বেশ ফুর্তিতে কাটবে।'

ও জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চেষ্টা করে চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়েছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর দিকেই তাকাতে হল। অবাক হয়ে দেখি ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা, চোখে কৌতুকের আভাস। বোধকরি কয়েক মুহূর্ত হবে, তারপরে ও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। বলল, 'তুমি একটি খোকা, একেবারে কচি খোকা।'

আমি হতবাক হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। কি বলব খুঁজে পাচ্ছি না, 'হ্যাঁ, তা--বেশ তবে—' তারপরে হঠাৎ অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বললুম, 'আমাকে বুঝি খুব বোকা-বোকা মনে হচ্ছে?'

'তা সে-রকম বলা যেতে পারে বই কি।'

ওকে কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে। মুখের উপরে রাস্তার আলো এসে পড়েছে; কচি টলটলে মুখখানি, ভারি সুন্দর! হঠাৎ এক পা এগিয়ে ওকে একেবারে বুকে টেনে আনলুম। ও যা ইচ্ছে ভাবুক গিয়ে কেয়ার করিনে। ওর রেশমের মতো চুল আমার গালে এসে পড়েছে, ওর মুখ প্রায় এসে আমার মুখে লেগেছে, পিচ্ ফলের মতো গায়ের একটি মৃদু গন্ধ পাচ্ছি; মুহূর্তের জন্য ওর ঠোঁট দুটি আমার মুখে এসে লাগল।

অকস্মাৎ কি যে হয়ে গেল বুঝে উঠবার আগেই দেখি ও ভিতরে চলে গিয়েছে। আস্ত একটি গাধার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মুখ দিয়ে অজান্তে দুটি কথা বেরিয়ে এল, 'কি কাণ্ড!'

যে পথে এসেছিলুম সে পথেই আবার ফিরে চলেছি। হাঁটতে-হাঁটতে এলুম বুড়ি-মা'র সেই সসেজ্-এর দোকানে; হাসি মুখে বললুম, 'বেশ বড় দেখে একটি সসেজ্ দাও তো।'

বুড়ি বলল, 'সঙ্গে রাই দেব?'

'হ্যাঁ, বেশ খানিকটা রাই দাও।' খুব তৃপ্তির সঙ্গে সসেজটি খেলুম।

এলয়সকে দিয়ে 'ইনটারন্তাশনাল' থেকে এক গ্লাশ বিয়ার আনিয়ে নিলুম।
গ্লাশে চুমুক দিয়ে বললুম, 'মানুষ বড় অদ্ভুত জীব, কি বল বুড়ি মা ?'
বুড়ি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলল, 'যা বলেছ ! এই দেখো না কালকে এক ভদ্রলোক এসেছিল, রাই সমেত দুটি ভিয়েনা সসেজ্ খেয়ে আর পয়সা দিতে পারে না ; পকেটে কিচ্ছু নেই। কি করি, রাত হয়ে গেছে অনেক, ধারে-কাছে লোকজন নেই। অমনিই ছেড়ে দিতে হল। না দিয়ে উপায় কি ? তারপরে, বললে বিশ্বাস করবে না, আজকে ভদ্রলোক এসে হাজির। পুরো দাম তো দিলই, উপরন্তু কিছু বখশিশও দিয়ে গেল।'
'আশ্চর্য তো। লড়াইয়ের আগে এসব ছিল, এখন তো ভাবাই যায় না। যাকগে, এমনিতে ব্যবসার অবস্থা কেমন ?'
'ভালো না। কালকে বিক্রির মধ্যে হয়েছে সাতটি ভিয়েনা সসেজ আর ন'টি দেশী সসেজ্। মেয়েগুলো না থাকলে কোনদিন ব্যবসা শিকেয় তুলতে হত।'
মেয়েগুলি মানে পেশাদার মেয়ের দল। এরা বুড়ি-মা'র ব্যবসায় যথাসম্ভব সাহায্য করে। কোনো রকমে শিকার জোটাতে পারলেই কাপ্তেনটিকে বুড়ির দোকানে নিয়ে আসে। সেখানে বসে সসেজ্ খায়। তাতেই বুড়ির ব্যবসা টিকে আছে।
বুড়ি-মা বলল, 'এই তো গরম এসে গেছে। শীতের সময়টা ভালো। বৃষ্টিতে, বাদলে, শীতে—পোশাক-পরিচ্ছদ যেমনই হোক না মেয়েগুলো শিকার জোটাতে পারে।'
বললুম, 'দাও তো আমাকে আর একটা সসেজ্ ! আজকে দিলটা বেশ খুশ আছে। তারপরে, বাড়ির খবর কি ?'
বুড়ি তার জলজলে দুই চোখ মেলে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, 'বরাবরকার যা খবর তাই। এই তো সেদিন বিছানাপত্তর সব দিয়েছে বিক্রি করে।'
বুড়ি বে-থা করেছিল। বছর দশেক আগে ওর স্বামী ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে যায়। গাড়ির চাকা চলে গিয়েছিল ওর পায়ের উপর দিয়ে, দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হয়েছিল। ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে ওর এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। পঙ্গু হওয়ার ফলে ওর মনে বিষম দাগা লেগেছিল। বোধ করি সেই জন্যই পঙ্গু হয়ে অবধি আর স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেনি। তা ছাড়া আবার হাসপাতালে থাকতে আফিং-এর অভ্যাস করেছিল, তাতে আরো খারাপ হয়েছে। আস্তে-আস্তে ও গিয়ে হোমো-সেক্সুয়েলদের দলে ভিড়েছে। আশ্চর্য, যে লোকটা জীবনের

পঞ্চাশ বছর সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছে, সে এখন সারাদিন ফচ্‌কে ছোঁড়াদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিকে তার আফিং-এর পয়সা অপরদিকে ছোকরার পয়সা জোটাবার জন্য ও হাতের কাছে যা পায়—তাই বিক্রি করে দেয়। বুড়ি কিন্তু ওকে ছাড়েনি। ও বুড়িকে গালমন্দ দেয়, কখনো-কখনো মারধরও করে। বুড়ি কিচ্ছু বলে না, প্রতিরাত্রে ভোর চারটে অবধি—ছেলেকে সঙ্গে করে এখানটায় দাঁড়িয়ে সসেজ বিক্রি করে। দিনের বেলায় আবার লোকের বাড়িতে বাসন মাজা কিম্বা কাপড় ধোয়ার কাজ করে। তার উপরে কি একটা অসুখ আছে, বরাবর তাতে ভোগে। রুগ্ন চেহারা, ওজন নব্বুই পাউণ্ড-এর বেশি হবে না। অথচ যখনই দেখা হবে, মুখের হাসিটি লেগেই আছে। বলে, 'মন্দ কি, ভালোই আছি।' কখনো-কখনো ওর স্বামীর যখন খুব মন খারাপ হয়ে যায়—তখন ওর কাছে এসেই কান্নাকাটি শুরু করে। বুড়ি ওতেই খুশ।

আমাকে জিগগেস করল, 'তুমি সেই যে ভালো চাকরিটি পেয়েছিলে, সেটি আছে তো?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ, বুড়ি-মা, এখন ভালোই আছি। বেশ দু-পয়সা রোজগার করছি।'

'দেখো—চাকরিটি আবার ছেড়ে-টেড়ে দিও না।'

'না, বুড়ি-মা, তা কি দিই?'

বাড়ি ফিরে এলুম। হল-এ ঢুকেই দেখি আমাদের রান্নাঘরের ঝি ফ্রিডা দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলুম ওকে একটা মিষ্টি কথা বলি, 'এই যে ফ্রিডা, সত্যি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।'

বেশ খানিকটা ভিনিগার গিলে ফেললে মুখের চেহারা যেমন হয়, ফ্রিডা তেমনি মুখভঙ্গি করল।

আমি বললুম, 'সত্যি বলছি তোমাকে, নিত্য-নিত্য ঝগড়া করে কি লাভ? একেই তো জীবনটা অল্পদিনের, তার উপর আবার কত বিপদ, কত বিঘ্ন। আজকাল মিলে-মিশে না থাকলে চলে না। এস ফ্রিডা, আমাদের পুরোনো ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি।'

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলুম, ও তা গ্রাহ্যই করল না। বিড়বিড় করে কি বলতে-বলতে সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জর্জ ব্লক-এর ঘরে গিয়ে কড়া নাড়লুম। দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো

দেখা যাচ্ছে। ও নিশ্চয় পড়া মুখস্থ করছে। বললুম, 'এস জর্জ, খাবে চল।' ছেলেটা রুগ্ন ফ্যাকাশে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমার খিদে নেই।'

ওকে খেতে বললেই ও ভাবে ওকে করুণা করা হচ্ছে। সেজন্যে প্রায়ই আসতে চায় না। বললাম, 'এসে একবার দেখেই যাও। মিছিমিছি আমার খাবারগুলো নষ্ট হবে। এস ভাই, লক্ষ্মীটি।'

করিডর দিয়ে দুজনে যাচ্ছি। দেখলুম আন্না বোনিগ-এর ঘরের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করা। হেসিদের ঘরের কাছে আসতেই খুট করে একটু শব্দ হল, দরজাটি কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল। মনে-মনে বললুম, ও বুঝেছি, বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কাল্পনিক বোনটিকে দেখবার জন্যে উদগ্রীব প্রতিক্ষায় বসে আছে। আমার ঘরে একটা প্রচণ্ড আলো জ্বলছে—তার উপরে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ঝালর-দেওয়া আর্ম-চেয়ার মিলে ঘরের চেহারা গিয়েছে বদলে। টেবিলের উপরে হেসিদের ল্যাম্পটি শোভা পাচ্ছে। তাছাড়া টেবিলে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সাজানো—একটি আনারস, সসেজ্, হ্যাম্, শেরির বোতল ইত্যাদি—

জর্জকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দরজায় টোকা পড়ল। ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি। জর্জকে কানে-কানে বললুম, 'একটা মজা দেখবে?—হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির প্রবেশ। মুখে-চোখে অদম্য কৌতূহল। পোশাকটা দেখবার মতো—যে কোনো ডিউক-পত্নীকে হার মানাতে পারে। সেকালের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো—লেসের পোশাক, ঝালর-দেওয়া শাল গায়ে, দামী ব্রোচ্ তাতে মৃত জালেওয়াস্কির ফটো আঁটা। মুখে অতি মিষ্টি একটি হাসি। ঘরে ঢুকেই হাসিটি এক ফুৎকারে নিবে গেল। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে হতভম্ব জর্জের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এদিকে আমার বিষম হাসি পেয়ে গেছে—একেবারে হো হো করে হেসে উঠলুম। ও তন্মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। শ্লেষের ভঙ্গিতে বলল, 'আহা, বোনের আসা পিছিয়ে গেল বুঝি?'

'হ্যাঁ ভাই।' আমি তখনও ওর বিচিত্র সাজটাই দেখছি। বাবাঃ, অতিথিটি যে আসেনি খুব রক্ষে!

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি আমার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'খুব হাসতে শিখেছ দেখছি। আমি তো বলি মানুষের বুকে যেখানটাতে হার্ট থাকে তোমার সেখানটাতে আছে একটি রাম্-এর বোতল।'

বললুম, 'কথাটা বেশ রসিয়ে বলেছ। কিন্তু ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, আপত্তি না থাকে তো আসুন বসে পড়া যাক—'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। শেষ পর্যন্ত বোধকরি কৌতূহলই জয়ী হল—দেখা যাক না রহস্যময়ী ভগ্নীটি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় কিনা। আমি ততক্ষণ শেরির বোতল খুলতে বসে গেলুম।

সমস্ত বাড়ি যখন নিঝুম হয়ে গেছে তখন আমার কোট এবং কম্বলটি হাতে করে পা টিপে-টিপে টেলিফোনটির কাছে গেলুম। টেবিলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এক হাতে রিসিভারটি তুলে নিলুম আর এক হাতে কোট এবং কম্বল মাথার উপর চাপিয়ে বেশ করে মুখ ঢেকে নিলুম। উদ্দেশ্য, আমার কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। আমাদের এই বোর্ডিং-হাউসটিতে সকলেরই শ্রবণেন্দ্রিয় একটু বেশি রকম তীক্ষ্ণ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান ঘরেই রয়েছে। জিগগেস করলুম, 'তোমার ইন্টারভিউ হয়ে গেল? কতক্ষণ ফিরেছ?'

'এই ঘণ্টাখানেক হল।'

'আঃ, দেখ তো আগে জানলে—'

ও হেসে উঠল। 'না, লাভ কিছু হত না। আমি শুয়ে পড়েছি। একটু জ্বর-জ্বর বোধ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ভালোই করেছি।'

'জ্বর? কি রকম জ্বর?'

'আর বল কেন? ভোগাবে দেখছি। যাকগে, সারা সন্ধ্যা তুমি কি করলে?'

'কি আর করব? আমার ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে খানিকক্ষণ দুনিয়াদারির গল্প হল। তারপর, তোমার কাজ হল তো?'

'আশা করি হয়েছে।'

এদিকে নাক মুখ কম্বল চাপা দেওয়াতে আমার ভীষণ গরম লাগছে। কাজেই ওদিক থেকে মেয়েটি যখনই কথা বলছে আমি সেই ফাঁকে কম্বল সরিয়ে একটু বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিচ্ছিলুম। আর নিজে কথা বলবার সময় আবার কম্বল চাপা দিয়ে নিচ্ছি।

জিগগেস করলুম, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কারো নাম রবার্ট নেই?'

ও হেসে ফেলল, 'মনে তো হচ্ছে না।'

'কি দুঃখের কথা! ও নামটা তোমার মুখে শুনতে ভারি ইচ্ছে করছে। সত্যি, একবার বল না শুনি।' ও আবার হেসে উঠল।

আমি বললুম, 'না হয় ঠাট্টা করেই বল। ধর, যদি বল—রবার্ট একটি আস্ত গাধা।'

'উহুঁ, রবার্ট একটি খোকা, চিরকাল খোকাই যেন থাকে—'

বললুম, 'আঃ, চমৎকার উচ্চারণ তোমার। আচ্ছা, এবার তা হলে বল তো বব্। এই যেমন—বব্ একটি—'

'বব্ একটি মাতাল।'—খুব আস্তে খুব ধীরে, অনেক দূর থেকে যেন গলার স্বর ভেসে আসছে। 'না, এবার আমি ঘুমোব—একটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, মাথা ঝিম-ঝিম করছে—'

'বেশ, শুভরাত্রি—এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও—'

রিসিভারটি রেখে দিয়ে মাথার উপর থেকে কোট আর কম্বলের বোঝাটি নামিয়ে নিলুম। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে চমকে উঠে দেখি ঠিক আমার পিছনে ভূতের মতো একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে! কে ও? আরে, এ যে সেই বৃদ্ধ অ্যাকাউনট্যাণ্ট ভদ্রলোক, আমাদের রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে থাকেন। বিরক্তি চাপতে না পেরে বিড়বিড় করে কি একটা বলে ফেললুম।

ভদ্রলোক হেসে বলল, 'এই যে নমস্কার—'

'নমস্কার,' কিন্তু মনে-মনে ওর মুণ্ডপাত করছিলুম।

ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে বলল, 'না, আমি কাউকে—রাজনৈতিক কথাবার্তা তো?'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'কি বলছেন?'

ও চোখ ঠেরে বলল, 'আপনার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি একেবারেই দক্ষিণপন্থী—বলছিলাম আপনাদের কথাবার্তাটা নিশ্চয় রাজনীতি-বিষয়ক।'

এতক্ষণে ওর কথা বুঝলুম। হেসে বললুম, 'হ্যাঁ, রাজনীতি বৈকি, খুব গোপন রাজনীতি।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলল, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।'

বললুম, 'সাবাস! কিন্তু আপনাকে একটা কাজের কথা জিগগেস করছি। টেলিফোন কে আবিষ্কার করেছিল বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে টাক মাথা চুলকাতে লাগলেন।

আমি বললুম, 'আমিও ছাই জানিনে। কিন্তু মশাই, যেই করে থাকুক অসাধারণ মানুষ বলতে হবে—'

নবম পরিচ্ছেদ

রবিবার। আজকে সেই মোটর রেসের দিন। গত সপ্তাহটায় রোজ কোষ্টার রেসের মহড়া দিয়েছে। তারপরে রাত্তিরে আমরা কার্লকে নিয়ে বসতুম। অনেক রাত অবধি কাজ করতুম। প্রত্যেকটি স্ক্রু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতুম, তেল মাখাতুম, কলকব্জায় কোথাও কোনো গলদ যাতে না থাকে। এখন আমরা রেস্-গ্রাউণ্ডে আমাদের পিট্-এ বসে আছি, কোষ্টারের অপেক্ষায়—ও গিয়েছে স্টার্ট নেবার জায়গাটা দেখে আসতে।

আমরা সবাই আছি—গ্রাউ, ভ্যালেন্টিন্, লেন্ত্স, প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান—তাছাড়া আছে জাপ্। জাপ্-এর গায়ে কোর্তা, চোখে গগল্স, মাথায় হেল্মেট। ও থাকবে কোষ্টার-এর পাশে, ছোটখাটো পাতলা মানুষটি বলে ওকেই নেওয়া স্থির হয়েছে। তবু লেন্ত্স-এর ভাবনার অন্ত নেই। বলছে, 'ওর যা লম্বা-লম্বা কান, বাতাস আটকাবে। গাড়ির স্পীড্ কমসে কম কুড়ি কিলোমিটার কমে যাবে। চাই কি, গাড়ি এরোপ্লেনের মতো উপরের দিকেও উঠে যেতে পারে।'

প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যান বসেছে গট্ফ্রিডের পাশে। গট্ফ্রিড্ জিগগেস করল, 'তোমার ইংরেজি নাম কোত্থেকে এল?'

'আমার মা ছিলেন ইংরেজ। ওঁরও এই নাম ছিল—প্যাট্।'

'আহা, প্যাট্ সে তো খুব ভালো নাম, অনেক সহজে উচ্চারণ করা যায়।'

লেন্ত্স একটি বোতল এবং গ্লাশ বের করে বলল, 'তাহলে এস প্যাট, আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী হোক। ভালো কথা, আমার নাম হচ্ছে গট্ফ্রিড্।'

আমি তো অবাক। সেই কতকাল ধরে আমি প্রকাণ্ড একটা জবড়জং নাম আউড়ে বেড়াচ্ছি আর ও কিনা দিন-দুপুরে এতখানি অন্তরঙ্গতা পাতিয়ে নিল! একটু লজ্জা করল না, মুখের রঙ এতটুকু বদলাল না। মেয়েটিও তাই, দিব্যি হেসে চলে সত্যি-সত্যি ওকে গট্ফ্রিড্ বলে ডাকতে শুরু করে দিল। ওদিকে ফার্ডিনাণ্ড

গ্রাউ আরো এক ডিগ্রি চড়া। ও তো রীতিমতো পাগলামি শুরু করেছে, ওর দিক থেকে আর চোখ ফেরাচ্ছে না। এক ধার থেকে শুরু করে কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে আর কেবলই বলছে ওকে ছবি আঁকা শিখতেই হবে। নিজে তো তক্ষুনি ছবি আঁকতে বসে গেল।

আমি ওর হাত থেকে ছবি আঁকার প্যাডটা ছিনিয়ে নিয়ে বললুম, 'দেখ ফার্ডিনাণ্ড, বরাবর তোমার মরা-মানুষ নিয়ে কারবার। যত ইচ্ছে তাদের ছবি আঁক ; কিন্তু জ্যান্ত মানুষ নিয়ে আবার টানাটানি কেন ? আর তোমাকে বলেই রাখছি—ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতাই আছে।'

মাঠ-ভর্তি মোটরের ঝক্ঝকানি মেশিন-গানের আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে। গ্রিজ্, পেট্রল, ক্যাস্টর-অয়েল-এর গন্ধে চারিদিক ভরে গিয়েছে। গন্ধটার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে, এঞ্জিনের শব্দের মধ্যে তো আছেই।

যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে মোটর মিস্ত্রীর দল পিট্-এ বসে আছে, চ্যাচামেচি করছে। আমাদের সঙ্গে সরঞ্জাম যৎসামান্য। কিছু হাতিয়ার, প্লাগ, কয়েকটা বাড়তি চাকা, টায়ার আর ছোটখাটো কিছু মোটরের পার্টস—চেনাজানা এক কোম্পানি থেকে যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে তাই। অন্যদের মতো কোষ্টার কোনো ফার্মের তরফ থেকে রেস্-এ যোগ দেয়নি কিনা, কাজেই আমাদের সব খরচা নিজেদেরই বইতে হচ্ছে। তহবিল যৎসামান্য বলে সরঞ্জাম বিশেষ কিছুই জোটাতে পারিনি।

অটো এতক্ষণে ফিরে এল। ওর পিছনে ব্রাউমুলার। ব্রাউমুলার অটোকে ডেকে বলছে, 'আমার প্লাগগুলো যদি শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকে তবে আর আজকে তোমার আশা নেই।'

কোষ্টার বলল, 'বেশ, এক্ষুনি দেখা যাবে।'

ব্রাউমুলার হাত পা নেড়ে বলল, 'একবার আমার গাড়িখানার দিকে তাকিয়েই দেখ—' নতুন ঝক্ঝকে একখানা গাড়ি, বেশ মজবুত দেখতে। ব্রাউমুলারের গাড়িটাই আজকের ফেভারিট। বেশির ভাগ লোকই ভাবছে ও-ই জিতবে।

লেন্‌ৎস চেঁচিয়ে বলল, 'রোস না, কার্ল ওর জিব বের করিয়ে তবে ছাড়বে, দেখবে এক্ষুনি।'

ব্রাউমুলার দাঁত মুখ খিঁচে খুব চোস্ত ভাষায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের পাশে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান-এর উপর নজর পড়াতে তাড়াতাড়ি

মুখের জবাবটা হজম করে নিল। চোখ বড়-বড় করে বোকার মতো হাসতে হাসতে অন্যদিকে চলে গেল।

চারদিক থেকে মোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা। কোষ্টার তৈরি হয়ে নিচ্ছে। কার্লের নাম দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস কার-এর দলে।

হাতিয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'অটো, আমাদের দিয়ে তোমার বিশেষ কিছু সাহায্য হবে না।'

ও হাত নেড়ে বলল, 'দরকারই হবে না। কার্ল একবার যদি বিগড়োয় তো কারখানা ভর্তি হাতিয়ার, যন্ত্র দিয়েও ওকে আর খাড়া করা যাবে না।'

'আচ্ছা, আমরা এখান থেকে কোনো রকম সিগ্‌ন্যাল দেব না? তোমার পজিশনটা যাতে ঠিক বুঝে নিতে পার।'

কোষ্টার মাথা নেড়ে বলল, 'দরকার নেই, আমি নিজেই ঠিক বুঝে নেব। তাছাড়া জাপ্‌ আছে, যা করবার ও ঠিক করবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' জাপ্‌ সোৎসাহে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল। ছোকরা উত্তেজনায় অধীর—মুখে কথা নেই, অনবরত চকোলেট খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যাই করুক স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও বিলকুল বদলে যাবে। তখন ও বিষম গম্ভীর।

'আচ্ছা, তবে এখন ভালোয়-ভালোয় যাত্রা করা যাক।'

আমরা কার্লকে ঠেলে বের করে দিলুম। লেন্‌ত্‌স আদর করে রেডিয়েটারের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'দেখ বাপু, স্টার্টের সময় গোলমাল-টোলমাল করো না। লক্ষ্মী সোনা কার্ল, তোমার বুড়ো বাপকে নিরাশ করো না যেন।'

কার্ল খানিক ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমরা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, পাশের থেকে একটা লোক বলে উঠল, 'বা, বা, দেখ, দেখ, মূর্তিখানা দেখ। আরে ভাই, ওর পিছনটা দেখাচ্ছে ঠিক একটা উটপাখির মতো।'

লেন্‌ত্‌স তিড়বিড় করে উঠল। চোখ মুখ লাল করে বলল, 'কার কথা বলছেন—ঐ সাদা গাড়িটার কথা?'

পাশের পিট্ থেকে ইয়া জাঁদরেল চেহারার একজন মোটর-মিস্ত্রী আর একজনের হাতে বিয়ারের বোতল এগিয়ে দিতে-দিতে খুব নির্বিকার ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ওটার কথাই বলছিলুম।' আর যায় কোথায়? লেন্‌ত্‌স রাগে তোতলাতে শুরু করে দিল, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিকটাতে যেতে চাচ্ছে, এক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত করা চাই। আমি ওকে টেনে সামলে রাখলুম, ধমক দিয়ে বললুম, 'এখন তোমার

'পাগলামি রাখ। চুপ করে এখানটায় বস। রেস্ শুরু হবার আগেই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে হাসপাতালে যেতে চাও নাকি?' কিন্তু ও কি তা শোনে! আমার হাত ছাড়িয়ে যেতে চায়। কার্ল-এর অপমান সে কিছুতেই সইবে না। আমি প্যাট্রিসিয়া হোল্ম্যানের দিকে ফিরে বললুম, 'দেখ না, আহাম্মকের কাণ্ডখানা। ইনি আবার নিজেকে রোমান্টিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন! ওকে দেখলে কে বলবে, ও একবার সত্যি-সত্যি চাঁদের সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখেছিল।'

মুহূর্তে ফল পাওয়া গেল। ওকে কায়দা করবার ওটাই সবচেয়ে সহজ উপায়। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'ও! সে অনেককাল আগের কথা, লড়াইয়ের আগে। তাছাড়া, যাই বল বাপু, রেস্-টেস্-এর সময় অত মাথার ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে এক-আধটু বেসামাল হলে এমন কি দোষ, কি বল প্যাট্?'

'মাঝে-মাঝে কেন, কোনো সময়েই ওটা দোষের নয়।'

গট্‌ফ্রিড্ সেলাম ঠুকে বলল, 'যা বলেছেন, কথার মতো কথা।'

এঞ্জিনের শব্দে আর সব শব্দ তলিয়ে গেছে। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে ছুটেছে একের পর এক গাড়ি। লেন্ৎস চেঁচিয়ে উঠল, 'সেরেছে, একেবারে সব শেষের আগেরটা। হারামজাদা গাড়ি গোড়াতেই বিগড়েছে।'

আমি বললুম, 'কুছ পরোয়া নেই। কার্ল স্টার্ট ভালো নিতে পারে না। একবার সামলে উঠতে পারলে ও মাঝখানে আর বিগড়োয় না।' এঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতেই লাউডস্পিকারের চিৎকার কানে এসে পৌঁছল। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিনে। বার্জার, আমাদের সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, নাকি স্টার্টই নিতে পারেনি।

গাড়িগুলি আবার গর্জন তুলে ঘুরে আসছে। বহু দূর থেকে ওগুলোকে দেখাচ্ছে গঙ্গাফড়িং-এর মতো। যত কাছে আসছে তত বৃহদাকার হয়ে স্ট্যাণ্ড-এর পাশ দিয়ে শাঁ করে মোড় ঘুরে চলে যাচ্ছে। ছটা গাড়ি, কোষ্টার এখনও সব শেষের আগে। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। প্রথম গাড়িটা অন্যগুলোর বেশ খানিকটা আগে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্রায় পাশাপাশি চলছে। তার পরেই কোষ্টার। মোড় ঘোরবার বেলাতেই ও খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও এখন চতুর্থ। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য হঠাৎ বেরিয়ে এল। বাঘের গায়ের ডোরার মতো আলো-ছায়ার ডোরা পড়েছে মাঠের গায়ে। ওদিকে জনতার চিৎকার আর

এঞ্জিনের গর্জনে আমাদের শরীরে উত্তেজনার আগুন ধরে গেছে। লেন্‌ত্‌স আর বসে থাকতে পারছে না, উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে শুরু করেছে। আমারও কোনো দিকে খেয়াল নেই। একটা সিগারেট চিবিয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেললুম। আর প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান ঘোড়ার মতো সশব্দে নিশ্বাস নিচ্ছে আর ফেলছে। কেবল ভ্যালেন্‌টিন্ আর গ্রাউ কোনো রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে চুপটি করে বসে আছে।

দেখতে-দেখতে প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িগুলো আবার ঘুরে এল। আমরা কোষ্টারের দিকে তাকিয়ে আছি ; ও মাথা নেড়ে জানাল টায়ার বদলাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে ও আর একটু এগিয়েছে। তৃতীয় গাড়িটার পিছনের চাকার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে।

'দূর ছাই,' বলে লেন্‌ত্‌স বোতলের মুখ খুলে ঢক-ঢক করে খানিকটা গিলে নিল। আমি প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে বললুম, 'ঐ মোড় ঘোরার মধ্যেই কোষ্টারের কায়দা, ওখানেই ও খানিকটা এগিয়ে নেয়।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'প্যাট্, এই নাও, বোতল থেকে এক ঢোঁক খেয়ে নাও।'

আমি বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকালুম, সেও কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকাল। সঙ্গিনী বলল, 'গ্লাশ থাকলে হত। আমি বোতল থেকে খেতে পারিনে।' লেন্‌ত্‌স গ্লাশ খুঁজতে-খুঁজতে বলল, 'আজকালকার শিক্ষার ঐ তো হচ্ছে মুশকিল !'

গাড়িগুলো আবার যখন ঘুরে এল তখন ব্রাউমূলার সর্বাগ্রে যাচ্ছে। কোষ্টার তৃতীয় গাড়ির পাশে একেবারে সমান-সমান চলছে। বিরাট স্ট্যাণ্ডের ওদিকটাতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্ট্যাণ্ড পার হয়ে যেই বেরিয়ে এল আনন্দে আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তিন নম্বরের গাড়িটা কোথায় গেল ? প্রথম দুটোর পিছন-পিছন কোষ্টার একলাই ছুটে বেরিয়ে গেল। ঐ যে এতক্ষণে আসছে তিন নম্বর খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। পিছনের টায়ার ফেটে গেছে। লেন্‌ত্‌স-এর আনন্দ দেখে কে ! কেমন হল তো। গাড়িটা আমাদের পাশের পিটের সামনে থেমে গেল। সেই জাঁদরেল চেহারার মিস্ত্রীটা হা হতোস্মি করতে-করতে ছুটে গেল। এক মিনিট মাত্র—ব্যস্ গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে।

এর পরের কয়েক রাউণ্ড-এ কোনোই পরিবর্তন হল না, কোষ্টার এখনও তৃতীয় যাচ্ছে। লেন্‌ত্‌স স্টপ্-ওয়াচ রেখে দিয়ে হিসেব-কিতেব করে বলল, 'কার্ল দম আরো কিছু বাড়াতে পারবে।'

আমি বললুম, 'তা বোধ হয় অন্য গাড়িগুলোও পারবে।'

লেন্‌ত্‌স রেগে উঠে বলল, 'কার্ল-এর ভালো তো তুমি দেখতে পার না।'
যখন আর দুটি রাউণ্ড মাত্র বাকি আছে, তখনও কোষ্টার মাথা নেড়ে জানাল টায়ার বদলাবে না। দেখাই যাক না, ভাগ্যে থাকলে এই টায়ারই টিকে যাবে।
শেষ রাউণ্ড শুরু হচ্ছে। দর্শকের উত্তেজনা চরমে পৌছেচে। হাতুড়ির বাঁটটা সজোরে মুঠির মধ্যে ধরে বললুম, 'সবাই কাঠ ছুঁয়ে থাক, ভাগ্যি ফিরবে।'
লেন্‌ত্‌স আমার মাথাটা আঁকড়ে ধরল। ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। ও বলে উঠল, 'তাই তো, ভুল করেছিলুম, এ তো কাঠ নয়, খড়।' তাড়াতাড়ি সুমুখের বেড়াটাকে আঁকড়ে ধরল।
উত্তেজনার চাপা গুঞ্জনটা ক্রমে বাড়ছিল। বাড়তে-বাড়তে এখন একেবারে মেঘগর্জনের মতো শোনাচ্ছে। কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। ট্র্যাক্‌-এর একধারে উঁচু পাড়ের মতো আছে, ব্রাউনুলার পাড়ের গা বেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'নম্বরের গাড়িটা এক্কেবারে ওর পিছনে। ও কিন্তু পাড় ছেড়ে দিয়ে খুব খানিকটা ধুলো উড়িয়ে বেঁকে ট্রাকের ভিতরে নেমে গেল। লেন্‌ত্‌স চেঁচিয়ে উঠল, 'এইরে, ভুল করলে।' পর মুহূর্তেই কোষ্টার এসে গেছে, ভয়ঙ্কর একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে পাড়ের ঢালু কিনারা বেয়ে উঠে পড়ল। মুহূর্তের জন্য আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। মনে হল এক্ষুনি গাড়ি-টাড়ি সুদ্ধ ওপাড়ে ছিটকে গিয়ে পড়বে। কিন্তু গাড়িটা প্রচণ্ড গর্জন করে তীরবেগে এগিয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'দেখলে কাণ্ডটা, অমন পুরো দমের উপর লাফ দিতে আছে?'
লেন্‌ত্‌স ঘাড় নেড়ে বলল, 'পাগল, ও এক্কেবারে পাগল।' বেড়ার উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি -এমন যে কাণ্ডটা করল কিছু ফল হল কিনা। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে আমাদের হাতিয়ারের বাক্সটার উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম। বললুম, 'এখানটায় দাঁড়ালে ভালো দেখতে পাবে। নাও, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াও। দেখবে, মোড় ঘোরবার বেলাতেই ও দু'নম্বরকে ধরে ফেলবে।'
ও তন্মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলেছে কি, ছাড়িয়ে গেছে।'
লেন্‌ত্‌সও চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ছাড়িয়ে গেছে। এবার ব্রাউমুলারের পিছনে ছুটেছে।'
আমরা সবাই মিলে পাগলের মতো চেঁচাতে শুরু করেছি—ভ্যালেন্‌টিন্‌ আর

গ্রাউণ্ড এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এখন তারাও প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। কোষ্টারের পাগলামিতে ফল হয়েছে বৈকি। দু'নম্বরের গাড়িটা ভিতর দিয়ে যেতে গিয়েই ভুল করল। কোষ্টার এখন বাজ-পাখির মতো ছুটেছে ব্রাউমুলারকে ছোঁ মারবার জন্য। দুজনের মধ্যে ব্যবধান বড় জোর কুড়ি মিটার।

আমরা প্রাণপণে হাত নাড়ছি, চেঁচাচ্ছি, 'অটো, আর একটু, ধর ওকে, ধরে ফেল।'

এবার শেষ রাউণ্ড। লেন্‌ত্‌স এশিয়া এবং সাউথ আমেরিকার যত দেবদেবীর নাম করে প্রত্যেকের কাছে কাতর আবেদন জানাতে লাগল। মাদুলিটার কথাও ভোলেনি, সেটিও হাতের মুঠিতে ধারণ করে আছে। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান আমার কাঁধে ভর দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দূরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ব্রাউমুলার-এর গাড়ি ভট্‌-ভট্‌ করতে-করতে আসছে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে কোষ্টারের সঙ্গে ব্যবধানটুকু কমে আসছে। কি হয়, কি হয়! আমি চোখ বুজে রইলুম। লেন্‌ত্‌স ট্র্যাক-এর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। অদৃষ্টে যদি থাকে— একটা বিরাট চিৎকার শুনে চোখ মেলে তাকালুম। মাত্র দু-মিটার ব্যবধানে কোষ্টার সর্বাগ্রে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল।

লেন্‌ত্‌স উন্মত্তপ্রায়। হাতিয়ার-টাতিয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টায়ারের উপর ভর করে একবার ডিগবাজি খেয়ে নিল। তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাশের পিট্‌-এ সেই বিরাটকায় মিস্ত্রীকে ডেকে বলল, 'কি হে এখন কেমন? কি যেন বলেছিলে আমাদের গাড়ি দেখে—কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি, না?'

লোকটা মেজাজ গরম করে বলল, 'চোপরাও, বাজে বোকো না।' জীবনে বোধকরি এই প্রথম লেন্‌ত্‌স আপমানের কথা শুনেও কানেই তুলল না। উল্লাসের চোটে নেচে কুঁদে হেসে সবাইকে অস্থির করে তুলল।

আমরা অটোর জন্য অপেক্ষা করছি। ও তখনও রেস্‌-এর কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত।

পিছন থেকে কে ভাঙা গলায় ডাকল, 'গট্‌ফ্রিড্‌।' ফিরে দেখি একটা মনুষ্যাকৃতি বিরাট পাহাড় বিশেষ—পরনে ডোরা-কাটা আঁটসাঁট ট্রাউজার, গায়ে তেমনি আঁট গোছের জ্যাকেট, মাথায় বোলার হ্যাট্‌। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে আলফন্‌স যে!'

আলফন্‌স ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, অধীন হাজির—'

'আরে এদিকে যে আমরা জিতে গিয়েছি।'

'তাই তো চাই, তাই তো চাই। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'দেরি আবার কি, এই তো ঠিক সময়।'

'আপনাদের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসেছি। ঠাণ্ডা পর্কের চপ আর ভিনিগার-দেওয়া কাটলেট।'

গট্‌ফ্রিড চেঁচিয়ে বলল, 'আরে নিয়ে এস, নিয়ে এস। তুমি যে দেখছি খাশা লোক হে। আর কি, বসে পড়া যাক, শুরু করে দিই।' বলেই পার্শেলটা টেনে খুলে ফেলল।

প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান বলে উঠল, 'ওরে বাপ্‌রে, এ যে গুচ্ছের খাবার। পুরো একটা রেজিমেন্টের খাওয়া হয়ে যেতে পারে।'

আলফন্‌স বলল, 'তা দেখুন না, শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে। আর এই যে কিঞ্চিৎ পানীয়ও এনেছি।' বলে দুটি বোতল বের করল।

আমাদের সঙ্গিনী খুশি হয়ে বলল, 'এই তো চাই, এই তো চাই।'

এদিকে খড়খড় ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে-করতে কার্ল আমাদের পিট্‌-এর কাছে এসে থামল। কোষ্টার এবং জাপ্‌ দুজনেই একসঙ্গে গাড়ি থেকে নামল। জাপ-এর কি গর্বিত মূর্তি—যেন বিজয়ী নেপোলিয়ান! খাড়া কান চক্‌চক্‌ করছে। হাতে বিদঘুটে দেখতে বিরাট এক রুপোর কাপ। কোষ্টার হেসে বলল, 'এই নিয়ে ছটা হল। আশ্চর্য, এই কাপ ছাড়া এরা অন্য কোনো জিনিসের কথা ভাবতেই পারে না।'

আলফন্‌স খুব গম্ভীর মুখ করে জিগগেস করল, 'শুধু এই দুধের জগ্‌টি বুঝি? নগদ টাকা পয়সা কিছু?'

অটো আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ, নগদও কিছু পেয়েছি বই কি।'

গ্রাউ বলে উঠল, 'এ্যাঁ, তবে তো এবার আমাদের টাকার ছড়াছড়ি হে। আজকে সন্ধ্যেয় একটু খানাপিনার ব্যবস্থা হলে হত না?'

আলফন্‌স বলল, 'তাহলে আমার ওখানেই হোক?'

লেন্‌ত্‌স লাফিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ তাই সই।'

আলফন্‌স একধার থেকে লোভনীয় খাদ্যের তালিকা দিয়ে গেল—'কড়াইশুঁটির স্যুপ, হাঁসের মাংস, ভেড়ার ঠ্যাং, শুয়োরের কান, ইত্যাদি।' শুনে প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যান পর্যন্ত শ্রদ্ধায় বিগলিত হল। আলফন্‌স একটু থেমে বলল, 'আগেই বলে রাখছি কিন্তু, দাম নিতে পারব না।'

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে-দিতে ব্রাউমুলারও এসে হাজির, হাতে তেলকালি-মাখা

কতকগুলো প্লাগ। লেন্ত্স বলল, 'দুঃখ করো না ভাই, অস্কার। এরপরে প্যারাম্ব লেটর রেস-এ তুমি ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।'

আলফন্স বলল, 'হের্ ব্রাউমুলার, আমি জীবনে কখনো কোষ্টারকে হারতে দেখিনি। কাজেই আপনার কোনো চান্সই ছিল না।'

ব্রাউমুলার ফিরে জবাব দিল, 'কিন্তু কার্লও এই আজকে ছাড়া আমাকে কখনো হারাতে পারেনি।'

গ্রাউ বলল, 'থাক, থাক, হারকে বুদ্ধিমানের মতো স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। এস এক গ্লাশ পান করা যাক। না হয় মেশিনের কাছে কালচারের পরাজয়ের কথা স্মরণ করেই সকলে মিলে পান করব।'

ওখানকার সভা ভঙ্গ করে ওঠবার আগে ভেবে রেখেছিলুম আমাদের খাদ্যের অবশিষ্টাংশ সঙ্গে নিয়ে যাব। গুচ্ছের খাবার রয়ে গেছে, বেশ কয়েকজনের পেট ভর্তি খাওয়া হয়ে যেতে পারে। ওমা! নিতে গিয়ে দেখি শুধু পার্শেলের কাগজটি অবশিষ্ট।

লেন্ত্স পরক্ষণেই জাপ্-এর দিকে তাকিয়ে বলল 'ও! এই ব্যাপার!' জাপ্-এর মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি, তখনও দুহাত ভর্তি খাবার, আর পেটটি ফুলে ঢাব হয়ে আছে। লেন্ত্স বলল, 'আমাদের জাপ্ বাবাজি আর একটি রেকর্ড করেছে হে।'

আলফন্স-এর ওখানটায় আমাদের সান্ধ্যভোজনে প্যাট্রিকে নিয়েই সকলে ব্যস্ত। এতটা অন্তরঙ্গতা আমি কিন্তু মনে-মনে বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। সুযোগ বুঝে গ্রাউ আবার সেই ছবি আঁকার কথা তুলেছে। বলে, ওর ছবি আঁকবে ও হেসে বলছে, ছবিতে বড্ড সময় লাগবে, ফটোগ্রাফ হলে বরং সে রাজী আছে। আমি ভালোমানুষটির মতো বললুম, 'ওটাই আসলে ওর লাইন। বোধকরি ও ফটোগ্রাফ থেকেই ছবিটা আঁকতে চায়।'

ফার্ডিনাণ্ড তার বড-বড দুই নীল চোখ মেলে প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার কথা ঠেলে দিয়ে বলল, 'চুপ কর বব্। দেখছি রাম্ খেলে তোমার মেজাজ বিগড়ে যায় আর আমার হয় দিল্দরিয়া মেজাজ। আমাদের কালে আর তোমাদের কালে ঐখানেই তফাত।'

আমি বললুম, 'তা বৈকি। জানো, ও আমার চেয়ে মাত্র দশ বছরের বড়।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'ওতেই এক পুরুষের তফাত। দশ বছর কি কম হল? বলতে গেলে একটা জীবৎকাল। হাজার বছরের ব্যবধান। তোমরা ছেলেমানুষ, দুনিয়ার

কি বোঝ, জীবনের কতটুকু জানো? নিজের মনকেই ভয় করে চল। চিঠি লেখ না, টেলিফোনে কথা কও। কল্পনাজগতে বিহার না করে উইক-এণ্ড-এ প্রমোদ-ভ্রমণে যাও। প্রেম করবার বেলায় খুব সেয়ানা, তখন কত রকম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, কিন্তু পলিটিক্সের বেলায় মতামতের বালাই নেই, একটা হলেই হল। সত্যি তোমরা কৃপার পাত্র।'

এক কান দিয়ে ওর কথা শুনছি, আর এক কান রয়েছে ব্রাউমুলার-এর দিকে। এরই মধ্যে ওকে কিঞ্চিৎ নেশায় ধরেছে। প্যাট্রিসিয়া হোল্‌ম্যানকে বলছে তাকে ড্রাইভিং শিখতেই হবে। ওস্তাদি কায়দা-টায়দা সব তাকে সে শিখিয়ে দেবে। এক সুযোগে ওকে এক পাশে টেনে নিয়ে বললুম, 'দেখ, অস্কার, তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তুমি হলে গিয়ে স্পোর্টস্‌ম্যান, মেয়েদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করা তোমার পক্ষে ভালো নয়।'

ব্রাউমুলার গম্ভীরভাবে বলল, 'হয়েছে, ও সব উপদেশ আমাকে দিতে হবে না। আমার স্বাস্থ্যখানা দেখছ তো?'

'আচ্ছা বেশ। তবে আর একটি কথা বলছি, সেটি বড় উপাদেয় হবে না। এই যে বোতলটি দেখছ এটি তোমার মাথায় ভাঙব।'

ও একগাল হেসে বলল, 'বৎস, তোমার অস্ত্র সম্বরণ কর। আচ্ছা, সত্যিকারের ক্যাভেলিয়ার কাকে বলে জানো? যে মাতাল হয়েও ভদ্র ব্যবহার করতে জানে। তুমি আমাকে ভেবেছ কি শুনি?'

বাস্তবিক পক্ষে আমার ভয়টা অমূলক। প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে এরা কেউ আমার ক্ষতি করবে না। ওরকম ব্যবহারের রেওয়াজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু মেয়েটির কথা তো ঠিক জানিনে। ধর, এদের মধ্যে কাউকে যদি ওর খুব ভালো লেগে যায়? আমাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় এখনও যৎসামান্য বলতে হবে। কাজেই ওর সম্বন্ধে আমার মনটা সুস্থির নয়।

সুযোগ বুঝে এক সময় ওকে বললুম, 'চল না, চুপচাপ সরে পড়া যাক।' বলা মাত্র ও রাজী হয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে দুজনে হেঁটে চলেছি। কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব হয়েছে। সমস্ত শহর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কুয়াশাটা ক্রমশ বাড়ছে—রুপোলী কুয়াশা, তাতে ঈষৎ সবুজের আভাস। ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে আমার কোটের পকেটে পুরে দিলুম। পাশাপাশি চলেছি, উভয়েই নীরব।

খানিক পরে জিগগেস করলুম, 'কি, খুব ক্লান্ত নাকি?'

ও শুধু একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না। রাস্তার দুধারে কাফে। তারই একটা দেখিয়ে বললুম, 'যাবে নাকি, একটু বসবে?'

'না, এখন নয়।'

হাঁটতে-হাঁটতে কবরখানার কাছে এসে পৌছলুম। গাছের পাতায় শরশর শব্দ, যদিও কুয়াশার দরুন গাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে একটা অস্পষ্ট অপার্থিব প্রদোষালোকের সৃষ্টি করেছে। ছোট-ছোট পতঙ্গের দল নেবু ফুলের মধু খেয়ে মাতাল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভন্‌ভন্‌ শব্দ তুলে জানালার শার্সি কিম্বা রাস্তার ল্যাম্পের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে।

কুহেলিকার আবরণে সমস্ত কিছুর মূর্তি গেছে বদলে, কাছের জিনিসকে নিয়ে গেছে দূরে। ওধারের ঐ হোটেলটাকে দেখাচ্ছে একটা বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজের মতো, বহু আলোকিত কেবিন সমেত কালো অন্ধকারের বুকে যেন ভাসছে। আর তার পিছনে গির্জার ধূসর ছায়াটাকেও একটা জাহাজ বলেই ভ্রম হয়, ঐ তো তার উঁচু লম্বা মাস্তুলগুলো দেখা যাচ্ছে। কাছে-দূরের বাড়ি-গুলোকেও দেখাচ্ছে ছোট বড় মাঝারি নানারকম জাহাজের মতো। তারাও কুয়াশার বুকে ভাসছে, নড়ছে চড়ছে।

পাশাপাশি দুজনে নীরবে বসে আছি। কুয়াশার দরুন সব কিছু অবাস্তব মনে হচ্ছে—এমন কি আমরা দুজনও যেন বাস্তব জগতের বাইরে চলে গেছি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাস্তার আলোয় ওর বড়-বড় চোখ দুটি চকচক্ করছে। বললুম, 'এস আরেকটু কাছে এসে বসো, নইলে কুয়াশা যে তোমাকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে—'

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। মুখে হাসি, ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করা, বড়-বড় চোখ মেলে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ও তো আমাকে দেখছে না—আমাকে ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেছে বহু দূরে ঐ ধূসর কুয়াশার জালে নিজেকে ফেলেছে হারিয়ে। কিসে যেন ওকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে—হয়তো বা বৃক্ষশীর্ষে বাতাসের ঐ মৃদু আন্দোলনটুকু, কিম্বা হয়তো শিশির-সিক্ত সারি-সারি ঐ বৃক্ষকাণ্ড। অদ্ভুত ওর মুখের ভাব—ও যেন কোন সুদূরের নীরব আহ্বান শুনতে পেয়েছে, পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ভেসে-আসা কার ডাক! কে জানে কার সে আহ্বান—সে কি বিচিত্ররূপিণী ধরিত্রীদেবীর না চিররহস্যময় জীবন-দেবতার?

ওর সেই মুখ আমি জীবনে কখনো ভুলব না। আমার দিকে মুখটি ফিরিয়ে বসেছিল, আস্তে-আস্তে মগ্ন ভাবটি কেটে গিয়ে মুখখানা সজীব হয়ে উঠল, কমলানন করুণায় কোমল হল সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলটির মতো। সত্যি সে কথা ভোলবার নয়—ধীরে, অতি ধীরে, ওর মুখ এগিয়ে এল আমার মুখের কাছে, ওর চোখ আমার চোখের অতি নিকটে। বড়-বড় জলজলে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার চোখে নিবদ্ধ। তারপরে—তারপরে সে চোখ আপনিই বুজে এল—আত্মসমর্পণের নিবিড়তায়।

কুজ্ঝটিকা চরাচর ব্যাপ্ত করেছে। কবরখানার ক্রশচিহ্নগুলি প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের কোটটি খুলে নিয়ে একাধারে উভয়ের গাত্র আচ্ছাদন করে নিলুম। সমগ্র নগরী কুয়াশায় ডুবে গেছে, কালের গতি শুদ্ধ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ যে বসেছিলুম। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। হঠাৎ এক সময় সুমুখ দিক থেকে কতগুলি ছায়ামূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে চাপা গলার অস্পষ্ট কথা কানে আসছে। তারপরে হঠাৎ গিটারের তারে ঝঙ্কার উঠল। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি ছায়ামূর্তিগুলি কাছে এসে গেছে। একটা জায়গায় গোল হয়ে সকলে দাঁড়িয়েছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ সমস্বরে সমবেত সঙ্গীত শুরু করে দিল—'প্রভু যীশু করিছেন আহ্বান।'

আমি চমকে উঠে নড়ে-চড়ে বসলুম। অ্যাঁ, এটা আবার কি? এ আমরা কোন রাজ্যে বসে আছি? চন্দ্রলোকে নয় তো? মেয়েদের কণ্ঠ, কিন্তু গানের সুরতালটা সামরিক। সমস্ত কবরভূমিটিকে চকিত করে দিয়ে গানের রব উঠেছে—'এস হে যতেক পাপীজন।'

প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি ব্যাপার বল তো? কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

ওদিকে দ্রুততালে গান চলছে—'যীশুপদে লভিবে করুণা—'

মুহূর্তে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'আরে তাই তো, এ যে স্যালভেশন আর্মি।'

গানের সুর ততক্ষণে সপ্তমে উঠেছে—'পাপমন কর সম্বরণ—'

প্যাট্-এর বেগনী চোখে মৃদু আলো এসে পড়েছে। এতক্ষণে ওর ঘোরটা কাটতে শুরু করেছে। ঠোঁট নড়ছে, কাঁধের দিকটাও একটু নড়ছে।

গান ধুয়োয় ফিরে এসেছে—'প্রভু যীশু করিছেন আহ্বান—'

হঠাৎ কুয়াশার ভিতর থেকে কে যেন বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'যীশুর দোহাই, এখানে চেঁচামেচি করো না।'

মুহূর্তের জন্য গানটা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ ধরনের বাধা পেয়ে-পেয়ে স্যালভেশন আর্মির অভ্যেস হয়ে গেছে। কাজেই পর মুহূর্তেই সামলে নিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে গান ধরল—'সংসার পথ দুর্গম অতি—'

পূর্বোক্ত কণ্ঠটি আবার শোনা গেল, 'কি মুশকিল রে, এখানেও একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?'

অপর পক্ষ—গানের সুরেই জবাব দিচ্ছে—'শয়তান ভোলায় যত মূঢ়মতি।'

কুয়াশার আড়াল থেকে তন্মুহূর্তে জবাব এল, 'ইস, এস দেখি কেমন তোমরা ভোলাতে পার?'

আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না, হো-হো করে হেসে উঠলুম। প্যাট্-এরও সেই অবস্থা। অকস্মাৎ কবরখানায় ইত্যাকার বাক্‌যুদ্ধ শুনে দুইজনেই হেসে গড়াগড়ি। প্রতিদিন রাত্রে জোড়ায়-জোড়ায় স্ত্রী-পুরুষের দল আর কোথাও নিরালা না পেয়ে এখানকার বেঞ্চগুলো এসে আশ্রয় করে। স্যালভেশন আর্মি সে কথা ভালো করেই জানে। সে জন্যেই আজ হঠাৎ এসে এখানটায় হামলা করেছে। আহা, এমন রবিবারের রাতটায় দু-একটি বিপথগামী আত্মাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা না করলে চলে! বেসুরা কর্কশ কণ্ঠে ঐ ধর্মান্ধ নারীর দল যীশুর বার্তা প্রচার করতে লাগল। সঙ্গে গিটারের একটানা সুরের আর্তনাদ।

সমস্ত কবরখানাটা সজীব হয়ে উঠেছে। কুয়াশার আড়াল থেকে কোথাও চাপা হাসির শব্দ, কোথাও বা উচ্চ কণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। বেশ বোঝা গেল প্রত্যেকটি বেঞ্চিই অধিকৃত। অন্ধকারে এতক্ষণ পর্যন্ত জোড়া-জোড়া স্ত্রী-পুরুষের দল প্রত্যেকেই ভেবেছিল ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে ওরাও দলে কম ভারি নয়। ব্যস, আর কিছু বলতে হল না। ধীরে-ধীরে এ পক্ষ থেকেও সমস্বরে গান শুরু হল। এদের মধ্যে অনেকে বোধকরি লড়াই ফেরতা লোক। মার্চিং-এর ছন্দে একেবারে গলা ছেড়ে গান ধরল—'হ্যামবুর্গ ঘুরে এসেছি, দুনিয়ার আর দেখতে বাকি?'

ওদিকে আবার সরু গলায়—ধর্মার্থিনীদের কাতর নিবেদন—'কোরো না কঠিন তব মন।' বেচারীরা এরই মধ্যে একেবারে ভড়কে গেছে। গান আর গলা দিয়ে বেরুচ্ছে না যেন।

'দুষ্টের জয় হবেই।' ভজনখানেক মোটা গলা ততক্ষণে সপ্তমে স্বর চড়িয়ে দিয়েছে, 'শুধায়ো না মোর নাম—'

আমি প্যাট্‌কে বললুম, 'চল এবার উঠে পড়ি। ও গানটা আমার জানা আছে। ইয়া লম্বা গান। এক লাইনের চাইতে আর এক লাইন বেশি চড়া। কাজেই আর বিলম্ব নয়।'

শহরের রাস্তায় তখনও পুরোমাত্রায় ভিড়। গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ, হর্নের আওয়াজ। কিন্তু রহস্যময় কুয়াশার অবগুণ্ঠনটি এখনও দূর হয়নি। কুয়াশার আবরণে বাসগুলিকে দেখাচ্ছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় প্রাণীর মতো, মোটর-এর আলোগুলো অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো জলজ্বল করছে। দোকানে-দোকানে সুসজ্জিত শো-কেস্‌গুলো আলাদীনের রত্ন-গুহার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবরখানাটা ঘুরে সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যামিউজমেণ্ট পার্কের কাছে এলুম। নাগরদোলাগুলো বাজনার তালে-তালে ক্রমাগত উঠছে আর নামছে, শয়তানের চাকাটা যেমন কলহাস্যমুখর তেমনি লাল, সোনালী, নানা রঙে রঙিন। ওদিকে গোলকধাঁধাটা আলোয় আলোময়—নীলচে রঙের আলো। আমি বললুম, 'আমাদের সাধের গোলকধাঁধা।'

প্যাট্ বলল, 'সাধের কেন?'

'মনে নেই, আমরা দুজনে একসঙ্গে ঢুকেছিলুম?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ।'

'মনে হচ্ছে কতকাল আগে।'

'আজকে আবার যাবে নাকি?'

আমি বললুম, 'না, আর নয়। তার চাইতে বরং চল কিছু একটু পান করা যাক।' ও মাথা নেড়ে নিষেধ করল। ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কুয়াশাটা যেন একটি মৃদু সুগন্ধের মতো ওকে জড়িয়ে ধরেছে, তাতেই ওকে আরো সুন্দর মনে হচ্ছে। জিগগেস করলুম, 'তোমার ক্লান্তি লাগছে না?'

'না, এখন পর্যন্ত তো নয়।'

ঘুরতে-ঘুরতে রিঙ-খেলার স্টলগুলোতে এলুম। সামনে শাদা গ্যাস-এর বাতি ঝুলছে। প্যাট্ একবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললুম, 'না, আজকে আর রিঙ ছুঁড়ছি না। স্বয়ং সেকেন্দার সাহেব ভাণ্ডার উজাড় করে সব রাম্ দিলেও না।' সেখান থেকে আবার এগিয়ে চললুম মিউনিসিপ্যাল

পার্ক-এর দিকে। প্যাট্ বলল, 'সেই—ডাফনে ইণ্ডিকা ফুলটা নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে।'

'তুমি তো দেখছি অনেক দূর থেকেই ফুলটার গন্ধ পাও।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়।'

'এ সময়টাতেই বোধ করি এ ফুল ফোটে। এখন শহরে সর্বত্র এর গন্ধ পাবে।'

আমি ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকেই একবার তাকিয়ে দেখলুম কোথাও একটি খালি বেঞ্চি আছে কিনা। কিন্তু সেই সুগন্ধি ফুলটির গুণেই হোক, কিম্বা রবিবার বলেই হোক, অথবা আমাদের কপাল দোষেও হতে পারে, একটি বেঞ্চিও খালি পেলুম না। প্রত্যেকটি বেঞ্চ আগে থেকেই দখল হয়ে আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বারোটা বেজে গেছে। বললুম, 'চল, আমার ঘরেই যাওয়া যাক। অন্তত সেখানটায় একটু নিরালা পাব।'

ও কোনো জবাব দিল না, কিন্তু আমরা আবার পিছনেই ফিরে চললুম। কবরখানার কাছে এসে দেখি অবাক কাণ্ড। স্যালভেশন আর্মি ইতিমধ্যে আরো লোক জুটিয়ে এনেছে। তখন ছিল শুধু ভগ্নী-সম্প্রদায়, এখন ইউনিফর্ম-পরা ভ্রাতারাও এসে হাজির হয়েছে। এখন আর আগের মতো সরু গলায় মিনমিনে গান নয়। সমস্ত কবরখানাটিকে কম্পিত করে মিলিত কণ্ঠের গান হচ্ছে—'সোনার জেরুজালেম'।

আশ্চর্য, প্রতিপক্ষের আর কোনো সাড়া-শব্দই নেই। ওরা সব পালিয়েছে। আমাদের বুড়ো হেডমাস্টার হিলারম্যান ঠিকই বলতেন, অধ্যবসায়ের মতো গুণ আর নেই, ওটা প্রতিভার চাইতেও বড় গুণ।

দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত বোধকরি একটু ইতস্তত করছিলুম। তারপরে দিলাম প্যাসেজের লাইট জেলে। প্যাসেজটি যা জঘন্য হয়ে আছে সে আর বলবার নয়। প্যাট্কে বললুম, 'তুমি বরং চোখ বুজেই থাক নইলে দৃশ্যটি দেখে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।' বলে, ওকে দুহাতে তুলে ধরে বাক্স-ডেস্কের মাঝখান দিয়ে কোনোরকমে লম্বা-লম্বা পা ফেলে আমার ঘরে এসে ঢুকলুম। ঘরের ভিতরে চারিদিকে কাপড়-জামা ছড়িয়ে আছে। দেখে আমারই চক্ষু স্থির। সে দিনের সেই আর্ম-চেয়ার নেই, কার্পেট নেই, হেসিদের টেবিল-ল্যাম্প নেই।

অপরাধীর মতো বললুম, 'দেখলে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা?'

প্যাট্ বলল, 'কই ভয়ঙ্কর তো কিছু দেখছি না।'

জানালার দিকে দু-পা এগিয়ে বললুম, 'ভয়ঙ্কর নয় তো কি? কিন্তু যাই বল এখান থেকে বাইরের দৃশ্যটি বেশ সুন্দর। এস চেয়ার দুটি জানালার ধারে টেনে নিই।' প্যাট্ ঘরের ভিতরটায় একবার পায়চারি করে নিল, বলল, 'কেন, বেশ তো ঘরটি। বিশেষ করে দিব্যি গরম।'

'ওঃ, তোমার এতক্ষণ খুব শীত করছিল বুঝি?'

ও বলল, 'একটু গরম না হলে আমার ভালো লাগে না। শীত আর বৃষ্টি আমি একেবারে সইতে পারিনে।'

'কি কাণ্ড দেখ তো—এতক্ষণ মিছিমিছি বাইরে, কুয়াশায় বসে কাটিয়ে দিলুম—'

'তাতে কি হয়েছে? বরং বাইরে থেকে এসেছি বলেই এখন ভিতরে আরো বেশি আরাম লাগছে।'

ও আরেকবার ঘরের ভিতরটায় পায়চারি করে নিল। অপ্রস্তুত ভাবটা তখনো কাটেনি—তবু রক্ষে ঘরটা বেশি নোংরা নয়। ছেঁড়া এক জোড়া চটি জুতো পড়েছিল। ওর অলক্ষ্যে লাথি মেরে সেটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলুম। পায়চারি করতে করতে ও এক কোণে আমার জামা-কাপড়ের তোরঙ্গের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরেই একটি ট্রাঙ্ক, ওটা লেন্‌ত্‌স আমাকে দিয়েছিল। লেন্‌ত্‌স নানান দেশ ঘুরেছে। ট্রাঙ্কটার গায়ে হরেক রকমের লেবেল লাগানো—রিয়ো ডি জেনেরো, ম্যানাওস, সান্টিয়াগো, ব্যুওনোস এয়ারিস্ ইত্যাদি ইত্যাদি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নামগুলো সব পড়ে ও আমার দিকে এগিয়ে এল। 'তুমি এর সবগুলো জায়গায় গিয়েছ নাকি?'

আমি মুখ চেপে অস্পষ্ট একটা জবাব দিলুম। ও আমার হাত ধরে ছেলেমানুষের মতো বলল, 'এস না, আমাকে সব বলবে। কত দেশ, কত শহর তুমি দেখেছ। কি চমৎকার—'

আমি কি যে বলব ভেবে পাচ্ছিনে। আমার সুমুখে ও দাঁড়িয়ে আছে—অপরূপ ওর মূর্তি, যৌবনের প্রাচুর্যে ভরা, উৎসাহে প্রদীপ্ত ওর মুখ। একটি যেন প্রজাপতি পথ ভুলে আমার ঘরে এসে ঢুকেছে—আমার এই মলিন শ্রীহীন ঘরে! আমার অকিঞ্চন অর্থহীন জীবনকে ক্ষণকালের জন্য হলেও ধন্য করেছে। ক্ষণিকের জন্যই বটে; কারণ যে কোনো মুহূর্তে প্রজাপতিটি ঘর ছেড়ে উড়ে যেতে পারে। অতএব মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলুম না ও সব দেশ আমি কখনো দেখিনি, কখনো যাইনি—

দুজনেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে কুয়াশাটা ঢেউ-এর মতো এসে জানালার কাঁচে ধাক্কা দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হল আমার বিগত জীবনের জীর্ণ কুৎসিত দিনগুলি প্রেতমূর্তি ধারণ করে জানালার বাইরে ওখানটায় দাঁড়িয়ে আছে—আমার অর্থহীন ব্যর্থ জীবনের একটা যেন কঙ্কাল! এদিকে ঘরের মধ্যে ঠিক আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে, একেবারে আমার গা ঘেঁষে কি আশ্চর্য রমণীর মূর্তি। বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না, অথচ ওর উষ্ণ নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। নাঃ, ওকে আমি যেতে দেব না, ওকে আমার পেতেই হবে।...ওর দিকে ফিরে বললুম, 'হ্যাঁ, রিয়ো ডি জেনেরোর কথা বলছিলে। কি বলব তোমাকে—সে কি যেমন-তেমন শহর! রূপকথার রাজ্যের বন্দর। সমুদ্রের ঢেউ তাকে পাকে-পাকে জড়িয়েছে। তারই উপরে নগরীটি বসে আছে শ্বেতবসনা মর্মরমূর্তির মতো।' গ্রীষ্মাঞ্চলের কত নগর, কত প্রান্তর, কত পীত নদের কাহিনী ওকে বলে গেলুম। কোথাও রৌদ্রালোকিত দ্বীপ কোথাও কুম্ভীরাকীর্ণ নদী, কোথাও পথহীন বিজন বন—হিংস্র শ্বাপদের গর্জনে উচ্চকিত। আর অন্ধকার রাত্রে নৌকা-পথে যেতে যেতে ভ্যানিলা এবং অর্কিড-এর গন্ধে অন্ধকারটা আরো যেন ভারি হয়ে ওঠে। এ সব কথা আমি লেন্‌ত্‌স-এর কাছে শুনেছি। কিন্তু বলতে-বলতে হঠাৎ মনে হল এসব যেন আমারই কথা—আমার মনের গোপন ইচ্ছা আর শোনা-কথার স্মৃতি মিলে-মিশে যেন এক হয়ে গেছে। আমার হতশ্রী অকিঞ্চিৎকর জীবনটার গায়ে একটুখানি রঙের ছোপ লাগাতে গিয়ে না হয় একটু মিথ্যাই বললুম। কি আর হবে? তবু ঐ লাবণ্যময়ীর আশা ছাড়তে পারব না। কিছু বানিয়ে কিছু বাড়িয়ে বলতেই হবে নইলে আমি কি ওর যোগ্য? পরে না হয় সব বুঝিয়ে বলব, যখন মনে আর শঙ্কা থাকবে না, যখন ওর সম্বন্ধে মন নিশ্চিন্ত হবে আর ওর চোখে আমার মূল্য খানিকটা বাড়বে—কিন্তু আজ নয়...বলতে লাগলুম, 'হ্যাঁ, ম্যানাওস, ব্যুওনোস এয়ারিস—'প্রত্যেকটি নামের উচ্চারণ মৃদু প্রেমগুঞ্জরণের মতো শোনাচ্ছে।

রাত বাড়ছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাসখানেক আগেও পত্রপুষ্পহীন লেবু গাছের ডালগুলিতে যেমন সশব্দে বারিপাত হয়েছে এখন তেমন নয়। এখন গাছে-গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, তারই উপরে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে নিঃশব্দে আর গাছের গা বেয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে যাচ্ছে একেবারে গাছের গোড়ায়, শিকড়ে। সেইখানে গিয়ে জলটুকু সঞ্চিত হবে।

তারপরে আবার সঞ্জীবন-রসের মতো গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠবে উপরে। আগামী বসন্তে এই বৃষ্টির জলই আবার কচি পাতা হয়ে দেখা দেবে।

চারদিক নিস্তব্ধ। রাস্তার গোলমাল থেমে গেছে। পাশের গলিতে একটিমাত্র আলো জ্বলছে। গাছের পাতায় আলো পড়ে পাতাগুলো শাদা চক্‌চকে দেখাচ্ছে, বাতাসের মৃদু আন্দোলনে মনে হচ্ছে যেন জাহাজের পাল।

ওকে ডেকে বললুম, 'প্যাট্‌, বৃষ্টির শব্দ শুনছ ?'

'হ্যাঁ।'

ও আমার পাশে শুয়ে আছে। শাদা বালিশের উপরে ওর কালো চুল আরো কালো দেখাচ্ছে আর কালো চুলে ঘেরা মুখখানা অত্যন্ত ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। কাঁধের উপরে বোধকরি আলো এসে পড়াতে একেবারে পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো চক্‌চক্‌ করছে। আর একটু চিলতে আলো এসে পড়ছে ওর বাহুর উপরে।

হঠাৎ ও তার দুহাত তুলে ধরে বলল, 'এই দেখ।'

আমি বললুম, 'বোধকরি এটা রাস্তার আলো।'

ও উঠে বসল। এখন আলোটা পড়েছে ওর মুখে, ক্রমে কাঁধে বুকে ছড়িয়ে পড়ল ঠিক মোমবাতির হলদে আলোর মতো। নাঃ, এই তো আবার বদলে গেল, এখন কমলা রঙ, তার মাঝে একটু নীলচে আভা। তারপরে না হঠাৎ রঙটা টক্‌টকে লাল হয়ে ওর মাথার পিছনে একটা জ্যোতির মতো দেখাতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে আলোটা আস্তে-আস্তে সরে ঘরের সিলিং-এ গিয়ে ঠেকল।

আমি বললুম, 'ও বুঝেছি, এটা রাস্তার ওপরে একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনের আলো।'

ও বলল, 'এখন তোমার ঘরটি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে তাই দেখ।'

আমি বললুম, 'তুমি এসেছ বলেই আমার ঘরের শ্রী ফিরেছে। আজ থেকে ওর জন্মান্তর হল। ওর পূর্বদশা ঘুচে গেছে বলতে হবে।'

ও বিছানার উপরে হাঁটু গেড়ে বসল, সমস্ত দেহটি নীল আলোয় রঞ্জিত। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এখন থেকে আমি প্রায়ই এখানে আসব—খুব ঘন-ঘন, দেখো।'

আমি চুপ করে শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। সবই দেখছি যেন ঘুমের ঘোরে, মনের ভিতরটা একটি সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বললুম, 'প্যাট্‌, তোমাকে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! সাজ-সজ্জার আবরণে কি এত ভালো দেখাতো ?'

মৃদু হেসে মুখখানা আমার দিকে নামিয়ে আনল। বলল, 'বব্‌, আমাকে

ভালোবাসবে তো? প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে কিন্তু। সত্যি, ভালোবাসা ছাড়া আমি যে আর বাঁচিনে।'

ওর চোখ আমার চোখে নিবদ্ধ। মুখখানা ঝুঁকে প্রায় এসে আমার মুখে লেগেছে। মুখের ভাব অতিশয় সরল, কিন্তু ভিতরের উত্তেজনায় আতপ্ত। খুব মৃদুকণ্ঠে কানে-কানে বলার মতো করে বলল, 'তুমি আমাকে ধরে থেক, ছেড়ে দিও না। কেউ আমাকে ধরে না রাখলেই আমার পতন হবে। সব সময় আমার ঐ ভয়।'

বললুম, 'কই, তোমাকে দেখলে তো মনে হয় না তুমি ভয়ে-ভয়ে থাক।'

'থাকি বৈকি। সাহসের ভান করি বটে। কিন্তু মনে-মনে আমার বড় ভয়।'

'ভয় নেই প্যাট্, অমি তোমায় আঁকড়ে থাকব।' আমি এখনও যেন সেই আধ-ঘুম আধ-স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছি। 'হ্যাঁ, দেখো, আমি কেমন তোমাকে ধরে রাখি, তুমি নিজেই অবাক হয়ে যাবে।'

ও দুহাতে আমার মুখখানা ধরে আদর করতে লাগল। 'সত্যি বলছ তো?'

ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হ্যাঁ।' ওর কাঁধের উপরে সবুজ আলো এসে পড়েছে। মনে হয় দেহটি জলমগ্ন। হঠাৎ অনুচ্চ কণ্ঠে কি একটা বলে ও আমার গায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক যেন ঢেউয়ের মতো। সেই স্নিগ্ধ কোমল ঢেউয়ের স্পর্শে আমার সমস্ত সত্তা কোথায় ডুবে তলিয়ে গেল।

আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ও ঘুমিয়ে আছে। মাঝে-মাঝে জেগে আমি ওর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে রাত্রি যেন আর শেষ হবে না। আমরা দুজনে ভেসে-ভেসে কোথায় যে চলে যাচ্ছি—বুঝিবা সময়ের ওপারে। এত সহজে এত শীঘ্র ওকে পাব ভাবতেই পারিনি। যে কোনো পুরুষের বন্ধু হবার যোগ্যতা হয়তো আমার আছে। কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক কি দেখে আমাকে ভালোবাসবে, কে জানে! হতে পারে, এই একটি রাত্রির জন্যই, কাল সকাল-বেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে সব চুকে-বুকে যাবে।

অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আছে। আমি চুপ করে শুয়ে আছি! প্যাট্-এর মাথার তলায় আমার হাত. ওটা যে আমার শরীরের একটা অংশ সে কথা ভুলে গিয়েছি। একটুও নড়ছি-চড়ছি না। খানিক পরে ও একটু নড়ে-চড়ে বালিশে মাথা তুলে শুল। আস্তে-আস্তে হাতখানা সরিয়ে আনলুম। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুলুম, তারপরে দাড়ি কামিয়ে নিলুম। খানিকটা ওড়িকোলোন

নিয়ে চুলে ঘাড়ে মেখে নিলুম। ফিকে অন্ধকারে ঘরের নিস্তব্ধতাটা আমার নানা ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে অদ্ভুত লাগছে। বাইরে গাছগুলোর কালো-কালো মূর্তি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ফিরে দেখি প্যাট্ চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে ডেকে বলল, 'এস।'

বিছানায় ওর পাশে গিয়ে বসলুম। বললুম, 'আচ্ছা, এ কি স্বপ্ন না সত্যি?'

'ও কথা কেন বলছ?'

'কি জানি বোধকরি সকালের আলোতে সব অন্য রকম ঠেকছে।'

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ও বলল, 'এবার আমার জিনিসগুলো দাও তো।' মেঝে থেকে ওর পাতলা সিল্কের জামা-কাপড় তুলে নিলুম। ছোট্ট ফিন্‌ফিনে ঐটুকু জিনিস, কিন্তু ঐ সামান্যতেই কত তফাত করে দেয়, আশ্চর্য। এই পোশাক পরলেই ও একেবারে বদলে যাবে। আগে এ কথা কখনো ভাবিইনি।

জামা-কাপড়গুলো ওর হাতে দিলুম। ও দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আমিও ওকে জোরে বুকে চেপে ধরলুম।

তারপরে ওকে নিয়ে ওর বাড়ির দিকে রওনা হলুম। রাস্তায় কেউ বড় একটা কথা বলিনি। পাশাপাশি দুজনে হেঁটে চলেছি। দুধের গাড়ি পাথরে-বাঁধানো রাস্তায় ঘড়ঘড় শব্দ করে চলেছে আর কাগজওয়ালারা ঘরে-ঘরে খবরের কাগজ বিলি করে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ একটা বাড়ির সামনে বসে-বসে ঘুমুচ্ছে। শীতে তার দাঁত অনবরত ঠক্‌ঠক্ করছে। রুটিওয়ালা ঝুড়িভর্তি রুটি নিয়ে সাইকেলে করে ছুটছে। টাট্‌কা গরম রুটির গন্ধে রাস্তা আমোদিত। খুব উঁচুতে একটি এরোপ্লেন নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

বাড়ির দরজায় এসে প্যাট্‌কে বললুম, 'তাহলে আজকে—?'

কিছু না বলে ও একটু হাসল।

জিগগেস করলুম, 'সাতটা নাগাদ তো?' ওকে একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। বরং খুব তাজা ফুটফুটে দেখাচ্ছে, দেখলে মনে হয় রাতভর খুব ঘুমিয়েছে। আমাকে চুমু খেয়ে বিদায় নিল। যতক্ষণ না ও ঘরে গিয়ে আলো জ্বালাল ততক্ষণ বাড়ির সুমুখে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একা-একা ফিরে চললুম। রাস্তায় যেতে-যেতে অনেক কথা মনে এসে গেল। এ সব কথা ওকে বলা উচিত ছিল, বলা হয়নি। বাছা-বাছা মিষ্টি কথা।

একেবারে জ্ঞানহারা না হয়ে একটু যদি আত্মস্থ থাকতুম তবে অনেক কথাই বলা যেত। হাঁটতে-হাঁটতে এসে গেলুম বাজারের দিকে। শাকসব্জির গাড়ি, মাংসের গাড়ি, ফুলের গাড়ি এরই মধ্যে এসে গেছে। দোকানে না কিনে এখানে ফুল কিনলে অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। সঙ্গে যা কিছু টাকা ছিল তাই দিয়ে অনেকগুলো টিউলিপ্ ফুল কিনলুম। ফুলগুলো চমৎকার দেখতে, একেবারে তাজা, এখনও পাপড়িতে শিশিরের ফোঁটা টলটল করছে। ফুলওয়ালী বলল, এগারোটা আন্দাজ ফুল প্যাট্-এর কাছে পৌঁছে দেবে। মুচকি হেসে টিউলিপ্ ফুলের সঙ্গে বড় দেখে একটি ভায়োলেটের তোড়া দিয়ে বলল, 'এই নিন্, এবার নিশ্চিন্দি, অন্তত দিন পনেরোর জন্য বান্ধবীর হাতছাড়া হবার জো নেই।'
ফুলওয়ালীর দাম চুকিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে এলুম।

দশম পরিচ্ছেদ

ফোর্ড গাড়ির কাজটা সবে শেষ হয়েছে। নতুন কোনো কাজ এখনও জোটেনি। শিগগিরই একটা কিছু জোটাতে হচ্ছে, নইলে আর চলছে না। কোষ্টার আর আমি গিয়েছিলাম এক নিলামে, ওখানে একটা ট্যাক্সি বিক্রি হবার কথা।
শহরের উত্তরাঞ্চলে উঠোন-ঘেরা একটা আস্তাবল মতো জায়গা। দেখলুম ট্যাক্সিটা ছাড়া আরো অনেক জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কিছু-কিছু জিনিস উঠোনেই রাখা আছে—বিছানা-বালিশ, নড়বড়ে টেবিল, দেয়াল-ঘড়ি, চেয়ার, আলমারি, রান্নার বাসন, কিছু বই, কিছুবা কাপড়-জামা—এক কথায় বলতে গেলে একটি হতভাগ্য গৃহস্থালীর ভগ্নাবশেষ। আমরা একটু আগে এসে পড়েছিলুম; নিলামওয়ালা তখনও এসে পৌছায়নি। জিনিসগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখছি, হঠাৎ কতগুলো পুরোনো বইয়ের উপরে নজর পড়ল। সস্তা দরের এডিশন, বহু ব্যবহারে জীর্ণ কতগুলো গ্রীক-লাটিনের প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ—মার্জিনে রাশীকৃত হাতে-লেখা নোট। এর জীর্ণ বিবর্ণ পাতায় হোরেস্ এনাক্রিয়নের কাব্য পাঠ এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। বইগুলোকে বড় জোর মালিকের দুঃসহ জীবনের নিদর্শন বলা যেতে পারে। এদের মালিক কে, কে জানে! কিন্তু এ বইগুলি যে তার জীবনে একমাত্র শান্তির আশ্রয় ছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। লোকটি শেষ পর্যন্ত বইগুলোকে আঁকড়ে ধরে ছিল। আজ যখন এইখানে তাদের গাত হয়েছে, বুঝতে হবে লোকটি জীবনের শেষ সম্বলও বিসর্জন দিয়েছে!
কোষ্টার আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, 'আঃ, দেখলে বড় কষ্ট হয়।' আমি মাথা নেড়ে অন্য জিনিসগুলো দেখিয়ে বললুম, 'এসব জিনিসেরও সেই একই ইতিহাস। রান্নাঘরের চেয়ার, পোশাকের আলমারি কেউ রগড় করবার জন্য এমন জায়গায় পাঠায় না।'
উঠোনের একধারে ট্যাক্সি গাড়িটা আছে। গায়ের বার্নিশ কোথাও-কোথাও

একেবারে উঠে গেছে, কোথাও বা রঙ চটে গেছে। কিন্তু মোটামুটি গাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমন কি মাড্‌গার্ডের তলায়ও ময়লা লেগে নেই। বেঁটে জোয়ান-মতো একটি লোক গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেহের অনুপাতে হাত দুটি একটু বেশি লম্বা। লোকটা কেমন যেন নিস্পৃহ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কোষ্টারকে জিগগেস করলুম, 'তুমি গাড়িটা একবার দেখেছ?'

'কালকে দেখে গিয়েছি। অনেকদিনের পুরোনো গাড়ি, তবে বেশ যত্নে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'তা হতে পারে। কিন্তু অটো, গাড়িটি এই আজকেই ধুয়ে মুছে রাখা হয়েছে। নিলামওয়ালারা ধোয়া-মোছা করেনি এ আমি বলে দিচ্ছি।'

কোষ্টার বেঁটে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ লোকটিই বোধ হয় গাড়ির মালিক। কালকেও ওকে এখানে দেখেছি। ও-ই গাড়িটিকে ঘষে-মেজে ঠিক করছিল।'

আমি বললুম, 'বলছ কি, ওকে দেখলে তো গাড়ির মালিক বলে মনে হয় না, বরং গাড়িচাপা পড়লে যেমন চেহারা হয় এ যে তেমনি দেখতে।'

আমরা কথা বলছি এমন সময় একটি যুবক উঠোন পার হয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এল। গায়ে বেল্ট-লাগানো একটা কোট, অতিরিক্ত স্মার্ট দেখতে—এত বেশি যে মন আপনিই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। হাতের ছড়ি দিয়ে গাড়িটার মাথায় খোঁচা মেরে বলল, 'অঃ, এই বুঝি সেই গাড়ি?' বলে একবার আমাদের দিকে, একবার অপর লোকটির দিকে তাকাল। মালিকের চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। লোকটা পূর্ববৎ চালের সঙ্গে বলল, 'বাজে, বাজে, একেবারে বাজে। এ বার্নিশের কানাকড়িও দাম নেই। মান্ধাতার আমলের সামিগ্‌গিরি—মিউজিয়ামের যুগ্যি বটে।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল। কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাবার জন্য আমাদের দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু আমরা তার হাসিতে যোগ দিলাম না। তখন মালিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এই বুড়ো দাদুর দাম কত হতে পারে?'

লোকটি ওর ঠাট্টা-তামাশা সবই হজম করে নিল, কিছু বলল না। চালিয়াত ছোকরা হেসে বলল, 'অর্থাৎ ভাঙা-চোরা লোহার দাম হিসাবে জিগগেস করছি।' আবার আমাদের দিকে ফিরে জিগগেস করল, 'আপনারাও খদ্দের হিসেবে

এসেছেন বুঝি ?' গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'বেশ তো, আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আসুন না, নাম মাত্র দামে ওটা কিনে নিই। মেরামত-টেরামত করে নিলে এক রকম দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে লাভটা ভাগাভাগি করে নিলেই হবে। ওদের পয়সা দিয়ে কী হবে, মশাই ? ভালো কথা, আমার নাম হচ্ছে থিজ্—গুইডো থিজ্।'

বাঁশের ছড়িটা ঘুরোতে-ঘুরোতে আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব বিজ্ঞের মতো চোখ ঠারল। লোকটার রকম-সকম দেখে আমার বিষম রাগ হচ্ছিল—হতভাগার দেখছি কোনো কথাই পেটে থাকে না। বললুম, 'থিজ্ নামটা তো আপনাকে মানায় না।'

লোকটা মনে-মনে খুশি হয়ে বলল, 'তাই নাকি ?' নিজেকে ও খুব বুদ্ধিমান মনে করে আর লোকের মুখে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা শোনার অভ্যেস আছে মনে হল। বললুম, 'হ্যাঁ, আপনার নাম রাখা উচিত ছিল টোয়ারপ্, গুইডো টোয়ারপ্।'

লোকটা চমকে দু-পা পিছিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তা তো বলবেনই। দলে ভারি কিনা। আপনারা দুজন, আমি একলা।'

বললুম, 'তাই যদি আপনার ভাবনা হয়—বেশ, আপনার যখন ইচ্ছে আসবেন, আমি একলাই আপনাকে সামলাতে পারব।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ঢের ধন্যবাদ,' বলে গুইডো মুখ গোমড়া করে চলে গেল।

বেঁটে মতো লোকটা বিষণ্ণ মুখে গাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কে কি বলে সে দিকে ওর নজর নেই, তাতে ওর কিছু যায় আসে না।

অটোকে বললুম, 'থাক, এই গাড়ি কিনে কাজ নেই।'

অটো বলল, 'আমরা না কিনলে গুইডো হতভাগা কিনবে ; ও ব্যাটাকে কোনো রকম সুবিধে দেওয়া চলবে না।'

'সেটা ঠিক বলেছ। কিন্তু এ জিনিস কিনলে বড় বেশি ঝক্কি নিতে হবে—'

'হবে বৈকি বব্। আজকাল কোন জিনিসে ঝক্কি পোয়াতে হয় না বল তো। যাই বল, মালিকের খুব ভাগ্যি যে আমরা এখানে রয়েছি। আমরা থাকাতেই ও যদি কিছু বেশি দাম পায়। তবে এও বলে রাখছি, গুইডো ব্যাটা যদি নিলামে ডাকে তবেই আমি ডাকব, নইলে নয়।'

ইতিমধ্যে নিলামওয়ালা এসে গেল। ভারি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। অবিশ্যি বেচারার কাজের চাপ খুবই বেশি। রোজ ডজন খানেক করে নিলামের কাজ ওকে করতে হয়। বৃথা কালক্ষেপ না করে অভ্যাস মতো হাত-পা নেড়ে লোকটা একের-পর-

এক জিনিস নিলামে চড়াতে লাগল। কথায়বার্তায় আবার কাটখোট্টা রকমের একটু রসিকতার ছোঁয়াচ আছে। এই কাজ করেই হাড় পাকিয়েছে কিনা, কাজেই এই সব ভাঙ্গা-চোরা মালের মধ্যে যে কত মানুষের ঘরভাঙার মনভাঙার কাহিনী জড়িয়ে আছে সে সব ওর গায়েই লাগে না।

যৎসামান্য দরে জিনিস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দোকানদাররাই কিনছে বেশি। নিলামওয়ালা ওদের দিকে তাকালে কেউ বা হাত তুলে সংকেত করে কেউ বা মাথা নাড়ে। হয়তো পাশেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণনয়না এক নারী মূর্তি। আশা-আশঙ্কায় দোলায়িত চিত্তে তাকিয়ে আছে খদ্দেরের উত্তোলিত অঙ্গুলিটির দিকে—ভগবানের অঙ্গুলি নির্দেশের মতো। এবার ট্যাক্সির পালা। খদ্দের জুটেছে তিনজন। প্রথমেই ডাকল গুইডো— তিনশো মার্ক। লোকটা নেহাত নির্লজ্জ বলেই অত কম হাঁকতে পারল। বেঁটে মতো লোকটি এক পা এগিয়ে এল। ঠোঁট নড়ছে কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। একবার মনে হল ও নিজেই বোধহয় ডাকবে। কিন্তু হাতটা তুলেও আবার নামিয়ে নিল, তারপরে পিছিয়ে গিয়ে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়াল।

এর পরের ডাক হল চারশো মার্ক। গুইডো হাঁকল সাড়ে চারশো। খানিকক্ষণ চুপচাপ, আর কেউ ডাকছে না। নিলামওয়ালা চেঁচাচ্ছে—'আর কেউ ডাকতে চান তো বলুন—যাচ্ছে—একবার—যাচ্ছে—দুবার—' ট্যাক্সির মালিক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে নিলামওয়ালার হাতুড়িটা এক্ষুনি দড়াম করে পড়বে টেবিলের উপর।

কোষ্টার বলে উঠল, 'এক হাজার।' আমি চমকে ওর দিকে তাকালুম। ও চাপা গলায় আমাকে বলল, 'কম-সে-কম তিন হাজারের মাল। লোকটাকে তো খুন হতে দিতে পারি না।'

গুইডো পাগলের মতো হাত নেড়ে আমাদের ইশারা করছে। ও ইতিমধ্যেই অপমানটা ভুলে গেছে, ব্যবসায় ঘা লেগেছে কিনা। চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'এগারোশো।' বলেই আমাদের দিকে প্রাণপণে চোখে ইশারা করতে লাগল।

কোষ্টার ডাকল, 'পনেরোশো।'

গুইডো হাঁকল, 'পনেরো দশ।' ও এখন ঘামতে শুরু করেছে।

'আঠারোশো,' কোষ্টার হাঁকল।

গুইডো কপালে করাঘাত করে রণে ভঙ্গ দিল। ওদিকে নিলামওয়ালা উত্তেজনায় ধেই-ধেই নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ আমার প্যাট্-এর কথা মনে পড়ে

গেল! কিছু না ভেবে-চিন্তে বলে উঠলুম, 'আঠারোশো পঞ্চাশ।' কোষ্টার অবাক হয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল। তাড়াতাড়ি বললুম, 'ও পঞ্চাশ মার্ক আমি শোধ করে দেব'খন। ভালো মতলবেই করেছি—ব্যবসার ফিকির, বুঝলে না?'

কোষ্টার মাথা নাড়ল। নিলামওয়ালা হাতুড়ি ঠুকে গাড়িটা আমাদের দিকে নির্দেশ করল। কোষ্টার তন্মুহূর্তে দাম চুকিয়ে দিল।

যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে গুইডো আমাদের পাশে এসে বলল, 'বেশ, বেশ, বেশ হয়েছে। তা হাজার মার্কেই আমরা গাড়িটা নিতে পারতাম। দেখলেন তো কেমন চাল দিয়ে গোড়াতেই ও খদ্দেরটি ভাগিয়ে দিলুম।'

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল 'এই যে বন্ধু—' ফিরে দেখি খাঁচায়-পোরা টিয়াপাখিটা।

আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, 'বল ভাই টোয়ারপ্।' আর কথা নেই মুহূর্তে গুইডো অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদূরে গাড়ির মালিক দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে এগিয়ে গেলুম, ওর পাশে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে, রোগা ফ্যাকাশে চেহারা। বললুম, 'আমরা দুঃখিত—' লোকটি বলল, 'কেন, ঠিকই তো হয়েছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন আমাদের ডাকবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু আমরা না ডাকলে আপনি আরো কম পেতেন।'

লোকটি শুধু মাথা নাড়ল। তারপরে হঠাৎ খুব আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, 'বড় ভালো গাড়ি। দেখবেন আপনার দাম কিছু বেশি হয়নি। দামের তুলনায় ঢের ভালো কাজ দেবে।...আর শুধু কি গাড়ি...কত - কি বলব আপনাকে—'

বললুম, 'হ্যাঁ বুঝতে পারছি।'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'তাছাড়া এ টাকার কিছুই আমরা পাচ্ছিনে। এ সবই যাচ্ছে—'

লোকটি বলল, 'ভেবো না গো, ভেবো না। আবার দিন ফিরবে।'

স্ত্রীলোকটি জবাব দিল না। লোকটি আবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, 'ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে চেঞ্জ করবার সময় ও সামান্য একটু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। তা আপনারা কিছু ভাববেন না, এটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। একেবারে নতুন অবস্থা থেকেই ওরকম ছিল।' এমন ভাবে কথা বলছে মনে হবে গাড়ি তো নয় নিজের সন্তানের সম্বন্ধে কথা বলছে। 'গত তিন বছর আমাদের

কাছে ছিল—একদিনের জন্যও কোথাও কিছু বিগড়োয়নি। অসুখ হয়ে বিছানায় পড়েছিলুম—সেই তখনই একটা লোক আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে—বন্ধুই বলতে পারেন।'

স্ত্রীলোকটি মুখ কালো করে বলে উঠল, 'বন্ধু না হাতি—জোচ্চোর, বদমাস।'

লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা, না গো, দিন ফিরবে। ফিরবে না ভাবছ ?'

স্ত্রীলোকটি আবার চুপ করে গেল। লোকটি ঘামে ভিজে উঠেছে।

কোষ্টার বলল, 'দেখি, আপনার ঠিকানাটা দিন তো। কিছুদিন বাদে আমাদের একজন ড্রাইভার দরকার হতে পারে, বলা তো যায় না।'

লোকটি হাতে স্বর্গ পাবার মতো পরম আগ্রহে নাম-ঠিকানা লিখে দিল। আমি কোষ্টারের মুখের দিকে তাকালাম। দুজনেই বেশ জানি নিতান্ত কিছু অঘটন না ঘটলে নতুন লোক নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর দিনকাল যা পড়েছে অঘটন ঘটবার কোনো লক্ষণই নেই। এ লোকটি ডুবেছে তো ডুবেছেই।

বেচারা আরো কত কথা বলে গেল, অনেকটা যেন জ্বরের ঘোরে। ততক্ষণে নিলাম শেষ হয়ে গেছে। ফাঁকা উঠোনটাতে শুধু আমরা ক'জনই দাঁড়িয়ে আছি। শীতকালে কেমন করে গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে ও তারই দু-একটা সন্ধান আমাদের বাত্‌লে দিল। বারবার কেবল গাড়িটার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারপরে নিজেই চুপ করে গেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'চল এলবার্ট, এবার যাওয়া যাক্।'

করমর্দন করে ওদের বিদায় দিলুম। ওরা যখন অনেকটা দূর চলে গিয়েছে তখন আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি একটি ছোটখাটো বৃদ্ধামতো স্ত্রীলোক একটি টিয়াপাখির খাঁচা হাতে যাচ্ছে। এক পাল ছেলেমেয়ে ওকে ঘিরে ধরেছে। বুড়ি তাদের খেদাতে ব্যস্ত। কোষ্টার গাড়ি থামিয়ে বলল, 'আসবেন আমাদের গাড়িতে ?'

'ক্ষেপেছ ! যা দিন কাল—ট্যাক্সি চড়বার পয়সা কোথায় ?'

অটো বলল, 'পয়সা লাগবে না ; আজকে আমার জন্মদিন কিনা। তাই ফুর্তি করে একটু গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছি।'

বুড়ি খুব সন্দিগ্ধ ভাবে খাঁচাটিকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'বাবা, বিশ্বাস তো নেই শেষ পর্যন্ত যদি কিছু খসিয়ে দাও।'

কোষ্টার আর এক দফা আশ্বাস দিল তবে সে গাড়িতে উঠে বসল।

যথাস্থানে পৌঁছে যখন গাড়ি থেকে নামছে তখন জিগগেস করলুম, 'বুড়ি-মা, এই টিয়াপাখিটি কিনেছ কেন?'

বুড়ি বলল, 'রাত্তিরবেলার জন্যে। আচ্ছা, ওর খাওয়ার খরচা খুব বেশি পড়বে নাকি?'

বললুম, 'না। কিন্তু রাত্রিবেলার জন্য মানে?'

বৃদ্ধা দুই কাতর চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। 'বুঝছ না বাবা, ও কথা তো বলতে পারবে। তবু ঘরে একটা পেরানী রইল, সময়-সময় কথা কইতে পারবে।'

বললুম, 'ঠিক, ঠিক বলেছ—বুড়ি-মা।'

বিকেলের দিকে পাঁউরুটিওয়ালা এল তার ফোর্ড গাড়ি নিতে। লোকটার বিরস বদন, মেজাজ খিটখিটে। আমি উঠোনে একলা দাঁড়িয়েছিলুম। জিগগেস করলুম, 'কেমন, রঙটা পছন্দ হয়েছে?'

বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ না করে লোকটি বলল 'এই চলনসই রকম।'

'যাই বলুন, সিট-ফিট্ ঢাকনা-টাকনাগুলো বেশ দেখাচ্ছে।'

'তা বই কি—'

লোকটা কেবলই এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, যাবার নাম নেই। ভাবলুম ও আরো কিছু আদায় না করে ছাড়বে না—ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতি কিম্বা এ্যাশ-ট্রে কিম্বা আর কিছু। কিন্তু পরে দেখলুম আমার অনুমান ঠিক নয়। লোকটি আরো খানিকক্ষণ এধার-ওধার করল এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখল। তারপরে হঠাৎ দুই আরক্ত চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি আশ্চর্য, একবার ভাবুন তো, এই সেদিনও এখানটায় বসেছিল—নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, জীবন্ত—'

ওর মুখে হঠাৎ এ ধরনের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেলুম। মনে-মনে ভাবলুম সেদিন সাজিয়ে-গুজিয়ে যে জ্যান্ত সঙ্‌টিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে নিশ্চয় ইতিমধ্যেই ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে।

'সত্যি এমন স্ত্রী হয় না, মশাই। কি আর বলব—রত্ন। কখনো মুখ ফুটে কিছু চায়নি। দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে একটি মাত্র কোট দিয়ে। ব্লাউজ ইত্যাদি বানিয়েছে নিজের হাতে। শুধু কি তাই? ঝি-চাকর ছিল না, ঘরের সব কাজ নিজেই করেছে!'

মনে-মনে বললুম, 'আহা, নয়া গিন্নি নিশ্চয় ওসব করেন না, বেশ বোঝা যাচ্ছে।' আগের স্ত্রী যে কত হিসেব-কিতেব করে চলত বিনিয়ে-বিনিয়ে তাই আমাকে বলতে লাগল। লোকটি নিজে তো একটি জুয়াড়ী। স্ত্রী নিজে কষ্ট করে টাকা

বাঁচিয়ে গেছে, সেইটেই এখন ওর বুকে বাজছে। বেচারী কখনো একটি ফটোগ্রাফ তোলেনি, বলতো মিথ্যে খরচা করে কি লাভ। বিয়ের সময়কার একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ আর দু-একটা স্ন্যাপ ছাড়া কোনো ফটো নেই বললেই হয়।

ওর কথা শুনে হঠাৎ মাথায় এক ফন্দি খেলে গেল। বললুম, 'কোনো ছবি আঁকিয়েকে দিয়ে বেশ ভালো একটি পোর্ট্রেট্ করিয়ে নিন না। তাহলে বরাবরকার মতো একটা চিহ্ন থাকে। ফটোগ্রাফ তো বেশি দিন থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের জানাশোনা আর্টিস্ট আছেন, তিনি এ ধরনের কাজ করেন।' ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ-এর কথা ওকে বুঝিয়ে বললুম। লোকটা অতিমাত্রায় শেয়ানা; ভয় হয়েছে পাছে আবার খরচান্ত হতে হয়। আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, দাম যাতে বেশি না পড়ে দেখব।' ও তবু পালাতে পারলে বাঁচে। আমি ছাড়ছিনে। অনেক রকমে বুঝিয়ে বললুম, 'আপনার স্ত্রীর প্রতি যখন আপনার এত টান রয়েছে তখন এটাকে এমন কিছু খরচা মনে করা উচিত নয়।' অনেক কষ্টে রাজী করানো গেল। তক্ষুনি ফোন করে ফার্ডিনাণ্ডকে বললুম, কি ভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তারও একটু আঁচ দিয়ে রাখলুম। তারপরে পাঁউরুটিওয়ালার গাড়ি করেই গেলুম ওর বাড়িতে তার স্ত্রীর ফটোগ্রাফ আনবার জন্যে।

আমাদের দেখেই কৃষ্ণনয়না দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। বারকয়েক ফোর্ড গাড়িকে প্রদক্ষিণ করে দেখল। 'রঙটা লাল হলে দেখতে ঢের ভালো হত পুপ্‌পি, কিন্তু তুমি তো তোমার গোঁ কিছুতেই ছাড়লে না।'

পুপ্‌পি বিরস কণ্ঠে জবাব দিল. 'এতেই ঢের হবে।'

আমরা বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম, কৃষ্ণনয়না আমাদের অনুসরণ করল। তার চঞ্চল দৃষ্টি সর্বত্র বিস্তারিত। পাঁউরুটিওয়ালার সাহস যেন কিঞ্চিত স্তিমিত হয়ে আসছে। অন্তত ওর চোখের সামনে ফটোগ্রাফ খুঁজবার সাহস বা ইচ্ছে ওর নেই। শেষটায় খুব রোখা চোখা ভাবেই বলল, 'যাও-যাও, এখন যাও।'

স্ত্রী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'ইস, খুব যে কর্তাত্বি দেখানো হচ্ছে।'

আঁট-সাঁট জামার তলায় বুক দোলাতে-দোলাতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাঁউরুটিওয়ালা তখন সবুজ একটি অ্যালবাম থেকে দুখানি ছবি বের করে আমাকে দেখাল। একটিতে সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী ও নিজে পাশে দাঁড়িয়ে গোঁফে চাড়া দেওয়া। মেয়েটি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটিতে অতিশয়

শীর্ণ কর্মক্লান্ত একটি রমণীমূর্তি, চোখে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি—চেয়ারের এক প্রান্তে কুঁচকে বসে আছে। ব্যস, দুটি মাত্র ছবিতে একটি সমগ্র জীবনের কাহিনী।

ফ্রক-কোট গায়ে ফার্ডিনাণ্ড আমাদের অভ্যর্থনা করল। খুব গুরু-গম্ভীর মূর্তি। ওটা তার ব্যবসার অঙ্গ। জানে শোকার্তদের কাছে শোকের চাইতে শোকের প্রতি সম্মান দেখানোটাই বড় কথা; শ্রাদ্ধের চাইতে শ্রদ্ধা বড়। স্টুডিয়োর দেয়ালে সোনালী ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি বড়-বড় তৈলচিত্র। আর যে সব ছোট ছোট ফটোগ্রাফ থেকে ঐ সব পোর্ট্রেট করা হয়েছে সেগুলোও তারই তলায় টাঙানো আছে। খদ্দের যাতে দেখবামাত্রই বুঝতে পারে কি জিনিস থেকে কি জিনিস হয়েছে।

ফার্ডিনাণ্ড পাঁউরুটিওয়ালাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল, জিগগেস করল কি ধরনের জিনিস সে চায়। খদ্দের প্রথমেই জানতে চাইল দামটা ছবির আকারের উপরে নির্ভর করে কিনা। ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'দাম সাইজের দরুন ততটা নয় যতটা স্টাইলের দরুন।' পাঁউরুটিওয়ালা তৎক্ষণাৎ জানাল যে ছবি যথাসাধ্য বড় সাইজের হলেই তার পছন্দ।

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'নিশ্চয়ই আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়। এই যে ছবিটি দেখছেন, এটি হল প্রিন্সেস বার্গিজ-এর। ফ্রেমসুদ্ধ দাম পড়েছে আটশো মার্ক।'

পাঁউরুটিওয়ালা হতবাক। 'এঁ্যা—আচ্ছা ফ্রেম ছাড়া?'

'সাতশো কুড়ি।'

খদ্দের চারশো পর্যন্ত দিতে রাজী হল। ফার্ডিনাণ্ড তার বিশাল মাথাটি নেড়ে বলল, 'চারশো মার্কে বড় জোর প্রোফাইল হতে পারে, পুরো মুখ নয়। পুরো আঁকতে ডবল খাটুনি, বুঝতেই তো পারছেন।'

পাঁউরুটিওয়ালা ভেবে-টেবে বলল, 'তা প্রোফাইল হলেই চলবে।' ফার্ডিনাণ্ড তখন বুঝিয়ে বলল, 'তা হয় না, দুটো ফটোতেই পুরো মুখ রয়েছে। স্বয়ং টিসিয়ান্ এলেও এর থেকে প্রোফাইল আঁকতে পারবেন না।' পাঁউরুটিওয়ালা ততক্ষণে ঘেমে উঠেছে। ভাবছে, আহা, ফটোগ্রাফ তুলবার সময় যদি এসব কথা খেয়াল থাকত। অবশ্য স্বীকার করতে হল যে ফার্ডিনাণ্ডের কথা অতি সঙ্গত, কারণ প্রোফাইলের চাইতে সম্পূর্ণ মুখের কাজ বেশি সন্দেহ নেই। কাজেই দামও বেশি হতে বাধ্য।

কিন্তু বেচারা কিছুতেই মন স্থির করতে পারছে না। ফার্ডিনাণ্ড এতক্ষণ খুবই

গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু এখন নানাভাবে ওকে ভজাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার গম্ভীর মোটা গলার আওয়াজে স্টুডিয়ো গম্‌গম্‌ করতে লাগল। আমি নিজে ব্যবসাদার মানুষ, কিন্তু ফার্ডিনাণ্ডের লোক ভজানোর ক্ষমতা দেখে অবাক হলুম। পাঁউরুটিওয়ালাকে বাগে আনতে বেশিক্ষণ লাগল না। বিশেষ করে ফার্ডিনাণ্ড যখন ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করে বলল, 'এই রকম একটি বিরাট ছবি ঘরে নিয়ে টাঙাতে পারলে হিংসুটে প্রতিবেশীদের মনের অবস্থাটা কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন।' ব্যাস, আর যায় কোথায়?

'আচ্ছা তবে—কিন্তু একটি কথা, নগদ দাম দিলে দশ পার্সেন্ট কম।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'বেশ, রাজী। দশ পার্সেন্ট ছুট, কিন্তু খরচা বাবদ—রঙ, ক্যানভাস ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা আগাম চাই। ধরুন তিনশো মার্ক।'

আবার খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়ে ছবির খুঁটিনাটি নিয়ে আবার আলোচনা চলল। পাঁউরুটিওয়ালার ইচ্ছে একটি মুক্তোর নেকলেস আর হীরে-বসানো একটি সোনার ব্রোচ ছবিতে জুড়ে দিতে হবে। এই কাজটি উপরি, কারণ ফটোতে ঐ দুটি জিনিস নেই।

ফার্ডিনাণ্ড তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বলল, 'তা তো বটেই। আপনার স্ত্রীর গয়না অবশ্যই ছবিতে থাকা প্রয়োজন। তবে কিনা যদি ঘণ্টাখানেকের জন্য জিনিসটা একবার আমাকে এনে দেখান সুবিধে হয়; যেমন দেখতে ছিল হুবহু তেমনি এঁকে দিতে পারি।'

রুটিওয়ালার মুখ লাল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ—তা—জিনিসটা এখন আমার কাছে নেই কিনা, ওর আত্মীয়দের কাছে রয়েছে।'

'থাক, ওতে কিছু যাবে আসবে না। আচ্ছা,' ফার্ডিনাণ্ড জিগগেস করল, 'ব্রোচটা দেখতে কেমন ছিল বলুন তো? ধরুন, ঐ ওদিককার ছবিটাতে যেমন আছে সে রকম দেখতে কি।'

রুটিওয়ালা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তবে অত বড় নয় অবিশ্যি।'

'বেশ, তাহলে ঠিক ঐ রকমই করে দেব। আর নেকলেসও আনতে হবে না। মুক্তো তো সবই এক রকম দেখতে, আমি ঠিক এঁকে দেব।'

রুটিওয়ালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। 'আচ্ছা, ছবি কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে?'

'এই ধরুন ছ-হপ্তা লাগবে।'

'বেশ, তাই,' বলে পাঁউরুটিওয়ালা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

স্টুডিয়োতে আর কেউ নেই, শুধু আমি আর ফার্ডিনাণ্ড। ওকে জিগগেস করলুম, 'সত্যি-সত্যি ছ-হপ্তা লাগবে নাকি তোমার ?'
'হুঁঃ, তুমিও যেমন। বড় জোর চার-পাঁচ দিন। কিন্তু তাকে তো সে কথা বলা যায় না। ও তক্ষুনি হিসেব করতে বসবে আমি ঘণ্টায় কত রোজগার করি। তারপরে মাথায় হাত দিয়ে ভাববে, আমি ওর সঙ্গে ডাকাতি করেছি। ছ-হপ্তা শুনে ও খুশি হবে। আর ঐ প্রিন্সেস বাগিজ-এর কথাটাও বেমালুম ফাঁকি। আরে বব্ ভায়া—মানুষের স্বভাব তো—যদি খোলাখুলি বলতাম ও দর্জির স্ত্রী তবে কি আর ঐ ছবি দেখে ওর ভক্তি-ছেদ্দা হত। তাছাড়া, মৃতা স্ত্রীকে গয়না পরাবার প্রস্তাবটাও আমার কাছে মোটেই নতুন নয়। এই নিয়ে ছ'জন হল। এর আগে আরো পাঁচজন ঐ কথা বলেছে। দেখলে, আশ্চর্য মানুষের মনের মিল!'
আমি পিছন ফিরে একবার দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো তাকিয়ে দেখলুম। এর মধ্যে কিছু-কিছু ছবি মালিকরা মোটে নেয়নি, দামও দেয়নি। প্রাণহীন মূর্তিগুলো দেয়ালের ফ্রেম থেকে নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছে। কতকাল আগে এদের নশ্বর দেহ কবরের মাটিতে মিশে গেছে। কিন্তু একদিন এরা জীবিত ছিল, জীবনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে গেছে! 'আচ্ছা ফার্ডিনাণ্ড, এসব কথা ভাবলে তোমার মনে কষ্ট হয় না ?'
ফার্ডিনাণ্ড ঘাড় নেড়ে বলল, 'উহুঁ, কষ্ট হবে কেন ? বরং হাসি পায় বলতে পার। জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবলে তবেই মনে বিষাদ আসে। কিন্তু লোকে জীবন নিয়ে যা ছেলেখেলা করে তা দেখলে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু মনে আসে না।'
'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু সবাই ছেলেখেলা করে না। কেউ-কেউ অন্তত জীবনকে গভীরভাবে দেখতে জানে!'
'জানে বৈকি। কিন্তু তারা কক্ষনো ছবি আঁকাতে আসে না।' বলতে-বলতে ফার্ডিনাণ্ড উঠে দাঁড়াল। 'তা, বব্ এটাই বা মন্দ কি ? যদ্দিন ফুর্তি করা যায়—নিজেকে কোনোরকমে ভুলিয়ে রাখতে হবে তো। নইলে সংসারে চলা দায়। কারণ একদিন না একদিন ভুল ভাঙবেই। বুঝবে, সংসারে কেউ কারো নয়—প্রত্যেকেই নির্জন, নিঃসঙ্গ। সেই দিনটাকে যতদূর ঠেকিয়ে রাখা যায় ততোই ভালো। ভেবে দেখ তো, যেদিন সব মোহ কেটে যাবে, সংসারে নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হবে সেদিন পাগল হওয়া ছাড়া কিম্বা আত্মহত্যা ছাড়া কি আর কোনো উপায় থাকবে ?'

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে আসবাবপত্রহীন প্রকাণ্ড ঘরটাকে দেখাচ্ছিল একটা কবরখানার মতো। পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—ক্রমাগত পায়চারি করছে। নিশ্চয় ওর ল্যাণ্ডলেডি। আমরা কেউ এলে ও কখনো এ ঘরে আসে না। আমাদের উপরে ওর রাগ আছে, ও ভাবে আমরা কেবলই গ্রাউ এর কাছে ওর নামে লাগাই।

ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে রাস্তার কোলাহলটা বেশ লাগল। উষ্ণ জলে অবগাহনের মতো আরামদায়ক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্যাট্-এর বাড়ি যাচ্ছিলুম। এই প্রথম আমি ওর বাড়িতে যাচ্ছি। ইতিপূর্বে হয় ও আমার ওখানে এসেছে নয়তো ওর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও ওর সঙ্গে দেখা করেছি। পরে দুজনে মিলে কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ যাই হোক এ পর্যন্ত আমাদের পরিচয়টা হয়েছে খুব ঢিলে গোছের। এখন ওকে আর একটু ভালো করে জানবার আমার ইচ্ছে হয়েছে। কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে তাই দেখতে হবে।

নাগরদোলাগুলোর পিছন দিকে যে পার্কটা সেটা ফুলে-ফুলে ভরে গেছে। কি খেয়াল হল এক লাফে রেলিং পার হয়ে দুহাতে লাইলাক্ ফুল লুট করতে লাগলুম।

হঠাৎ শুনি পিছন থেকে কে কর্কশ কণ্ঠে জিগগেস করছে, 'কি করছ হে বাপু?' তাকিয়ে দেখি টকটকে লাল মুখ আর শাদা গোঁফওয়ালা একটা লোক কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পুলিসের লোক নয়, বাগানের মালি তো নয়ই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয় কোনো মিলিটারি অফিসার, সম্প্রতি অবসর নিয়ে থাকবে।

ভদ্রভাবেই জবাব দিলুম, 'দেখতেই পাচ্ছেন, কটা লাইলক্ ফুল নিচ্ছি।' লোকটা এত চটেছে যে কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল. 'জানো না এটা সরকারি বাগান।'

আমি একগাল হেসে বললুম, 'বলেন কি? আমি ভেবেছিলাম এটা ক্যানারি দ্বীপ —সেই যেখান থেকে হলদে রঙের ক্যানারি পাখি আসে, সুন্দর গান করে।'

ভদ্রলোকের লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। ভয় হচ্ছে লোকটা রাগে হঠাৎ ফিট না হয়ে যায়। একেবারে মিলিটারি গলায় গর্জন করে উঠল, 'এখান থেকে বেরোও এক্ষুনি, পাজি কোথাকার। নইলে তোমাকে এক্ষুনি পুলিসে দিচ্ছি।'

ফুল যা নেবার আমার নেওয়া হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'এস না দাদু, কেমন আমাকে ধর, দেখি।' বলেই ওদিককার রেলিঙ টপ্‌কে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

প্যাট্‌-এর বাড়ির দরজায় পৌঁছে পোশাকটা একবার একটু দেখে নিলুম। তারপরে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলুম। বাড়িটা নতুন, হাল-ফ্যাশানের। আমার বাড়ির মতো জীর্ণ কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি নয়। সিঁড়িতে লাল কার্পেট বিছানো—ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বাড়িতে ও সব বালাই নেই। লিফ্‌ট-এর তো প্রশ্নই ওঠে না।

প্যাট্‌ থাকে তিন-তলায়। দরজায় খুব চটকদার পেতলের প্লেটে লেখা—'এগবার্ট ফন্‌ হাকে, লেফটেনাণ্ট কর্নেল।' বেল টেপবার আগে নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার টাইটা ঠিক করে নিলুম।

মাথায় শাদা টুপি, গায়ে শাদা এপ্রন-পরা একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। দিব্যি পরিচ্ছন্ন মূর্তি। আমাদের ট্যারা-চোখ নোংরা ফ্রিডার সঙ্গে স্বর্গ মর্তের তফাত! ওকে দেখে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। মেয়েটি জিগগেস করল, 'আপনি হের্‌ লোকাম্প্‌ তো?'

ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হ্যাঁ।'

আর কোনো কথা না বলে মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ; সিঁড়ির ধার দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটি দরজা খুলে দিল। ছোট্ট বসবার ঘর, চারিদিকের দেওয়াল থেকে বড়-বড় সৈন্যাধ্যক্ষের ছবি ঝুলছে। জমকালো সামরিক পোশাক পরা মূর্তিগুলি খুব যেন অবজ্ঞার সঙ্গে আমার সিভিলিয়ান পোশাকের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরটার ভিতরে এমনি একটা সামরিক আবহাওয়া যে দরজা খোলবামাত্র যদি লেফটেনাণ্ট কর্নেল এগবার্ট ফন্‌ হাকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত তবে কিছুমাত্র অবাক হতুম না। কিন্তু বাঁচা গেল—ঐ যে প্যাট্‌ দ্রুতপদে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে ঘরের চেহারা গেল বদলে, একটি উষ্ণ আনন্দস্রোত ও যেন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে ওকে ধীরে বুকে টেনে নিলুম! চুরি-করা লাইলাক্‌-গুচ্ছ ওর হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নাও টাউন কাউন্সিলের সাদর সম্ভাষণ সমেত।' ফুলগুলি নিয়ে ও একটি সুদৃশ্য মৃৎপাত্র করে জানালার ধারে রেখে দিল। আমি ইতিমধ্যে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। ফিকে মৃদু রঙ, চোখকে একটুও পীড়া দেয় না। আসবাবপত্রে

রুচির প্রকাশ, নীলচে রঙের কার্পেট, মনোরম পরদা, ভেলভেটের ঢাকনা-দেওয়া আর্মচেয়ার। 'বাঃ, এমন একটি ঘর কেমন করে যোগাড় করলে, প্যাট্? ভাড়াটে ঘর তো দেখেছি যত ভাঙাচোরা আসবাব আর জন্মদিনে-পাওয়া বাজে প্রেজেণ্ট দিয়ে ঠাসা থাকে।'

প্যাট্ ফুলদানিটি সযত্নে দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল। ওর ঋজু-দীর্ঘ গ্রীবা, অনাবৃত বাহুটি দেখতে পাচ্ছি। আগের চাইতে একটু যেন শীর্ণ। হাঁটু গেড়ে বসে যখন ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখছিল ওকে দেখাচ্ছিল একটি শিশুর মতো— শিশুর মতো অসহায়। কিন্তু ওর হাঁটা চলা হাবভাবের মধ্যে বনের প্রাণী-সুলভ বিশেষ একটি শ্রী আছে। ওখান থেকে উঠে আমার গা ঘেঁষে যখন দাঁড়াল তখন আর ওকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয়নি। ওর চোখে মুখে কি এক অজ্ঞাত রহস্যের ইঙ্গিত আমার মনকে নেশায় মাতাল করে তুলছিল। ওকে জানবার আগে ভেবেছিলাম এই পোড়া সংসারে রহস্য বলে আর কোনো জিনিস নেই। কোনোরকম মোহের অবকাশ নেই।

দুহাত দিয়ে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরলুম। বাহুবন্ধনের মধ্যে ওর স্পর্শটি বেশ লাগছিল। ও বলল, 'যে সব জিনিস দেখছ সবই আমার নিজের, বব্। এ বাড়িটা ছিল আমার মায়ের। মা মারা যাবার পরে এই দুটি ঘর নিজের জন্য রেখে আর সব ভাড়া দিয়ে দিয়েছিলুম।'

'ওঃ, তাহলে বাড়িটা তোমার? লেফটেনাণ্ট কর্নেল এগবার্ট ফন্ হাকে তোমার ভাড়াটে?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, এখন আর বাড়ি আমার নয়। বাড়িটা রাখতে পারলুম না, বাকি সব আসবাবপত্রও বিক্রি করে দিয়েছি। আমিই এখন এ-বাড়ির ভাড়াটে। কিন্তু বুড়ো এগবার্টের প্রতি তোমার বিরাগের কারণ কি।'

'কিছুই না। শুধু পুলিসের লোক আর স্টাফ্ অফিসার ঠিক আমার ধাতে সয় না। আর্মিতে থাকবার সময় থেকেই ও রকম হয়ে গেছে।'

ও হেসে বলল, 'আমার বাবা ছিলেন মেজর। যাক, বুড়ো হাকেকে তুমি চেনো নাকি?'

হঠাৎ আমার ভীষণ ভয় হল। বললুম, 'আচ্ছা দেখতে কেমন বল তো? বেঁটে, খুব সোজা হয়ে চলে, লাল টকটকে মুখ, শাদা গোঁফ, খুব চেঁচিয়ে কথা কয়, প্রায়ই পার্কে বেড়াতে যায়—কেমন তো?'

প্যাট্ একবার আমার মুখের দিকে একবার লাইলাক্ ফুলের দিকে তাকিয়ে

হাসতে-হাসতে বলল, 'না, না, উনি বেশ লম্বা, মুখের রঙ ফ্যাকাশে, চোখে শেলের চশমা।'

তাহলে 'আমি তাকে চিনিনে।'

'পরিচয় করবে ওঁর সঙ্গে ? বেশ চমৎকার লোক।'

'রক্ষে কর। এখন আমি হলুম গিয়ে জাতে মিস্ত্রি, জালেওয়াস্কির সমাজের লোক। ওসব আমার পোষাবে কেন ?'

দরজায় শব্দ হল। আগের সেই মেয়েটি ছোট্ট একটি ট্রলি ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকল পর্সিলেন-এর পাত্র, রুপোর ডিশ-এ কেক্, ছোট-ছোট স্যাণ্ডউইচ্, টেবিল ন্যাপকিন্, সিগারেট ইত্যাদি বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার। দেখে আমি চমৎকৃত।

'কি কাণ্ড, প্যাট্, এ যে ঠিক সিনেমার মতো দেখতে। আমার দশা তো জানো, জালেওয়াস্কির জানালার পৈঠেতে রেখে গ্রিজ-প্রুফ কাগজে খাওয়া আমার অভ্যেস। আর আমার কুকারটি তো দেখেছই। কাজেই অনভ্যাসের দোষে লক্ষ্মীছাড়া লোকটা যদি এক-আধটা কাপ ভেঙে চুরমার করে দেয় তো কিছু মনে করো না যেন।'

ও হেসে বলল, 'ভাঙতে তুমি পারবে না। শত হলেও মেকানিক মানুষ তো, কিছু ভাঙতে গেলে তোমার ব্যবসার বিবেকে লাগবে। বিশেষ করে হাতের কায়দা তোমার জানা আছে।' একটি জগ্ টেনে নিয়ে বলল, 'কি চাই বব্, চা না কফি ?'

'চা না কফি ? অ্যাঃ, তাহলে দুটোই আছে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ দুটোই, এই দেখ না।'

'আঃ, খাসা। এ যে একেবারে স্বর্গ। এতটু বাজনা-টাজনার ব্যবস্থা থাকলে আর কথাই ছিল না।'

প্যাট্ একদিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট রেডিয়োটি চালু করে দিল। এতক্ষণ ওটা আমার নজরেই আসেনি।

'আচ্ছা, এবার বল দেখি—চা না কফি ?'

'কফি, প্যাট্, কফি। তুমি কি খাবে ?'

'আমিও তোমার সঙ্গে কফিই খাব।'

'কিন্তু সাধারণতঃ তুমি চা-ই খাও বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চা-ই খাওয়া যাক।'

'না, এখন থেকে আমিও তোমার মতো কফি খাবার অভ্যেস করব। সঙ্গে কেক্ খাবে না স্যাণ্ডউইচ্ ?'

'দুটোই খাব। হাতের কাছে জুটলে কিছু ছাড়তে নেই। পরে একটু চা-ও খাব। তোমার যা আছে সবই একটু চেখে দেখতে হবে।'

হাসতে-হাসতে ও আমার প্লেট ভরতি করে দিল। আমি বললুম, 'আরে ঢের ঢের, ভুলে যাও কেন পাশেই যে আবার লেফটেনাণ্ট কর্নেল রয়েছেন। আর্মিতে আবার পান-ভোজনের খুব কড়াকড়ি কিনা—অবিশ্যি সেটা কেবল সাধারণ সৈনিকদের বেলায়।'

'বব্, যাই বল, কড়াকড়িটা শুধু পানীয় সম্বন্ধে। নইলে বুড়ো এগবার্ট নিজেই তো দেখি কেক্ খেতে খুব ভালোবাসে।'

আমি বললুম, 'শুধু যদি পান ভোজনে কড়াকড়ি হত তাহলেও হত। কোনোরকম আরামের উপায়ই ছিল না। কর্তারা আমাদের মন থেকে আরামের চিন্তা একেবারে উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন।' কথা বলছি আর রবারের চাকা-লাগানো টেবিলটিকে একবার এদিক একবার ওদিক ঠেলছি। চাকা-লাগানো বলে এটাকে দেখলেই ঠেলতে ইচ্ছে করে। কার্পেটের উপর দিয়ে খুব নিঃশব্দে ওটা গড়াতে থাকে। আর একবার চারদিকটা তাকিয়ে দেখলুম প্রত্যেকটি জিনিস ঘরের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। হ্যাঁ, থাকতে হলে এইভাবেই থাকা উচিত। প্যাটকে বললুম, 'আমাদের বাপ-দাদারা ঠিক এমনি ভাবেই বাস করতেন।'

ও হেসে বলল, 'কি সব বাজে বকছ ?'

'বাজে কথা নয় হে। এই হচ্ছে এ-যুগের ভাবনা।'

'বব্ এই যে দু-চারটি জিনিস আমার আছে সেটা নেহাতই দৈব কৃপায় বলতে হবে।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'উঁহু দৈবের কথা নয়, এমন কি ঐ জিনিসগুলোর কথাও আমি ভাবছিনে। ভাবছি এ সবের পশ্চাতে যা রয়েছে তারই কথা। সেটা তোমার চোখে পড়বার কথা নয়। যারা এর বাইরে তারাই শুধু দেখতে পারে।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু ইচ্ছে করলে তুমিও এসব জিনিস অনায়াসেই পেতে পারো।'

ওর হাতখানা হাতের মুঠিতে নিয়ে বললুম, 'কিন্তু প্যাট্, ওসব যে আমি চাইনে। যাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, সুখের জীবন, তাদেরই এসব পোষায়। আমরা হলাম গিয়ে ভবঘুরে মানুষ, যে কোনো মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে

হবে। পথের মানুষ পথে থাকাই আমাদের অভ্যেস। এ-যুগের নিয়মই তাই।'
প্যাট্ বলল, 'তা সেটাও কিছু খারাপ নয়।'
আমি হেসে বললুম, 'হতে পারে। আচ্ছা, এবার একটু চা দাওতো, চেখে দেখি।'
ও বলল, 'না। কফি খাচ্ছি, কফিই খাব। কিন্তু আরও কিছু খাও, কি জানি যদি তোমাকে আবার এক্ষুনি পথে বেরোতে হয়?'
'ঠিক বলছ। কিন্তু এগ্‌বার্ট বেচারা কেক্ অতো ভালোবাসে। নিশ্চয় আশা করে আছে ওর জন্যে কিছু থাকবে।'
'আশা করুক না। কিন্তু তারও মনে রাখা উচিত যে সেপাই সুযোগ পেলেই লেফটেনান্ট কর্নেল-এর উপর প্রতিশোধ নেবে। এটাও তো এ-যুগের নিয়ম। তুমি সবটুকু খেয়ে ফেল সেই ভালো।'
ওর চোখ দুটো জলজল করছে আর ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি বললুম, 'জানো, আবার যখন পথে বেরোব তখন একটি জিনিস সঙ্গে নিতে ভুলব না।'
ও কোনো জবাব দিল না, আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। বললুম, 'কোন জিনিসটি বুঝলে তো?—তোমাকে। আচ্ছা, এখন তবে এগবার্টের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া যাক।'
লাঞ্চ-এর সময় শুধু এক প্লেট স্যুপ খেয়েছিলাম। কাজেই বাকি খাবারগুলো নিঃশেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। আর প্যাট্-এর কাছে উৎসাহ পেয়ে কফির জগ্‌টিও শেষ করে দিলুম।

জানালার কাছে দুজনে বসে ধূমপান করতে লাগলুম। বাড়ির ছাতে-ছাতে সন্ধ্যের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। আমি বললুম, 'জায়গাটি সত্যি বড় সুন্দর। আমার তো মনে হয় বাইরে না বেরিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানটাতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাইরে আজে-বাজে কি ঘটছে না ঘটছে দিব্যি ভুলে থাকা যায়।' ও হেসে বলল, 'এক সময় তো আমি সত্যি ভেবেছিলুম এখান থেকে বুঝি আর বেরোনো হবে না।'
'কি রকম?'
'তখন আমার খুব অসুখ।'
'সে কথা আলাদা। কিন্তু কি হয়েছিল?'
'এমন কিছু নয়। কিন্তু সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হত। তখন আমার বাড়ন্ত শরীর কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পাইনি। বোধকরি সেজন্যেই—জানোই

তো লড়াইয়ের সময় এবং তার পরেও খাবার-দাবার যথেষ্ট পাওয়া যেত না।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'হুঁ, কতদিন শয্যাগত ছিলে?'

'প্রায় এক বছর।'

'সে তো অনেক দিন!' খানিকক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম।

ও বলল, 'থাক, সে সব কেটে গেছে। কিন্তু তখন মনে হত যেন অফুরন্ত কাল বিছানায় শুয়ে আছি। তোমার মনে আছে একদিন বার্-এ তুমি আমাকে ভ্যালেন্‌টিন্‌-এর কথা বলেছিলে? লড়াই থেকে ও যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে সেই আনন্দটা ও কিছুতেই ভুলতে পারত না। ঐ আনন্দেই সে এত মশগুল হয়ে আছে যে আর কোনো কথা ভাবতেই চায় না।'

আমি বললুম, 'তোমার তো দেখছি কথা খুব মনে থাকে।'

'ও কথা আমি মর্মে-মর্মে বুঝেছি কিনা। সেই অসুখের পর থেকে আমিও একটুতেই খুশি। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি বুঝি খুব খেলো প্রকৃতির মানুষ।'

'যারা খেলো নয় বলে বাহাদুরি করে তারাই আসলে খেলো প্রকৃতির মানুষ।'

'কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি তাই। সংসারে যা আসল বস্তু, নিত্য বস্তু তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। শুধু চোখে যেটুকু ভালো লাগে সেটুকু পেলেই আমি খুশি। এই যে লাইলাক ফুল কটি এই যথেষ্ট, ওতেই আমার সুখ।'

'এটা তো খেলো প্রকৃতির লক্ষণ নয়, প্যাট্। ওখানেই জীবনের মূল তত্ত্ব, সকল জ্ঞানের নির্যাস।'

'না, আমার বেলায় নয়। সত্যি আমি অত্যন্ত খেলো, অত্যন্ত ছ্যাবলা।'

'তাহলে আমিও তাই।'

'না, তুমি আমার মতো নও। এই একটু আগে তুমি ভাবনা-চিন্তাহীন সুখের জীবনের কথা বলছিলে, আমি ঠিক তাই। আমি কেবল সুখান্বেষী। মনে-মনে পণ করেছিলুম যেমন করে পারি কিছুদিন অন্তত জীবনটাকে পুরোপুরি ভোগ করব। তা সেটা বুদ্ধিমানের মতোই হোক আর নির্বোধের মতোই হোক, কিছু যায় আসে না! করেছিও তাই।'

আমি হেসে বললুম, 'হঠাৎ এমন বিদ্রোহের ভাব তোমার মধ্যে এল কেমন করে?'

'সবাই মিলে সৎপরামর্শ দিতে লাগল কিনা—ওসব অন্যায়। দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত, টাকা-পয়সা কিছু হাতে রাখা দরকার, চাকরি-বাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম

ভাবনা-চিন্তা কিছুই করব না, খাব-দাব, ফুর্তি করব। অত হিসেব-কিতেব করতে গিয়ে নিজেকে কষ্ট দেব না। তখন আমার মা মারা গিয়েছেন, ওদিকে বহুদিন অসুখে ভুগে সবে সেরে উঠেছি।'

ওকে জিগগেস করলুম, 'তোমার ভাই-বোন কেউ আছে?'

ও মাথা নেড়ে জানাল, 'না।' একটু পরে বলল, 'আচ্ছা তুমিও কি মনে কর আমার কাজটা দায়িত্বহীনের মতো হয়েছিল?'

'না, না, তুমি সাহসের কাজ করেছ।'

'না, সাহস নয়, আমাকে সাহসী বল না। বরং মাঝে-মাঝে আমার ভয়ই হত। থিয়েটারে গিয়ে কেউ ভুল সিট্-এ বসলে যেমন হয় তেমনি—মনে-মনে ভয়ও থাকে অথচ বেরিয়ে আসতেও চায় না।'

'আমি বলব ওটা সাহসেরই কাজ। মানুষ তখনই সাহস দেখায় যখন মনে-মনে ভয় থাকে। আর শুধু সাহস নয় তুমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ। টাকা বাঁচাতে তুমি পারতে না, খরচা হয়েই যেত। ফুর্তি করে টাকার মূল্য তবু বরং কিছু পেয়েছ। কিন্তু কি ভাবে ফুর্তি করতে শুনি?'

'বিশেষ কিছুই না। শুধু নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতুম।'

'খুব ভালো কথা। সংসারে সেটাই তো সব চেয়ে দুর্লভ জিনিস।'

ও হেসে বলল, 'কিন্তু আর বেশি দিন এটা চলবে না। শিগগিরই একটা কিছু নিয়ে আমাকে বসতে হবে।'

'ওঃ তাই বিনডিং-এর সঙ্গে সেদিন ইণ্টারভিউতে গিয়েছিলে।'

ঘাড় নেড়ে প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, বিনডিং-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম ইলেকট্রো গ্রামোফন কোম্পানীর কর্তা ডক্টর ম্যাক্স ম্যাটাস্‌কিট-এর এর কাছে।'

আমি বললুম, 'তা বিনডিং এর চাইতে ভালো কিছু জোটাতে পারলে না?'

'চেষ্টা অবশ্যই করেছিল, কিন্তু পাওয়া গেল না।'

'কবে থেকে কাজে যোগ দিচ্ছ?'

'পয়লা আগস্ট থেকে।'

'ওঃ, তাহলে তো আর বেশি সময় নেই। তবু এর মধ্যে অন্য কিছুর চেষ্টা করা যায়। ইতিমধ্যে খদ্দের হিসেবে আমাদের ধরে নিতে পার।'

'তোমার গ্রামোফেন আছে নাকি?'

'না, একটা এক্ষুনি কিনে নেব। তবে তোমার এই চাকরিটি কিছুতেই আমার মনে ধরছে না।'

ও বলল, 'আমার নিজের কিচ্ছু খারাপ লাগছে না আর তুমি আছ বলে আমার কাজের অনেক সুবিধেও হবে। কিন্তু চাকরিটার কথা তোমাকে না বললেই বোধ হয় ভালো করতুম।'

'তা কেন? বলবে বৈকি। এখন থেকে সব কথা আমাকে বলবে।'

কয়েক মুহূর্ত ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'বেশ বব্, তাই হবে।' ঘরের কোণে ছোট একটি আলমারি। সেটি খুলে বলল, 'তোমার জন্য কি এনে রেখেছি বল তো? রাম্, খুব ভালো রাম্।'

টেবিলে গ্লাশটি রেখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি বললুম, 'বেশ ভালো রাম্, দূর থেকে গন্ধেই বুঝতে পারি। কিন্তু প্যাট্, এখন কিছু টাকা জমালে ভালো হত না? তাহলে গ্রামোফোনের চাকরিটি দেখে শুনে দুদিন পরেও নেওয়া যেত।'

ও বলল, 'না, তা হয় না।'

এদিকে রাম্-এর রঙ দেখেই বেশ বুঝতে পারছি ওটা বাজে মাল। দোকানি মিথ্যে কথা বলে ওকে ঠকিয়েছে। তবু গ্লাশটি নিঃশেষ করে বললুম, 'চমৎকার আর এক গ্লাশ দাও তো। জিনিসটা কোত্থেকে আনলে?'

'এই মোড়ের দোকান থেকে।'

মনে-মনে ভাবলুম, তা তো হবেই, ওগুলো বাজে মাল বিক্রির দোকান। হ্যাঁ, যাবার পথে ব্যাটাকে একটু ধমকে দিয়ে যেতে হবে।

'আচ্ছা, প্যাট্, তবে এবার আমি উঠি?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, এক্ষুনি নয়।'

দুজনে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। নিচের থেকে আলোর কম্পিত রেখা ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। বললুম, 'আচ্ছা, তোমার শোবার ঘরটি একবার আমাকে দেখাবে?'

বলতেই দরজাটি খুলে আলো জ্বালিয়ে দিল। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি ভিতরটা একবার দেখে নিলুম। মুহূর্তে কত এলোমেলো চিন্তা যে মাথায় এসে ভিড় করল। শেষটায় বললুম, 'এ্যাঁ, তাহলে ঐটি তোমার বিছানা?'

ও হেসে বলল, 'তা ছাড়া আর কি হবে, বব্।'

'তাই তো! কি যে মাথামুণ্ডু বকছি। বলতে চাইছিলুম ঐখানটায় তুমি ঘুমোও। আর ঐ বুঝি তোমার টেলিফোন? হ্যাঁ, এখন ঠিক বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হয়। আসি প্যাট্।'

প্যাট্ তার হাত দিয়ে আমার কপাল স্পর্শ করল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এ সময়টাতে এখানে থাকতে পারলে আর কথা ছিল না। ঐ নীল বেড্‌কভারটির তলায় দুজনে পাশাপাশি। কিন্তু নিজে থেকেই লোভ সম্বরণ করলুম। এটা ঠিক সংযমও নয়, ভয়ও নয়। কিম্বা সুবুদ্ধি-প্রণোদিতও নয়। মনটা এমন স্নেহার্দ্র হয়ে উঠেছিল যে লোভ আপনা থেকেই দমন হয়ে গেল।

'আচ্ছা প্যাট্, আসি তবে। তোমার এখানটাতে এসে ভারি ভালো লাগল। কতখানি ভালো লেগেছে তুমি নিজে তা অনুমান করতে পারবে না। বিশেষ করে তোমার রাম্—আমার জন্যে ঐ জিনিসটির কথা যে ভেবেছ—'

'এ আর এমন কি?'

'এই ঢের, প্যাট্। আমার কাছে এর মূল্য অনেক। এমন করে আমার জন্যে আগে কেউ ভাবেনি।'

আবার জালেওয়াস্কির হোটেল-ঘর। খানিকক্ষণ একলা বসেই কাটিয়ে দিলুম। প্যাট্‌কে কোনো কারণে বিনডিং-এর অনুগ্রহপ্রার্থী হতে হয়—এটা একেবারে আমার পছন্দ নয়। ভেবে-চিন্তে শেষটায় প্যাসেজ পার হয়ে আর্না বোনিগ-এর ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। বললুম, 'বিশেষ একটু কাজের কথা বলতে এলুম আর্না, আচ্ছা, মেয়েদের চাকরির বাজার কেমন বল তো?'

আর্না বলল, 'বাঃ! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলে একেবারে সোজাসুজি মোক্ষম প্রশ্ন করেছ। তা, খাঁটি কথা যদি জানতে চাও তো বলব—যদ্দুর হতে পারে খারাপ।'

'কোনো আশা নেই?'

'কি রকম চাকরি শুনি?'

'এই ধর সেক্রেটারী, অ্যাসিস্টাণ্ট কিংবা—'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'হাজারে-হাজারে বেকার বসে আছে। আচ্ছা, ভদ্রমহিলার বিশেষ কোনো কাজে দখল আছে?'

আমি বললুম, 'দেখতে খুব সুন্দরী।'

আর্না জিগগেস করল, 'কত শব্দ লিখতে পারে?'

'কি বলছ?'

'বলছি মিনিটে কত শব্দ লিখতে পারে এবং কটা ভাষায়?'

আমি বললুম, 'তা বলতে পারিনে। কিন্তু আর্না, মানুষের ব্যক্তিগত দিকটাও তো দেখতে হয়! জানোই তো—'

আর্না বলল, 'জানি বাপু খুব জানি—ভালো পরিবারের মেয়ে, এককালে অবস্থা ভালো ছিল, এখন অবস্থাচক্রে বাধ্য হয়ে ইত্যাদি, ইত্যাদি। উঁহু, ওতে কিছু হবে না, কোনো আশা নেই। এক যদি তেমন কোনো দরদী লোক চেষ্টা-চরিত্তির করে মেয়েটিকে ঢুকিয়ে দেয় তবেই হতে পারে। কেন বলছি বুঝতেই তো পারছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই তা চাও না. কি বল ?'

আমি বললুম, 'তোমার প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত।'

আর্না তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'যত অদ্ভুত ভাবছ ততটা নয়। কত ব্যাপার দেখলুম।' ওর নিজের মনিবের কথাই আমার মনে পড়ে গেল। ও বলতে লাগল, 'তোমাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি। আমি বলি কি, নিজেই বেশি করে খাটো, দুজনের আন্দাজ রোজগার কর। আমার মতে এটাই সব চেয়ে সহজ সমাধান। তারপরে মেয়েটিকে বিয়ে কর।'

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, 'খুব তো সহজ উপায় বাতলে দিলে। কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চিন্ত নই।'

আর্না কেমন একরকম মুখ করে আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ ওর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। অত্যন্ত নির্জীব শুষ্ক ওর মূর্তি। বলল, 'তোমাকে একটি কথা বলছি। দেখছ তো, আমি তো বেশ ভালোই আছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক জিনিস ভোগ করছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যে কোনো পুরুষ-মানুষ যদি এসে বলে, আমাকে নিয়ে ঘর করতে চায়, ভদ্রভাবে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে যদি আমাকে নেয় তবে এই মুহূর্তে এই ছাইভস্ম সব ফেলে দিয়ে তার সঙ্গে চলে যাব। দরকার হলে তার সঙ্গে ছাতের চিলে-কোঠায়ও থাকতে রাজী আছি।' ক্রমে ওর মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। বলল, 'থাক, এসব কথা ভুলে যাও—সবার মনেই খানিকটা জোলো আবেগ থাকে।' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ ঠারল। 'তোমার মধ্যেও আছে, বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'ধ্যাৎ, আমি ?—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললে কি হবে ? যখন সব চেয়ে বেশি জোর দেখাতে যাও তখনই মনের দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ে।'

বললুম, 'হুঁ, আমি তেমন নই।'

আটটা অবধি ঘরেই বসে ছিলুম। বসে-বসে ক্লান্ত হয়ে শেষটায় বেরিয়ে পড়লুম

বার-এর দিকে। সেখানে অন্তত কথা বলবার লোক পাওয়া যাবে। ভ্যালেন্‌টিন্‌ ঠিক বসে আছে ওখানে। আমাকে দেখে বলল, 'এস, বস এসে, কী খাবে বল?' আমি বললুম, 'রাম্‌। আজ বিকেল থেকে রাম্‌-এর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা বড় বেড়ে গেছে।'

ভ্যালেন্‌টিন্‌ বলল, 'রাম্‌ই তো সৈনিকদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু বব্‌, তোমাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে বয়স কয়েক বছর কমে গেছে।'

উভয়ে উভয়ের স্বাস্থ্য কামনা করে গ্লাশ মুখে তুললুম। নিঃশেষিত গ্লাশ টেবিলে নামিয়ে রেখে একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপরে দুজনেই অকারণে হেসে উঠলুম। ভ্যালেন্‌টিন্‌ বলল, 'বুড়ো খোকা!'

আমি বললুম, 'বুড়ো মাতাল! আচ্ছা, এখন কি খাওয়া যায়?'

'ঐ জিনিসই আবার।'

'বেশ, তাই।' ফ্রেড্‌ গ্লাশ ভর্তি করে দিয়ে গেল। আবার দুজনের স্বাস্থ্য কামনা হল। এমনি করে আরো বারকয়েক গ্লাশ ঠোকাঠুকি হবার পরে ভ্যালেন্‌টিন্‌ উঠে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি আরো খানিকক্ষণ একলাই বসে রইলুম। ফ্রেড্‌ ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। দেয়ালের গায়ে পুরোনো ম্যাপ আর হলদে পালতোলা জাহাজের ছবিগুলো দেখছি আর বসে-বসে ভাবছি প্যাট্‌-এর কথা। টেলিফোনে ওকে ডাকতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত করলুম। ওর সম্বন্ধে অত করে না ভাবাই ভালো। ওকে দেখা উচিত পড়ে-পাওয়া ভেসে-আসা সামগ্রীর মতো—এসেছে আবার চলে যাবে। চিরকাল আমার কাছে থাকবে এমন আশা মনে স্থান দেওয়াই ভুল। প্রেমিক মাত্রেই মনে করে ভালোবাসা চিরস্থায়ী। এ রকম ভাবে বলেই সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে। এখন আর জানতে বাকি নেই সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়—কিছুই টেঁকে না।

ফ্রেড্‌কে বললুম, 'আমাকে আর এক গ্লাশ দাও তো।'

একটি স্ত্রীলোক সমেত একজন লোক এসে ঢুকল। স্ত্রীলোকটিকে দেখলে মনে হয় অতিশয় ক্লান্ত, পুরুষটির কামুকের মতো চেহারা। বরফ-দেওয়া এক গ্লাশ পানীয় সেবন করে ওরা দুজন আবার বেরিয়ে গেল।

গ্লাশটি নিঃশেষ করে আমি আবার আপন মনে ভেবে চলেছি। প্যাট্‌-এর

ওখানটায় আজ না গেলেই ভালো করতুম। সেই ছবিটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিনে—আধ-অন্ধকার ঘরটি, সন্ধ্যের মৃদু নীলচে আভা, মেয়েটির অতি মনোরম বসবার ভঙ্গি, ঈষৎ ভাঙা গলার স্বর, জীবনকে ভোগ করবার বাসনা, সব মিলিয়ে—দূর ছাই, মনটা বড্ড হ্যাংলামি শুরু করেছে। গোড়ার দিকে ছিল ভালো—এ্যাড্ভেঞ্চারজনিত নিঃশ্বাস-রোধকর একটা উত্তেজনার মোহ ছিল, কিন্তু এরই মধ্যে মনটা স্নেহে গদগদ হয়ে ভিজে জব্জবে হয়ে উঠেছে। ঐ এক চিন্তা মনটাকে পুরোপুরি অধিকার করে বসেছে। আজকেই প্রথম টের পেলুম ভিতরে-ভিতরে আমি কতখানি বদলে গিয়েছি। নইলে আজ ওখান থেকে চলে এলুম কেন? ওর কাছে থেকে গেলেই হত? নাঃ, এসব ছাই-ভস্ম আর ভাববই না। যা হবার হবে—কিন্তু মন যে মানে না। মনে হয় ওকে না পেলে পাগল হয়ে যাব। দূর হোক্—এই তো জীবন! এর আর আঁট-ঘাঁট বেঁধে কি হবে। দুদিন আগে আর পরে এক ঢেউ এসে ভেঙে-চুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

ফ্রেড্কে বললুম, 'এস না, আমার সঙ্গে এক গ্লাস পান করবে।'

ফ্রেড্ বলল, 'বহুত আচ্ছা।'

দু-গ্লাশ পান করবার পর আমি বললুম, 'আরো দু-গ্লাশ হোক।'

হঠাৎ ফ্রেড্কে জিগগেস করলুম, বাইরে মেঘের ডাক শুনছি যেন; না কি নেশার ঝোঁকে অমন মনে হচ্ছে?'

ফ্রেড্ কান পেতে শুনে বলল, 'না, মেঘের ডাকই তো। এ-বছর এই প্রথম ঝড়।' দুজনেই দরজার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালুম। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। একটু গরম হাওয়া দিয়েছে আর ক্ষণে-ক্ষণে মেঘ গর্জন করে উঠছে। আমি বললুম, 'তাহলে ঝড়ের নাম করে আর এক গ্লাশ পান করা যাক।' ফ্রেড্ আপত্তি করবার পাত্রই নয়, তৎক্ষণাৎ রাজী। নিঃশেষিত গ্লাশটি টেবিলে রেখে দিয়ে বললুম, 'নেহাত জোলো পদার্থ, ওষুধের মতো লাগছে।' ফ্রেড সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, একটু কড়া মাল খেলে হত।' ওর ইচ্ছে চেরি ব্র্যাণ্ডি, আমার পছন্দ রাম্। এ নিয়ে ঝগড়া করা বিধেয় নয় সুতরাং আমরা একে-একে দুটোই পান করলাম। বারবার ঢালাঢালি করা ফ্রেডের পক্ষে এক দিকদারি, কাজেই বেশ বড় দেখে গ্লাস নেওয়া গেল। এতক্ষণে আমাদের বেশ একটু রঙিন নেশায় ধরছে। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য দুজনেই বারে-বায়ে বেরিয়ে আসছি। বিদ্যুতের চমকানি দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যেই ভিতরে চলে আসি ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। ফ্রেড্ তার ভাবী বধূর গল্প

জুড়ে দিল। মেয়ের বাপ একটা কাফের মালিক। বাপ মরলে মেয়েই সেটার মালিক হবে। তবে বুড়ো না মরলে ফ্রেড্ বিয়ে করছে না। আমি বললুম, 'অত সাবধান হবার কি দরকার ?'

ও বলল, 'হতচ্ছাড়া বুড়োকে মোটেই বিশ্বাস নেই। কিচ্ছু বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে ও হয়তো রেস্তোর াঁটি মেথডিস্ট চার্চকে দান করে যাবে।' আমি বললুম, 'হ্যাঁ, তেমন হলে অবিশ্যি তুমি ঠিকই বলেছ।' ফ্রেড্ বলল, 'সম্প্রতি একটু আশাও দেখা যাচ্ছে। বুড়ো সর্দিতে ভুগছে। কপাল জোরে সেটা যদি ইনফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়ায় তবে এই বয়সে বুড়োকে আর উঠতে হবে না।'

বাধ্য হয়ে ফ্রেড্‌কে বলতে হল যে মদখোর লোকদের পক্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা তেমন মারাত্মক নয়। এমন কি উল্টো ফলও হতে পারে। কারণ দেখা গেছে মদ্যপ ব্যক্তিরা বুড়ো বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আগের চাইতে শরীর ভালো হয়েছে, ওজন বেড়েছে। ফ্রেড্ চিন্তিত হয়ে বলল, 'তাহলে ? এক যদি লোকটা রাস্তায় বাস্ চাপা পড়ে মরে, নইলে তো আর ভরসা দেখছিনে।' আমি বললুম, 'সেটা খুবই সম্ভব। বিশেষ করে বৃষ্টি বাদলার দিনে শান-বাঁধানো রাস্তায় পিছলে পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়।'

ফ্রেড্ তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে দেখে এল বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিনা। কিন্তু তখনো জল নামেনি, রাস্তা খটখটে শুকনো। শুধু মেঘের ডাকটা একটু বেড়েছে। ওকে এক গ্লাশ নেবুর রস খেতে দিয়ে আমি টেলিফোনটার কাছে এগিয়ে গেলুম। ওখানটায় গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল—নাঃ ফোন করবার কোনো দরকার নেই তো। টেলিফোন যন্ত্রটার কাছে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে টুপি তুলতে গিয়ে দেখি মাথায় টুপিটা নেই! আবার স্বস্থানে ফিরে এলুম। দেখি কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌স হাজির। আমায় দেখেই গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'মুখ দিয়ে একবার নিঃশ্বাস ফেল দেখি।'

আমি নিঃশ্বাস ফেলতেই বলে উঠল, 'হুঁ—রাম্, চেরি ব্রাণ্ডি আর অ্যাবসিন্থ! হুতচ্ছাড়া আর জিনিস খুঁজে পেল না।'

বললুম, 'তোমরা যদি ভেবে থাক যে আমাকে নেশায় ধরেছে, তাহলে খুবই ভুল করছ। যাকগে, তোমরা কোত্থেকে আসছ শুনি ?'

'একটা সভায় গিয়েছিলুম। তা অটোর একটুও ভালো লাগেনি, রাজনীতি ওর সয় না। কিন্তু ফ্রেড্ ওখানটায় বসে কি খাচ্ছে ?'

'নেবুর রস।'

ও বলল, 'তুমিও একগ্লাশ খেয়ে নিলে পারতে।'

আমি বললুম, 'আজ নয়, কালকে। আমি যাচ্ছি, আমার এখন কিছু খাদ্য প্রয়োজন।'
কোষ্টার উদ্বিগ্ন মুখে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললুম, 'অমন করে তাকিয়ো না, অটো। যদি নেশা করে থাকি তো প্রাণের আনন্দেই করেছি, মনের দুঃখে নয়।'
'ব্যস, তবে ঠিক আছে। কিন্তু খাবে বলছিলে, এস খেয়ে যাও।'

এগারোটা নাগাদ আমার নেশা কেটে গিয়ে মাথা দিব্যি সাফ হয়ে গেছে। কোষ্টার বলল, 'একবার ফ্রেড্‌কে গিয়ে দেখলে হত! ভিতরে গিয়ে দেখি কাউণ্টারের পিছনে ফ্রেড্ লম্বা হয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে।
লেন্‌ত্‌স বলল, 'ওকে তোমার পাশের ঘরে নিয়ে যাও। আমি এদিকে কাউণ্টারের ভার নিচ্ছি।'
আমি আর কোষ্টার মিলে ফ্রেড্-এর শুশ্রূষা করতে লাগলুম। একটু গরম দুধ খাইয়ে দিতে না দিতেই ও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললুম. 'আধঘণ্টাটাক বসে বিশ্রাম কর। লেন্‌ত্‌স কাউণ্টার দেখছে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'
গট্‌ফ্রিড্ ওস্তাদ লোক। দরদস্তুর সব মুখস্থ, ককটেল-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব কিছু ওর জানা আছে। ককটেল তৈরির কায়দা দেখলে মনে হবে সারাজীবন এ কাজ করেই হাত পাকিয়েছে।
ঘণ্টাখানেক পরে ফ্রেড্ ফিরে এল। শ্রীমানের পাকস্থলীটি খুব মজবুত বলতে হবে, তাই এত তাড়াতাড়ি সামলে উঠেছে! বললুম. 'ফ্রেড্ ভাই, বড়ই দুঃখিত। আমরা ভুল করেছিলুম, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'
ও বলল, 'তাতে কি? সব ঠিক হয়ে গেছে, মাঝে-মাঝে এক-আধটু এরকম হওয়া ভালো।'
'সে তো খুব ঠিক কথা।' উঠে গিয়ে প্যাট্‌কে টেলিফোনে ডাকলুম। অনেক ভেবে-চিন্তে মনটাকে যাও বা একটু বাগে এনেছিলুম এক মুহূর্তে সব গেল ভেস্তে। ওদিক থেকে ওর গলার আওয়াজ পেতেই বললুম, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমার বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি।' বলেই রিসিভার রেখে দিলুম। ভয় ছিল পাছে ও বলে শরীর ক্লান্ত কিম্বা আর কোনো অজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়াই চাই।

আমি যেতেই ও নেমে এল। দরজার সুমুখে এসে যখন দাঁড়িয়েছে তখন এ পাশ থেকে দরজার কাঁচে ওর মাথার কাছটিতে আমি চুমু খেলুম। দরজা খুলে ও কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তার সুযোগই দিলুম না। মুখে চুমু খেয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দিলুম। রাস্তায় নেমে দ্রুতপদে চলতে লাগলুম। কয়েক পা এগিয়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। হরদম মেঘগর্জন আর আকাশ চিরে বিদ্যুতের চমকানি চলছে।

ওকে বললুম, 'চট্‌পট্ উঠে পড় বৃষ্টি শুরু হবার আগে পৌছানো চাই।'

উঠে বসতে না বসতে গাড়ির ছাতে দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বিছানো রাস্তায় গাড়িটা ঝাঁকুনি খেতে-খেতে চলেছে। বেশ লাগছে, প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে প্যাট্ এসে আমার গায়ে পড়ছে। যা কিছু দেখছি সবই ভালো লাগছে—আকাশের ঘনঘটা, শহরের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, এমন কি খানিক আগে মদ্যপানের অনুভূতিটাও চমৎকার লাগছে। মনের ভিতরটা অতিমাত্রায় সজাগ—মদের নেশা কেটে যাওয়ার পর মনটা যেমন সাফ হয়ে যায় তেমনি। রাত্রিটা কি এক বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ, কি অপরূপ সৌন্দর্য-মণ্ডিত। আমার সংযমের বাঁধ গেছে ভেঙে। এমন রাতে কিছুই অস্বাভাবিক নয় কিছুই অন্যায় নয়।

বাড়ির দোরে ট্যাক্সি থেকে নামতে না নামতে চেপে বৃষ্টি এল। ট্যাক্সিওয়ালাকে যখন পয়সা দিচ্ছি তখনও ফুটপাতের উপরে বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা চিতাবাঘের চাকা-চাকা দাগের মতো দেখাচ্ছিল, কিন্তু দাম চুকিয়ে ঘরে ঢুকবার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে রাস্তা ভাসিয়ে দিল।

ঘরে আর আলো জ্বাললুম না। বিদ্যুৎ চমকানিতে অন্ধকার দূর হয়েছিল। ওদিকে মেঘগর্জনেরও বিরাম নেই। প্যাট্‌কে বললুম, 'আজকে একটু প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে কথা বলতে পারব, কেউ শুনতে পাবে না।'

বিদ্যুৎ চমকানিতে জানালার কাঁচগুলো যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছে। শাদা ঘোলাটে আকাশের তলায় কবরখানার কালো গাছের মূর্তিগুলো পলকের জন্য দেখা দিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আলোয় ক্ষণেকের জন্য প্যাট্-এর কোমল দেহটি যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠল—দুই হাতে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরলুম। ও আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিল। ওর কোমল ওষ্ঠের স্পর্শ, ওর মৃদু নিঃশ্বাস, তারপরে সব ভাবনা-চিন্তা গেল অন্ধকারে তলিয়ে।

ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও

আমাদের কারখানা এখন একেবারে খালি—ফসল তোলবার আগে গোলাঘরের যেমন দশা। কাজেই স্থির করলুম নতুন-কেনা ট্যাক্সিটা এখন বিক্রি না করে কিছুদিন ট্যাক্সি হিসেবেই ব্যবহার করা যাক। লেন্‌ত্‌স আর আমি ভাগাভাগি করে ট্যাক্সি চালাব। ইতিমধ্যে যদ্দিন না নতুন কাজ আসছে কোষ্টার আর জাপ্‌ মিলেই কারখানা দেখাশোনা করতে পারবে।

বেশ কিছু খুচরো পয়সা পকেটে ফেলে কাগজপত্রসমেত ট্যাক্সিটি নিয়ে ভালো একটি স্ট্যাণ্ড-এর খোঁজে বেরিয়েছি। এ কাজ এই প্রথম কিনা, কেমন একটু বাধ-বাধ ঠেকছে। যত সব হাবা-গোবা-মুখ্যুর হুকুম তালিম করে বেড়াতে হবে। ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না। অবস্থা যদি বা একটু ফিরেছিল, আবার পূর্বদশা না হয়। কিন্তু এও বুঝি না অবস্থাটা যখন নতুন নয় তখন এবারই বা এত মন খারাপ হচ্ছে কেন? নিশ্চয় এভাবে চিরদিন কাটবে না, আবার সুদিন আসবে। তবু আপিসের কাজের চাইতে এ ঢের ভালো, হেডক্লার্কের গালমন্দ খাবে, মেজাজ বিগড়োবে, ক্ষেপে গিয়ে লেজার বই ওর মুখে ছুঁড়ে মারবে, ব্যস, তারপরে চাকরি খতম।

একটি স্ট্যাণ্ড খুঁজে বের করলুম। মোটে পাঁচটি গাড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ালডেকার হফ্‌ হোটেলের ঠিক উল্টো দিকটাতে। ব্যবসার জায়গা—সওয়ারি জোটাবার পক্ষে বেশ ভালো। এঞ্জিন থামিয়ে গাড়ি থেকে নামলুম। সেখানের একটা গাড়ি থেকে চামড়ার কোট গায়ে লম্বা-চওড়া একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। খুব ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আমাদের স্ট্যাণ্ডে নয়, এখান থেকে যাও।' কিছু না বলে ওকে একবার বেশ করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম। হুঁ, গায়ে যা ভারি কোট, চট করে হাত তুলতে পারবে না। দরকার হলে ঘুঁষিটা একটু উপর ঘেঁষে মারতে হবে।

অর্ধ-দগ্ধ একটা সিগারেটের টুকরো মুখ থেকে থুতিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কি, শুনতে পাচ্ছ না? বলছি বেরিয়ে যাও। এখানে অমনিতেই লোকের কমতি নেই, আর বেশি চাইনে।'

বেশ বোঝাই যাচ্ছে একজন লোক বেড়ে যাওয়াতে ও ক্ষেপে গেছে। কিন্তু আমিই বা ছাড়ব কেন? স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াবার অধিকার আমারও আছে। বললুম, 'চাও তো ভর্তির ফিস হিসাবে কয়েক গ্লাশ মদের দাম দিতে পারি।'

ভাবলুম ওতেই গোলমাল চুকে যাবে। শুনেছি নতুন কেউ এলে ওটাই নিয়ম। অল্পবয়স্ক ছোকরা এক ড্রাইভার এসে বলল, 'বেশ ভাই তাই সই। ছেড়ে দাও গুস্তভ্, থাক না ও —'

কিন্তু কোনো কারণে গুস্তভ্ গোড়া থেকেই আমাকে অপছন্দ করে বসে আছে! কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি। ও বুঝে ফেলেছে যে আমি এ কাজে একেবারে নতুন নেমেছি। চেঁচিয়ে বলল, 'দেখ আমি এক দুই তিন বলব তার মধ্যে যদি—'

লোকটা আমার চাইতে বিঘতখানেক লম্বা, তাতেই সে জোর পেয়েছে। দেখলুম ওর সঙ্গে কথা বলে কিচ্ছু লাভ হবে না। ভালোয়-ভালোয় চলে যেতে হয় নয়তো থাকতে গেলে মারামারি করতেই হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। কোটের বোতাম খুলতে-খুলতে গুস্তভ্ বলল, 'এক —'

তবু আর একবার থামাবার চেষ্টা করে বললুম, 'কি বাজে বকছ। তার চাইতে একটু রাম্ গলায় ঢাললে হত না?'

গুস্তভ্ জোর গলায় হাঁকল—'দুই —'

লোকটা দেখছি আমাকে খতম না করে ছাড়বে না। বললুম, 'আরে লোকে—' ও টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল।

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলুম, 'দূর বোকা, মুখ বন্ধ কর।' থতমত খেয়ে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এল। আমি ঠিক তাই চেয়েছিলুম। তক্ষুনি মারলুম এক ঘুঁষি—ঠিক হাতুড়ির ঘায়ের মতো গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে। এ কায়দাটা কোষ্টারের কাছ থেকে শেখা। আসলে আমি কুস্তি-টুস্তি ভালো জানিনে। জানবার দরকারও করে না।

হার-জিত নির্ভর করে প্রথম ঘুঁষিটার উপরেই। তা এইটি যা মেরেছি একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

গুস্তভ্ ধরাশায়ী। ছোকরা ড্রাইভারটি বলল, 'ওতে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না, ও

হামেশাই লড়াই করে বেড়াচ্ছে।' দুজনে ধরাধরি করে তুলে ওকে গাড়িতে শুইয়ে দিলাম।' 'কিছু চিন্তা নেই, এক্ষুনি সেরে উঠবে।'

এদিকে আমার এক ভাবনা হয়েছে। ঘুঁষিটা মারবার সময় বুড়ো আঙুলটা গিয়েছে মচ্‌কে। এখন গুস্তভ্‌ সামলে উঠে যদি আবার 'যুদ্ধং দেহি' বলে আসে তবে আর রক্ষা নেই। ছোকরা ড্রাইভারটিকে অবস্থাটা খোলাখুলি বলে জিগগেস করলুম, 'কি বল, বোধকরি সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

ও বলল, 'দূর, দূর, তুমিও যেমন। ও সব চুকে-টুকে গেছে। চল ঐ রেস্তোরাঁয় তোমার ভর্তির ফি-টা হয়ে যাক।' যেতে-যেতে জিগগেস করল, 'মোটর ড্রাইভারি বোধহয় তোমার ব্যবসা নয়, কি বল?'

'না—'

'আমারও না, আমি ছিলুম থিয়েটারের অভিনেতা।'

'তা, এতে তোমার পুষিয়ে যায়?'

ও হাসতে-হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে তো আছি। এটাও এক রকমের অভিনয় আর কি।'

সব মিলে আমরা পাঁচজন। দুজন একটু বয়স্ক, বাকি তিনজন কমবয়েসী। খানিক বাদে গুস্তভ্‌ এসে হাজির। দূর থেকে একবার চোখ পাকিয়ে আমাদের টেবিলের দিকে তাকাল, তারপরে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল। বাঁ হাতে পকেটের চাবির তোড়াটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলুম। দরকার হলে আত্মরক্ষা করতে হবে তো। কিন্তু তার দরকার হল না। লাথি দিয়ে একটা চেয়ার সোজা করে নিয়ে গোমড়া মুখে বসে পড়ল। ওর সামনেও এক গ্লাশ বিয়ার দেওয়া হল। ও ঢকঢক করে সমস্তটা খেয়ে নিল। আর এক দফা অর্ডার দেওয়া হল। গুস্তভ্‌ আড় চোখে আমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল। এবার গ্লাশ তুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জিন্দা রহ।' কিন্তু মুখ আগের মতোই গোমড়া করে আছে।

'জিন্দা রহ' বলে হাত বাড়িয়ে গ্লাশে-গ্লাশে ঠোকাঠুকি করলুম।

গুস্তভ্‌ পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল কিন্তু এখনও আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছে না। একটি সিগারেট নিলুম, আমার দেশলাই দিয়ে ওর সিগারেটও ধরিয়ে দিলুম। তারপরে আবার এক দফা কুমেল ফরমাশ করলুম। খেতে-খেতে গুস্তভ্‌ আর এক নজর আমার দিকে তাকাল। আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'বাঁদর।' গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে রাগটা পড়ে গেছে। আমিও হাল্কা সুরেই বললুম, 'হাঁদা কোথাকার।'

এবার সোজা হয়ে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, 'হুঁ, ঘুঁষির মতো ঘুঁষি বটে।'
আমি বললুম, 'কিচ্ছু না, বরাতের জোরে লেগে গিয়েছিল, নইলে এই দেখ না—'
বুড়ো আঙুলের অবস্থাটা ওকে দেখালাম।
দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে বলল, 'তাই তো, দুঃখের কথা। যাক গে, আমি হচ্ছি গুস্তভ্।'
'আমি রবার্ট।'
'ঠিক আছে রবার্ট। আমি ভেবেছিলুম তুমি সবে মায়ের আঁচল ছেড়ে এসেছ।'
'ঠিক আছে গুস্তভ্।' ব্যস্, দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।
একটি-একটি করে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। ছোকরা ড্রাইভারটি নাম টমি, বেশ ভালো ভাড়া বাগিয়ে স্টেশনে চলে গেল। গুস্তভ্-এর কপাল খারাপ, মাত্র তিরিশ ফেনিগ-এ ওকে যেতে হল খুব কাছের একটা রেস্তোরাঁয়। বেচারা রাগে ফেটে পড়বার উপক্রম। মাত্র দশ ফেনিগ লাভের জন্য ফিরে এসে ওকে লাইনে সবার পিছনে দাঁড়াতে হবে। কপাল ক্রমে আমার খুব ভালো সওয়ারি জুটে গেল। এক বুড়ি ইংরেজ মহিলাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। ঘণ্টাখানেক ওকে নিয়ে নানা রাস্তায় ঘুরতে হল। ফেরবার পথে আরো কয়েকটা ছোটখাট ভাড়া জুটে গেল। দুপুর বেলায় আবার সবাই যখন আগের সেই রেস্তোরাঁয় এসে জুটেছি, দল বেঁধে রুটি আর মাখন খাচ্ছি আমার মনে হল যেন কত কাল ধরে এই কাজ করেই আমি হাত পাকিয়েছি। দেখলুম এর মধ্যে খানিকটা আর্মির পাঁচমিশেলি আবহাওয়া আছে। দুনিয়ার যত রকমের লোক সব এসে এখানে জুটেছে। এদের মধ্যে বড় জোর অর্ধেক লোক বরাবর এই কাজ করে আসছিল, বাকিরা সবাই অন্য ব্যবসা ছেড়ে কোনো কারণে এর মধ্যে এসে ঢুকছে।
বিকেলে বেশ খুশি মনেই গাড়িটি নিয়ে আমাদের কারখানার হাতায় এসে ঢুকলুম। লেন্ত্স আর কোষ্টার আমার অপেক্ষায় বসে ছিল। ওদের জিগগেস করলুম, 'কিহে, কেমন রোজগার করলে আজ, শুনি?'
জবাব দিল জাপ্, 'সত্তর লিটার পেট্রল।'
'ব্যস, আর কিছু নয়?'
লেন্ত্স ভিখিরীর মতো আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। 'আঃ, একটি ফোঁটা বৃষ্টি যদি হত! তারপরে ঠিক আমাদের গেট্-এর সুমুখটিতে বাঁধানো রাস্তায় চাকা হড়কে গিয়ে ছোটখাট একটি কলিশন। তাই বলে অবিশ্যি কারো গায়ে চোট-

ফোট লাগাবার প্রয়োজন নেই। শুধু একটু মেরামতের কাজে আমাদের দু-পয়সা আমদানি হলেই হয়।'

হাতের তেলোতে পঁয়ত্রিশটি মার্ক রেখে বললুম, 'একবার দেখ দেখিনি এদিকে।'

কোষ্টার বলে উঠল, 'বাঃ, বাঃ, খাশা! এ যে কুড়ি মার্ক নেট লাভ। দাঁড়াও, এটা এক্ষুনি উড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম ব্যবসার লাভ। তাই দিয়ে একটু ফুর্তি করা চাই তো।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'এক পাত্র উড্রাফ্‌ মদ আনতে হবে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'পাত্র! পাত্র দিয়ে কি হবে?'

'প্যাট্‌ আসবে কিনা।'

'প্যাট্‌!'

লেন্‌ত্‌স ঠেস মেরে বলল, 'ইস, একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লে! নাও, এ সব আমরা ঠিক করে ফেলেছি। সাতটার সময় ওকে গিয়ে আনবার কথা। ও সব জানে। তোমার যদি পছন্দ না হয় তো এস না, আমরাই ব্যবস্থা করব। হুঁ, আমাদের দরুনই ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, সে কথাটি ভুললে চলবে না, বাপু।'

অটোকে বললুম, 'দেখলে আস্পর্ধা, ওর মতন বেআক্কেল লোক আর দেখেছ!'

কোষ্টার হাসল। পরমুহূর্তেই বলে উঠল, 'ও কি বব্‌, তোমার হাতে আবার কি হল, হাতটা কেমন ভাবে রাখছ যেন!'

বললুম, 'মচকে গেছে বোধহয়।' গুস্তভ্‌-এর কাহিনীটা সবিস্তারে বর্ণনা করলুম।

লেন্‌ত্‌স হাতটা টেনে নিয়ে দেখল, বলল, 'যদিও তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছ, তবু খাঁটি খ্রীস্টান হিসেবে এবং আমি মেডিকেল ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বলে তোমার জখমি হাত আমি দলাই-মলাই করে দিতে রাজী আছি। চলে এস, কুস্তিগীর!'

আমরা কারখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। গট্‌ফ্রিড্‌ কি একটা তেল নিয়ে আমার হাতে মালিশ করতে লাগল। ওকে জিগগেস করলুম, 'প্যাট্‌কে বললে নাকি যে আজকে আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতেখড়ির উৎসব?'

গট্‌ফ্রিড্‌ আপন মনে শিস দিতে-দিতে বলল, 'ওঃ, এতেই বুঝি তোমার আত্ম-সম্মানে লাগছে।'

ধমক দিয়ে বললুম, 'বাজে বকো না, থাম।' আসলে কিন্তু ও সত্যি কথাই বলেছে। আবার জিগগেস করলুম, 'বলেছ নাকি ওকে?'

আমার কথা ও কানেই তুলল না, বলল, 'ভালোবাসা অতি উত্তম জিনিস। কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে মানুষের নিজস্ব চরিত্র আর বজায় থাকে না।'
আমি বললুম, 'আচ্ছা তুমিই বল আমার অবস্থায় পড়লে তুমি নিজে কি করতে। ধর ট্যাক্সি নিয়ে চলেছ, রাস্তায় কেউ হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি থামাল। থামিয়ে দেখলে প্যাট্।'
বোকার মতো হেসে ও বলল, 'না হয় ওর কাছ থেকে ভাড়াটা নিতুম না।'
এক ধাক্কা মেরে তেপায়া টুলটা থেকে ওকে ফেলে দিলুম। বললুম, 'জানো আজকে কি করব? এই ট্যাক্সি নিয়েই রাত্রে ওকে আনতে যাব।'
'বহুত আচ্ছা।' গট্‌ফ্রিড্ হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করল। 'যাই কর ভাই, নিজের স্বাধীন সত্তা কখনো নষ্ট করবে না। ভালোবাসার চাইতেও ওটা বড় কথা, পরে বুঝতে পারবে। যাকৃগে, ট্যাক্সিটি কিন্তু তুমি পাচ্ছ না। ওটা নিয়ে আমরা ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ আর ভ্যালেন্‌টিন্‌কে আনতে যাচ্ছি। উৎসবটা আজকে একটু জাঁকিয়ে করতে হবে কিনা।'

শহরের বাইরে ছোট্ট একটি সরাইখানার বাগানে আমরা বসে আছি। বৃষ্টিতে-ভেজা চাঁদ, লাল একটি মশালের মতো ঠিক যেন ঐ বনের উপরটাতে ঝুলছে। চেস্টনাট্ গাছের ফুলন্ত ডালগুলো বাতাসের মৃদু কম্পনে দুলছে। লাইলাক্ ফুলের গন্ধে বাতাস মদির আর আমাদের সুমুখে টেবিলের উপরে মস্ত একটা কাঁচের পাত্রে উড্‌রাফ্-গন্ধী পানীয়। সন্ধ্যার মৃদু আলোয় কাঁচের পাত্রটাকে দেখাচ্ছে নীলে-শাদায় মেশা একটা জ্বলজ্বলে ওপেল পাথরের মতো। পাত্রটি এরই মধ্যে চারবার ভর্তি করা হয়েছে, চারবার নিঃশেষ হয়েছে।
ফার্ডিনাণ্ড-এর পাশে বসেছে প্যাট্। গোলাপী রঙের একটি অর্কিড ফুল জামায় পরেছে। ওটি ফার্ডিনাণ্ড-এর দেওয়া। ফার্ডিনাণ্ড অতি ক্ষুদ্র একটি পোকা গ্লাশ থেকে আঙুলে তুলে নিয়ে টেবিলের উপরে রাখল। আমাদের উদ্দেশ করে বলল, 'দেখ-দেখ, কি সুন্দর দেখতে এই পোকাটা। দেখেছ কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম! মাকড়সার জালও এর কাছে লাগে না। কি আশ্চর্য সুন্দর দেখতে অথচ একটি দিন মাত্র এর পরমায়ু।'
তারপর একে-একে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, সংসারে সব চাইতে অস্বস্তিকর জিনিস কি বল তো?'
লেন্‌ত্‌স বলে উঠল, 'শূন্য গ্লাশ!'

ফার্ডিনাণ্ড এমন কটমট করে ওর দিকে তাকাল, লেন্‌ত্‌স তাতেই ঠাণ্ডা। 'দেখ গট্‌ফ্রিড্‌, ভাঁড়ামির চাইতে নিকৃষ্ট জিনিস আর কিছু হতে পারে না।' এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সংসারে সব চেয়ে অস্বস্তিকর জিনিস হল সময়। সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছি অথচ সময়কে ধরে রাখার উপায় নেই।' পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সেটি লেন্‌ত্‌স-এর চোখের সামনে ধরে বলল, 'কি হে রোমান্টিকপ্রবর, এই যে শয়তানের অস্ত্রটি দেখছ সারাক্ষণ কেবল টিক্‌টিক্‌-টিক্‌টিক্‌ করেই চলেছে—একে কেউ থামাতে পারে? ধ্বসে-যাওয়া বরফের পাহাড়কে ঠেকিয়ে রাখতে পার, কিন্তু একে নয়।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'আমি ঠেকাতে চাইও না। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে বার্ধক্য আসবে, আমি কিছুমাত্র আপত্তি করব না। বরং তাই আমার পছন্দ; পরিবর্তন না হলে চলবে কেন?'

গ্রাউ ওর কথা কানেই তুলল না। বলল, 'সময় মানুষকে মানে না। মানুষও সময়কে মানতে চায় না। তাই নিজেকে ভোলাবার জন্য মানুষ একটি মনগড়া স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে। বেচারা মানুষ সে স্বপ্নের নাম দিয়েছে—অনন্ত।'

গট্‌ফ্রিড্‌ হেসে বলল, 'ফার্ডিনাণ্ড, সংসারের সব চেয়ে কঠিন রোগ হল চিন্তা। এ বড় দুরারোগ্য ব্যাধি।'

গ্রাউ বলল, 'সেটাই যদি একমাত্র ব্যাধি হত তা'হলে তুমি অমর হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকতে। বুঝলে গট্‌ফ্রিড্‌, ভুলে যেও না যে তুমি কিঞ্চিৎ আয়রন, ক্যালসিয়াম্‌, ফস্‌ফরাস্‌, কিছু বা কার্বোহাইড্রেট্‌-এর সংমিশ্রণ মাত্র।'

কথা শুনে গট্‌ফ্রিড্‌ নির্বিকার ভাবে হাসতে লাগল। ফার্ডিনাণ্ড তার প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ভায়া, জীবনটাই একটা ব্যাধি। যে মুহূর্তে জন্ম, সে মুহূর্তেই মৃত্যুর শুরু। প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি হৃৎস্পন্দন মৃত্যুর দিকে তোমাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে।'

'শুধু কি নিঃশ্বাস, প্রত্যেক ঢোক পানীয়ও বটে।' গ্লাশ তুলে লেন্‌ত্‌স বলল, 'কুচ পরোয়া নেই, ফার্ডিনাণ্ড। মৃত্যুও কখনো-কখনো দিব্যি আরামের হতে পারে।'

গ্রাউ হাসতে-হাসতে গ্লাশ তুলে বলল, 'বেঁচে থাক, গট্‌ফ্রিড্‌, সময়ের স্রোতের উপর তুমি লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছ। বাহাদুরি আছে তোমার। যে দেবতা চিন্তা নামক ব্যাধিটা আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি তোমায় সৃষ্টি করবার বেলায় কোথায় ছিলেন তাই ভাবি।'

গট্‌ফ্রিড্‌ বলল, 'দেবতাদের কথা দেবতারা ভাববেন। তাঁদের ব্যাপার নিয়ে

তোমার মাথা ঘামানো কেন? আর মানুষ যদি অমর হত তবে তুমি হতে বেকার। তুমি একটি মৃত্যুর পরগাছা বই তো নও।'

গ্রাউ হেসে ফেলল। তারপরে প্যাট্-এর দিকে ফিরে বলল, 'কি বন্ধু, তোমার কি মত? সময়ের স্রোতের উপর তুমি তো একটি ভাসমান ফুল।'

খানিক পরে প্যাট্ আর আমি উঠে গিয়ে বাগানে পায়চারি করতে লাগলুম। চাঁদের রুপোলী আলোয় মাঠ-প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে। গাছের কালো-কালো ছায়া মাঠের বুকে এসে পড়েছে অজানার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের মতো। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা দুজনে লেকের পাড় অবধি চলে গিয়েছিলুম, সেখান থেকে আবার ফিরলুম। ফিরবার পথে গট্‌ফ্রিড্-এর সঙ্গে দেখা। একটা লাইলাক্ ঝোপের পাশে একটি চেয়ার পেতে ও বসে আছে। অন্ধকারে ওর মাথার হলদে চুল আর সিগারেটের আগুনটা শুধু দেখা যাচ্ছে। মাটিতে এক পাশে একটি গ্লাশ আর সেই মদের পাত্রটিতে খানিকটা উড্‌বাফ্-গন্ধী পানীয়।

প্যাট্ বলল, 'বেশ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন তো চারিদিকে লাইলাক-এর ছড়াছড়ি।'

গট্‌ফ্রিড্ উঠে বলল, 'হাঁ। জায়গাটা মন্দ নয়। একবার বসেই দেখ না।'

প্যাট্ চেয়ারে বসল। ফুটন্ত ফুলের মতোই তাজা ওর মুখখানা। রোমান্টিক-শ্রেষ্ঠ লেন্‌ত্‌স বলল, 'আমি তো রীতিমতো লাইলাক্-পাগল। লাইলাক্-এর সময় এলে বিদেশে থেকে শান্তি পাইনে। দেশের জন্য মনকেমন করতে থাকে। মনে আছে চব্বিশ সালে সেই রিয়ো ডি জেনেরো থেকে সাত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এলুম। কোনো কারণ ছিল না, শুধু মনে পড়ে গেল দেশে এখন লাইলাক্ ফুটতে শুরু করেছে। অবিশ্যি যখন দেশে এসে পৌঁছলুম তখন লাইলাক-এর মরশুম শেষ হয়ে গেছে।' নিজের মনেই হেসে বলল, 'তা বরাবর এমনই হয়'

ফুল সমেত লাইলাক্-এর একটি ডাল টেনে নিয়ে প্যাট্ বলল, 'রিয়ো ডি জেনেরো। আপনারা দুজন একসঙ্গেই গিয়েছিলেন বুঝি?'

গট্‌ফ্রিড্ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। আমি ভাবলুম এইবে! সেরেছে, এক্ষুনি সব ফাঁস হয়ে যাবে। কথাটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললুম, 'দেখ, দেখ, চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।' ওদিকে লেন্‌ত্‌স যাতে ফাঁস করে না দেয় সেজন্য খুব আস্তে ওর পায়ে একটু চাপ দিলুম।

সিগারেটের আলোয় দেখতে পেলুম মুহূর্তের জন্য ওর চোখে মুখে একটি কৌতুকের হাসি খেলে গেল। যাক, ও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বলল, 'নাঃ,

একসঙ্গে নয়। সেবারে আমি একলাই ছিলুম। হ্যাঁ, ভালো কথা, আসুন না, বাকি উড্‌রাফটুকু শেষ করে দেওয়া যাক।'

প্যাট্ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আর নয়। ও সব জিনিস আমি বেশি খেতে পারিনে।' ওদিকে ফার্ডিনাণ্ড হাঁক দিয়ে আমাদের ডাকছে। তিনজনেই ফিরে চললুম। যেতে-যেতে ভাবলুম, নাঃ, ঐ ব্রেজিলের ভাঁওতাটা শুধরে নিতে হবে। গট্‌ফ্রিড্ ঠিকই বলেছে—প্রেমে পড়লে মানুষের চরিত্র বিকৃত না হয়ে যায় না।

ফার্ডিনাণ্ড তার বিরাট দেহ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, 'বাপু হে, ভেতরে চলে এস। আমাদের মতো মানুষের আবার রাত্তিরবেলায় প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? প্রকৃতিদেবী একলা থাকতে ভালোবাসেন, তাঁকে একলা থাকতে দাও। চাষী হয়, জেলে হয়, সে আলাদা কথা। আমরা হলাম শহুরে মানুষ—হৃদয় বলে কোনো পদার্থ তো আমাদের নেই।' গট্‌ফ্রিডের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বুঝলে গট্‌ফ্রিড্ সভ্যতা জিনিসটা একটা কুষ্ঠক্ষতের মতো আর রাত্রি হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে প্রকৃতিদেবীর প্রতিবাদ। বুদ্ধিমান মানুষের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে আমাদের উপরে প্রকৃতির একটা অভিশাপ আছে। দুদিন আগে হোক পরে হোক বুঝতে পারবেই যে গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার কিম্বা আকাশের তারার যে নীরব নির্বিকার জীবন তার থেকে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।' বলে সে হাসতে লাগল। অদ্ভুত হাসি—দেখে বোঝবার উপায় নেই সেটা দুঃখের কি সুখের হাসি। 'এস, এস, ভেতরে এস। অতীতের স্মৃতির উত্তাপে শরীরটা একটু চাঙ্গা করা যাক্। সত্যি একবার ভেবে দেখ তো পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছর আগে আমরা যখন ছিলাম কাদা-মাটির মাছ তখন কি চমৎকার ছিল। সে তুলনায় আজকে কি পতনটাই হয়েছে—'

প্যাট্-এর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোতে নিয়ে বলল, 'তবু এইটুকু সৌন্দর্য-স্পৃহা আছে বলে রক্ষে—নইলে একেবারেই জাহান্নামে যেতুম।' প্যাট্-এর হাত-খানি নিজের কাঁধের উপরে রাখল, বলল, 'বাছা, অতল গহ্বরের উপরে তুমি একটি উল্কার রুপোলী রেখার মতো। আপত্তি কোরো না বৎসে, এই অতীত যুগের বৃদ্ধটির সঙ্গে এক পাত্র সুধা পান কর।'

প্যাট্ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বলল, 'নিশ্চয়, যা আপনার ইচ্ছে।'

দুজনে উঠে ভিতরে চলে গেল। পাশাপাশি যাচ্ছে, মনে হচ্ছে প্যাট্ যেন ফার্ডিনাণ্ড-এর মেয়ে—কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা অতি-বৃদ্ধ ক্লান্ত দৈত্য আর পাশে তারই ক্ষীণকায়া সুন্দরী যৌবনদৃপ্তা কন্যা।

ফিরছি যখন তখন প্রায় এগারোটা বাজে। ভ্যালেন্‌টিন্‌ আর ফার্ডিনাণ্ড গেল ট্যাক্সিটাতে। ভালেন্‌টিন্‌ বসেছে ষ্টিয়ারিং-এ। আমরা সবাই চেপে বসলাম কার্ল-এ। রাত্তিরটা বেশ একটু উষ্ণ বোধ হচ্ছে। কোষ্টার ঘুরে ফিরে গ্রামের রাস্তা ধরে চলল। রাস্তার দুধারে গ্রামগুলি সুপ্তিতে মগ্ন। এখানে-সেখানে দু-একটা আলো, থেকে-থেকে কোথাও কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ। এ ছাড়া কোথাও জাগ্রত চৈতন্যের কোনো চিহ্নই নেই।

লেন্‌ত্‌স সামনে অটোর পাশে বসেছে, গান করছে। প্যাট্‌ আর আমি বসেছি পিছনের সিট্‌-এ।

মোটর চালনায় কোষ্টারের অপূর্ব দক্ষতা। গাড়িটা যেন পাখির মতো উড়ে চলেছে। সাংঘাতিক বিপজ্জনক মোড়গুলো এমন অনায়াসে পার হয়ে যায় ভাবলে অবাক লাগে, ছেলেখেলা মাত্র। এতটুকু ঝাঁকুনি লাগে না। চুলের কাঁটার মতো সাংঘাতিক বাঁক ঘোরবার সময়ও তুমি ইচ্ছে করলে ঘুমিয়ে নিতে পার। রাস্তার কোনখানটা ভালো কোনখানটা মন্দ সেটা টায়ারের শব্দ দিয়ে বুঝতে পারছি। আলকাতরা-দেওয়া মসৃণ পাকা রাস্তায় শোঁ-ও শব্দে চলে যাচ্ছে; আর যেখানটায় এবড়ো-খেবড়ো পাথর সেখানটায় ঘড়ঘড় শব্দ। সুমুখে সার্চ-লাইটের আলোটা একটা দীর্ঘায়িত গ্রে-হাউণ্ডের মূর্তির মতো ছুটে চলেছে। তারই আলোতে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে একে-একে দেখা দিচ্ছে বার্চ গাছের সারি, কোথাও পপ্‌লারের, কোথাও টেলিগ্রাফের খুঁটি. কোথাও গুড়ি মেরে বসে আছে মানুষের আবাস-গৃহ, আবার কোথাও বা গাড়ি চলেছে কোনো ঘন বনের ধার ঘেঁষে। আর মাথার উপরে বিরাট আকাশ, কোটি-কোটি নক্ষত্রে ভিড়-করা ধোঁয়াটে রঙের ছায়াপথ। গাড়ির বেগ বাড়তে লাগল। আমার কোটটি নিয়ে প্যাট্‌-এর গায়ে চাপিয়ে দিলুম। আমার দিকে তাকিয়ে ও মিষ্টি করে একটু হাসল। জিগগেস করলুম, 'সত্যি-সত্যি আমাকে ভালোবাস?'

ও মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। 'তুমি আমাকে ভালোবাস?'

'না। ভালোই হল কি বল?'

'খুব।'

'কারোই কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা রইল না।'

ও বলল, 'কিছুমাত্র না।' কোটের তলায় হাত বাড়িয়ে আমার হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে নিল।

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে এখন সে রাস্তায় আমরা যাচ্ছি।

রেল-লাইনগুলো অন্ধকারে চক্‌চক্‌ করছে। সুমুখের দিকে একটা লাল আলো দেখা যাচ্ছে। কার্ল হর্ন বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে চলল। ওটা একটা এক্সপ্রেস গাড়ি—ডাইনিং-কারটা দেখা যাচ্ছে, আলোয় আলোময়। দেখতে-দেখতে আমরা গাড়িটার পাশাপাশি এসে গেলুম। জানালা থেকে যাত্রীরা আমাদের দেখে হাত নাড়ছে। আমরা ফিরে হাত নাড়লুম না, শাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। আমি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম, গাড়িটা ধোঁয়া আর আগুনের কণা ছড়াতে-ছড়াতে চলেছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে রাত্রির কালো অন্ধকার ভেদ করে ও কোথায় চলেছে। রাস্তায় মুহূর্তের জন্য দেখা হল। আমরা যাচ্ছি শহরের দিকে—সেখানে ট্যাক্সি আর কারখানা আর সারি-সারি সাজানো বাড়ি। ততক্ষণ ও চলতে থাকবে বনের পাশ দিয়ে, মাঠের ভিতর দিয়ে, নদী পার হয়ে দূরে, বহু দূরে, আরো দূরে।

শহরের রাস্তা বাড়িঘর ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। কার্লের গতি মন্থর হয়েছে কিন্তু ঘড়ঘড় আওয়াজটা এখনও বুনো জানোয়ারের গোঙানির মতো। কোষ্টার গাড়ি নিয়ে প্যাট্‌-এর বাড়িতেও গেল না, আমার বাড়িতেও না। গাড়ি থামাল কবরখানাটার কাছে, অর্থাৎ মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে আমাদের দুজনের বাড়িই কাছাকাছি। তাছাড়া ও নিশ্চয় ভেবেছে আমরা দুজনে একটু নিরালা হতে পারলে খুশি হব। আমরা নেমে পড়লুম। ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আমি কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারলুম না। মুহূর্তের জন্য মনটা কেমন দমে গেল—যারা আমার সবচেয়ে আপন, আমার চিরদিনের সাথী, তারা চলে গেল আর পথের মাঝখানে আমি রইলুম পড়ে।

পর মুহূর্তেই চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। প্যাট্‌কে বললুম, 'চল যাই।' ও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, বোধকরি আমার মনের কথাটা একটু আঁচ করেছে। বলল, 'ওদের সঙ্গে যাও না।'

আমি বললুম, 'না।'

'ওদের সঙ্গে গেলেই তুমি খুশি হতে—'

'না, না, তা কেন?' মনে-মনে অবশ্যই স্বীকার করতে হল ও সত্যি কথাই বলেছে।

কবরখানার পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। এতটা পথ উর্ধ্বশ্বাসে মোটরে এসে এখন হাঁটতে যেন পা টলছে। প্যাট্‌ বলল, 'বব্‌, আমি বরং বাড়ি চলে যাই।'

'কেন ?'

'আমার জন্ত তোমাকে কিছু ছাড়তে হয়, এ আমি চাইনে।'

'কি যে বলছ তার ঠিক নেই। আমি আবার কি ছাড়তে গেলুম ?'

'তোমার বন্ধুদের—'

'বন্ধুদের মোটেই ছাড়ছিনে। কাল সকাল বেলায় সর্বাগ্রে তাদের সঙ্গেই দেখা হবে।'

ও বলল, 'আমি কি বলতে চাই সে তুমি বেশ বুঝতেই পারছ। আগে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাতে।'

ততক্ষণে বাড়ির দরজায় এসে গেছি। বললুম, 'তা তো বটেই, তখন তুমি ছিলে না কিনা।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'সে কথা আলাদা।'

'আলাদাই তো, ভাগ্যিস আলাদা।' আলগোছে ওকে তুলে ধরে করিডরের সংকীর্ণ পথে পা টিপে-টিপে ঘরের দিকে এলুম। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ও বলল, 'তোমার সঙ্গীর দরকার, সাথীর দরকার।' আমি বললুম, 'তোমাকেও দরকার।'

'আমাকে ততখানি নয়, যত—'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন।'

ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ওকে কোল থেকে নামাতে গেলুম। ও আমাকে তেমনি আঁকড়ে ধরে বলল, 'বব্, আমি তোমার যোগ্য সাথী নই।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। তাছাড়া স্ত্রীলোককে আমি কেবল সাথী হিসেবে চাই না, প্রেমিকা হিসেবে চাই।'

ও আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি তাও নই।'

'তবে তুমি কি ?'

'আমি কোনোটাই পুরোপুরি নই, আধেক—আমি মানুষের একটা টুকরো মাত্র।' আমি বললুম, 'সেই তো সব চেয়ে ভালো। ওরকম মেয়েই মনকে দোলা দেয়, সেই মেয়েকেই পুরুষ সারাজীবন ভালোবাসে। নিখুঁত মেয়েদের লোকে বেশিদিন সইতে পারে না, সর্বগুণ-সম্পন্নাদের তো মোটেই নয়। সুন্দরের ভাঙাচোরা কণাটুকুই চিরকালের জিনিস।'

তখন ভোর চারটে হবে। প্যাটকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি ঘরে ফিরছিলুম। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। বাতাসে ভোরের আঘ্রাণ।

কবরখানার পাশ দিয়ে আসছিলুম। কাফে 'ইনটারন্যাশনাল'-এর কাছাকাছি আসতেই ছোট একটি রেস্তোরাঁর দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। রেস্তোরাঁটা ট্যাক্সিওয়ালাদের আড্ডা। মেয়েটির মাথায় টুপি, লাল রঙের বিচ্ছিরি একটা কোট গায়ে, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার উঁচু বুট। ওর পাশ দিয়েই চলে আসছিলুম। হঠাৎ নজর পড়তেই চিনলুম—'আরে, লিজা যে!'

ও বলল, 'এই যে, এরই মধ্যে ফিরে এসেছ?'

জিগগেস করলুম, 'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'এখানেই অপেক্ষা করছিলুম। ভাবলুম তুমি হয়তো এ পথেই ফিরবে। এ সময়েই বাড়ি ফের, না?'

'হ্যাঁ, তা এই সময়েই—'

'আচ্ছা—তাহলে আসবে নাকি?'

ইতস্তত করে বললুম, 'না, থাক—'

ও তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমাকে টাকা দিতে হবে না।'

বোকার মতো বললুম, 'না, সেজন্য নয়, টাকা সঙ্গে আছে—'

ও তিক্তকণ্ঠে বলল, 'ওঃ আচ্ছা—' বলেই পিছন ফিরে চলতে শুরু করল।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে ফেললুম, 'না, না, লিজা—'

আধ-অন্ধকার জনহীন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওর শীর্ণ পাংশুটে মূর্তি। সেই কত বছর আগে ঠিক এমনি অবস্থায় ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। তখন আমারও সে কি লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা, বনের পশুর মতো নিঃসঙ্গ একাকী। সংসারে একটি আপনার জন নেই, কোথাও এতটুকু আশার ইঙ্গিত নেই। প্রথমটায় ও ঠিক ধরা দিতে চায়নি। এসব মেয়েরা যেমন হয়, গোড়াতে আমাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছে, কিন্তু কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হওয়ার পরে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছিল। আমাকে তার সুখ-দুঃখের অংশীদার করে নিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত সম্পর্ক—কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওর সঙ্গে আমার দেখাই হত না। তারপরে হঠাৎ একদিন দেখতুম কোথাও রাস্তার ধারে ও আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দুজনেরই তখন এক অবস্থা—সংসারে কেউ নেই, কিছু নেই। কাজেই সঙ্গ দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, একে অন্যের যেটুকু ভার লাঘব করতুম তার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। ইদানীং কতকাল যে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি! প্যাট্-এর সঙ্গে জানাশোনা হবার পরে বোধকরি একদিনও নয়।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, লিজা?'

ঘাড়টা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে ও বলল, 'তা দিয়ে তোমার কি? তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব ভেবেছিলুম, সেজন্যেই এখানে অপেক্ষা করা। আচ্ছা, এখন তবে আমি আসি।'

জিগগেস করলুম, 'কেমন আছ, দিন কেমন কাটছে?'

ও বলল, 'তাই নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' কথা বলতে গিয়ে ওর ঠোঁট দুটি কাঁপছে, অনাহারক্লিষ্ট মূর্তি। বললুম, 'চল, তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।'

ওর শীর্ণ করুণ মুখখানা মুহূর্তের জন্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিশুর মতো টলটলে হাসি-খুশি ভাবখানা। রাস্তায় ট্যাক্সিওয়ালাদের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খাবার জিনিস কিনে নিলুম। ও কিছুতেই কিনতে দেবে না। শেষটায় বলতে হল আমার নিজেরই দরকার, খিদে পেয়েছে ইত্যাদি—তবে ও রাজী হল। তখন নিজেই দেখে শুনে বেছে জিনিস কিনে নিল, দোকানী বাজে জিনিস দিয়ে পাছে আমাকে ঠকায় এই তার ভয়। আমি চাই আধ পাউণ্ড হ্যাম্, ও কিছুতেই তা কিনবে না। বলে, 'সঙ্গে সসেজ্ যখন কিনছ তখন কোয়ার্টার পাউণ্ডেই হয়ে যাবে।' আমিও ছাড়ব না। শেষ পর্যন্ত আধ পাউণ্ডই কেনা হল, সঙ্গে দুটিন সসেজও নিলুম।

একটা বাড়ির চিলেকোঠায় ও থাকে। ঘরটি নিজেই সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়েছে। টেবিলের উপরে একটি ল্যাম্প আর বিছানার পাশে মোমবাতি। খবরের কাগজ থেকে ছবি কেটে-কেটে সারা দেয়ালে পিন দিয়ে আটকেছে। ছোটো আলমারির উপরে কয়েকখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস। তার পাশে কতকগুলো অশ্লীল ফটো-গ্রাফ। যে সব পুরুষ ওর ঘরে আনা-গোনা করে তারা এসব ছবি দেখতে ভালোবাসে, বিশেষ করে এরা যদি বিবাহিত পুরুষ হয়। লিজা তাড়াতাড়ি ফটোগুলো নিয়ে একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তার পরে পরিষ্কার একখানা টেবিলক্লথ বের করে টেবিলে বিছিয়ে দিল। বহু পুরাতন টেবিলক্লথটির অতি জীর্ণ দশা।

আহার্য বস্তুগুলো খুলে টেবিলে রাখলুম। ইতিমধ্যে লিজা তার পোশাক ছেড়ে নিল। পোশাক ছাড়বার আগে জুতোটা ছাড়তে পারলে ও আরাম পেত। ঐ জুতো পরে রাতভর রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যে কি কষ্টকর সে আমি জানি। কালো রঙের অধোবাস পরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁটু অবধি পেটেণ্ট লেদারের বুট। আমাকে জিগগেস করল, 'আমার পা দুটি দেখতে কেমন বল তো?'

'চমৎকার। তোমার পা বরাবরই দেখতে সুন্দর।'

আমার প্রশংসা শুনে ও খুব খুশি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। একটু পরে জুতো জোড়া তুলে ধরে বলল, 'জানো এর দাম নিয়েছে একশো কুড়ি মার্ক। তাও—জুতোর দাম ওঠবার আগেই জুতো ছিঁড়ে যায়।'

দেরাজ থেকে একটি কিমোনো বের করে নিয়ে পরল আর এক জোড়া জরির কাজ-করা চটি। সুদিনের কেনা, এখন এরও জীর্ণ দশা। বেচারীর মুখে একটি লজ্জিত কুণ্ঠিত হাসি, পাছে আমি মনে করি আমাকে খুশি করবার জন্যই ঐটুকু সাজ-সজ্জার আয়োজন। আসলে কিন্তু খুশি করবার জন্যই। হঠাৎ ঐ ঘরটাতে বসে আমার কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগল। খুব আপনার জন কেউ মরে গেলে মনের অবস্থা যেমন হয় এও তেমনি।

ওর সঙ্গে বসে খেলুম, খেতে-খেতে কথাবার্তাও হল। কিন্তু ও ঠিক বুঝতে পেরেছে সে আগের দিন আর নেই। ওর চোখে ভীত দৃষ্টি। অথচ ওর সঙ্গে কোনোদিনই আমার সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ হয়নি, দৈবের চক্রান্তে যেটুকু সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে সেটুকুই। কিন্তু দৈবের দাবি অনেক সময়ে ঘনিষ্ঠতার দাবির চাইতে বড় হয়ে ওঠে। আমি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ও জিগগেস করল, 'তুমি যাচ্ছ নাকি?' ওর তাই ভয় হয়েছে। বললুম, 'আমার যে আবার একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে—'

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'এই এত রাত্রে!'

'ব্যাপারটা খুব জরুরি, লিজা। একজনের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। এ্যাস্টরিয়াতে এই সময়টাতে ও আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

লিজার মতো মেয়েদের এসব ব্যাপার বুঝতে বাকি থাকে না। ওদের ঠকানো দায়। বেচারীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বলল, 'তুমি নিশ্চয় অন্য কোনো মেয়ের কাছে যাচ্ছ—'

'লিজা, ভেবে দেখ, তোমার আর আমার মধ্যে কি-ই বা সম্পর্ক। এই তো কতদিন দেখাই হয়নি, বোধহয় বছরখানেক হয়ে গেল—'

'না, না, সে কথা হচ্ছে না। আসলে তুমি অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছ। তুমি যে বদলে গিয়েছ সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।'

'কি যে বলছ, লিজা—'

'ঠিকই বলছি। সত্যি কথা স্বীকার করতে দোষ কি?'

'কি জানি, লিজা, বোধকরি আমি নিজের মনকেই জানি না। হয়তো—'

কয়েক মুহূর্ত ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে মাথা নেড়ে বলল, 'তাই তো! আমিও যেমন বোকা আমাদের সম্পর্ক কোন দিন চুকে-বুকে গেছে!' কপালে একবার হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মিছিমিছি কেন আবার ভাবতে গেলুম—' আমার সুমুখে ও দাঁড়িয়ে। ওর শীর্ণ মূর্তি কেমন অসহায় দেখতে, মুখে করুণ মিনতি। জরি-দেওয়া চটি জোড়া, বহুদিনের পুরোনো কিমোনোটি, কত দীর্ঘ ক্লান্ত নিশিযাপন—এক সঙ্গে বহু স্মৃতি মনে এসে গেল। তাড়াতাড়ি বললুম, 'আচ্ছা আসি লিজা. আবার দেখা হবে—'

'যাচ্ছ? আর একটু বসবে না? এরই মধ্যে চলে যাবে?'

ও কি বলতে চায় আমি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু সে আর হয় না। অবিশ্যি আমি এমন কিছু সাধুপুরুষ নই, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বাছবিচার একটা নেই। তবু ওসব আর আমার দ্বারা হবে না। আজই প্রথম বুঝতে পারি আমি কতটা বদলে গেছি, কত দূরে সরে গেছি।

দরজার মুখে ও দাঁড়িয়ে আছে। 'যাচ্ছ তাহলে?' বলেই ছুটে ভিতরে চলে গেল। 'দাঁড়াও, মনে হল, খবরের কাগজের তলায় লুকিয়ে তুমি কিছু টাকা রেখে গেছ।. না, না, ও আমি চাইনে। এই নাও, যাও—জানি এই শেষ, আর কখনো আসবে না—'

'আসব বৈকি, লিজা।'

'উঁহু. আর তুমি আসছ না। হ্যাঁ, না আসাই ভালো। যাও, যাও—'

ও কাঁদছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে তাড়তাড়ি নেমে গেলুম। পিছন ফিরে আর তাকালুম না।

বহুক্ষণ রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম। চোখে আমার ঘুম নেই, আজকে কিছুতেই ঘুম হবে না। 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে লিজার কথা মনে পড়ল, বিগত দিনের অনেক কথা—সে সব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। বহু পুরাতন স্মৃতি, কিন্তু আমার আজকের জীবনের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্কই নেই। হাঁটতে-হাঁটতে প্যাট্-এর বাড়ির দিকে চললুম। জোরে হাওয়া দিয়েছে। ওর বাড়ির কোনো জানালাতেই আলো নেই। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার। অন্ধকার ক্রমে ফিকে হয়ে ধূসর আকাশে প্রভাতের আভাস দিয়েছে। এবার ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে ফিরলুম। কেন জানি না মনটা খুব খুশি লাগছে। বিধাতাকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিলুম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'দেখ, যে মেয়েটিকে তুমি লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ তাকে খোলাখুলিই এখানে আনতে পার। লুকোচুরির তো কোনো দরকার দেখিনে। মেয়েটিকে আমার ভালোই লেগেছে—'

আমি বললুম, 'ওকে তো আর তুমি দেখনি।'

'খুব দেখেছি,' ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলে উঠল। 'দেখেছি এবং দেখে বেশ ভালোই লেগেছে। তবে কিনা অমন মেয়ে তোমাকে মানায় না।'

'সত্যি নাকি?'

'সত্যি না তো কি? আমি তো ভেবেই পাইনে কাফে আর রেস্তোরাঁ ঘেঁটে অমন রত্নটি কেমন করে জোটালে। অবশ্যি যত সব হাভাতেরাই—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'আহা, অবান্তর কথা এসে যাচ্ছে না?'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে বলল, 'ও সব মেয়ে কাদের জন্য জানো? যাদের ঘরে পয়সা আছে, যাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই তাদের। সোজা কথা, ধনী না হলে এ সব মানায় না।'

ওর কথাগুলি মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। মনে-মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'সব মেয়ের বেলাতেই তাই?'

মাথার পাকা চুল নেড়ে বুড়ি বলল, 'উঁহুঁ, একটু সবুর কর, দুদিন বাদে দুনিয়ার হালচাল বুঝবে।'

হাতের বোতামগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, 'ভবিষ্যতের কথা রেখে দাও। আজকাল কেউ ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায়?'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি তার বিরাট মাথাটি ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আজকালকার ছোকরারা কি যে হয়েছে তা আর বলবার নয়। তোমরা অতীতকে ঘৃণা কর,

বর্তমানকে হেসে উড়িয়ে দাও আর ভবিষ্যৎকে তো পাত্তাই দাও না। এভাবে চললে শেষরক্ষা করবে কেমন করে? জানো তো সব ভালো যার শেষ ভালো।'
আমি বললুম, 'এ আবার কেমন কথা হল? যার কেবল শেষটাই ভালো, বুঝতে হবে তার আগের সবই মন্দ। কাজেই শেষটা মন্দ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'
ফ্রাউ জালেওয়াস্কি গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'থাক-থাক, ইহুদীদের মতো চুলচেরা তর্ক করতে হবে না।' বলেই দরজার দিকে এক পা বাড়াল। দরজার ছিটকিনি খুলতে গিয়ে হঠাৎ যেন বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়াল, 'এঁ্যা, ডিনার স্যুট যে! তোমার নাকি?'
অটো কোস্টারের স্যুটটি আলনায় ঝুলছে, বড়-বড় চোখ করে ও তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্যাট্কে নিয়ে থিয়েটারে যাব বলে অটোর কাছ থেকে স্যুটটি ধার করে এনেছি। ওকে চটাবার জন্য বললুম, 'হ্যাঁ, আমারই তো। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, তোমার মতে দেখছি আমাকে কোনো জিনিসেই মানায় না।'
বুড়ি আমার দিকে ফিরে তাকাল। এক সঙ্গে অনেক রকমের চিন্তা ওর মুখের উপর দিকে খেলে গেল। বোকার মতো একটু হেসে বলল, 'আহা-হা।' হঠাৎ কোনো কিছুর আবিষ্কারে স্ত্রীলোকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হলে যেমন চেহারা হয় ওরও তেমনি হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে একবার পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'তাই তো তলে-তলে এ্যাদ্দূর!'
ও যখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে তখন চেঁচিয়ে বললুম, 'হ্যাঁগো ডাইনী বুড়ি, এ্যাদ্দূরই বটে।' অবিশ্যি ও কথাগুলো শুনতে পায়নি। এতক্ষণে নতুন পেটেণ্ট চামড়ার জুতো জোড়াটি বাক্স সমেত মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললুম। হুঁ! ধনী লোক না হলে মানায় না—উনি বড় নতুন কথা বলতে এসেছেন—যেন আমি জানিনে।

প্যাট্কে আনতে গিয়েছি। ও আগে থেকেই সেজেগুজে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ওকে দেখে আমার চক্ষু স্থির! এই প্রথম ওকে সান্ধ্য-পোশাকে দেখলুম। চমৎকার রুপোলী-কাজ-করা ফ্রকটি কাঁধ থেকে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে লেগে গেছে। একটু সরু মতো দেখতে অথচ এমন মানানসই রকম খাপ খেয়ে গেছে যে ওর স্বাভাবিক চলনভঙ্গি একটুও আড়ষ্ট হয়নি। এই অত্যাশ্চর্য পোশাকে প্যাট্কে দেখাচ্ছে নীল প্রদোষালোকে একটি রুপোলী অগ্নিশিখার মতো। সত্যি ওর চেহারা আশ্চর্য রকম বদলে গিয়েছে, ও যেন বহুদূরের

অপার্থিব এক মূর্তি। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল ফ্রাউ জালেওয়াস্কির প্রেতমূর্তি যেন ওর পশ্চাৎ থেকে আঙুল উঁচিয়ে আমাকে সাবধান করছে।

বললুম, 'প্যাট্, ভাগ্যিস প্রথম দিনে তোমাকে এই পোশাকে দেখিনি। তাহলে ভরসা করে তোমার কাছে এগোতেই সাহস হত না।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'বব্, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বল, তোমার কথা বিশ্বাস করিনে। সত্যি, পোশাকটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'কি বলব, চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। তুমি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছ।'

'সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। রূপের রূপান্তর করবার জন্যই তো রকমারি পোশাক।'

'তা হতে পারে। কিন্তু আমাকে যে একটু বেকায়দায় পড়তে হয়। তোমার পাশে আমি একেবারে বেমানান। যথেষ্ট পয়সাওয়ালা লোক হলে তবেই তোমার সঙ্গে মানাত।'

ও হেসে বলল, 'কিন্তু পয়সাওয়ালা লোকগুলো যে বড় সাংঘাতিক জীব।'

'কিন্তু পয়সা জিনিসটা তো সাংঘাতিক নয়।'

'না, তা নয়, পয়সা খারাপ জিনিস নয়, কি বল?'

'আমি তো তাই বলি। টাকায় সুখ না থাকুক, সোয়াস্তি আছে, আরাম আছে।'

'বব্, তার চেয়ে বল, টাকায় স্বাধীনতা আছে, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না। সেটাই সব চেয়ে বড় কথা। যাকগে, তোমার যদি আপত্তি থাকে বল, এ পোশাকটা বদলে নিই।'

'না, না, মোটেই না। তোমাকে অদ্ভুত মানিয়েছে। পোশাকের মর্ম আজকেই বুঝলুম। এখন থেকে বস্ত্রব্যবসায়ীকে আমি দর্শনশাস্ত্রীর উপরে স্থান দেব। রূপকে অপরূপ করবার কৌশল সংসারের গভীরতম চিন্তার চাইতে ঢের বেশি মূল্যবান। কিন্তু তোমাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে, পাছে না তোমার প্রেমে পড়ে যাই।'

ও হেসে উঠল। আমি আড়চোখে একবার নিজের পোশাকটার দিকে তাকিয়ে নিলুম। কোটটার আকারে প্রকারে আমার চাইতে কিঞ্চিত বৃহৎ। ওর প্যাণ্টটিকে আমার দেহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য এখানে-ওখানে সেফটিপিন দিয়ে জোড়াতালি লাগাতে হয়েছে। খুব ভাগ্যি এক রকম মানিয়ে গেছে।

ট্যাক্সি করে থিয়েটারে রওনা হলুম। কেন জানিনে রাস্তায় কথাবার্তা বড় একটা বলিনি। গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছি, হঠাৎ ড্রাইভারের মুখের দিকে নজর পড়ল। চোখের তলায় লাল শিরে দাগ, দাড়ি কামায়নি, অত্যন্ত শ্রান্ত

চেহারা। লোকটি নির্লিপ্তভাবে হাত বাড়িয়ে দামটা নিল। আমি আস্তে জিগগেস করলুম, 'কেমন, আজকে রোজগার কেমন হল?'
এক নজরে আমার দিকেতাকিয়ে লোকটি সংক্ষেপে জবাব দিল, 'এই, এক রকম।' বেশি কথা বলবার ইচ্ছে নেই মনে হল। আমার অনাবশ্যক কৌতূহল বোধ করি ওর ভালো লাগেনি।
হঠাৎ আমার মনে হল ওর পাশের সিটে বসে ওর সঙ্গেই চলে যাই, ওখানেই আমার স্থান। মুহূর্তমাত্র, তারপরেই পিছন ফিরে চলে এলুম। ঐ যে প্যাট্ দাঁড়িয়ে, তনুদেহটি রূপোলী ফ্রকে আবৃত, তার উপরে আবার ঢিলে হাতাওয়ালা রুপোলী জ্যাকেট। অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। উৎসাহে উত্তেজনায় অধীর। আমাকে ডেকে বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, বব্, এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে।'
থিয়েটার-গৃহের সুমুখে লোকের বিষম ভিড়। আজকেই একটা নতুন অভিনয় শুরু হবে, ফ্লাড্‌লাইট দিয়ে চারদিক আলোয় আলোময় করা হয়েছে, গাড়ির পর গাড়ি এসে জমছে, সান্ধ্য-পোশাক-পরা মেয়ে দলে-দলে গাড়ি থেকে নামছে, দামী গয়না ঝিলিক মেরে যাচ্ছে। সঙ্গে সুসজ্জিত পুরুষের দল হাসি-মশকরা করছে, ফুর্তি করছে, চিন্তা, ভাবনা এদের বাড়ির ধারে-কাছেও নেই। চারিদিকের হৈ-হল্লার ভিতরে পূর্বোক্ত ড্রাইভারটি তার ট্যাক্সিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল। প্যাট্ অস্থির হয়ে ডাকতে লাগল, 'চলে এস বব্। কি হয়েছে, কিছু ভুলে-টুলে এসেছ নাকি?'
লোকের ভিড়ের দিকে একবার বিরক্ত মুখে তাকিয়ে বললুম, 'না, না, কিছু ভুলিনি।'
আপিসে গিয়ে আমি টিকিট দুটি বদলে বক্স সিট্ নিলুম, যদিও তাতে দাম পড়ে গেল অনেক। এই নিশ্চিন্ত নির্বিকার বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে প্যাট্‌কে নিয়ে বসতে আমার মন সরছিল না। প্যাট্‌কে ওদের সঙ্গে একদলে ভিড়তে দেব না। ওকে নিরালায় আমার কাছে পেতে হবে।

অনেকদিন থিয়েটারে আসিনি। প্যাট্ আসতে চাইল বলেই, নইলে আজও আসতুম না। থিয়েটার-কনসার্ট-এ যাওয়া, বই পড়া—এ সব মধ্যবিত্তদের অভ্যাস আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। ও সবের দিন গিয়েছে। আজকাল থিয়েটারের চাইতে রাজনীতি বেশ রোমাঞ্চকর, আর প্রতি রাত্রে যে গোলাগুলি খুনখারাপি চলছে তার কাছে কোথায় লাগে কনসার্ট? তা ছাড়া চতুর্দিকে বহুবিস্তৃত যে

দারিদ্র্যের কাহিনী তার তুলনায় লাইব্রেরির বইয়ের গল্প তো কোন ছার!
গ্যালারি এবং স্টল সব ভর্তি। সিট্‌-এ গিয়ে বসতে না বসতে আলো নিভে গেল। শুধু ফুট্‌লাইটের সামান্য আলো হল্‌-এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরোদমে বাজনা শুরু হয়েছে, তারি তালে-তালে সমস্ত ঘরটা যেন দুলছে। আমার চেয়ারটি সরিয়ে নিয়ে বক্সের এক কোণে গিয়ে বসলুম। সেখান থেকে স্টেজও দেখা যায় না আর দর্শকদের শাদা পাংশুটে মুখগুলিও দেখা যায় না। বসে শুধু বাজনাটা শুনছি আর প্যাট্‌-এর মুখখানা দেখছি।
সুরের ধ্বনি চতুর্দিকে একটি মোহ বিস্তার করেছে। সুরের মোহে সমস্তই অবাস্তব মনে হচ্ছে। এ যেন বসন্ত সমীরণের মতো কিম্বা ঈষদুষ্ণ বসন্ত নিশির মতো কিম্বা বলা যেতে পারে তারায়-ভরা আকাশের তলায় সমুদ্রগামী জাহাজের ভরা-পালের মতো কোনো অজানা স্বপ্নরাজ্যের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। রঙে রসে সব কিছু ঝলমল করছে, সুরের সুরায় জীবনপাত্র উচ্ছল হয়ে উঠেছে। মনে হয় কোনো বাধা নেই, বিঘ্ন নেই—সঙ্গীতে, সুধায়, প্রেমে, জীবন অপূর্ব মনোহর। এখানে বসে কে বলবে চতুর্দিকে দুঃখ দৈন্য হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই।
স্টেজ-এর মৃদু আলোকে প্যাট্‌-এর মুখখানা দেখাচ্ছে কি যেন এক রহস্যে আবৃত। সুরের লহরীতে ও নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। ও যে আমার কাছে ঘেঁষে এসে বসেনি কিম্বা হাত বাড়িয়ে আমার হাতে হাত রাখেনি, সে আমার কাছে ভালোই লাগল। এমন কি একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়ওনি বোধকরি আমার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। চোখের সুমুখে যখন সুন্দরের প্রকাশ তখনো যদি মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় তবে আমার বড় রাগ ধরে, এ সব প্রেমিকাদের ঘেঁষাঘেঁষি আর হ্যাংলামি দেখলে বড় ঘেন্না লাগে। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল-করা চোখ দেখলেই চিত্ত জ্বলে যায়। গরু-ভেড়ার মতো সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া আর কিছুর কথা এরা ভাবতেই পারে না। প্রেমের ভিতর দিয়ে দুজন মানুষের মিলন হয়, দুয়ে মিলে এক হয়, এ সব কথা আমি শুনতেই পারি না। আমার তো মনে হয় আমরা অমনিতেই এক হয়ে আছি, একটু দূরে সরতে পারলে বর্তে যাই। মাঝে-মাঝে বিচ্ছেদ না ঘটলে মিলনের আনন্দ ঠিক বোঝা যায় না। নিরন্তর একলা থেকে যাদের অভ্যাস তারাই সত্যিকারের মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। অন্যথা মিলনের সূত্রটি কেবলই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়।
দপ্‌ করে সব আলো জ্বলে উঠল। ক্ষণকালের জন্য চোখ বুজতে হল। বসে-বসে

কি যে ভাবছিলুম! এতক্ষণে প্যাট্ ফিরে তাকাল। সার-সারি লোক দরজার দিকে এগোচ্ছে! ইন্টারভ্যাল্ শুরু হয়েছে, ভাই।
প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'বাইরে যাবে?'
ও মাথা নেড়ে নিষেধ করল।
যাক্ বাঁচা গেছে। বাইরে না যাওয়াই ভালো। লোকগুলো এমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে!
আমি একলাই গেলুম, ওর জন্য একগ্লাশ লেবুর সরবত আনতে। বার্-এ বিষম ভিড়। গান-বাজনা শুনে দেখেছি কোনো-কোনো লোকের ভয়ানক খিদে পেয়ে যায়। গরম-গরম সসেজ মুহূর্তে কোথায় উড়ে যেতে লাগল, যেন খিদের এপি-ডেমিক্ লেগেছে!
ভিড় ঠেলে কাউন্টারের দিকে এগোতে-এগোতে ভাবছিলুম আমাদের বুড়ি-মা'র দোকানটি এখানটায় হলে বেশ হত। কোনো রকমে গিয়ে এক গ্লাশ লেবুর রস সংগ্রহ করা গেল। এটিই শেষ গ্লাশ, আর নেই। খোঁচা-খোঁচা গোঁপওয়ালা একটা লোক গ্লাশটির উমেদার ছিল। জিনিসটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে লোকটা বিষম চটে গেল, রাগে গরগর করতে লাগল।
আমি ওকে শান্ত করবার জন্য বললুম, 'আপনি তো আগেই দু-গ্লাশ খেয়েছেন।' লোকটা বলল, 'তাতে কি? আর এক গ্লাশ না হলে যে আমার তেষ্টা মিটছে না।'
এমন লোকের সঙ্গে কথা বলে কি লাভ, ওকে আমল না দেওয়াই ভালো। অপরের ধন কেড়ে নেওয়া মানুষের আদিমতম বৃত্তি, এর মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি আছে। সত্যি, মানুষের কোনো কালে দয়া-মায়া ছিল না, কখনো থাকবেও না। গ্লাশ হাতে বক্সে এসে দেখি প্যাট্-এর চেয়ারের পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। প্যাট্ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে খুব কথা বলছে। আমি আসতেই বলল, 'রবার্ট, ইনি হচ্ছেন হের ক্রয়ার।'
মনে-মনে বললুম, 'একটি ষণ্ড বিশেষ।' বোধকরি একটু বিরক্তির সঙ্গেই ওর দিকে তাকালুম। লক্ষ্য করলুম প্যাট্ আমাকে রব্বি না বলে রবার্ট সম্বোধন করল। গ্লাশটি রেলিং-এর উপর রেখে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, লোকটা কতক্ষণে যায়। খুব চমৎকার ফ্যাশনদার একটি ডিনার স্যুট পরে এসেছে। অভিনয়, অভিনেতা ইত্যাদি নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু যাবার নামটি করছে না।

প্যাট্ আমার দিকে ফিরে বলল, 'হের ক্রয়ার জিগগেস করছিলেন এর পরে কাস্‌কেড্-এ যেতে তোমার আপত্তি আছে কিনা।'

আমি বললুম, 'তোমার যেমন ইচ্ছে।'

ক্রয়ার বলল, 'ওখানে গেলে একটু নাচ-টাচ হতে পারে।'

মন্দ কি ? লোকটি খুব ভদ্র, মোটামুটি ওকে আমার ভালোই লাগল। শুধু ওর ফিটফাট কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গি আর আলাপ জমাবার সহজ ক্ষমতা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। প্যাট্-এর উপরে এ সবের খানিকটা প্রভাব না হয়ে যায় না। বিশেষ করে আমার নিজের ওসব গুণ একেবারেই নেই কিনা। হঠাৎ কানে গেল ও যেন খুব অন্তরঙ্গ স্বরে আদর করে প্যাট্‌কে সম্বোধন করছে। করাটা কিছুই বিচিত্র নয়, হয়তো ওর অধিকারও আছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি ওকে ধরে ঐ অর্কেস্ট্রার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

বেল বেজে উঠল। বাজনদারেরা যার-যার যন্ত্রের সুর বাঁধছে, বেহালার মৃদু তান শোনা যাচ্ছে। 'আচ্ছা, তবে ঐ ঠিক হল, বেরোবার পথটাতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব'—বলে ক্রয়ার এতক্ষণে বিদায় নিল।

প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'এই মূর্তিমানটি কে ?'

'আহা অমন করে কেন বলছ। ও খুব ভালোমানুষ, আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

'ও সব অনেককালের বন্ধুদের আমি কেন যেন ঠিক পছন্দ করতে পারিনে।'

প্যাট্ অনুনয়ের সুরে বলল, 'আহা, শোনোই না, লক্ষ্মীটি—'

ওদিকে আমি ভাবছি কাস্‌কেড্-এর কথা আর মনে-মনে টাকার হিসেব করছি। দুত্তোর, ও সব কি আমার পোষায় ? টাকার শ্রাদ্ধ আর কি !

প্যাট্-এর পিছন-পিছন বেরিয়ে আসছি মনে কিছু-বা বিরক্তি কিছু-বা কৌতূহল। এই ক্রয়ারকে দেখে অবধি ক্রাউ জালেওয়াস্কির যত সব অপয়া কথাবার্তা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। ক্রয়ার আগে থেকেই দরজার মুখে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা ট্যাক্সিকে ডাকতেই ক্রয়ার বলল, 'কিছু ভাববেন না, আমার গাড়িতে যথেষ্ট জায়গা আছে।'

বললুম, 'বেশ।' এ ছাড়া আর কিছু বলাও যায় না ; কিন্তু মনে-মনে বিরক্ত হলুম। প্যাট্ দেখলুম ক্রয়ারের গাড়ি দেখেই চিনে ফেলল। প্রকাণ্ড একটি প্যাকার্ড, সুমুখের খোলা জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে। প্যাট্ এদিক-ওদিক না তাকিয়ে

সোজা ঐ গাড়িটার দিকেই এগিয়ে গেল। বলল, 'রঙটা দেখছি বদলানো হয়েছে।' ক্রয়ার বলল, 'হ্যাঁ, গ্রে রঙ করেছি। আগের চাইতে এটা ভালো হয়নি?'

'অনেক ভালো।'

ক্রয়ার আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বলেন? রঙটা পছন্দ হয়?'

আমি বললুম, 'আগে কি রঙ ছিল তা তো জানিনে।'

'আগে ছিল কালো।'

বললুম, 'তা কালোও তো বেশ দেখতে।'

'তা ঠিক। তবে, মাঝে-মাঝে একটু অদল-বদল না হলে চলে না। মাস কয়েক বাদে একটা নতুন গাড়ি কিনব ভাবছি।'

কাস্কেড-এর দিকে রওনা হলুম। ফ্যাশনেবলদের নাচের আড্ডা, ভিতরে চমৎকার ব্যাণ্ড বাজছে। ভয়ানক ভিড়। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আমি একটু খুশির সুরেই বললুম, 'ঘর ভর্তি, জায়গা নেই দেখছি।'

প্যাট্ নিরাশ হয়ে বলল, 'তাই তো!'

ক্রয়ার বলল, 'রোসো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।' ভিতরে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কি একটু কথা বলল। লোকটার দেখছি এখানে পসার-প্রতিপত্তি আছে, কারণ, বলতে-না বলতে আমাদের জন্য আলাদা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার এসে গেল। দু-মিনিটের মধ্যে আমরা ঘরের সব চেয়ে ভালো জায়গাটি দখল করে বসলুম। সেখান থেকে সমস্ত নাচের জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়।

ট্যাঙ্গো বাজনা চলছে। প্যাট্ রেলিং-এ ঝুঁকে বসেছিল, বলল, 'আহা কতকাল যে নাচিনি।'

ক্রয়ার তন্মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'তবে হোক না, এস।'

প্যাট্ খুব খুশি, হেসে আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম, 'ততক্ষণ আমি একটা কিছু পানীয় ফরমাশ করি।'

অনেকক্ষণ ধরে ট্যাঙ্গো নাচ চলল। প্যাট্ নাচের ফাঁকে-ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছে, মিষ্টি করে হাসছে। আমিও প্রতিবারে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসিটি গ্রহণ করছি। কিন্তু মনে-মনে খুব যে খুশি হচ্ছি এমন নয়। ওকে দেখাচ্ছে অপূর্ব আর নাচছেও চমৎকার। দুঃখের বিষয় ক্রয়ার লোকটাও কিছু কম নাচিয়ে নয়, রীতি-মতো ভালো নাচে আর দুটিতে যা মানিয়েছে—খাশা।

বেশ বোঝা যায় এর আগে বহুবার ওরা একসঙ্গে নেচেছে। আমি বড় এক গ্লাশ রাম্‌-এর ফরমাশ দিলুম।

ওরা দুজনে ফিরে এল। ক্রুয়ার আবার উঠে গেল চেনা-জানা কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। খানিকক্ষণের জন্য প্যাট্‌-এর সঙ্গে একলা থাকার একটু সুযোগ পেলুম। জিগগেস করলুম, 'এ ছোকরার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?'

'অনেকদিন। কেন বল তো?'

'কিছু না, অমনি মনে হল। ওর সঙ্গে এখানে প্রায়ই আসতে নাকি?'

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'রব্বি, অত কথা আমার মনে নেই।'

আমি নাছোড়বান্দার মতো বললুম, 'এসব কথা লোকে ভোলে না।'

অবিশ্যি ও কি বলতে চায় আমি বেশ বুঝেছি।

ও কিন্তু কিছুই বলল না। শুধু মাথা নেড়ে-নেড়ে হাসতে লাগল। সেই স্বল্পপরিসর মুহূর্তটিতে ওকে কি যে ভালো লাগছিল কি বলব! ও আমাকে বোঝাতে চায় যে সে-সব পুরোনো কথা সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। কিন্তু আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে আছে। জানি নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছি, তবু মন থেকে কাঁটাটা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। হাতের গ্লাশটি টেবিলের উপর রেখে বললুম, 'ইচ্ছে করলে আমাকে সব বলতে পার। ওতে কিছু এসে যাবে না।'

ও চোখ তুলে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি যেত আসত তবে কি তোমাকে নিয়ে এখানে আসতুম?'

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, 'না, তা তো নয়ই।'

আবার বাজনা শুরু হল। ক্রুয়ার এসে বলল, 'এ নাচটা চমৎকার। আসুন না, নাচবেন।'

বললুম, 'না।'

'বড়ই দুঃখের কথা।'

প্যাট্‌ বলল, 'রব্বি, একবার দেখই না চেষ্টা করে।'

'না, সে আমার দ্বারা হবে না।'

ক্রুয়ার বলল, 'কেন, হবে না কেন?'

একটু বিরক্তির সুরেই বললুম, 'নাচ-টাচ আমার ভালোই লাগে না। আমি কখনো শিখিনি, শেখবার সময়ও হয়নি। তা, আপনারা নাচুন না। আমার জন্য

ভাববেন না, আমি এখানে বেশ আছি।' দেখলুম প্যাট্ একটু ইতস্তত করছে। বললুম, 'প্যাট্, তুমি নাচের ভক্ত, কেন মিছিমিছি—'
'সেটা সত্যি কথা। কিন্তু এখানে সত্যি তোমার ভালো লাগছে?'
'বলছ কি?' গ্লাশটি দেখিয়ে বললুম, 'এটাও এক রকমের নাচ।'
ওরা দুজনে উঠে চলে গেল। গ্লাশটি নিঃশেষ করে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টেবিলে ঠেসান দিয়ে বসে রইলুম আর টেবিলে ছড়ানো নোস্তা বাদামগুলো একে-একে গুনতে লাগলুম। হঠাৎ মনে হল ফ্রাউ জালেওয়াস্কির একটি প্রেতাত্মা আমার পাশে বসে আছে।

ক্রুয়ার কয়েকজন নতুন লোক আমাদের টেবিলে এনে হাজির করল। দুজন স্ত্রীলোক, বেশ সুন্দরী দেখতে আর একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা, তার মাথায় প্রকাণ্ড টাক। খানিক পরে আর একজন এসে জুটল। চারজনই বলতে গেলে এক জাতের—শোলার মতো হাল্কা স্বভাব, মুখে খই ফুটছে, সবজান্তার মতো ভাব-ভঙ্গি। দেখলুম প্যাট্ এদের সবাইকেই জানে।
একটা মাটির তালের মতো আমি বসে আছি। ইতিপূর্বে প্যাট্‌কে বরাবর দেখেছি একলা। আজকেই প্রথম ওকে দেখলুম নিজের পরিচিত মহলে। এখানে আমার কিছু বলবারও নেই করবারও নেই। এরা কিন্তু দিব্যি সহজে চলছে ফিরছে, ফুর্তি করছে, নিশ্চিন্ত নির্বিকার জীবন। বলতে গেলে এরা অন্য জগতের মানুষ। এখানটায় আমি যদি একলা আসতুম কিংবা লেন্‌ৎস আর কোষ্টার যদি সঙ্গে থাকত তবে এদের নিয়ে মাথাই ঘামাতুম না। কিন্তু মুশকিল যে প্যাট্ রয়েছে সঙ্গে আর এরা তার চেনা-জানা লোক। তাতেই সমস্ত জিনিসটা অদ্ভুত ঠেকছে। আমাকে একেবারে মুষড়ে দিয়েছে, কিছুতেই নিজের সঙ্গে ওদের তুলনা না করে পারছি না।
ক্রুয়ার প্রস্তাব করল, 'এবার আর কোথাও যাওয়া যাক্।'
ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে প্যাট্ বলল, 'রব্বি, তুমি বরং বাড়ি চলে গেলে পারতে।'
বললুম, 'না। যেতে বলছ কেন?'
'বুঝতে পারছি তোমার ভালো লাগছে না, বিরক্ত লাগছে।'
'মোটেই না, বিরক্ত লাগবে কেন? বরং উল্টো। বিশেষ করে তোমার তো ভালো লাগছে।'

ও আমার মুখের দিকে একবার তাকাল, কিছুই বলল না।

নতুন জায়গায় এসেই আমি মদের গ্লাশ নিয়ে বসলুম। একটু বেশি পরিমাণেই গলাধঃকরণ করতে হবে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই টেকো-মাথা ছোকরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। জিগগেস করল, 'কি খাচ্ছেন ?'

বললুম, 'রাম্।'

'এ্যাঁ, গ্রগ ?'

'উহুঁ, রাম্।'

ছোকরা একটুখানি চেখে দেখতে গিয়ে বিষম খেয়ে দম্ আটকে মরে আর কি ! আমার প্রতি ওর ভক্তি শ্রদ্ধা ঢের বেড়ে গেল, বলল, 'বাপরে বাপ ! রীতিমতো অভ্যেস না থাকলে এসব জিনিস চলে না।' ততক্ষণে স্ত্রীলোক দুটিও আমাকে লক্ষ্য করতে শুরু করেছে। ওদিকে প্যাট্ আর ক্রুয়ার নাচছে। প্যাট্ প্রায়ই আমার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু আমি আর ফিরে তাকাচ্ছি না। জানি সেটা অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ কেন এমন মতি হল জানিনে। ওদিকে এরা সবাই আমার মদ খাওয়াটা লক্ষ্য করছে দেখে মনে-মনে আমি বিরক্ত হচ্ছিলুম। আমি তো ছোকরা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের মতো একটু কেরদানি দেখবার জন্য খাচ্ছি না। ওখান থেকে উঠে বার-এর ভিতরে চলে গেলুম। প্যাট্‌কে এখন একেবারে অজানা অচেনা মনে হচ্ছে। তার দলের লোকদের সঙ্গে সে জাহান্নমে যেতে চায় তো যাক। ও তো ওদেরই দলের। না, না, ও এদের দলের নয়। হ্যাঁ, তা—এদেরই তো।

টেকো-মাথা ছোকরা আমার সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে। এক দফা ভড্‌কা খাওয়া গেল। বার্-এর মিক্সার লোকটিকেও ডেকে বসালুম। সঙ্গী হিসাবে এরা বেশ লোক। এদের সঙ্গে সর্বত্র খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, কথাবার্তার বালাই থাকে না। তাছাড়া এ লোকটি অমনিতেও ভালো। কিন্তু মুশকিল বাধাল টেকো-মাথা। সে তার দুঃখের কথা আমার কাছে নিবেদন না করে ছাড়বে না। কোথাকার কোন ফিফি নামধারিণীর প্রেমে পড়ে ওর হৃদয়ভার দুর্বহ হয়েছে। অবিশ্যি সে বৃত্তান্তটা বেশি দূর অগ্রসর হল না। প্রসঙ্গক্রমে টেকো আমায় বলল ক্রুয়ার নাকি এককালে প্যাট্ এর প্রেমিক ছিল এবং বেশ কয়েক বছর দুজনের বেশ ভাব ছিল। আমি বললুম, 'সত্যি নাকি ?' আমার প্রশ্ন শুনে ও মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল। একটি অয়স্টার খেতে দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করলুম। কিন্তু ওর ঐ কথাটা আমার মাথায় বিঁধে রইল। নিজের উপরেই রাগ হচ্ছিল ; কারণ, এলুম বলেই

তো কথাটা শুনতে হল। না হয় শুনলুম কিন্তু মনে যে বিঁধছে তাতেই আরো বেশি রাগ হচ্ছে। টেবিল চাপড়ে ধমকে লোকটাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া উচিত ছিল। অক্ষম রোষে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে; কিন্তু অপরের চাইতে নিজের উপরেই ক্রোধটা হচ্ছে বেশি।

টেকো-মাথার কথা অল্পতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, খানিক পরে উঠে চলে গেল। আমি একলাই বসে রইলুম। হঠাৎ কার অঙ্গস্পর্শে চমকে উঠে দেখি ক্রয়ার যে দুজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিল তারই একজন আমার গা ঘেঁষে এসে বসেছে। তার নীলচে চোখের ত্যারছা চাউনি দিয়ে একবার আমার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে নিল। সে চাউনির ভাষা এত স্পষ্ট যে মুখে কিছু বলবার প্রয়োজন হয় না। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আশ্চর্য, আপনি একধার থেকে যে পরিমাণ পান করেছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।' আমি কোনো জবাবই দিলুম না। ও একটি হাত আমার গ্লাশের দিকে বাড়িয়ে দিল, খুব আস্তে যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। গিরগিটির মতো একটি হাত। রুক্ষ এবং পেশীবহুল, কিন্তু দামী গয়নায় ঝকঝক করছে। ও কি চায় আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। মনে-মনে বললুম, রোসো তোমাকে ঠাণ্ডা করছি। আমাকে তো চেনোনি। মনটা দমে আছে কিনা, তাই ভেবেছ—ভুল করেছ, বন্ধু। স্ত্রীলোকে আমার আর রুচি নেই। ওসব ঢের হয়েছে। শুধু ভালোবাসার প্রতি একটু লোভ ছিল, সেটার অভিজ্ঞতা হয়নি কিনা। সেই অসম্ভবের আশাতেই মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছি।

স্ত্রীলোকটি কথা বলতে শুরু করল। ওর গলার স্বরটা কেমন কাঁচ-ভাঙা শব্দের মতো ঝন্‌ঝনে। দেখলুম প্যাট্‌ দূর থেকে তাকিয়ে দেখছে। আমি তা দেখেও দেখছিনে। অবিশ্যি পাশের স্ত্রীলোকটিকেও আমল দিচ্ছি না, ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি যেন একটা অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছি। অবিশ্যি আমার এ ভাবান্তরের জন্য ক্রয়ার কিম্বা তার এই দলটি দায়ী নয়, এমন কি প্যাট্‌ও নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে বাস্তবজীবন মানুষের মনে কেবল কামনা-বাসনারই সৃষ্টি করে, কিন্তু তার তৃপ্তি যোগাতে পারে না। মানুষের মনে প্রেমের উদয় হয়, কিন্তু প্রেমের তৃপ্তি সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। মানুষের জীবনে কি যে এক অভিশাপ আছে, সব যদি তার হাতে তুলেও দেওয়া যায়—সুখ, প্রেম, জীবন—তবু জীবনের পরিধি বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আসল বস্তুটা যেন ক্রমে ছোট হয়েই আসে।

আড়চোখে এক-একবার প্যাট্-এর দিকে তাকাচ্ছি। তার রুপোলী পোশাক পরে সে নাচছে। আশ্চর্য লাবণ্যময়ী মূর্তি, একটি যেন প্রদীপ্ত জীবনশিখা আপন যৌবনবেগে চঞ্চল। আমি ওকে ভালোবেসেছি। একবার যদি 'এস' বলে ডাকি জানি সে না এসে পারবে না। আমার আর ওর মধ্যে কোনো বাধা নেই। দুটি মানুষের যতখানি কাছে আসা সম্ভব তাই আমরা এসেছি। তবু কোথায় যেন ব্যথার খোঁচা লেগে থাকে, হঠাৎ কখন মনের আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওর জীবনের কেন্দ্র থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে পারিনে; ওর বিগত জীবনের শিকড় যেখানে গেড়ে গেছে সেখান থেকে ওকে উপড়ে ফেলতে পারিনে। এ মুহূর্তের পাওয়া বিগত দিনের না-পাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। পেয়েও যেন পাই না। সময়ের শিকল পায়ে জড়িয়ে গেছে। সুমুখে চলতে গেলে পিছনে টান পড়ে। অতীতের সহস্র স্মৃতি এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। আমি ওকে চেনবার আগেই যে সব মানুষের সঙ্গে ও দিন কাটিয়েছে এদের হাত থেকে ওকে আমি ছিনিয়ে নেব কেমন করে।

আমার পাশে বসে ঐ মেয়েটি তার ঝনঝনে গলায় কথা বলে যাচ্ছে। আজ রাত্রের জন্য ও একটি সঙ্গী চায়, ওর বহুদিনের অতৃপ্ত খিদেয় একটু শান দেবে বলে। বোধকরি নিজেকেই ভুলে থাকতে চায়। কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে সংসারে শেষ পর্যন্ত কিছুই টেঁকে না—'আমি'ও না 'তুমি'ও না, 'আমরা' তো নয়ই। আসলে ও আর আমি একই জিনিস খুঁজছি। নিঃসঙ্গ নিরর্থক জীবনের গ্লানি ঘুচাবার জন্য অন্তত একটি সঙ্গীর প্রয়োজন। ওকে বললুম, 'এস, তুমিও ফিরে চল। আমিও ঘরে ফিরি। তুমি যা চাও আর আমি যা চাই সে জিনিস কোথাও মিলবে না।'

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হো-হো করে হেসে উঠল।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা পর-পর আরো কয়েক জায়গায় গেলাম। ক্রুয়ার ফূর্তিতে মশগুল, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু প্যাট্ এখন চুপচাপ। ও আমাকে কিছু জিগগেসও করল না, কিম্বা আমার প্রতি যে কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ করা তাও করল না। ভালো-মন্দ কিছুই বলল না। চুপচাপ দলের সঙ্গে চলেছে, এই যা। দরকার হলে মাঝে-মাঝে নাচছেও, কখনো-কখনো আমার দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছে। নৃত্যভঙ্গিটি আগের মতোই মনোহর।

নাইট ক্লাবের পাংশুটে ক্লান্তির ছাপ লেগেছে মানুষের মুখে, ঘরের দেয়ালে।

বাজনাটা শোনাচ্ছে মৃতদেহ সৎকারের বাজনার মতো। টেকো-মাথা লোকটি কফি খাচ্ছে আর গিরগিটির মতো হাতওয়ালা স্ত্রীলোকটি শূন্য দৃষ্টিতে সুমুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি মেয়ের কাছ থেকে ক্রয়ার কিছু গোলাপ ফুল কিনে নিয়ে প্যাট্ এবং অপর স্ত্রীলোক দুটিকে ভাগ করে দিল। আধ-ফোটা কুঁড়িগুলিতে বিন্দু-বিন্দু জলের ফোঁটা টল্‌টল্ করছে। প্যাট্ আমার দিকে ফিরে বলল, 'এস না, একবার আমরা দুজনে একটু নাচি।'

বললুম, 'না।' এতক্ষণ ও যে অপরের বাহুবন্ধনের মধ্যে ছিল সে কথা ভেবেই বললুম, 'উঁহু, তা হয় না।' কথাটা বলে নিজেরই কেমন বোকা-বোকা মনে হতে

প্যাট্ বলল, 'হবে না। কেন, এস।' ওর চোখের তারা দুটি কালো হয়ে উঠেছে।

বললুম, 'না, প্যাট্, আমার দ্বারা হবে না।'

এবার সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। ক্রয়ার বলল, 'আসুন, আপনাকে গাড়িতে পৌছে দিই।'

বললুম, 'খুব ভালো কথা।'

গাড়ির ভিতরে একটি কম্বল ছিল। ক্রয়ার সেটি নিয়ে প্যাট্-এর হাঁটুর উপরে ঢেকে দিল। প্যাট্-এর মুখ ফ্যাকাশে, ওকে হঠাৎ বিষম ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় বার্-এর চাকরানি এসে এক টুকরো কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিল। যেন ও কিছুই নয় এমনি ভাব দেখিয়ে গাড়িতে উঠে বসলুম। গাড়ি চলছে, আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। প্যাট্ একটি কোণে কুঁচকে বসে আছে, একটুও নড়ছে-চড়ছে না। এমন কি ওর নিঃশ্বাসের শব্দটিও শুনতে পাচ্ছিনে। ক্রয়ার প্রথমে থামল প্যাট্-এর বাড়িতে। কিছু জিগগেস না করে সোজা যখন ওখানে চলে এল, তখন বোঝা গেল প্যাট্-এর বাড়ি ও আগে থেকেই চেনে। প্যাট্ নেমে গেল। ক্রয়ার ওর হাতে চুমু খেল। আমি ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললুম, 'গুড্ নাইট।'

ক্রয়ার এবার আমাকে জিগগেস করল, 'আপনাকে কোথায় নামাব, বলুন।'

'এই সামনের মোড়টাতেই।'

ও তক্ষুনি খুব ভদ্রভাবেই বলল, 'তা কেন, বাড়ি অবধিই পৌছে দিতে পারি।' আসলে ওর ভয় হয়েছে পাছে আমি এখানটায় আবার ফিরে আসি। মনে-মনে খুব রাগ হল, দুকথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছে হল। শেষটায় ভাবলুম, যাকগে, কি দরকার আবার ওর সঙ্গে—'বেশ, আমাকে বরং বার্ ফ্রেডিতে পৌছে দিন।'

'এত রাত্রে ওখানে ঢুকতে পারবেন ?'

বললুম, 'আমার জন্য দেখছি আপনার বিষম দুশ্চিন্তা। কিচ্ছু ভাববেন না, আমি যে কোনো জায়গায় ঢুকে পড়তে পারব।'

কথাটা বলে ফেলে শেষটায় দুঃখ হল। বেচারা সেই সন্ধ্যে থেকে খুব ফুর্তিতে আছে। মনের আনন্দে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ওকে ঘা দিয়ে কথা বলবার কিছু দরকার ছিল না। বিদায় নেবার সময় খুব হৃদ্যতার সঙ্গেই বিদায় নিলুম, প্যাট্‌কে যে-ভাবে বিদায় দিয়েছি সে-ভাবে নয়।

বার্ তখনো বেশ ভর্তি। লেন্‌ত্‌স, ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ, বলউইজ্ এবং আরো কজন মিলে পোকার খেলছে। গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'বসে পড়, বব্, দিব্যি পোকার খেলবার মতো আবহাওয়াটা হয়েছে।'

বললুম, 'না হে।'

টেবিলের উপরে ছড়ানো এক গাদা টাকা দেখিয়ে বলল, 'একবার ওদিকে তাকিয়েই দেখ। ধাপ্পাবাজি চলবে না। ফ্লাশ হল বলে।'

'আচ্ছা তবে দাও দেখিনি এদিকে।'

দুটি সাহেব পেয়েই আমি ধাপ্পা মেরে চারটি গোলামকে কাত করলাম। 'কেমন, দেখলে তো ধাপ্পা চলে কি না চলে ?'

ফার্ডিনাণ্ড আমার দিকে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'সে তো সব সময়ই চলছে।'

ওখানে বেশিক্ষণ থাকবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখানটায় এসে তবু যেন পায়ের তলায় মাটির নাগাল পেয়েছি। খুব যে ভালো লাগছিল এমন নয়। তবু জায়গাটা আমার বহুদিনের পুরোনো আস্তানা, নিজের বাড়িঘরের মতো হয়ে গেছে। ফ্রেড্‌কে ডেকে বললুম, 'আধ বোতলটাক রাম্ এদিকে দিয়ে যাও তো।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'এর সঙ্গে কিছু পোর্ট মিশিয়ে দেখ।'

আমি বললুম, 'উঁহু, এখন পরীক্ষা করবার সময় নয়। একটু ভালো রকম নেশা না হলে চলছে না।'

'তাহলে মিষ্টি মদ নাও। কেন, ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি ?'

'বাজে বকো না।'

'বাপু হে, আমার সঙ্গে চালাকি ? লেন্‌ত্‌স তোমার বাপের বয়েসী, তাকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আমি মানুষের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াই। স্বীকার করেই ফেল, তারপরে নেশা করতে হয় কর।'

'দূর, পুরুষমানুষ কখনো মেয়েমানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে? বড় জোর মনে-মনে রাগ করতে পারে।'

'নাও, নাও, হয়েছে। রাত তিনটের সময় অত চুলচেরা বিচার চলে না। আমার তো বাপু প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আর ঝগড়াই যদি না হল তবে বুঝবে সম্পর্ক চুকেছে।'

'বেশ, বেশ, বোঝা গেল। আচ্ছা, এবার কার ডিইল।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'তোমার। বব্, তোমার মেজাজটা দেখছি আজ ভালো নয়। কিন্তু তাই বলে তাশের ধাপ্পা দেবার বেলায় তো কিছু কম দিচ্ছ না।'

ফ্রেড্ কাউণ্টার থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'একবার একজনকে দেখেছিলুম, সাহেবের জোড়া পেয়ে সাত হাজার ফ্র্যাঙ্ক বাজি ধরেছিল।'

লেন্ত্স জিগগেস করল, 'সুইস্ না ফ্রেঞ্চ?'

'সুইস্।'

গট্ফ্রিড্ বলল, 'তবু ভালো। ফ্রেঞ্চ বলে যে খেলায় বাধা দাওনি এই বেশি।'

ঘণ্টাখানেক ধরে খেলা চলল। আমি বেশ কিছু জিতেছি। বলউইজ্ বেচারী ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে। মদ খেয়ে লাভের মধ্যে বেদম মাথা ধরেছে। নেশা-টেশা কিছুই হয়নি। ভেবেছিলুম চোখের সামনে বেগনী রঙের রুমাল উড়তে দেখব, কই কিচ্ছু না। সব জিনিস আরো যেন স্পষ্ট দেখছি। বুকের ভিতরটা জ্বালা করছে।

লেন্ত্স আমাকে বলল, 'থাক আর খেলতে হবে না, কিছু বরং খাও। ফ্রেড্, ওকে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর সার্ডিন দাও তো। নাও বব্, টাকাগুলো পকেটে ফেল।'

বললুম, 'আর এক দান হোক।'

'আচ্ছা, এই শেষ দান, ডবল তো?'

'হ্যাঁ ডবল,' সবাই সমস্বরে বলল।

চিড়িতনের দশ আর সাহেব আমার হাতে। নেহাত অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়বার মতো বাকি তিনখানি তাশ বদলে আর তিনখানা নিলুম। পেয়ে গেলাম গোলাম, বিবি আর টেক্কা। তাই দিয়ে বলউইজ্কে দিলুম আবার হারিয়ে। ও পেয়েছিল আট টপ্ রান্। কি ফুর্তি! ভেবেছে হাতে স্বগ্‌গ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের ফাটা কপালকে গাল দিতে-দিতে এক গাদা টাকা আমাকে দিয়ে দিল।

লেন্ত্স বলল, 'কেমন দেখলে তো, বলেছিলুম গ্লাশের আবহাওয়া।'

সবাই গিয়ে বার্-এর বসলাম। বলউইজ্ কথায়-কথায় কার্লের কথা জিগগেস করল। কোষ্টার যে ওর স্পোর্টস কারকে রেসে হারিয়ে দিয়েছিল সে কথা ও এখনো ভোলেনি। সেই থেকে ও কেবলই কার্লকে কেনবার তালে আছে।
লেন্‌ত্‌স বলল, 'অটোকে জিগগেস করে দেখতে পার। তবে আমার তো মনে হয় এর চাইতে ও বরং নিজের একখানা হাত বিক্রি করে দিতে রাজী হবে।'
বলউইজ্ বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।'
লেন্‌ত্‌স জবাব দিল, 'ওসব বাপু তুমি বুঝবে না। বিংশ শতাব্দীর মানুষ, তোমরা কেবল টাকাটাই চিনেছ।'
ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ হেসে উঠল, ফ্রেড্‌ও হেসে ফেলল। তারপর আমরা সবাই মিলেই হাসতে লাগলাম। বিংশ শতাব্দীর কথা উঠলে না হেসে থাকা যায়? কিন্তু বেশিক্ষণ হাসাও চলে না। আসলে যে হাসির কথা নয়, কান্না পাবারই কথা।
গট্‌ফ্রিড্‌কে হঠাৎ জিগগেস করলুম, 'তুমি ভাই নাচতে জানো?'
'জানি বৈকি। এক সময়ে আমি তো নাচ শেখাতুম। কিন্তু তুমি নাচতে ভুলে গেছ নাকি?'
ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ বলল, 'আরে ভুলে থাকলে ভুলতে দাও। ভুলে থাকার মানেই তো অনন্ত যৌবন লাভ করা। স্মৃতির বোঝা ভারি করে-করেই তো মানুষ বৃদ্ধ হয়। সংসারে কেউ কিছু ভুলতে চায় না।'
লেন্‌ত্‌স বলল, 'ঠিক তা নয়। যে কথা ভোলা উচিত নয় সে কথাটি মানুষ দিব্যি ভুলে বসে থাকে।'
আমি বললুম, 'যাকগে, আমাকে শিখিয়ে দিতে পার?'
'নাচের কথা বলছ। পারব না কেন? একদিনে শিখিয়ে দেব। ওঃ, এই মুশকিলের কথা বলছিলে?'
'না, মুশকিলের কথা কই বললুম। মাথাটা একটু ধরেছে, এই যা।'
ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'ওটাই এ যুগের ব্যাধি হে বব্। মাথাটাকে বাদ দিয়ে জন্মাতে পারলে ভালো হত।'
কাফে 'ইন্‌টারন্যাশনাল'-এর দিকে গেলুম। এলয়স্ সবে খড়খড়ি বন্ধ করছে। ডেকে জিগগেস করলুম, 'কেউ আছে ভিতরে?'
'হ্যাঁ, রোজা আছে।'
'ভালোই হল, এস না তিনজনে বসে এক পাত্র পান করা যাক।'

এলয়স্ বলল, 'বহুত আচ্ছা।'

রোজা কাউণ্টারের পাশে বসে মেয়ের জন্য উলের মোজা বুনছে। আমি কাছে যেতেই আমাকে নমুনাটা দেখাল। এর আগে আবার একটি জ্যাকেট বুনেছে। জিগগেস্ করলুম, 'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'ভালো না। চলবে কি? কারো হাতে টাকাই নেই।'

'টাকার দরকার আছে নাকি? এই নাও, ধার দিতে পারি। পোকার খেলে এক্ষুনি জিতে এলাম কিনা।'

রোজা বলল, 'হ্যাঁ, খেলায় জিতলে খুব মজা।' টাকাটা নিয়ে দু-এক ফোঁটা থুতু ছিটিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল।

এলয়স্ তিনটি গ্লাশ নিয়ে এল। খানিক বাদে ফ্রিত্সিও এসে জুটল। ওর জন্য আর এক গ্লাশ আনা হল। সবার খাওয়া শেষ হলে এলয়স্ বলল 'নাঃ, এবার বন্ধ করতে হয়। আর বসতে পারছিনে, আমি বিষম ক্লান্ত।' আলো বন্ধ করে দিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। রোজা দরজা থেকেই বিদায় নিল। ফ্রিত্সি এলয়স্-এর বাহুলগ্ন হয়ে চলতে লাগল। এলয়স্ তার খোঁড়া পা নিয়ে হড়কাতে-হড়কাতে চলেছে। পাশে ফ্রিত্সির পরিচ্ছন্ন মূর্তি, গতিভঙ্গিটি সুন্দর! রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ দেখি ফ্রিত্সি ঝুঁকে পড়ে তার নোংরা কিম্ভূতকিমাকার চেহারার প্রেমিকটিকে চুমু খেল। এলয়স্-এর কিন্তু তেমন ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আস্তে ঠেলে সঙ্গিনীকে একটু যেন সরিয়ে দিল। হঠাৎ কেন জানিনে সেই জনশূন্য রাস্তা, অন্ধকারে বাড়িগুলোর কালো-কালো মূর্তি আর মাথার উপর শীতার্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্যাট্-এর জন্য কি এক উদগ্র কামনায় আমার দেহ-মন অবশ হয়ে এল। আমি যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে, এক্ষুনি পড়ে যাব। সারা সন্ধ্যের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সন্ধ্যেবেলার ব্যবহারটা নিজের কাছেই অদ্ভুত ঠেকছে। কি ভেবে যে কি করেছি কে জানে?

একটা বাড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। শূন্যদৃষ্টিতে সুমুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তাই তো, কেন অমন ব্যবহার করলুম। বোধকরি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলুম যেখানটায় ধাক্কা খেয়ে আমার এতদিনের স্বপ্নসাধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাতেই বুদ্ধিশুদ্ধি গিয়েছিল গোল পাকিয়ে আর ব্যবহারটাও হয়েছিল অত্যন্ত বেয়াড়া। হতভম্বের মতো ওখানটাতেই দাঁড়িয়ে রইলুম। কী যে করব বুঝে উঠতে পারছিনে। নাঃ, এখন বাড়ি ফেরা চলবে না।

ওখানে গেলে মন আরো দমে যাবে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল অ্যালফন্‌স্‌-এর দোকান এখনো বোধকরি খোলা আছে। ওখানেই যাওয়া যাক, বাকি রাত্তিরটুকু ওখানেই কাটিয়ে দিই। আমাকে ঢুকতে দেখে অ্যালফন্‌স্‌ এমন কিছু অবাক হল না, বিশেষ কিছু বললও না। বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার কাগজ পড়াতেই মন দিল। একটি টেবিলে বসে-বসে একা ঝিমুতে লাগলুম।

দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। বসে-বসে প্যাট্‌-এর কথা ভাবছি, শুধু প্যাট্‌-এর কথা। নিজের ব্যবহারের কথাটাও মনে হচ্ছে। খুঁটিনাটি সব কিছু মনে পড়ে গেল। এখন ভেবে দেখছি আমারই দোষ, সম্পূর্ণ আমার। বোধকরি আমার মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখনো মাথার মধ্যে রক্ত টগবগ করছে। রাগটা ষোলো আনা নিজের উপরেই। রাগে গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করছে। নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি কিনা।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ আর ভাঙা কাঁচের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ। চমকে উঠে দেখি আমারই হাতের প্রচণ্ড ঘুঁষিতে টেবিলের উপরকার গ্লাশটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। অ্যালফন্‌স্‌ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মজা মন্দ নয়।'

এগিয়ে এসে হাত থেকে কাঁচের টুকরোগুলো টেনে বের করতে লাগল।

বললুম, 'ভারি দুঃখিত, কোথায় বসে আছি, তা ভুলেই গিয়েছিলুম।'

অ্যালফন্‌স্‌ ভিতর থেকে তুলো আনল, ষ্টিকিং প্লাস্টর আনল। বলল, 'এখানে আসবার কী দরকার, বেশ্যাবাড়িতে গেলেই হত।'

বললুম, 'না, না, ও কিছু নয়। সব ঠিক হয়ে গেছে। ভিতরের চাপা রাগ কেমন করে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।'

অ্যালফন্‌স্‌ গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করল, 'রাগকে কক্ষনো রাগিয়ে দিতে নেই, হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।'

বললুম, 'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারা চাই তো।'

'হ্যাঁ, সে রকম অভ্যেস করতে হবে। ছেলে-ছোকরারা তো দেয়াল দিয়ে মাথা গলাতে চায়। তা বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সবাই নরম হয়ে আসে।' অ্যালফন্‌স্‌ উঠে গিয়ে গ্রামোফোনে একটি রেকর্ড চাপিয়ে দিল। ওদিকে রাত্রির অন্ধকার দ্রুত ফিকে হয়ে আসছে।

বাড়ি ফিরে গেলুম। অ্যালফন্‌স্‌ আমাকে বেশ বড় এক গ্লাশ ফার্নেট্‌-ব্রাঙ্কা খেতে দিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে চোখের উপরে কে যেন আস্তে-আস্তে কুড়ুলের ঘা

মারছে। পায়ের তলায় রাস্তাটা কেবলই উঁচুনিচু মনে হচ্ছে। কাঁধ দুটো কিসের ভারে যেন নুয়ে পড়ছে। আর আমি চলতে পারছিনে।

পা-দুটোকে টেনে-টেনে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। চাবির খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছি। এ্যাঁ! আধ-অন্ধকারে কার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি। সিঁড়ির উপরে ওখানটায় কে বসে আছে না? ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু—'আরে প্যাট্ যে!'—আমি একেবারে হতভম্ব। 'প্যাট্—তুমি এখানে কি করছ?'

ও একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু এখানে এলে কেমন করে?'

'তা, তোমার বাড়ির চাবি আমার কাছে আছে কিনা!'

'সেকথা বলছিনে, বলছি যে—' আমার মদের নেশা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে। সমস্ত দৃশ্যটা ক্রমে আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বহু ঘুরোনো সিঁড়ির ধাপ, দেয়ালমোড়া কাগজ, রুপোলি পোশাক, পায়ের চকচকে জুতো—'হঠাৎ কি মনে করে এলে সে কথাই বলছিলুম।'

'এখানে বসে-বসে আমিও সে কথাটাই ভাবছিলুম।' প্যাট্ এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে শরীরটাকে একটু সজাগ করে নিল, ভঙ্গিটি এমন সহজ যেন এই ভোর রাত্তিরে কারো সিঁড়ির গোড়ায় বসে থাকার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। বার দুই জোরে নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'হুঁ, লেন্‌ত্‌স থাকলে ঠিক বলে দিত—কনিয়াক্, রাম্, শেরি, আবসিনথ্—'

বললুম, 'শুধু কি তাই—মায় ফার্নেট্-ব্রাঙ্কা। যাই বল প্যাট্, আমি একটি হদ্দ বোকা, চোখের মাথা খেয়ে বসেছিলুম তাই, নইলে তোমার মতো লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না।' বলেই কোলপাঁজা করে ওকে তুলে নিলুম। দরজাটা খুলে সরু করিডর বেয়ে ওকে নিয়ে চললুম। ধবধবে শাদা একটি বকের মতো ও আমার বুকে লেগে আছে, অতিশয় ক্লান্ত পাখির মতো যেন আশ্রয়প্রার্থী। পাছে আমার মুখ থেকে আবার রাম্-এর গন্ধ পায় এই ভয়ে আমি মুখ অন্য দিকে সরিয়ে রেখেছি। আমার বুকের মধ্যে ওর দেহটি একটু-একটু শিউরে উঠছে কিন্তু মুখে বেশ একটি মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

ওকে একটা আরাম-কেদারায় বসিয়ে দিয়ে আলোটা জ্বেলে দিলুম। একটা কম্বল এনে পা-দুটি ঢেকে দিলুম। 'কি বলব প্যাট্, তুমি আসবে জানলে কি আর আজে-বাজে জায়গায় ঘুরে বেড়াতুম—হুঁ, বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে—অ্যালফন্‌স্-এর ওখান থেকে তোমাকে রিং করেছিলুম, তারপরে তোমার বাড়ির

কাছে গিয়ে বাইরে থেকে দু-একবার শিসও দিয়েছিলুম। কিন্তু রা-শব্দ পাওয়া গেল না, ভাবলুম—'

'বাড়ি পৌঁছে দেবার পরে আমার ওখানে আবার ফিরে এলে না কেন?'

'তাই তো, কেন যে যাইনি নিজেই তা বুঝে উঠতে পারছিনে।'

'যাকগে, এর পর থেকে তোমার ঘরের চাবিটিও আমাকে দিয়ে রেখো, তাহলে আর সিঁড়ির গোড়ায় বাইরে বসে থাকতে হবে না।' বলতে-বলতে ও হেসে ফেলল, ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে-কেঁপে উঠল। বুঝতে পারলুম কতখানি বেচারীকে ভুগতে হয়েছে—এই এতখানি পথ হেঁটে আসা, এতক্ষণ অপেক্ষা করে ঠায় বসে থাকা, কিন্তু তারপরেই হেসে কথা কইবার চেষ্টা—

তাড়াতাড়ি বললুম, 'প্যাট্, তুমি বোধহয় ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছ। দেখি কিছু একটু গরম পানীয় যোগাড় করতে পারি কিনা।' অরলভ্-এর ঘরে আলো দেখা যাচ্ছিল। রাশিয়ানদের কাছে সব সময় চায়ের ব্যবস্থা থাকে, দেখি একটু পাওয়া যায় কিনা। 'আমি এই এলুম বলে।' হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা উষ্ণতা অনুভব করলুম—দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলে উঠলুম, 'প্যাট্, জীবনে এ-ঘটনা ভুলতে পারব না বোধহয়।' তারপর দ্রুতপায়ে চলে এলুম। অরলভ্ তখনো জেগে বসে আছে। ঘরের এক কোণে একটি খ্রীষ্ট মূর্তি, তারই সুমুখে ও বসে আছে, পাশে একটি আলো জ্বলছে আর টেবিলের উপরে কেটলিতে চায়ের জল গরম হচ্ছে। বললুম, 'মাপ করবেন, হঠাৎ একটা বড় মুশকিলে পড়েছি, একটু গরম চা পেলে বড় উপকার হয়।'

মুশকিলের কথা শুনলে রাশিয়ানরা কখনো অবাক হয় না, কারণ ছোটখাটো অঘটন ওদের জীবনে লেগেই আছে। বলবামাত্র দু-গ্লাশ চা আমাকে ঢেলে দিল, তা ছাড়া কিছু চিনি আর প্লেট-এ করে কয়েকখানা কেক্। বলল, 'হেঁ, হেঁ, তা আমার দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়, আমিও বহুবার অমন মুশকিলে পড়েছি কিনা—দরকার হয় তো কিছু কফি-বিন্ও নিয়ে যেতে পারেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

লোকটি একেবারে বিগলিত হয়ে বলল, 'আর কিছু চান তো বলুন। আমি আরো খানিকক্ষণ জেগে আছি। দরকার হলেই—'

করিডর দিয়ে যেতে কফি-বিন্ মুখে ফেলে চিবুতে লাগলুম। ওতে রাম্-এর গন্ধটা দূর হয়ে যাবে। প্যাট্ তখন টেবিল-ল্যাম্পের ধারে বসে মুখে পাউডার লাগাচ্ছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ছোট্ট আর্শিটিতে

একদৃষ্টে তাকিয়ে গালে পাউডার পাফ বুলোচ্ছে—হঠাৎ দেখে দৃশ্যটা কেমন একটু করুণ ঠেকল।

'এই নাও চা-টুকু খেয়ে ফেল, দিব্যি গরম আছে।'

গ্লাশটি তুলে নিয়ে ও আস্তে-আস্তে চুমুক দিয়ে খেতে লাগল। আমি বললুম, 'প্যাট্, আজ রাত্তিরভর কি যে সব ঘটছে কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিনে।'

প্যাট্ বলল, 'আমি খুব বুঝতে পারছি।'

'তাই নাকি ? আমি সত্যি বুঝতে পারছিনে।'

'থাক বুঝে কাজ নেই বব্, মনটা যে তোমার খুশিতে ভরপুর হয়ে আছে তা ও কথা বলতেই বুঝতে পেরেছি।'

বললুম, 'কথাটা খুব মিথ্যে বলনি। কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়, তোমাকে জানবার পর থেকে আমি ক্রমেই কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছি।'

'হলেই বা, তাতে দোষ কি ? অতি বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার চাইতে ছেলেমানুষি করা ভালো।'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে দেখতে গেলে সেটা সত্যি। কিন্তু এমন হুড়মুড় করে এক রাত্তিরের মধ্যে কত কি যে ঘটল কি বলব।'

গ্লাশটি খালি করে ও টেবিলের উপর রেখে দিল। আমি খাটে হেলান দিয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করে ঘরে ফিরে এসেছি। চরম ক্লান্তির পরে পরম শান্তি।

গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠেছে। বাইরে দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয় অনাথাশ্রমের নার্স ফ্রাউ বেন্ডার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম। আর আধঘণ্টার মধ্যে ফ্রিডা এসে রান্নাঘরের কাজ শুরু করে দেবে। তখন ওর চোখ এড়িয়ে বেরোনো শক্ত হবে। কিন্তু প্যাট্ এখনো ঘুমুচ্ছে। কি আরামে ঘুমুচ্ছে, ওকে জাগাতে মন সরছে না। কিন্তু না জাগিয়ে উপায় কি ? 'প্যাট্—' ঘুমের মধ্যেই ও বিড়বিড় করে কি যেন বলল। 'প্যাট্, সময় হয়ে গেছে যে। উঠে এখন জামা-কাপড় পরে নিতে হচ্ছে।'

চোখ মেলে ও মিষ্টি করে হাসল। সদ্যজাগা শিশুর মতো ঘুমের আমেজটুকু চোখে-মুখে লেগে আছে। ঘুম থেকে জেগেই মুখে হাসি—দেখে ভারি ভালো লাগল। কারণ হঠাৎ জেগে গেলে আমার নিজের মেজাজ বিষম বিগড়ে যায়। বললুম, 'প্যাট্, ওঠ, জালেওয়াস্কি এতক্ষণে তার আলগা দাঁত মাজতে বসেছে।'

'আজকের দিনটা তোমার কাছেই থাকব ভেবেছি।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে।'

'এঁ্যা!' আনন্দে উঠে বসলুম। 'বেশ—কিন্তু তোমার এসব জিনিস—এই জুতো, এই পোশাক—এ যে ইভনিং ড্রেস।'

'বেশ তো, না হয় সন্ধ্যে অবধিই এখানে থাকব।'

'কিন্তু তোমার বাড়িতে কি হবে?

'টেলিফোন করে দেব যে রাত্তিরে অন্য জায়গায় ছিলুম।'

'আচ্ছা তাই করা যাবে। এখন তোমার খিদে পেয়েছে তো।'

'না, এখনো পায়নি।'

'তা হোক। এক্ষুনি গিয়ে ভালো দেখে কিছু রুটি নিয়ে আসি। এই ঠিক সময়।'

ফিরে এসে দেখি প্যাট্ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে চকচকে রুপোলী জুতোজোড়াটি। সকালবেলার মৃদু আলোটুকু ওর ঘাড়ে এসে পড়েছে দামী একখানি শালের মতো। বললুম, 'প্যাট্, কালকের কথা সব নিশ্চয় ভুলে গেছ, না?'

আমার দিকে মুখ না ফিরিয়ে ও নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'অন্য লোকের সঙ্গে আমরা আর কোথাও যাচ্ছিনে, কেমন? একবার প্রেমে পড়লে অপর লোকের সঙ্গ অসহ্য মনে হয়। যাক আর যাব না, মিথ্যে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে না, ঝগড়াঝাঁটিও হবে না। ব্রুয়ার তার চ্যালাচামুণ্ডার দল নিয়ে চুলোয় যাক, আমরা আর তাদের খোঁজ নিচ্ছিনে।'

প্যাট্ বলল, 'নিশ্চয়, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীমতী মারকুইৎস্‌টিকেও বিদেয় করতে হবে।'

'মারকুৎইস্? সে আবার কে? কোত্থেকে এল?'

'কেন, কাসকেড্-এর বার-এ যে মেয়েটিকে পাশে নিয়ে তুমি বসেছিল।'

'ওঃ, সেই মেয়েটির কথা বলছ!' মনে-মনে বেশ একটু খুশিই হলুম।

এবার প্যাট্কে পকেটটি দেখিয়ে বললুম, 'এই দেখ, কালকের রাতটা একেবারে বৃথা যায়নি। পোকার খেলে মেলাই টাকা জিতেছি। তাই দিয়ে আজকের রাত্তিরে কোথাও যাওয়া যাবে, কিন্তু সঙ্গে আর কোনো লোক নয়, বুঝলে? ওদের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছি, মনে থাকে যেন।'

প্যাট্ মাথা নেড়ে সায় দিল।

ট্রেড্‌স হল-এর ছাতের উপর দিয়ে সূর্য উঁকি মারছে। জানালায়-জানালায় রোদের ঝিকিমিকি। প্যাট্‌-এর মাথার চুলে, ঘাড়ে, আলো পড়ে একটি সোনালী আভা দিয়েছে। 'আচ্ছা, ক্রয়ার লোকটা কী করে যেন বলছিলে? মানে ওর কাজকর্মের কথা বলছি।'

'ও আর্কিটেক্ট-এর কাজ করে।'

'আর্কিটেক্ট?' শুনে বড় খুশি হলুম না। বোধকরি কিচ্ছু করে না, নিষ্কর্মা ব্যক্তি, শুনলেই বেশি খুশি হতুম। বললুম, 'বেশ তো হলই বা আর্কিটেক্ট, সেটাই বা এমন কি? কি বল, প্যাট্‌?'

'নিশ্চয়।'

'সত্যি, এমন কিছু নয়!'

প্যাট্‌ও বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।' তারপরে আমার দিকে ফিরে হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি ও সবের কিচ্ছু মূল্য দিই না, মাটি-কাদার সামিল মনে করি।'

'আর এই যে আমার আস্তানাটি, এটাই বা এমন মন্দ কি? অন্যদের না হয় এর চাইতে একটু ভালোই—'

প্যাট্‌ আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আরে এ তো খাশা ঘর। এর চাইতে ভালো ঘর আছে বলে তো জানিনে।'

'আর এই আমাকেই দেখ না, প্যাট্‌, দোষত্রুটি অল্পবিস্তার তো আছেই—তা ছাড়া হলুমই বা ট্যাক্সি ড্রাইভার কিন্তু—'

'আহা বোলো না। তোমার মতো কজন আছে—এমন রুটি-খাইয়ে, রাম্‌ গিলিয়ে। তোমার সঙ্গে কার তুলনা—তুমি আমার—' বলেই দু-হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, আমাকে মিষ্টি করে বলল, 'আহা বোকারাম অত কথায় কাজ কি? শুধু কেবল বেঁচে থাকার মতো আর আনন্দ আছে?'

'খুব সত্যি কথা। তবে কিনা যদি কেবল তোমাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি।'

সকালবেলাটা আশ্চর্যরকম সুন্দর হয়ে উঠেছে। চারদিকে আলোর ঝলমলানি। নিচে কবরখানাটার উপরে এখনো পাতলা কুয়াশার একটা পরদা ঝুলছে, কিন্তু গাছের আগায়-আগায় সোনালী রোদ এসে পড়েছে। বাড়িগুলোর ছাত থেকে চিমনির মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। রাস্তায়-রাস্তায় খবরের কাগজের ফিরিওলারা হাঁক দিয়ে যাচ্ছে। সকাল বেলায় আর এক দফা ঘুমিয়ে নেবার

জন্য দুজনে জড়াজড়ি হয়ে শুয়ে পড়লুম। ঠিক ঘুম নয়—ঘুমের প্রান্তসীমায় যেখানে আধ-ঘুম আধ-জাগরণের স্বপ্নরাজ্য সেইখানে দুজনে দেহলগ্ন হয়ে শুয়ে আছি—একের নিঃশ্বাস অপরের গায়ে লাগছে। তারপরে বেলা নটা নাগাদ উঠে লেফটেনান্ট-কর্নেল এগবার্ট ফন্ হাকে-কে টেলিফোন করে দিলুম। নিজের নামটা বানিয়ে বলতে হল—বুরখার্ড। আর লেন্‌ত্‌সকেও রিং করে বলে দিলুম সে যেন আমার হয়ে ট্যাক্সিটা নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ে—কোনো রকমে সকালবেলাটা চালিয়ে দেয়। ও বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, থাক, আমাকে বেশি বলতে হবে না। ও আমার আগে থেকেই জানা ছিল। আরে বাপু সাধে কি বলি, গট্‌ফ্রিড্ মানুষের মনের জহুরী, তাকে আর নতুন কথা কি বলবে? ভালো ভালো, খুব ফুর্তি করে নাও।'

ওকে ধমকে চুপ করিয়ে দিলুম, যদিও মনে-মনে খুব খুশিই হয়েছি। এর পরে রান্নাঘরে গিয়ে বলে এলুম শরীরটা বড় ভালো নেই, দুপুর অবধি বিছানায় চুপচাপ শুয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু তাই কি হবার জো আছে। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি তারই মধ্যে তিন-তিনবার এসে দরজায় হানা দিয়েছিল, কখনো ক্যামোমিলের চা নিয়ে, কখনো বা এ্যাসপিরিন্ নিয়ে কিম্বা আর একটা কিছু। বিপাকে পড়ে কি আর করি—প্যাট্‌কে সাত তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে কোনোরকমে বুড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করি।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এর ঠিক হপ্তাখানেক পরে একদিন সেই পাউরুটিওয়ালা হঠাৎ কারখানায় এসে হাজির। জানালা দিয়ে লোকটাকে দেখেই লেন্‌ত্‌স মুখ বাঁকাল। 'বব্‌, যাও তো দেখে এস, ব্যাটা নিশ্চয় ফাঁকতালে আবার কিছু বাগাতে এসেছে।'

লোকটার মুখে কেমন একটু মনমরা ভাব। বললুম, 'কি, গাড়ির কিছু গোলমাল-টোলমাল হয়েছে নাকি।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, গাড়ি চমৎকার চলছে। বলতে গেলে একেবারে নতুন গাড়ি কিনা।'

আমি বললুম, 'সে তো আমাদের জানা কথা।'

লোকটি এবার একটু আমতা-আমতা করে বলল, 'কিন্তু হয়েছে কি জানেন—আমি অন্য একটা গাড়ি চাই এই একটু বড়সড় গাড়ি—' উঠোনের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সেই ওবারে একটা ক্যাডিলাক্‌ দেখেছিলুম না?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই যে ওর সঙ্গিনী কৃষ্ণনয়নাটি, সেই খুঁচিয়ে ওকে অতিষ্ঠ করছে। ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ক্যাডিলাকটির কথা বলছেন তো। আহা, সময় থাকতে বললে হত। কি সুযোগটাই হাতছাড়া করলেন। গাড়িটা জলের দরে বিক্রি হয়ে গেল—মাত্র সাত হাজার মার্ক-এ বলতে গেলে বিনি পয়সায়—'

'না, তা এমন জলের দর আর কি হল?'

'কি বলছেন, জলের দর বৈকি।' ইতিমধ্যে ভাবছি এর পরে কি চাল দেওয়া যায়। একটু ভেবে নিয়ে বলে ফেললুম, 'তা বলেন তো, একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। যে লোকটা কিনেছিল তার আবার এখন টাকার টানাটানি চলতে পারে। আজকাল এসব জিনিস কেবলই হাত বদলায়। আচ্ছা একটি মিনিট অপেক্ষা করুন—' বলেই দোকানে গিয়ে ঢুকলুম। সংক্ষেপে ব্যাপারটা ওদের

বললুম। গট্‌ফ্রিড্‌ লাফিয়ে উঠল। 'এঁ্যা, পুরনো একটা ক্যাডিলাক্‌ কোথায় যোগাড় করা যায় বল তো? শিগগির ভেবে নাও, বিলম্ব সইবে না।'

বললুম, 'আচ্ছা সে আমি দেখছি, তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যাও তো, দেখ পাঁউরুটিওয়ালা আবার কোন ফাঁকে ভেগে না যায়।'

'তাই দেখছি,' বলে গট্‌ফ্রিড্‌ তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

ব্লুমেন্‌থল্‌কে ফোন করলুম। অবিশ্যি তেমন ভরসা ছিল না, তবু একবার দেখতে দোষ কি? ওকে আপিসেই পাওয়া গেল।

কোনোরকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি জিগগেস করলুম, 'ক্যাডিলাক্‌টা বিক্রি করবার ইচ্ছে আছে?'

ব্লুমেন্‌থল হেসে উঠল। বললুম, 'একজন লোক পাওয়া গেছে। বাকি-বকেয়া নয়, একেবারে নগদ টাকা।'

'নগদ টাকা?' কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে ব্লুমেন্‌থল্‌ বলল, 'নগদ টাকা,— এই দুর্দিনে কথাটা শুনতে একেবারে কবিতার মতো মিষ্টি।'

মনে-মনে খুশি হয়ে বললুম, 'আমিও তাই বলি। আচ্ছা, তাহলে কি বলেন? আপনার সঙ্গে সামনাসামনি একবার কথা বলতে পারলে ভালো হত।'

ব্লুমেন্‌থল বলল, 'হ্যাঁ, কথা বলতে দোষ কি?'

'বেশ, তাহলে কখন দেখা হতে পারে?'

'লাঞ্চের পরে আজ বিকেলে আমার সময় হবে। এক কাজ করুন, দুটো নাগাদ আপিসেই বরং আসুন।'

'বেশ, তাই হবে।'

রিসিভার রেখে কোষ্টারকে বললুম, 'অটো, এখনো ঠিক বলতে পারছিনে তবে মনে হচ্ছে যেন ক্যাডিলাক্‌টা আবার আমাদের কাছে ফিরে আসছে।'

কোষ্টার কাগজপত্তর একধারে সরিয়ে রেখে বলল, 'সত্যি নাকি? ওর তাহলে বিক্রি করবার ইচ্ছে আছে?'

ওদিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি লেন্‌ত্‌স হাত-পা নেড়ে পাঁউরুটিওয়ালার সঙ্গে খুব একচোট কথা বলে যাচ্ছে। অস্থির হয়ে বললুম, 'এইরে হতভাগা সব মাটি করল। ওর সঙ্গে অত কথা কখনো বলতে আছে? পাঁউরুটিওয়ালা লোকটার বিষম সন্দেহবাই। ওকে বলে-কয়ে কিছু করানো যাবে না। বরং একেবারে চুপ করে থাকলে ও আপনিই পথে আসবে। যাই, গিয়ে গট্‌ফ্রিড্‌কে তো আগে ওখান থেকে বিদেয় করি।'

কোষ্টার হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ—আচ্ছা যাও, ঘাৎ বুঝে কোপ মেরো।' জবাবে মুখে কিছু না বলে একটু চোখ ঠেরে বেরিয়ে পড়লুম। ওখানটায় গিয়ে আমার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারিনে। ভেবেছিলুম সে বুঝি পঞ্চমুখে ক্যাডিলাক্-এর গুণকীর্তন করছে। আসলে তা নয়—সাউথ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কেমন করে ভুট্টার রুটি তৈরি করে সে কথাটাই পাউরুটিওয়ালাকে বিশদভাবে বোঝাচ্ছে। ওর সুবুদ্ধি দেখে খুশি হয়ে ওর দিকে তাকালুম। তার-পরে পাউরুটিওয়ালার দিকে ফিরে বললুম, 'ভারি দুঃখিত, ভদ্রলোক গাড়িটা বিক্রি করতে চাচ্ছেন না।'

লেন্‌ত্‌স বলে উঠল. 'কেমন বলেছিলুম না ?' ভাবটা যেন ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে ও বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে।

ঘাড় নেড়ে বললুম, 'কী আর করা যায়। তবে আমাব মনে হয়—'

পাঁউরুটিওয়ালা মনস্থির করতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি লেন্‌ত্‌স-এর দিকে এক নজর তাকাতেই ও বলে উঠল, 'আচ্ছা, আর একবার ওর সঙ্গে কথা কয়ে দেখলে হয় না, চেষ্টা করতে দোষ কি ?'

বললুম, 'তা তো করবই। আজই বিকেলবেলায় ওর সঙ্গে দেখা করছি।' পাঁউরুটিওয়ালার দিকে ফিরে বললুম, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আবার কখন দেখা হতে পারে ?'

'চারটে নাগাদ আমি এ পাড়ায় একবার আসব। বলেন তো খোঁজ নিয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তার আগেই আমি খবর নিয়ে নেব। আমার তো মনে হয় ওকে রাজী করাতে পারব !'

পাঁউরুটিওয়ালা বিদায় নিয়ে তার ফোর্ড গাড়ি চেপে চলে গেল। গাড়ি মোড় ঘুরতেই লেন্‌ত্‌স একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথাকার আহাম্মক হে তুমি ! আমি লোকটাকে সবে একটু বাগিয়ে আনছি আর তক্ষুনি তুমি কিনা এসে বললে আচ্ছা এখন আসুন তবে।'

ওর কাঁধে এক থাপ্পড় মেরে বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্‌ ভায়া, একেই বলে মনস্তত্ত্ব। ওসব প্যাঁচ তো তুমি বুঝবে না।' কাঁধ থেকে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'রেখে দাও তোমার মনস্তত্ত্ব। আসল কথা হল সুযোগ, তার চাইতে বড় মনস্তত্ত্ব আমি বুঝিনে। আর এমন সুযোগ কটা মেলে শুনি ? ছেড়ে দিলে তো ? লোকটা আর ফিরে আসছে না দেখে নিও—'

'ঠিক চারটের সময় এসে হাজির হবে।'

গট্‌ফ্রিড্ খুব অবজ্ঞার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল, 'বেশ, বাজি রাখবে?'

'আলবৎ রাখব। কিন্তু তোমাকেই হারতে হবে। ও লোকটাকে তোমার চাইতে আমিই বেশি জানি। ওকে বাগাবার আগে বার কয়েক ঘোরাতে হয়। তা ছাড়া, যে জিনিস আমাদের হাতে নেই, সে জিনিস বিক্রি করি কোত্থেকে বল তো?'

গট্‌ফ্রিড্ মাথা নেড়ে বলল, 'বাপু হে, ভগবান ভরসা বলে যদি সব ছেড়ে দাও তো তোমার দ্বারা ব্যবসা কোনোকালে হবে না। আমার সঙ্গে এস ব্যবসার গুটিকতক গোড়ার কথা তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি—'

লাঞ্চ সেরেই ব্লুমেন্‌থল্-এর সঙ্গে দেখা করতে চললুম। সেই যে গল্পে পড়েছিলুম ছাগল গিয়েছিল নেকড়ে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে—পথে যেতে-যেতে সেই কথাটাই বার-বার মনে পড়তে লাগল। সূর্যের তাপে রাস্তার পিচ গলতে শুরু করেছে। যতই এগুচ্ছি ব্লুমেন্‌থলের মুখোমুখি হতে ততই ভয় হচ্ছে। ওকে বেশি কথা বলবার অবসরই দেব না, যত সংক্ষেপে পারি কথা সেরে নেব। ঘরে ঢুকেই ওকে আর কথা বলবার অবসর না দিয়ে বললুম, 'হের ব্লুমেন্‌থল্, খুব ভালো প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনি তো সাড়ে-পাঁচ হাজার মার্কে ক্যাডিলাকটা কিনেছিলেন—আমি আপনাকে ছ-হাজার দেব—অবিশ্যি যদি সত্যি-সত্যি গাড়িটা বিক্রি করতে পারি। সেটা আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই জানতে পারব।'

ব্লুমেন্‌থল্ তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আপেল খাচ্ছে। আমার কথা শুনে খাওয়া থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, 'বেশ কথা।' বলেই আবার খেতে শুরু করল। খেয়ে বিচিটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। আমি বললুম, 'তা হলে আপনি রাজী?'

'বলছি, দাঁড়ান।' দেরাজ থেকে আর একটি আপেল বার করে বলল, 'আপনি খাবেন না একটা?'

'ধন্যবাদ, এখন নয়।'

নিজেই খেতে শুরু করে দিল। 'হের লোকাম্প্, যত পারেন আপেল খাবেন। আপেল খেলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। জানেন তো রোজ আপেল খেলে বদ্যি ডাকতে হয় না।'

'ধরুন যদি কোনো রকমে হাতটা ভাঙল?'

ব্লুমেন্থল্ হেসে উঠল, দ্বিতীয় বিচিটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপেল খেলে হাত মোটে ভাঙবেই না।'

আলমারি থেকে সিগারের বাক্স নিয়ে আমার দিকে একটি এগিয়ে দিল। সেই যে প্রথম দিনে দেখেছিলুম—'করোনা'—সেই সিগার। আমি বললুম, 'এতেও আয়ুবৃদ্ধি হয় নাকি?'

'না, এতে আয়ু কমে। সিগার আর আপেলে মিলে সমতা রক্ষা হয়।' মুখ দিয়ে রাশিকৃত ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মাথাটি কাত করে একবার আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে বলল, 'হের লোকাম্প্, সমতা রক্ষা করতে শিখুন, ওটাই হল গোড়ার কথা।'

'হ্যাঁ, যদি পারা যায়—'

'ঠিক বলেছেন, পারা না পারার কথাটাই গোড়ার কথা কিনা। আমরা জানি ঢের, পারি সামান্য আর বেশি জানি বলেই পারি কম।' একটু থেমে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, লাঞ্চের পরে আমার মনটা সাধারণতঃ একটু দার্শনিক-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।'

আমি বললুম, 'দার্শনিক হবার পক্ষে ওটাই প্রকৃষ্ট সময়। আচ্ছা, এবার তাহলে ক্যাডিলাক্-এর কথা হোক। ওখানেই সমতা রক্ষার চেষ্টা করা যাবে, কি বলেন?'

ব্লুমেন্থল্ হাত তুলে বলল, 'দাঁড়ান, এক মিনিট।'

কি আর করি, আবার থামতে হল। ব্লুমেন্থল্ তাই দেখে হেসে ফেলল, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি আপনাকে প্রশংসা করতেই যাচ্ছিলুম। আপনি তো গোড়াতেই তুরুপ মেরে বসেছেন। তা, চালটা দিয়েছেন ভালো। জানেন, আমি কি ভেবেছিলুম?'

'ভেবেছিলেন আমি সাড়ে-চার হাজার থেকে শুরু করব।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তাহলে ভুল করতেন। আপনি নিশ্চয় সাত হাজারে বিক্রি করবার মতলব করেছেন।'

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললুম, 'সাত হাজার কেন বলছেন?'

'গোড়াতে আমার কাছে ঐ দাম হেঁকেছিলেন কিনা।'

'আপনার তো দেখছি পুরোনো কথা খুব মনে থাকে।'

'হ্যাঁ, টাকার বেলায়। টাকার অঙ্ক আমি সহজে ভুলিনে। যাকগে, এখন তবে কাজের কথা হয়েই যাক—হ্যাঁ, ঐ দামে গাড়ি আপনি নিতে পারেন।'

বলেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, 'আঃ, বাঁচালেন।

অনেক দিন ধরে ব্যবসা বড় মন্দা যাচ্ছিল। আমাদের দিক থেকে ক্যাডিলাকটা দেখছি বড় পয়মন্ত।'

ব্লুমেন্থল্ বলল, 'আমার দিক থেকেও। আমি যে মাঝখান থেকে পাঁচশো মার্ক করে নিলুম, সেটা ভুলবেন না।'

'তা তো বটেই। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো এত শিগগির গাড়িটা বিক্রি করছেন কেন? ওটা বুঝি আপনার পছন্দ হয়নি?'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, স্রেফ কুসংস্কার। কথা কি জানেন, দুপয়সা করে নেবার সুযোগ পেলে আমি কক্ষনো তা ছাড়ি না।'

'এ তো খুব ভালো কুসংস্কার!'

ব্লুমেন্থল্ তার চকচকে টেকো মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, 'আপনারা ওসব কথা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মশাই খাঁটি কথা। দেখেছি তো আমি কোনো ব্যাপারে ঠকি না। সুযোগ হাতছাড়া করলেই অদৃষ্ট বিরূপ হয়। আর ভাগ্য বিরূপ হলে কি আর রক্ষে আছে?'

সাড়ে-চারটের সময় গট্‌ফ্রিড্ লেন্ত্স একটি খালি জিন্-এর বোতল টেবিলের উপর রেখে বলল, 'বাপু হে, বোতলটি এবার ভর্তি করে দাও তো। দামটি তোমাকেই দিতে হবে। বাজি রেখেছিলে মনে আছে?' মুখে একটু কৌতুকের হাসি। বললুম, 'খুব মনে আছে; কিন্তু অত তাড়া কেন?'

গট্‌ফ্রিড্ জবাব না দিয়ে ঘড়িটি আমার নাকের সামনে এগিয়ে দিল।

'হুঁ, সাড়ে-চারটে, কিন্তু সময়ের অত বাঁধাবাঁধি কি? এক-আধটু দেরি তো হতে পারে। বেশ আমি না হয় বাজিটা ডবল করে দিচ্ছি।'

গট্‌ফ্রিড্ খুশি হয়ে বলল, 'বেশ তাই সই। বিনি পয়সায় চার বোতল জিন্ পাওয়া যাবে। একেই বলে সাহস—নিশ্চিত হার জেনেও—বাপু হে অত কেরদানি ভালো নয়।'

'আরে, একটু সবুর করে দেখই না।' কিন্তু মুখে যতই সাহস দেখাই না মনে তেমন ভরসা ছিল না। বরং এখন মনে হচ্ছে পাঁউরুটিওয়ালা সত্যিই আসবে না। সকাল বেলায় কথাটা আর একটু পাকাপাকি করে নেওয়া উচিত ছিল। লোকটা বিশ্বাসযোগ্য নয় কিনা।

সুমুখের গদি-জাজিমের কারখানায় পাঁচটার ভোঁ বেজে উঠল। গট্‌ফ্রিড্ কোনো কথা না বলে আরো তিনটি খালি বোতল টেবিলের উপর সাজিয়ে দিল।

জানালায় হেলান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাঃ, আমার তেষ্টা পেয়ে গেছে, গলাটা না ভিজালে আর চলছে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তায় ফোর্ড গাড়ির একটা ঘড়্ঘড়্ আওয়াজ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই দেখলুম পাউরুটিওয়ালার গাড়ি আমাদের গেট দিয়ে ঢুকছে। তক্ষুনি খুব গম্ভীর হয়ে বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্ ভায়া, তেষ্টা যদি পেয়ে থাকে তবে যাও, ছুটে গিয়ে দুবোতল রাম্ কিনে নিয়ে এস। বাজিটা এখন আমিই জিতেছি কিনা। তোমাকে বরং কিঞ্চিৎ ভাগ দেওয়া যাবে। কেমন পাঁউরুটিওয়ালাকে দেখতে পাচ্ছ তো? বাপু হে, একেই বলে মনস্তত্ত্ব। নাও, এখন জিন্-এর বোতলগুলো এখান থেকে সরাও। পরে না হয় ট্যাক্সিটা নিয়ে বেরিও। এখনো ছেলেমানুষ কিনা, এসব সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে তোমার দেরি আছে।'

বেরিয়ে এসে পাঁউরুটিওয়ালাকে বললুম, 'হ্যাঁ, গাড়িটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবিশ্যি ভদ্রলোক সাড়ে-সাত-হাজার চাচ্ছেন। তবে নগদ টাকা পেলে সাত হাজার পর্যন্ত নামতে পারেন।'

পাঁউরুটিওয়ালা এমন হতভম্বের মতো আমার দিকে তাকাল যে আমিই ভড়কে গেলুম। তাড়াতাড়ি বললুম, 'অবিশ্যি ছটা আন্দাজ ওকে আবার রিং করবার কথা।' পাঁউরুটিওয়ালা এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'ছটায় বলছেন? ছটার সময় তো'—হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'আসুন না আমার সঙ্গে?'

অবাক হয়ে বললুম, 'কোথায় যেতে বলছেন?'

'আপনার সেই ছবি-আঁকিয়ে বন্ধুর কাছে। ছবিটা হয়ে গেছে কিনা।'

'ওঃ, তাহলে ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ-এর কাছে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দয়া করে চলুন না আপনিও। গাড়ির কথা পরে আলোচনা করা যাবে।'

যে কারণেই হোক্ বোঝা গেল ও একলা যেতে চায় না। ওদিকে আমিও ভেবে দেখলুম ওকে আর হাতছাড়া করা কোনো কাজের কথা নয়। বললুম, তা বেশ, চলুন, কিন্তু দূর তো কম নয়—আসুন, তাহলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক।'

ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ-এর শরীরটা তেমন ভালো দেখাচ্ছে না। মুখের রঙ বিবর্ণ, একটু যেন ফোলা-ফোলা। আমাদের দেখে স্টুডিয়োর দোরে এগিয়ে এল। পাঁউরুটি-ওয়ালা ওর দিকে ভালো করে তাকালই না, জিগগেস করল, 'কোথায়, ছবিটা কোথায়?'

ফার্ডিনাণ্ড হাত দিয়ে জানালার দিকে দেখিয়ে দিল। ইজেলের উপরে ছবিটি হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। পাঁউরুটিওয়ালা এগিয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে মাথার টুপিটা সরিয়ে নিল, এতক্ষণ বোধকরি খেয়াল ছিল না।

আমি আর ফার্ডিনাণ্ড দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। জিগগেস করলুম, 'কি খবর, ফার্ডিনাণ্ড ?'

ও মুখে কোনো জবাব দিল না, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে একটু হাত নাড়ল।

'কিছু হয়েছে নাকি ?'

'কি আর হবে ?'

'তোমার শরীরটা তেমন ভালো দেখাচ্চে না—'

'আর কিছু ?'

বললুম, 'না, আর কিছু নয়—'

ও এবারও মুখে কিছু বলল না। ওর বিশাল হাতখানা আমার কাঁধে রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ একটু হাসল।

তারপরে দুজনেই পাঁউরুটিওয়ালার দিকে এগিয়ে গেলুম। ছবিটা দেখে আমি একেবারে অবাক। চমৎকার হয়েছে। সেই বিয়ের সময়কার ফটো আর তার পর তোলা ছবির চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানা মিলিয়ে ও চমৎকার একটি রমণী-মূর্তি সৃষ্টি করেছে। এখনও যৌবন গত হয়নি, মুখখানা গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। পাঁউরুটিওয়ালা মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হ্যাঁ, অবিকল ওর চেহারা।'

কথাগুলো ও আপন মনেই বলছে, কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। মনে হল, কথা কটা যে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে সে নিজেই তা জানে না।

ফার্ডিনাণ্ড জিগগেস করল, 'ওখানটায় আলো আছে তো ? ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন ?'

পাঁউরুটিওয়ালা কথার কোনো জবাবই দিল না। ফার্ডিনাণ্ড এগিয়ে গিয়ে ইজেলটি একটু ঘুরিয়ে দিল, তারপরে আমাকে ইশারা করে বলল, 'চল, পাশের ঘরে যাওয়া যাক।' ঘরে ঢুকেই বলল, 'দেখলে, আহাম্মকটা ছবি দেখে খুব তো মজেছে, কাঁদছে মনে হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সবারই অমনি হয়, ওর একটু দেরি লেগেছে, এই যা।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'বড্ড বেশি দেরি হয়ে যায় হে, বব্। কেউ সময় থাকতে বোঝে না। দুনিয়ার হালই দেখলুম ঐ।' বলে, ঘরের মধ্যে ও পায়চারি করতে লাগল।

'থাক ওকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও। ততক্ষণ এক হাত দাবা খেলে নিলে কেমন হয় ?'

আমি বললুম, 'তুমি যে দেখছি খুব ফুর্তিতেই আছ।'

'দোষ কি ? ওর মতো ও থাক্, আমাদের ফুর্তি করতে বাধা কি ? সবাই যদি ওর মতো কাঁদতে বসে তাহলে ত্বনিয়াতে কারো মুখে আর হাসি থাকবে না, বব্।'

'তা ঠিকই বলেছ। তাহলে এস, তাড়াতাড়ি এক হাত খেলে নিই।'

ঘুঁটি বসিয়ে নিয়ে খেলা শুরু করলুম। দেখতে-দেখতে ফার্ডিনাণ্ড আমাকে হারিয়ে দিল। দাবা না চেলে গজ আর নৌকো দিয়েই ও আমাকে মাত করে দিলে। ওস্তাদ আর কাকে বলে। বললুম, 'আচ্ছা লোক বটে তুমি। দেখে মনে হচ্ছে তিন রাত্তির ঘুমোওনি। এদিকে খেলছ ঠিক ডাকাতের মতো।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'আমার মন খারাপ হলেই দেখেছি দিব্যি খেলায় হাত আসে।'

'আবার মন খারাপ হল কেন ?'

'কি জানি কেন ? বোধ করি সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে। ভদ্রলোক মাত্রেরই দেখেছি সন্ধ্যের দিকে মন খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ কোনো কারণে নয়, অমনিতেই—'

আমি বললুম, 'তা কেন হবে ? সঙ্গী-সাথী না থাকলেই মন-খারাপ হয়।'

'সে কথা ঠিক। সন্ধ্যেবেলায় ছায়া ঘনিয়ে আসে, অমনিতেই নির্জন মনে হয়। যাই বল, কোনিয়াক্ খাবার পক্ষে ওটাই প্রকৃষ্ট সময়।'

উঠে গিয়ে একটি বোতল আর তুটি গ্লাশ নিয়ে এল। আমি বললুম, 'এবার পাঁউরুটিওয়ালার কাছে গেলে হত না ?'

'দাঁড়াও এক মিনিট,' বলে গ্লাশে ঢালতে লাগল। 'এস বব্, তোমার স্বাস্থ্য পান করি। একদিন সবাই মরব কিনা তাই।'

'আর আমি তোমার স্বাস্থ্য কামনা করছি, কারণ এখনো তুজনেই বেঁচে আছি।'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'আচ্ছা, তাও মন্দ নয়। তাহলে এস বাঁচবার নাম করে আর এক গ্লাশ হোক।'

বললুম, 'বহুত আচ্ছা।'

তুজনে গিয়ে স্টুডিওতে ঢুকলুম। অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঁউরুটিওয়ালা কুঁজো হয়ে তখনো ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড বড় ঘরটাতে লোকটাকে হঠাৎ কেমন ছোট্ট দেখাতে লাগল।

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'ছবিটা ওখান থেকে তুলে এনে দেব ?'
লোকটা চমকে উঠে বলল, 'না, না—'
'আচ্ছা তাহলে কালকেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'
পাউরুটিওয়ালা ইতস্তত করে বলল, 'কিছুদিন না হয় এখানেই থাক না ?'
ফার্ডিনাণ্ড খুব অবাক হয়ে বলল, 'কেন বলুন তো ? ছবিটা আপনার পছন্দ হয়নি ?'
'তা হয়েছে, তবে ছবিটা আপাতত এখানেই থাকুক।'
'আপনার কথা বুঝতে পারছিনে—'
পাউরুটিওয়ালা নিরুপায়ভাবে আমার দিকে একবার তাকাল। ওর অবস্থাটা আমি বুঝে নিয়েছি। ওর সেই কৃষ্ণনয়নার ভয়ে ছবিটা বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। তাছাড়া মৃতা পত্নীর সুমুখে ও নিজেকেই অপরাধী মনে করছে। আমি ফার্ডিনাণ্ডকে বললুম, 'ধর, দাম-টাম চুকিয়ে দেওয়া হল—তারপরে ছবিটা এখানে থাকতে দোষ কি ?'
'না, তাতে আর—'
পাউরুটিওয়ালা এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। পকেট থেকে চেক বই বের করে জিগগেস করল, 'চারশো মার্ক বাকি ছিল, না ?'
ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'চারশো কুড়ি, ডিসকাউণ্ট সমেত। আচ্ছা, আপনার রসিদ চাই তো ?'
'হ্যাঁ, রসিদ দিন।'
টেবিলের কাছে গিয়ে একজন চেক লিখছে, আর একজন রসিদ। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে দেখছি। সোনালী ফ্রেমে আঁটা অনেক-গুলো ছবি দেয়ালে ঝুলছে। সন্ধ্যের আবছা আলোয় ছবির মুখগুলো চকচক করছে। যারা এসব ছবির ফরমাশ দিয়েছিল তারা শেষ পর্যন্ত দামও দেয়নি, নেয়ওনি। ছবির মূর্তিগুলো যেন এক-একটি পরলোকের প্রেতাত্মা। এখন মনে হচ্ছে ওরা যেন সবাই একযোগে জানালার ধারের ঐ ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে আর একটি নতুন প্রেতাত্মা এসে ওদের দলে ভিড়ল। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা বাস্তবিকই অদ্ভুত—দুটি মানুষ টেবিলে ঝুঁকে টাকার অঙ্ক লিখছে আর দেয়ালের গায়ে নির্বাক প্রেতমূর্তিগুলো সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে।
পাউরুটিয়ালা আবার জানালার কাছে ফিরে এল। রাঙা চোখ দুটি কাঁচের মার্বেলের মতো দেখাচ্ছে। মুখটি হাঁ-করা, নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে পড়েছে,

আর তার ফাঁক দিয়ে দাগ-পড়া দাঁত কটি দেখা যাচ্ছে। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে হাসিও পায় দুঃখও লাগে। উপরের তলায় কে পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছে। বোধকরি নতুন শিখছে—একঘেয়ে সুরে একই গৎ বাজিয়ে যাচ্ছে। ফাডিনাণ্ড গ্রাউ তখনো টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়ে। পকেট থেকে বের করে একটি চুরুট ধরাল। দেশলাইয়ের আলোতে আধ-অন্ধকার ঘরটা বিরাট বড় মনে হতে লাগল।

পাঁউরুটিওয়ালা বলল, 'আচ্ছা, ছবিটায় এখন এক-আধটু অদল-বদল করা সম্ভব?'

ফার্ডিনাণ্ড এগিয়ে এসে বলল, 'কি করতে চান?'

পাউরুটিওয়ালা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এ জিনিসটা তুলে ফেলা যায় না?'

জিনিসটা হল সেই প্রকাণ্ড সোনার ব্রোচ্‌টা। ছবির অর্ডার দেবার সময় যেটা ও নিজেই যোগ করে দিতে বলেছিল।

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'খুব পারা যায়। ওটা থাকাতেই বরং মুখের চেহারা বদলে গেছে। বাদ দিতে পারলে ছবিটা অনেক ভালো হবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।' পায়চারি করতে-করতে বলল, 'কত খরচা পড়বে?'

কথাটা বলতেই ফার্ডিনাণ্ড আর আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। 'না, খরচা কিছুই লাগবে না,' খুব দরাজ ভাব দেখিয়ে ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'বরং আপনিই কিছু ফিরে পাবেন। কারণ ছবিটার থেকে কিছু অংশ বাদ যাবে কিনা।'

পাঁউরুটিওয়ালা খুব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। মনে হল কিছু একটা জিগগেস করবে; কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলল, 'না, না, ও কথা ছেড়ে দিন—যাই বলেন, আপনাকে কষ্ট করে জিনিসটা আঁকতে হয়েছিল?'

'সে কথা সত্যি বটে।'

খানিক বাদে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে নামছি। আমার আগে-আগে পাঁউরুটিওয়ালা। পিঠটি কুঁজো। ব্রোচ্‌-এর ব্যাপারটা নিয়ে যে মিথ্যাচারটুকু করেছিল শেষ পর্যন্ত সেটা ওর বিবেকে লেগেছে। বেচারার জন্য কষ্ট হয়। ভাবলুম ওর মন মেজাজ যখন ভালো নয় তখন আজকে আর ক্যাডিলাক্‌-এর কথাটা তুলব না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল মৃত পত্নীর জন্য ওর এত যে দরদ তার আসল কারণটা হচ্ছে বাড়িতে ঐ জ্যান্ত পেত্নীটি। এ কথা মনে হতে না হতেই মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।

রাস্তায় নেমেই ও বলল, 'চলুন না আমার বাড়ি, ওখানে গিয়েই সব কথাবার্তা হবে।'

আমি তক্ষুনি রাজী। ভালো হল। ও ভেবেছে নিজের ঘরে নিজের বাড়িতে ও কথা বলতে জোর পাবে। আমি ভাবলুম তা হোক না, কৃষ্ণনয়না তো রয়েছেন, তিনিই আমার সহায় হবেন।

উক্ত প্রাণীটি দরজাতেই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলেন। পাঁউরুটিওয়ালা মুখ খুলবার আগেই আমি বললুম, 'আর কি, আপনার হয়ে গেল—'

'এ্যাঁ কি হল?—' চোখে বিষম উৎকণ্ঠা।

আমি দিব্যি নিরুদ্বেগে বলে বসলুম, 'কেন আপনার ক্যাডিলাক্—'

সুন্দরী এক লাফে পাঁউরুটিওয়ালার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যি লক্ষ্মীটি?'

'না, না, এখনো কিছু ঠিক হয়নি—' বলেই আদরিণীর বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কম্‌লি ছাড়লে তো! আরো জোরে আঁকড়ে ধরে ওকে সুদ্ধু নিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। বেচারা কথা বলবার অবসরই পেল না। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একবার দেখছি স্ত্রীলোকটির মিটমিটে চোখ আর দুষ্টুমি-ভরা মুখ, আর একবার দেখছি গুবরে পোকার মতো পাঁউরুটি-ওয়ালার গোমড়া মুখ। শেষটায় কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কথাবার্তা এখনো তেমন হয়নি।'

আমি বললুম, 'তা এক রকম তো হয়েই গেছে! আপনাকে বলেই রাখছি ও যা চেয়েছে তার থেকে কমসে-কম পাঁচশো মার্ক কমাতে পারবই, সাত হাজারের উপরে আপনাকে এক পয়সা দিতে হবে না।'

কৃষ্ণনয়নার সবুর সয় না, বলে উঠল, 'ব্যস! ও তো খুব সস্তা, হ্যাঁ লক্ষ্মীটি—'

পাঁউরুটিওয়ালা হাত তুলে বলল, 'থামো, থামো।'

রমণীরত্নটি এবার উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কি হয়েছে তোমার শুনি? একবার বললে গাড়ি কিনবে, এখন বলছ কিনবে না।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, উনি কিনবেন বৈকি। আমাদের কথা হয়ে গেছে।'

'ওঃ তাই বল, মিছিমিছি কেন—' বলে আর একদফা ওকে জড়িয়ে ধরল। বেচারা যত নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় কম্‌লি ততই তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে। লোকটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, চোখে মুখে বিরক্তি, কিন্তু বাধা দেবার শক্তিও নেই। বলল, 'ফোর্ড গাড়িটা—'

বললুম, 'ওটা অবশ্যই দামের মধ্যে ধরে নেওয়া হবে।'

'কিন্তু দাম চার হাজার মার্ক।'

আমি নেহাত ভালোমানুষের মতো বললুম, 'ওটাতে অত দাম পড়েছিল ?'
পাঁউরুটিওয়ালা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, ওটার দাম চার হাজার মার্কই ধরতে হবে।' প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ও এখন আমাকে উল্টো চাপ দিচ্ছে। বলল, 'দেখছেন তো গাড়িটা বিলকুল নতুন হয়ে গেছে।'
বললুম, 'হ্যাঁ, এতখানি মেরামতের পরেও যদি বলেন নতুন তবে—'
'আজ সকাল বেলায় আপনি নিজেই ও কথা বলছিলেন।'
'সকালের কথা আলাদা। আর নতুনেরও রকম ফের আছে, মশাই—কেনবার বেলায় এক, বেচবার বেলায় আর। আপনার ঐ ফোর্ডের দাম চার হাজার হলে বুঝতে হবে ওর কলকব্জা এক-আধটা সোনাদানার তৈরি।'
পাঁউরুটিওয়ালা নিতান্ত গোঁজের মতো বলল, 'অতশত বুঝিনে মশাই। চার হাজার হলে হবে, নয়তো হবে না।' এতক্ষণে ওর পূর্ব স্বরূপটি দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে আজকেই ও যে মনের দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছিল এখন তার শোধ তুলে তবে ছাড়বে !
'আচ্ছা তবে উঠতে হল।' কৃষ্ণনয়নার দিকে ফিরে বললুম, 'বড়ই দুঃখিত, কিন্তু উপায় নেই। লোকসান দিয়ে ব্যবসা তো আর করতে পারিনে। অমনিতেই তো ক্যাডিলাক্ বিক্রি করে আমাদের দু-পয়সাও আসবে না, তার উপরে যদি একটা পুরনো ফোর্ড অমন অসম্ভব চড়া দামে কিনতে হয় তবে তো—নাঃ, সে হয় না। আচ্ছা আসি তবে।'
যা ভেবেছিলুম, কৃষ্ণনয়না নিজেই আমার পথ আটকে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে স্বামীকে বলল, 'এ্যাঁ, তুমি নিজেই না একশোবার বলেছ, তোমার ঐ ফোর্ড গাড়ি বাজে, ওর কিচ্ছু দাম হয় না—এখন ?'
পাঁউরুটিওয়ালা আর পালাবার পথ পায় না। ওদিকে আদরিণী রাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলেছে।
আমি বললুম, 'থাক-থাক, আমি দুহাজার মার্কই দেব, অবিশ্যি সেটা আমার পক্ষে ভয়ানক বেশি হয়ে যায়।'
পাঁউরুটিওয়ালা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।
কৃষ্ণনয়না তর্জন করে উঠল, 'কই কিছু বলছ না যে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি ? মুখে রা নেই কেন ?'
আমি বললুম, 'কিছু মনে করবেন না, আমি বরং গিয়ে ক্যাডিলাক্টা নিয়ে আসি। আপনারা ইতিমধ্যে কথাবার্তা বলে মন স্থির করে ফেলুন।' ভেবে

দেখলুম এমন অবস্থায় আমার পক্ষে বেরিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাকি কাজটুকু কৃষ্ণনয়না নিজেই আমার হয়ে সমাধা করবে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাডিলাক্ নিয়ে ফিরে এলুম। দেখেই বুঝলুম ঝগড়া বেশ ভালো ভাবেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। পাঁউরুটিওয়ালার পোশাকটা একটু আলুথালু বোধ হচ্ছে, গদিওয়ালা বিছানার একটি পালক লেগে আছে কোটে। কৃষ্ণনয়নার মুখ-চোখে একটি জলজ্বলে ভাব, বুকের নাচুনি তখনো থামেনি। হাবভাবে জয়ের আভাস। ইতিমধ্যে পোশাক বদলে নিয়েছে। একটি পাতলা সিল্কের ফ্রক গায়ে লেপ্টে আছে। সুযোগ বুঝে একবার আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল যে সব ঠিক হয়ে গেছে।

গাড়ি ট্রায়াল দেবার জন্য ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কৃষ্ণনয়না প্রকাণ্ড সিটটাতে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে অনর্গল বকে যেতে লাগল। এমন বিরক্তি লাগছিল কি বলব। ইচ্ছে করছিল ওকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। ফেলিনি যে তার কারণ ও না হলে শেষ পর্যন্ত কার্য উদ্ধার হবে না। পাউরুটিওয়ালা বসেছে আমার পাশে মুখ বিষম গোমড়া করে। টাকার শোকে ও আগে থেকেই অধীর হয়ে পড়েছে। বেচারার দোষ নেই—মন খারাপ হবারই কথা।

ঘুরে ফিরে পাঁউরুটিওয়ালার বাড়ির কাছে এসে আবার গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নেমে সবাই বাড়িতে ঢুকলুম। পাঁউরুটিওয়ালা টাকা আনতে ভিতরে চলে গেল। লোকটাকে হঠাৎ কেমন বুড়ো-বুড়ো দেখাচ্ছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম ওর চুলে কলপ লাগানো।

কৃষ্ণনয়না একবার তার পাতলা পোশাকের উপর হাতটি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'খুব কায়দা করে বাগানো গেছে, কি বলেন?'

ওর কথার জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না। সংক্ষেপে বললুম, 'হুঁ।'

'কিন্তু বলে রাখি একশোটি মার্ক আমায় দিতে হবে। আমিই তো—'

'অ্যাঁ? তাহলে—'

শ্রীমতী কাছে ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'ঐ কিপ্টে হতভাগার কথা আর বলবেন না। টাকার অন্ত নেই, কিন্তু বের করুন তো দেখি একটি টাকা! উইল করাতে পারছিনে, মশাই। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সব ছেলেরাই পাবে, কিন্তু তখন আমার কি হবে? আর বলতে কি, ওর মতো বুড়ো-হাবড়ার সঙ্গে থেকেই বা কি সুখ!'

বলতে-বলতে আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে বুক দোলাতে-দোলাতে বলল, 'তাহলে কাল এক সময়ে গিয়ে আমার একশো মার্ক আমি নিয়ে আসব, কেমন? কখন গেলে আপনাকে পাওয়া যাবে, বলুন। কিম্বা আপনি যদি এদিকটায় আসেন তবে তো আরো ভালো হয়।' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'কাল বিকেল বেলায় আমি বাড়িতে একলাই থাকব।'

আমি বললুম, 'টাকাটা আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেব।'

আর একদফা খিলখিল হাসি। 'না, না, আপনি নিজেই আসুন। কেন, আপনার ভয় করছে নাকি?'

ও ভেবেছে আমি কচি খোকাটি। কোনো যে ভয়ের কারণ নেই সেটা আরো খুলে বলতে যাচ্ছিল। আমি বললুম, 'ভয়ের কথা নয়। আমার সময়ই নেই। কালকে আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনেকদিনের পুরোনো সিফিলিস বড্ড কষ্ট দিচ্ছে।'

যেই না বলা, সুন্দরী বিদ্যুদ্বেগে তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে আরাম কেদারাটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। ঠিক সেই মুহূর্তে পাউরুটিওয়ালা ঘরে এসে ঢুকল। বেশ একটু সান্দিগ্ধভাবে ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে ধীরে-ধীরে টেবিলের উপর টাকা গুনে-গুনে রাখতে লাগল। রসিদ লিখে দেবার সময় হঠাৎ আমার মনে হল আজকের দিনের মধ্যে একই ব্যাপার দুবার ঘটল, শুধু আগের বারে রসিদ লিখেছে—ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ, এই যা তফাত। এ কথাটা মনে হবার বিশেষ কোনো অর্থ নেই, তবু কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বাতাসটা বেশ মিঠে লাগছে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাডিলাকটা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারছে। আদর করে রেডিয়েটার-এর গায়ে হাত বুলিয়ে বললুম, 'বেঁচে থাক্ বাছা। শিগগির শিগগির আবার ফিরে আয় আমাদের কাছে।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সকাল বেলার রোদটুকু মাঠের উপরে চক্‌চক্‌ করছে। প্যাট্ আর আমি একটা চষা মাঠের ধারে বসে প্রাতরাশ সেরে নিচ্ছি। দু-হপ্তার ছুটি নিয়েছি, প্যাট্‌কে সঙ্গে করে যাচ্ছি সমুদ্রের ধারে, দিন কয়েক ওখানে কাটাব বলে।

রাস্তার এক পাশে একটি পুরোনো সিত্রয়ঁ। গাড়ি। পাঁউরুটিওয়ালার ফোর্ড আর কিছু নগদ টাকা দিয়ে এইটি সংগ্রহ করা গেছে। এখন ছুটির কদিনের জন্য কোষ্টার নিজে থেকেই গাড়িটা আমাকে ধার দিয়েছে। বাক্স-তোরঙ্গে গাড়িটা এমন ঠাসা হয়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটি বোঝাই-করা গাধা।

আমি বললুম, 'ইনি আবার রাস্তার মাঝখানে খোঁড়া না হয়ে পড়েন।'

প্যাট্ বলল, 'না খোঁড়া হবে না।'

'কেমন করে জানলে?'

'এ তো জানা কথা। আমরা শখের ছুটিতে বেরিয়েছি, সে কি আর ও বোঝে না?'

বললুম, 'সে একটা কথা বটে। কিন্তু ওর পিছনের চাকাটার যা অবস্থা! তার উপরে আবার এই বোঝা।'

'ছাখ না তুমি, ও হচ্ছে কার্লের জমজ ভাই। ও ঠিক টিকে যাবে।'

'হ্যাঁ, রোগা টিংটিং-এ ভাইটি!'

'আঃ, বব্, কেন মিথ্যে ওকে গাল দিচ্ছ? এর চাইতে ভালো গাড়ির কথা আমি ভাবতেই পারিনে।'

বললুম, 'বেশ, এখন একবার এদিকে এস।'

'ওখানে গিয়ে কী হবে?'

'কী হবে ঠিক বলা যায় না।'

মাঠের মধ্যে দুজনে পাশাপাশি খানিকক্ষণ শুয়ে রইলুম। পাশের বন থেকে

দিব্যি মিঠে হাওয়া দিচ্ছে। পাইনের গন্ধ আর বুনোফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে।

খানিক বাদে প্যাট্ বলে উঠল, 'আচ্ছা বব্, ওখানটায় নদীর ধারে ওগুলো কি ফুল বল তো?'

ওদিকে না তাকিয়েই বলে দিলুম, 'আনিমোন্।'

'না গো মশায়, আনিমোন দেখতে আরো ছোট হয়, আর ও ফুল বসন্তকাল ছাড়া ফোটে না।'

'ঠিক বলেছ। ও হচ্ছে লেডিজ স্মক।'

প্যাট্ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, ও ফুল আমি খুব ভালো করে চিনি। এটা সে ফুল নয়।'

'তাহলে ওটা হেমলক্।'

'আঃ বব্, হেমলক্-এর রঙ শাদা, কখনো লাল হয় না।'

'ওঃ, তাহলে বলতে পারব না। এ পর্যন্ত যে যখন ফুলের নাম জিগগেস করেছে আমি ঐ তিন নাম দিয়েই কাজ সেরে দিয়েছি। একটা না একটা লেগে গিয়েছে কিম্বা তাই মেনে নিয়েছে।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'তোমার এমন দুর্দশা জানলে আমিও আনিমোন নামটাই মেনে নিতুম।'

আমি বললুম, 'অনেক ক্ষেত্রেই হেমলক নামটা খেটে গিয়েছে।'

প্যাট্ উঠে বসে বলল, 'তবু ভালো। দেখা যাচ্ছে ফুল সম্বন্ধে অনেকেই তোমাকে প্রশ্ন করেছে।'

'না, অনেকেই নয়। তাও আবার স্থান কাল পাত্র ঠিক অনুরূপ নয়।'

মাটিতে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় সঙ্গিনী বলল, 'কি দুঃখের কথা, মানুষ পৃথিবীর বুকের উপরে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় অথচ পৃথিবীর কিছুই জানে না। এমন কি দু-চারটে নাম মনে রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না।'

বললুম, 'এ আর এমন কি দুঃখের কথা। কেন যে মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় সে কথাই সে জানে না; সেটাই বরং দুঃখের কথা। গোটা কয়েক নাম মুখস্থ করে রাখলে এমন কি লাভ হত।'

'তা তো তুমি বলবেই, তোমার মতো কুড়ে মানুষরাই অমন কথা বলে।'

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললুম, 'নিশ্চয়, কুড়েমি কি একটা ফ্যালনা জিনিস? ও হল গিয়ে সকল সুখের মূল, সকল শাস্ত্রের মূল কথা। এস, আবার দিব্যি আরাম

করে শুয়ে পড় তো। মানুষ এখনো শুয়ে থাকতেই শেখেনি, হয় দাঁড়িয়ে থাকে নয় তো বসে থাকে। দৈহিক আরামের পক্ষে ওটা প্রশস্ত নয়। শুয়ে পড়তে পারলে তবে শান্তি।'

একটা গাড়ি সশব্দে পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি উঠে বসেই বললুম, 'ওটা বেবী মারসিডিস্‌। চার সিলিণ্ডারের গাড়ি!'

প্যাট্‌ বলল, 'ঐ আর একটা আসছে।'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। এটা রেনো। ছাখ তো রেডিয়েটারটা দেখতে শুয়োরের নাকের মতো না?'

'হ্যাঁ তাই।'

'তাহলে নিশ্চয়ই রেনো। ঐ শোনা আর একটি আসছে। এটি হচ্ছে গাড়ির মতো গাড়ি—ল্যান্‌সিয়া। বাজি রেখে বলতে পারি ও নিশ্চয় ঐ গাড়ি দুটোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে—নেকড়ে যেমন ভেড়াকে তাড়া করে তেমনি। এঞ্জিনের শব্দটা শুনছ। ঠিক অর্গানের আওয়াজের মতো।'

গাড়িটা শোঁ করে চলে গেল। প্যাট্‌ বলল, 'এর বেলায় তো দেখছি তিনটের চাইতে ঢের বেশি নাম তোমার জানা আছে।'

'তা তো বটেই। আরো কি, সবগুলোই সঠিক নাম। এর মধ্যে আর ভুল-চুক হবার জো নেই।'

প্যাট্‌ হেসে বলল, 'সেই তো দুঃখের কথা।'

'দুঃখের কথা কেন? বরং খুব স্বাভাবিক কথা। আমার কাছে মাঠভর্তি ফুলের চাইতে একটি ভালো মোটরের মূল্য ঢের বেশি।'

'হুঁ, ঠিক বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতোই কথা। তোমাদের আর কোনো আশা নেই। তোমার মধ্যে বোধ করি সেন্টিমেন্ট বলে কোনো পদার্থই নেই।'

'আছে বইকি—আছে। এই যে শুনলে। মোটরকার-এর বেলায় আমার যথেষ্ট সেন্টিমেন্ট আছে।'

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আর আমার সম্বন্ধে বুঝি একটুও নেই?'

ফার্‌ গাছের ভিতর থেকে একটা কোকিল ডাকতে শুরু করেছে। প্যাট্‌ এক দুই তিন চার করে তাই গুনছে। আমি বললুম, 'ও আবার কী?' প্যাট্‌ বলল, 'জানো না বুঝি? ও যতবার ডাকবে তত বছর তুমি বেঁচে থাকবে।'

'তাই নাকি? আমি কিন্তু আর এক রকম শুনেছি। কোকিল যখন ডাকবে তখন টাকা হাতে করে ঝাঁকাতে হয়, তা হলে টাকা বেড়ে যায়।' পকেট থেকে খুচরো টাকা বের করে হাতের মুঠোয় নিয়ে খুব করে ঝাঁকাতে লাগলুম।

প্যাট্ হেসে বলল, 'যার যেমন মতি! আমি চাই জীবন আর তুমি চাও টাকা।'

আমি বললুম, 'কিন্তু টাকা যে চাই, জীবনধারণের জন্যই তো। আদর্শবাদী ব্যক্তি মাত্রই টাকা খুঁজে বেড়ায়। টাকা হল স্বাধীনতার নামান্তর আর স্বাধীনতাকেই বলে জীবন।'

প্যাট্ চোদ্দ অবধি শুনে বলল, 'কিন্তু এ-সম্বন্ধে আগে তোমাকে অন্য রকম বলতে শুনেছি।'

'সে তখন আমার মনের ভাব অন্য রকম ছিল বলে। আসলে টাকাকে অবজ্ঞা করতে নেই। টাকা নইলে মেয়েরা প্রেমিক জোটাতে পারে না। আবার প্রেম মানুষকে অর্থলোভী করে তোলে। তবেই দেখছ টাকা জিনিসটা প্রেম এবং বাস্তবজীবনের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। দুই আদর্শকেই বজায় রাখে।'

প্যাট্ গুনল, 'পঁয়তিরিশ।' আমি বললুম, 'স্ত্রীলোকের দরুনই পুরুষ অর্থলোভী হয়। স্ত্রীলোক না থাকলে টাকারও প্রয়োজন থাকত না আর সব পুরুষই বীর-পুরুষ হত। ট্রেঞ্চে যখন লড়াই করেছি তখন সেখানে স্ত্রীলোক ছিল না। কাজেই কার পয়সা আছে আর কার নেই সেই প্রশ্নই উঠত না। কে কেমন মানুষ তাই নিয়ে তার বিচার। অবশ্য তাই বলে আমি ট্রেঞ্চের স্বপক্ষে কিছু বলছি না। প্রেমের আসল স্বরূপটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য! প্রেম মানুষের মনে যত রকমের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়—অর্থের লোভ, সম্মানের লোভ, আরামের লোভ। এই জন্যেই ডিক্টেটাররা চায় তাদের অধীন কর্মচারীরা বে-থা করে বসে, তাহলে ওদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। অপর পক্ষে ক্যাথলিক পুরোহিতরা যে বিয়ে করে না তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে—বিয়ে করলে এরা অমন দুঃসাহসী ধর্মপ্রচারক হতে পারত না।'

প্যাট্ গুনে চলেছে, 'বাহান্ন।'

আমি হাতের টাকাগুলো পকেটে রেখে দিয়ে একটি সিগারেট ধরালুম। ওকে বললুম, 'তুমি যে একধার থেকে গুনেই চলেছ, থামবে না নাকি? সাবধান সত্তর ছাড়িয়ে যেও না যেন!'

'সত্তর কি—একশো অবধি যাব।'

'বাবাঃ, তোমার সাহস আছে বটে। একশো বছর বেঁচে কি হবে?'

ও একবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল, তারপরে বলল, 'এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না।'

'তা হবার কথা নয় বটে। কিন্তু মনে রেখো সত্তর অবধিই জীবনের সবচেয়ে খারাপ অংশ। তারপরে একরকম সয়ে যায়।'

প্যাট্ আমার কথা কানেই তুলল না। 'উহুঁ, একশো বছরের কমে হবে না।'

তৃণশয্যা ছেড়ে দুজনেই উঠে পড়লুম। আবার রওনা হওয়া গেল।

দূর থেকে সমুদ্রটাকে দেখাচ্ছে যেন বিরাট একটা রুপোলী পরদা। অনেকটা দূর থেকে লোনা জলের হাওয়া পাচ্ছিলুম। আর যতই এগিয়ে যাচ্ছি দিগন্তরেখা ক্রমেই যাচ্ছে পেছিয়ে। তারপরে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি একেবারে সুমুখেই সমুদ্র—অস্থির চঞ্চল সীমাহীন জলরাশি।

সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে বনের ভিতরে ঢুকেছে। বনের পারেই গ্রাম। গ্রামের ভিতরে গিয়ে আমাদের থাকবার আস্তানা খুঁজে বের করলুম। বাড়িটা গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে। কোষ্টার-এর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এসেছিলুম। লড়াইয়ের পরে সে বছরখানেক এখানে এসে ছিল।

দিব্যি ছোট্ট একটি বাড়ি। দুবার বাঁক ঘুরে সিত্রয়াঁটি আমাদের বাড়ির ঠিক সুমুখে এসে দাঁড়ল। হর্ন বাজাতেই চ্যাপ্টা মতো প্রকাণ্ড একটি মুখ পরদার ফাঁক দিয়ে একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বললুম, 'বাবাঃ, ইনি ফ্রাউলিন্ মুলার হলেই হয়েছে আর কি!'

প্যাট্ বলল, 'তাতে কি হয়েছে? ওর চেহারা দিয়ে আমাদের কি হবে?' একটু পরেই দরজা খুলে গেল। যাক বাঁচা গেছে ওটি ফ্রাউলিন্ মুলার নয়, বাড়ির ঝি। মিনিট খানেক পরেই গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এলেন, ইনিই ফ্রাউলিন্ মুলার। দিব্যি ছিমছাম দেখতে—ওল্ড মেড-এর চেহারা, চুলে পাক ধরেছে। উঁচু কলারওয়ালা কালো রঙের পোশাকে সোনার একটি ক্রস্ ব্রোচের মতো করে আটকানো। ব্রোচের দিকে এক নজর তাকিয়েই ফিস্‌ফিস্ করে প্যাট্‌কে বললুম, 'সাবধান! প্রস্তুত থাক, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়।'

মহিলাটিকে বললুম, 'হের্ কোষ্টার বোধকরি আপনাকে আগেই খবর দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, আপনারা আসছেন বলে উনি আমাকে তার করেছেন।' একবার আপাদ-মস্তক আমার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিগগেস করল, 'হের্ কোষ্টার কেমন আছেন?'

'তা, বেশ ভালোই আছেন—অবিশ্যি দিনকাল আন্দাজে।'
ঘাড় নেড়ে আর এক দফা আমাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। 'ওঁর সঙ্গে আপনার কদ্দিন থেকে জানাশোনা?'
ভাবলুম, এইরে, রীতিমতো জেরা শুরু হল যে। কোষ্টার-এর সঙ্গে কতকাল থেকে আমার জানা তা বললুম। মনে হল শুনে খুশি হয়েছে। ইতিমধ্যে প্যাট্ গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। আমার কথামতো সে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে বলেই মনে হল। তাকে দেখেই ফ্রাউলিন্ মুলার-এর মুখের চেহারা কোমল হয়ে এল। আমার চাইতে বরং প্যাট্কে দেখেই বেশি খুশি হয়েছে বলে মনে হল। জিগগেস করলুম, 'তাহলে আমাদের থাকবার জায়গা হবে?'
ফ্রাউলিন্ মুলার একটু যেন বিরক্ত হয়েই আমার দিকে তাকাল। বলল, 'দেখুন, হের্ কোষ্টার যখন তার করেছেন তখন ব্যবস্থা হবেই।' প্যাট্-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমার সবচেয়ে ভালো ঘরটাই আপনাদের জন্য রেখেছি।'
প্যাট্ আর ফ্রাউলিন্ মুলার-এর মধ্যে মৃদু হাস্য বিনিময় হল। ফ্রাউলিন্ বলল, 'আসুন আপনাকে ঘর দেখিয়ে দিই।'
ছোট্ট বাগানের ভিতর দিয়ে একটি সরু পথ বেয়ে ওরা দুজন আগে-আগে চলল, আমি পিছন-পিছন। নিজেকে নিতান্তই অবান্তর মনে হতে লাগল, কারণ ফ্রাউলিন্ মুলার প্যাট্কে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছেন।
ঘরটি নিচের তলায়। বাগানের দিকে একটি দরজা আছে। ঘরটি খুবই পছন্দসই—বেশ বড়-সড়, খোলামেলা। ঘরের এক কোণে দুটি খাট।
ফ্রাউলিন্ মুলার বলল, 'কেমন পছন্দ হল?'
প্যাট্ বলল, 'চমৎকার!'
ওকে খুশি করবার জন্য আমি বললুম, 'এর চাইতে ভালো কিছু আশাই করা যায় না। যাক্ ওটা তো হল, আর একটা?'
ফ্রাউলিন্ মুলার আমার দিকে ফিরে বলল, 'আর একটা? আর একটা আবার কেন? আপনাদের এই ঘরটাতে মন উঠছে না?'
'না, না, এটা তো চমৎকার ঘর, কিন্তু—'
ফ্রাউলিন্ মুলার এবার রোখা-চোখা জবাব দিয়ে দিল, 'উঁহু, এর চাইতে ভালো ঘর আমার এখানে হবে না।'
আমাদের দুজনের যে দুটো ঘর আবশ্যক সে কথাটাই বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, ফ্রাউলিন্ মুলার বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার স্ত্রীর তো এ ঘর খুব পছন্দ হয়েছে।'

আপনার স্ত্রী! চমকে উঠে দু-পা পিছিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। অতি কষ্টে সামলে গেলুম। আড়চোখে প্যাট্‌-এর দিকে তাকিয়ে দেখি সে ঝুঁকে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে, নিশ্চয় আমার দুরবস্থা কল্পনা করে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী, তবে কিনা—' ফ্রাউলিন্ মুলারের কাঁধে সেই ক্রস আকৃতি ব্রোচটার উপরে চোখ পড়তেই আমার মুখের কথা আটকে গেল। নাঃ, একে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধাবে; চাই কি ফিট-টিট হয়ে যেতে পারে। একটু ইতস্তত করে বললুম, 'আমাদের আলাদা ঘরে শুয়ে অভ্যেস কিনা. তাই।'

ফ্রাউলিন্ মুলার ঘাড় নেড়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'বাবাঃ, বিয়ে করবার পরেও আলাদা শোবার ঘর—এই বুঝি আজকালকার ফ্যাশান?'

পাছে ওর মনে আবার কোনো রকম সন্দেহ জাগে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'না, না, ফ্যাশানের কথা নয়। আসল কথা কি জানেন, আমার স্ত্রীর ঘুম বড় পাতলা। আবার এদিকে মুশকিল হয়েছে ঘুমের মধ্যে আমার বিষম নাক ডাকে।'

'ওঃ এই কথা—নাক ডাকে!' ফ্রাউলিন মুলার এমন ভাব দেখাল যেন সে কথা আগেই তার ভাবা উচিত ছিল।

উপস্থিত বিপদ তো কাটল, কিন্তু এখন ভাবনা হল উপরের তলায় না আমার ঘর ঠিক করে দেয়। তবে বিবাহ সম্পর্কটা এদের কাছে খুব একটা পবিত্র সম্পর্ক, এই যা ভরসা।

ফ্রাউলিন এক পাশের একটা দরজা খুলে দিল। বড় ঘরটার লাগোয়া ছোট্ট একটি ঘর—তাতে একটি মাত্র খাট রয়েছে, আর কিছু নেই।

আমি বললুম, 'চমৎকার, এতেই আমাদের দিব্যি হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য কারো কিছু অসুবিধে হবে না তো।' আসলে আমার জানবার উদ্দেশ্য নিচের তলাটায় আর কোনো ভাড়াটে আছে কিনা।

'না, না, কারো কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।' ফ্রাউলিন্ মুলার-এর উগ্র ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে—'আপনারা ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণীই এখানে নেই। বাকি ঘরগুলো সবই খালি। আচ্ছা, আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় করব, এখানে না খাবার ঘরে?'

আমি বললুম, 'এখানে হলেই ভালো হয়।'

ফ্রাউলিন্ তাতেই রাজী হয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এই যে ফ্রাউ লোকাম্প্, এবার তো আমাদের সম্পর্কটা ঠিক হয়ে গেছে। যাই বল, ওর কাছে সত্যি কথা কবুল করবার সাহস আমার নেই, যা ধর্মাবতারের মতো চেহারা! আর লক্ষ্য করেছ, ও যেন ঠিক আমাকে পছন্দ করছে না, না? কিন্তু বরাবর দেখেছি বুড়ো-বুড়িদের সঙ্গে আমার সহজে ভাব হয়ে যায়।'

'আহা ওকে বুড়ি বলছ কেন? বড় জোর ওল্ড মেড্ বলতে পার, তাও দিব্বি ভালোমানুষ।'

'ভালোমানুষ? তবেই হয়েছে। যা চাল, বাপস্।'

'বাজে কথা—মোটেই চাল নেই।'

'তোমার কাছে নেই।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'না, না, ওকে আমার বেশ লেগেছে। যাক, এখন ট্রাঙ্ক বিছানাপত্তরগুলো নিয়ে এলে হয় না? স্নানের জিনিসগুলো তো বের করতে হবে।'

ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটবার পর আমি তীরে উঠে রদ্দুরে শুয়ে পড়েছি। প্যাট্ এখনো সাঁতার কাটছে। ওর মাথার শাদা টুপিটা নীল জলে ক্রমাগত ডুবছে আর উঠছে। কয়েকটা সামুদ্রিক পাখি মাথার উপরে কেবলি চক্কর দিচ্ছে। বহু দূরে একটি ষ্টীমার দেখা যাচ্ছে—ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ রেখা ছড়াতে-ছড়াতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছে।

রোদ্দুরটা ক্রমেই কড়া হয়ে উঠেছে। আমি চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। পিঠের চাপে গরম বালির দানাগুলি মৃদু শব্দ করে ভেঙে এলিয়ে গেল। তীরে-এসে-লাগা ছোট-ছোট ঢেউয়ের ছল-ছল-ছলাৎ শব্দ ক্রমাগত কানের কাছে গান গেয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন আগের আর একটা দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকাল। আমাদের রেজিমেণ্ট তখন ফ্লাণ্ডার্স-এ। খুব অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের কদিন ছুটি মিলে গেল। দল বেঁধে গিয়েছিলুম অস্টেণ্ডে—মেয়ার, হলটফ্, ব্রেয়ার, লুটজেনস্, আমি এবং আরো জনকয়েক মিলে। তখন আমাদের সুমুখে মৃত্যু, পশ্চাতে মৃত্যু—তার মাঝখানে ঐ কদিনের মুক্তির আস্বাদ যে কি মধুর লেগেছিল কি বলব! একেবারে উজাড় করে নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলুম—সেই রৌদ্রতাপ, সেই বেলাভূমি আর সাগর-জলের কাছে।

সারাদিন কেটে যেত সমুদ্রতীরে। দেহটি অনাবৃত করে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতুম রোদ্দুরে; আর কিছু নয় এই যে বন্দুক সঙিন যোদ্ধবেশ থেকে মুক্তি এই যথেষ্ট, এই পরম শান্তি। কখনো-কখনো সমুদ্রতীরে ছুটাছুটি করতুম, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তুম জলে। এই দেহটা যে আমাদের, এই নিঃশ্বাস যে আমাদের, আমরা যে বেঁচে আছি—সেই ছিল আমাদের জপমন্ত্র। আর সব কিছু ভুলে গিয়েছিলুম, ভুলবার প্রয়োজনও হয়েছিল। কিন্তু সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার যখন ঘিরে আসত, কালো-কালো ছায়া এসে সমুদ্রকে ঢেকে দিত তখন সমুদ্রের গর্জনকে ছাপিয়ে আর একটা প্রচণ্ডতর গর্জন কানে এসে লাগত। বুঝতে মুহূর্ত বিলম্ব হত না—এটা বহুদূরাগত যুদ্ধক্ষেত্রের কামান-গর্জন। সান্ধ্যবৈঠকে আমাদের মৃদুগুঞ্জন অকস্মাৎ থেমে যেত, প্রত্যেকটি লোক উৎকর্ণ হয়ে শুনত সেই মৃত্যুর গর্জন। ক্লান্ত স্কুলবালকের প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে ধীরে-ধীরে সৈনিকের কঠোরতা ফুটে উঠত। পর মুহূর্তে দেখা দিত বিষাদের ছায়া—সে বিষাদের কোনো ভাষা নেই, কিন্তু মুখের প্রতি রেখায় ফুটে উঠত আশা-নিরাশার দোলা, একদিকে কঠোর কর্তব্যের আহ্বান, অপরদিকে ব্যর্থতার তিক্ততা, একদিকে জীবনের ভোগলালসা অপরদিকে অকালমৃত্যুর অমোঘ ললাট-লিখন। এরই কদিন পরে শুরু হল '১৭ সনের সেই প্রচণ্ড আক্রমণ। কদিন যেতে না যেতেই জুলাই-এর গোড়ার দিকে দেখা গেল আমাদের রেজিমেণ্টের মোটে বত্রিশটি প্রাণী বেঁচে আছে— মেয়ার, হলটফ্, লুটজেনস্ কেউ বেঁচে নেই।

প্যাট্ ডাকল, 'বব্—' ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালুম। এঁ্যা, আমি কোথায় শুয়ে আছি। তাই তো, ভাবতে-ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলুম! লড়াইয়ের কথা যখনই ভাবি মন যেন নিমেষে কোন দূরান্তে চলে যায়। অন্য কোনো ব্যাপারে তো এমনটা হয় না।

উঠে বসলুম। প্যাট্ জল থেকে উঠে আসছে আর পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে ওর সিক্ত দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই প্রখর আলোতে ওকে রীতিমতো কালো দেখাচ্ছে। ধাপে-ধাপে ও উঠে আসছে আর ডুবন্ত সূর্যের লাল গোলকটা ঠিক ওর মাথাটিকে ঘিরে একটি জ্যোতিঃশিখার মতো ফুটে উঠেছে।

চমকে লাফিয়ে উঠলুম। দৃশ্যটা এমন অত্যাশ্চার্য যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন—উপরে অন্তহীন নীল আকাশ, তলায় ফেনিল জলরাশি আর তারি মাঝখানে তন্বী রমণীমূর্তি—সমস্তটা মিলিয়ে একটা যেন অপার্থিব অনুভূতি। যেন বিশ্বসংসারে আমি একমাত্র পুরুষ আর সমুদ্রগর্ভ থেকে ধীরে-ধীরে উঠে আসছে

পৃথিবীর আদি রমণী। সৌন্দর্যের যে কি অপরিসীম শক্তি তা আজকেই প্রথম উপলব্ধি করলুম, আমার রক্তকলঙ্কিত অতীত ইতিহাসের চাইতে সে শক্তি ঢের বড়। তাই যদি না হত তো সৃষ্টি টি ঁকে থাকতে পারত না, সমস্ত দুনিয়া ছারখার হয়ে যেত। আর তারও চাইতে বড় কথা হল যে আমি বেঁচে আছি, প্যাট্ বেঁচে আছে, সেদিনের সেই মৃত্যুর তাণ্ডব থেকে আমি কোনো রকমে ছিটকে চলে এসেছি, হাত-পাগুলো আস্ত আছে, চোখ আছে, শিরায়-শিরায় রক্ত এখনো বইছে—এ যে কি অত্যাশ্চর্য সৌভাগ্য সে আমি কেমন করে বোঝাব!

প্যাট্ আবার ডাকল, 'রব্বি।'

হাত নেড়ে আমাকে ইশারা করল।

ওর কাপড়-জামা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলুম, বললুম, 'বড্ড বেশিক্ষণ জলে ছিলে।'

ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, বলল, 'কিন্তু শরীরটা বেশ গরম হয়েছে।'

ওর ভিজে কাঁধের উপর চুমু খেয়ে বললুম, 'প্রথমেই অতটা ভালো নয়, একটু সাবধান হওয়া ভালো।'

ও হাসতে-হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উঁহু, বহুকাল সাবধানে কাটিয়েছি আর নয়।'

'তাই নাকি?'

'সত্যি তাই, বহুদিন বৃথা কেটেছে এখন একটু অসাবধান হতেই চাই।' বলেই হেসে ওর ভিজে গালটি আমার মুখের দিকে এগিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, রব্বি, আগে থেকেই বলে রাখছি কিন্তু সাবধান-টাবধান হওয়া চলবে না। কোনো রকম ভাবনা চিন্তা মনের কাছেই আসতে দেব না। সমুদ্র আর সূর্য আর ছুটি—ব্যস, এ ছাড়া আর কোনো কথাই ভাবব না।'

'বেশ, তাই হবে।' তোয়ালে হাতে নিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, এখন দাঁড়াও, তোমার ভিজে গা আমি মুছিয়ে দিই। তাই তো, তোমার গায়ের রঙটি দেখছি আগে থেকেই বাদামি হয়ে আছে, কেমন করে হল বল তো?'

গায়ে কাপড় জড়াতে-জড়াতে ও বলল, 'সেই যে অতি সাবধানে একটি বছর কাটিয়েছিলুম তখন থেকেই এমনি হয়েছে। উপরের বারান্দায় রোজ এক ঘণ্টা করে রোদে শুয়ে থাকতুম। রাত্তিরে আটটা বাজতে না বাজতে শুয়ে পড়তে হত। আরো কত নিয়ম। আজকে রাত্তির আটটায় কিন্তু আমি আর এক দফা সাঁতার কাটতে আসছি।'

বললুম, 'আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। অনেক কথাই তো আমরা ভাবি, কাজে কি আর ততখানি হয়?'

সন্ধ্যেবেলায় স্নানের কথা আর উঠলই না। গাঁয়ের দিকটাতে হেঁটে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তারপরে সিত্রয়ঁটি নিয়ে একটু বেরোলুম, কিন্তু প্যাট্‌ বলল, তার ক্লান্তি লাগছে, কাজেই শিগগির-শিগগির ফিরতে হল। বরাবর ওর এই দেখছি, হৈচৈ ফুর্তির অন্ত নেই কিন্তু পরক্ষণেই ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে। শরীরে ওর এতটুকু উদ্বৃত্ত শক্তি নেই অথচ বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। ফুর্তি যখন করবে তখন এমন প্রাণ ভরে করবে যে মনে হবে অফুরন্ত ওর যৌবন, ফুর্তির আর অন্ত নেই, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যাবে মুখের রঙ ফ্যাকাশে, চোখের নিচে কালি—একেবারে যেন নিবে গেছে। ওর ক্লান্তিটা যেন ধীরে-ধীরে আসে না—মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যেন হঠাৎ বেড়ে যেতে থাকে।

'রব্বি, চল বাড়ি ফিরে যাই,' ওর গলার স্বরে ক্লান্তির আভাস।

'বাড়ি? ফ্রাউলিন্ মুলারের ঘরকে বলছ বাড়ি? মনে নেই ওর বুকে ঝুলছে সোনার ক্রস্! বুড়ি এরই মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতে শুরু করেছে কে জানে!'

প্যাট্‌ তার ক্লান্ত মাথাটি আমার কাঁধে রেখে বলল, 'বাড়ি বই কি, ঐ আমাদের বাড়ি।'

ষ্টীয়ারিং-এ এক হাত রেখে আর এক হাতে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরলুম। সন্ধ্যার নীলচে কুয়াশার ভিতর দিয়ে গাড়িটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাটা যেখানে ক্রমে ঢালু হয়ে অনেকটা নিচে নেমে গেছে সেইখানে আমাদের ছোট্ট বাড়ির জানালায় আলো দেখা দিল। তলার ঐ অন্ধকারে বাড়িটা যেন একটা জানোয়ারের মতো গুড়িসুড়ি মেরে আরামে শুয়ে আছে। মনটা সত্যি সত্যি খুশি হয়ে উঠল, মনে হচ্ছিল অনেক দূর থেকে যেন নিজের ঘরে ফিরে আসছি।

ফ্রাউলিন্ মুলার আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষাতেই ছিল। ইতিমধ্যে সে তার কালো রঙের উলের পোশাক বদলে একটি সিল্কের পোশাক পরেছে। অবশ্য এটিরও রঙ এবং কাটছাঁট তার পিউরিটান স্বভাবেরই উপযোগী। আর ক্রসের পরিবর্তে এখন বুকে আর একটি জিনিস ধারণ করেছে তাতে একাধারে একটি হৃৎপিণ্ড, একটি নোঙর এবং ক্রসের চিহ্ন আঁকা—শাস্ত্রমতে এগুলো নাকি বিশ্বাস, আশা এবং প্রেমের প্রতীক।

বিকালের চাইতে এখন ওর কথাবার্তায় একটু বেশি আত্মীয়তার সুর লেগেছে!

রাত্তিরের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়েছে—ডিম, ঠাণ্ডা মাংস আর সেঁকা মাছ। সেটা আমাদের ঠিক পছন্দসই হবে কিনা জিগগেস করে জানতে চাইল। আমি বললুম, 'হ্যাঁ. তা ভালোই তো।'

আমার গলার স্বরে উৎসাহের অভাব দেখে বুড়ি উদ্বিগ্নভাবে বলল, 'কেন, তাজা সেঁকা ফ্লাউণ্ডার মাছ. আপনার ভালো লাগে না?'

বললুম, 'লাগে বৈকি।' কিন্তু এবারও কণ্ঠে উৎসাহের অভাব।

প্যাট্ আমার দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকাল। বলল, 'তাজা ফ্লাউণ্ডার মাছের নাম শুনেই তো আমার লোভ হচ্ছে। সমুদ্রের ধারে প্রথম দিন এসে এর চাইতে ভালো খাবার আর কি হতে পারে? আর তার সঙ্গে যদি একটু ভালো গরম চা হয় তবে তো আর কথাই থাকে না—'

'তা তো বটেই, খুব ভালো গরম চা পাবেন। দাঁড়ান সব নিয়ে আসছি।' ফ্রাউলিন্ মুলার রীতিমতো খুশি হয়ে সিল্কের পোশাকে খসখস শব্দ তুলে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যাট্ বলল, 'কি ব্যাপার, মাছ তোমার পছন্দ নয় নাকি?'

'পছন্দ বলে পছন্দ? তার উপরে আবার ফ্লাউণ্ডার। কদ্দিন থেকে স্বপ্ন দেখছি!'

'তবে ওরকম করলে কেন? বেচারির সঙ্গে ভারি রূঢ় ব্যবহার করেছ।'

'করব না? ও বিকেল বেলায় আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিল, তার শোধ তুলব না?'

প্যাট্ হেসে উঠল। 'বাবাঃ, তুমি দেখছি কাউকে রেহাই দিতে জানো না। আমি তো সে সব কখন ভুলে গিয়েছি।'

'আমি বাপু ভুলিনি। অত সহজে আমি ভুলবার পাত্র নই।'

'না, না, ভুলে যাওয়াই ভালো।'

ইতিমধ্যে ঝি ট্রে-সমেত সব নিয়ে এল। ফ্লাউণ্ডার মাছগুলোর চমৎকার হলদে রঙ—আর সমুদ্র ও ধোঁয়ার একটা অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ। তার উপরে আবার তাজা চিংড়ি। খুশি হয়ে বললুম, 'নাঃ রাগটা ভুলতে হল দেখছি। তা ছাড়া খিদেটাও পেয়েছে জবর!'

'খিদে আমারও পেয়েছে, কিন্তু আগে আমাকে একটু গরম চা দাও তো! কেন জানিনে বড় শীত করছে অথচ বাইরে তো দিব্যি গরম!'

ওর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখের রঙ একেবারে ফ্যাকাশে। তবু হাসবার চেষ্টা করছে। তামাশা করে বললুম, 'অতক্ষণ ধরে যে চান করছিলে আমি কিন্তু সে

বিষয়ে কিছু বলছিনে।' ঝিকে ডেকে জিগগেস করলুম, 'তোমাদের এখানে রাম্ ট্যম্ কিছু আছে?'
'অ্যাঁ, কী বললেন?'
'রাম্—ঐ যে বোতলে থাকে।'
'রাম্?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'
'আজ্ঞে না, নেই।'
খানিকক্ষণ ও চ্যাপ্টা মুখে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে আবার বলল, 'না, ওসব নেই।'
আমি বললুম, 'বেশ, বেশ। তা, দরকার নেই। আচ্ছা তুমি যাও।'
ও চলে গেলে প্যাট্‌কে বললুম, 'প্যাট্, ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের বন্ধুদের কিন্তু কিঞ্চিত দূরদৃষ্টি আছে। সকাল বেলায় ঠিক রওনা হবার আগে লেন্‌ত্‌স ছুটে এসে বেশ ভারি রকমের একটা পুঁটলি গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেটা একবার খুলে দেখলে হত?'
গাড়ি থেকে পুঁটলিটা বের করে আনলুম। খুলে দেখি ভিতরে দু-বোতল রাম্, এক বোতল কোনিয়াক্ আর এক বোতল পোর্ট। বোতলগুলো তুলে ধরে বললুম, 'তোফা সেন্ট্ জেম্‌স্ রাম্! আর বলছিলুম না, এমন বন্ধু থাকতে আবার চিন্তা!'
একটি বোতল খুলে খানিকটা প্যাট্-এর চায়ে ঢেলে দিলুম। দেখি ওর হাত রীতিমতো কাঁপছে। 'ও কি, তোমার অতই শীত করছে নাকি?'
'ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে। রাম্‌টা চমৎকার। কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে।'
আমি বললুম, 'এক্ষুনি বিছানায় গিয়ে বসো। দাঁড়াও আমি টেবিলটা ঠেলে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে বসেই খাওয়া যাবে।'
প্যাট্ রাজী হল। আমার বিছানা থেকে আর একখানা কম্বল এনে ওর গায়ে চাপিয়ে দিলুম। প্যাট্‌কে বললুম, 'চাও তো গরম জলের সঙ্গে পানীয় মিশিয়ে তোমার জন্য একটু গ্রগ্ করে দিতে পারি। এই দু-মিনিটে করে দেব, দেখবে খেলেই শরীর চাঙা হয়ে উঠবে।'
ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, দরকার নেই, আমার এরই মধ্যে অনেকটা ভালো লাগছে।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সত্যি একটু ভালো দেখাচ্ছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটি আগের চাইতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, ঠোঁট দুটি লাল এবং মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। বললুম, 'আশ্চর্য তো এত শিগগির সামলে উঠবে মোটেই ভাবিনি। এটাও নিশ্চয় রাম্-এর দৌলতে।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'বিছানার দৌলতেও বটে। আমি দেখেছি বিছানায় এসে শুলেই আমি সুস্থ বোধ করি। শয্যাটা আমার মস্ত বড় এক আশ্রয়।'

'অবাক করলে। সন্ধ্যেবেলায় বিছানায় শুয়ে থাকতে হলে তো আমি পাগল হয়ে যেতুম—অর্থাৎ যদি একলা শুয়ে থাকতে হত।'

ও হেসে ফেলল, বলল, 'মেয়েদের কথা আলাদা।'

'হোক না আলাদা, তুমি তো আর মেয়ে নও।'

'মেয়ে নই ? আমি তবে কি ?'

'তুমি কী সেটা ঠিক বলতে পারছিনে, তবে মেয়ে নও। আর পাঁচজন মেয়ের মতো যদি হতে তবে কি তোমাকে ভালোবাসতে পারতুম ?'

কয়েক মুহূর্তে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, 'তুমি সত্যি কাউকে ভালোবাসতে পার ?'

রেগে বললুম, 'বেশ, খুব হয়েছে, খেতে বসে অমন প্রশ্ন করলেই হয়েছে আর কি! এ রকম আরো কিছু প্রশ্ন তোমার আছে নাকি ?'

'থাকা তো সম্ভব। কিন্তু যে প্রশ্নটা করেছি আগে সেটারই জবাব দাও না, দেখি।'

নিজের জন্য এক গ্লাশ রাম্ ঢেলে নিলুম। 'আগে তোমার স্বাস্থ্য পান করা যাক। তা, তুমি যা বলেছ হয়তো সে কথাই ঠিক। আগেকার লোকে যেমন করে ভালোবাসতো আজকাল আমরা বোধহয় সে রকম ভালোবাসতে জানিইনে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। একই জিনিসের রকমফের। ভালোবাসার ব্যাপারটাকে আমরা ও ভাবে আর দেখিই না।'

দরজায় একবার টোকা মেরে ফ্রাউলিন্ মুলার এসে ঘরে ঢুকল। হাতে একটি ছোট্ট কাঁচের জগ্ তাতে অতি সামান্য একটু পানীয় জাতীয় পদার্থ, বলল, 'আপনি চেয়েছিলেন তাই রাম্ নিয়ে এলুম।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।' আমার উপরে উনি হঠাৎ এতটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন দেখে খুব অবাক হলুম। 'আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা আগেই ব্যবস্থা করে নিয়েছি।'

এদিকে টেবিলের উপরে এক সারে চার-চারটি বোতল দেখে বুড়ির তো চক্ষু স্থির! 'বাপরে বাপ্, এতটাই আপনার বরাদ্দ নাকি?'
নেহাত ভালোমানুষের মতো বললুম, 'না, না, এই শুধু একটু ওষুধের মাত্রায় খাওয়া। ডাক্তার বলে দিয়েছেন কিনা—আমার আবার অতিরিক্ত শুকনো লিভার। সেইজন্য এই ব্যবস্থা। আর ফ্রাউলিন্ মুলার—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—' পোর্টের বোতলটি খুলে বললুম, 'আসুন আপনার স্বাস্থ্য পান করা যাক। আপনার বাড়ি নতুন-নতুন অতিথিতে ভরে উঠুক।'
'ধন্যবাদ,' কায়দামাফিক অভিবাদন করে গ্লাশটি তুলে নিল। তারপরে পাখির মতো ঠোঁট দিয়ে একটু-একটু করে খেতে লাগল! হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খেতে বেশ, তবে একটু বেশি কড়া।'
খেতে না খেতে বুড়ির চেহারার এমন পরিবর্তন হল আমি দেখে অবাক! গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ উৎসাহে অনবরত বকে যেতে লাগল। অবিশ্যি সে সব কথায় আমাদের কোনো আগ্রহ থাকবার কথাই নয়! কিন্তু প্যাট্ দেখলুম পরম ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে বুড়ি আমার দিকে ফিরে বলল, 'হের্ কোষ্টার তাহলে ভালোই আছেন?'
মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'
ফ্রাউলিন্ মুলার বলল, 'উনি এত চুপচাপ থাকতেন। কোনো কোনো দিন সারাদিন একটা কথাও বলতেন না। এখনো ঐ রকমই আছেন নাকি?'
'তা, এখন মাঝে-মাঝে কথা বলেন বৈকি।'
'প্রায় বছরখানেক এখানে ছিলেন। একেবারে একা—'
বললুম, 'হ্যাঁ, ওরকম অবস্থায় লোকে এমনিতেই কম কথা বলে।'
ফ্রাউলিন্ মুলার খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। হঠাৎ প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকি আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'
প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, একটু ক্লান্ত বৈকি।'
আমি বললুম, 'একটু নয়, রীতিমতো।'
ফ্রাউলিন মুলার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'ওঃ, তাহলে তো আমাকে উঠতে হয়। আচ্ছা গুড্ নাইট্। রাত্তিরটা ভালো করে ঘুমোন।'
যাবার ইচ্ছে ছিল না, নেহাত অনিচ্ছায় ওকে উঠতে হল।
আমি প্যাট্কে বললুম, 'আহা ওর আর একটু বসবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমাদের সঙ্গে অত আত্মীয়তা করতে এল কেন বল তো?'

'আহা বেচারী, কি করবে বল। সঙ্গী নেই, সাথী নেই—দিনের পর দিন রাতের পর রাত একা-একা কাটিয়ে দেয়।'

'হ্যাঁ, সেটা একটা কথা বটে। কিন্তু যাই বল, এবারে ওর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছি।'

প্যাট্ খুশি হয়ে বলল, 'তা করেছ বৈকি। আচ্ছা এখন একটু দরজাটা খুলে দাও তো।'

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম। বাইরেটা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক ফালি জ্যোৎস্না স্নমুখের রাস্তাটির উপরে পড়েছে, দরজা খুলতেই খানিকটা এসে ঘরের ভিতরে পড়ল। আর স্নমুখের বাগানটা রাতে ফোটা ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে ছিল, যেই না দরজা খোলা এক মুহূর্তে ঘরের হাওয়াটা গোলাপ আর আরো নানারকম অজানা ফুলের গন্ধে একেবারে মেতে উঠল।

বাইরের দিকে দেখিয়ে বললুম, 'শুধু একবার তাকিয়ে দেখ ফুটফুটে চাঁদের আলোতে বাগানের সমস্ত পথটা আলোকিত হয়ে গেছে। দুধারে ফুলের গাছ, পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে রুপোলী ঝালরের মতো আর দিনের আলোয় যে সব ফুল মাথা উঁচিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়েছিল এখন চাঁদের আলোয় তাদের দেখাচ্ছে অতিশয় ম্লান ও কোমল। রাত্রি ও জ্যোৎস্না যদিও তাদের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য হরণ করেছে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢেলে দিয়েছে অপর্যাপ্ত সৌগন্ধ।'

মুখ ফিরিয়ে প্যাট্-এর দিকে তাকালুম। ধবধবে শাদা বালিশের উপরে মাথাটি রেখে ও শুয়ে আছে। কালো-চুলে-ঘেরা ওর মুখখানা যেমন কোমল তেমনি করুণ। ওর ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ দেহের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর ফুলের কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। গোধূলির ম্লান আলো আর জ্যোৎস্নাসিক্ত ফুলের মতোই ও রহস্যময়ী।

ও একবার একটু উঠে বসল। বলল, 'বব্, আমার সত্যি বড় ক্লান্তি লাগছে। কিছু অসুখ-বিসুখ করবে না তো?'

ওর পাশে এসে বললুম, 'না, না, কিচ্ছু না। চুপটি করে ঘুমোও দেখি।'

'কিন্তু তুমি তো এখন শোবে না?'

'আমি একবার সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসব।'

'আচ্ছা,' বলে ও আবার শুয়ে পড়ল। আমি আরো খানিকক্ষণ ওর পাশে বসে রইলুম! ঘুমে ওর দু-চোখ জড়িয়ে এসেছে, ঘুম-জড়ানো স্বরে বলল, 'দরজাটা সারারাত খুলেই রেখ, তাহলে মনে হবে বাগানে শুয়ে ঘুমুচ্ছি।'

ও যখন বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আস্তে-আস্তে উঠে বাগানে চলে এলুম। কাঠের বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরালুম। ওখান থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। চেয়ারের পিঠে ঝুলছে প্যাট্-এর স্নানের গাউন, এ ছাড়া আরো ওর জামা-কাপড়, অধোবাস চেয়ারের উপরে ছুঁড়ে ফেলে রেখেছে। চেয়ারের সুমুখে মেঝেতে রয়েছে ওর জুতো জোড়া, একটি পাটি উল্টে পড়ে আছে। হঠাৎ মনের মধ্যে এমন একটি ঘরোয়া ভাব এসেছে কি বলব। এতদিনে একজন মানুষ পাওয়া গেছে নিতান্ত আপন জনের মতো যে কাছে রয়েছে, কাছে থাকবে। বেশি কিছু না, এক পা হেঁটে গেলেই ওর কাছে গিয়ে বসতে পারি, ওর কাছে থাকতে পারি—শুধু এক-আধ-দিনের জন্য নয়, বহু-বহুদিন ধরে, হয়তো বা—ঐ আবার হয়তো বা—সব সময়ে ঐ একটা কথা হয়তো—এর থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। জীবনে কোথাও আর নিশ্চয়তা খুঁজে পেলুম না—না মানুষের জীবনে, না সংসারযাত্রায়।

হাঁটতে-হাঁটতে সমুদ্রের ধারটাতে এসে পেঁছলুম। সেখানে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ আর ঢেউয়ের গর্জন—বহুদূরাগত কামান্-গর্জনের মতো কানে এসে লাগছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমুদ্রের ধারে বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখছিলুম। প্যাট্ সঙ্গে আসেনি। আজ সারাদিন ওর শরীরটা ভালো নেই।

অন্ধকার হয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হব ভাবছি, এমন সময় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি বাড়ির ঝি আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। হাত দিয়ে ইশারা করছে আর চেঁচিয়ে কি যেন বলছে। এদিকে বাতাসের শব্দ আর ঢেউয়ের গর্জন মিলে কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে, ওর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে বললুম যেখানাটায় আছে ওখানেই দাঁড়াতে, আমি এলুম বলে। কিন্তু ও থামল না, আমার দিকে ছুটে এগোচ্ছে আর দু-হাত মুখের কাছে নিয়ে চেঁচাচ্ছে।

দুটো কথা মাত্র কানে গেল—'শিগগির···আপনার স্ত্রী···'

আমি তখন দৌড়চ্ছি, 'এ্যাঁঃ, কি হয়েছে?'

ও বিষম হাঁপাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না—'তাড়াতাড়ি করুন···আপনার স্ত্রী··· অ্যাকসিডেণ্ট ··'

বালির রাস্তা পার হয়ে বনের ভিতর দিয়ে আমি প্রাণপণে ছুটলুম। বাগানের কাঠের গেট্‌টা জাম্ ধরে আটকে আছে। একলাফে সেটা পার হয়ে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। প্যাট্ শুয়ে আছে, রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে, হাত দুটো শক্ত মুঠি করা, মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ফ্রাউলিন্ মুলার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—এক হাতে কতগুলো কাপড়ের টুকরো আর এক হাতে জলের গামলা। ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিয়ে বললুম, 'কী, ব্যাপার কী? কী হয়েছে?'

ও কি যেন বলল, আমার কানেই গেল না। চেঁচিয়ে বললুম, 'যান কিছু ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসুন তো, লেগেছে কোথায় দেখি?'

ফ্রাউলিন্ মুলার-এর ঠোঁট কাঁপছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথাও লাগেনি তো···রক্তবমি হচ্ছে।'
মনে হল কে যেন হাতুড়ি দিয়ে আমার মাথায় মারল। 'রক্তবমি ?' জলের গামলাটা ওর হাত থেকে টেনে বললুম, 'বরফ নিয়ে আসুন, বরফ, শিগগির।' তোয়ালেটা গামলায় ডুবিয়ে নিয়ে প্যাটের বুকে রাখলুম। ফ্রাউলিন্ মুলার বলল, 'বরফ তো বাড়িতে নেই।'
আমি ক্ষিপ্তের মতো ফিরে তাকালুম, বেচারি ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল।
'আমার মাথা আর মুণ্ডু, বরফ চাই যে। কাছে কোন রেস্তরাঁ আছে, সেখানে পাঠান। আর এক্ষুনি ডাক্তারকে টেলিফোন করে দিন।'
'আমাদের তো টেলিফোন নেই—'
'উঃ, আর পারিনে, কাছে কোথায় টেলিফোন আছে বলুন।'
'মাসম্যান্-এর ওখানে আছে।'
'তবে ওখানেই যান, ছুটে যান, কাছে যে ডাক্তার তাকেই ফোন্ করুন।'
ও কিছু বলবার আগেই ওকে ধাক্কিয়ে বের করে দিলুম, 'খুব জলদি চাই কিন্তু, এখান থেকে কদ্দুর হবে ?'
'এই মিনিট তিনেকের রাস্তা,' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।
ওকে ডেকে বললুম, 'কিছু বরফ সঙ্গে আনবেন।'
ও মাথা নাড়তে-নাড়তে ছুটতে লাগল।
গামলায় করে আরো জল এনে তোয়ালেটা আবার ভিজিয়ে দিলুম। প্যাট্‌কে নেড়ে শোয়াতে আমার সাহস হল না। শোয়ানোটা ঠিক ভাবে হয়েছে কিনা কে জানে। নিজের উপরেই রাগ হল। ঠিক যে জিনিসটা জানা উচিত ছিল সেইটেই জানিনে। মাথার তলায় বালিশ দেব কি দেব না বুঝে উঠতে পারলুম না।
হঠাৎ একটা বিষম খেয়ে ওর দম আটকে এল। নিজেই মাথাটা একটু উপর দিকে তুলল, আর সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আবার দম আটকে এল, খক্‌খক্ কাশি, তারপরে মুখে আর এক ঝলক রক্ত। ওর কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ওকে শক্ত করে ধরলুম। সমস্ত শরীরটা যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে—কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। অনেকক্ষণ পরে কাঁপুনি থেমে অবসন্ন শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়ল।
ফ্রউলিন্ মুলার এসে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন

কোনো প্রেতাত্মার দৃষ্টি। জিগগেস করলুম, 'কী খবর, এখন কী করতে হবে?' ওর গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ডাক্তার এক্ষুনি আসবেন। বরফটা ওঁর বুকে দিন···আর পারে যদি···দু-এক টুকরো মুখে···'

'ওকে বসাব না শুইয়ে রাখব? কি মুশকিল রে, একটু তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারেন না?'

'যেমন আছে তেমনি থাক, শুইয়েই রাখুন—ডাক্তার তো এক্ষুনি আসছেন।'

বরফগুলো টুকরো-টুকরো করে নিয়ে প্যাট্-এর বুকে চাপা দিয়ে রাখলুম। এতক্ষণে একটা কিছু করবার মতো পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ করছি। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওর যন্ত্রণাকাতর রক্ত-মাখা ঠোঁট দুটির দিকে।

ঐ যে সাইকেলের শব্দ শোনা যাচ্চে। হ্যাঁ, ডাক্তার এসেছেন। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললুম, 'কী করতে হবে বলুন।' ডাক্তার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তার বাক্স খুলতে লাগল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমি ডাক্তারকেই শুধু দেখছি। ভদ্রলোক প্যাট্-এর বুকের হাড়গুলি একবার দেখে নিল। প্যাট্ যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

ডাক্তারকে জিগগেস করলুম, 'খুব ভয়ের কারণ আছে নাকি?'

ডাক্তার বলল, 'আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা হচ্ছিল কোথায়?'

থতমত খেয়ে বললুম, 'অ্যাঁঃ, কী বললেন—চিকিৎসা?'

লোকটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিল?'

'সে তো আমি জানিনে, আমি এর কিছুই জানতুম না, আমার এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

ডাক্তার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। 'জানতেন না, বলছেন কী?'

'সত্যি জানতুম না, ও আমাকে আগে কিচ্ছু বলেনি।'

প্যাট্-এর মুখের কাছে ঝুঁকে ডাক্তার নিজেই ওকে জিগগেস করল। প্যাট্ জবাব দেবার চেষ্টা করল, কিছু বলতে পারল না। আবার কাশি শুরু হল, তার সঙ্গে রক্ত। নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য ও আকুলি-বিকুলি করছে। ডাক্তার ওকে ধরে আছে। অনেকক্ষণ পরে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে অতি কষ্টে বলল, 'জাফে।'

ডাক্তার বলল, 'অ্যাঁঃ, ফিলিক্স জাফে? প্রফেসর ফিলিক্স জাফে?' প্যাট্ চোখের ইঙ্গিতে জানাল, হ্যাঁ, তাই। ডাক্তার আমার দিকে ফিরে বলল, 'তাঁকে একবার টেলিফোন করে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, এক্ষুনি। নামটা কি বললেন, জাফে?'

'হ্যাঁ, ফিলিক্স জাফে। এক্সচেঞ্জকে জিগগেস করে ওঁর নম্বরটা জেনে নেবেন।'

ডাক্তারকে জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা, ও সেরে উঠবে তো ?'
ডাক্তার বলল, 'আপাতত রক্তবমিটা তো বন্ধ করতে হবে।'
আর বিলম্ব না করে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। ঝি বেচারীকে হ্যাঁচকা টান মেরে বললুম, 'শিগগির দেখিয়ে দাও টেলিফোনওয়ালা বাড়িটা।' ও দেখিয়ে দিতেই ছুটলুম প্রাণপণে। গিয়ে দেখি একদল লোক ওখানটায় বসে কফি আর বিয়ার খাচ্ছে। লোকগুলোর দিকে এক নজরে একটু তাকিয়ে দেখলুম। ভারি অদ্ভুত লাগল—প্যাট্ ওখানে রক্তবমি করে মরছে আর এই লোকগুলো এখানে নিশ্চিন্তে বসে বিয়ার খাচ্ছে! টেলিফোনে জরুরি কল্ পাঠিয়ে বসে অপেক্ষা করছি। অন্ধকার, চারদিকের একটা অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে এসে লাগছে। পরদার ফাঁকে পাশের ঘরের চিলতে একটু অংশ দেখা যায়। একটি টাক-পড়া মাথা একবার এদিক একবার ওদিক ঈষৎ দুলছে, দেখতে পাচ্ছি। কালো সিল্কের একটি লেস্-দেওয়া জামা ঝুলছে, তাতে একটি ব্রোচ লাগানো। প্যাঁস্‌নে-পরা একটি মুখের কিয়দংশ—মোটা-মোটা শিরা বেরকরা মজবুত হাড়ওয়ালা একটি হাত টেবিলের উপরে তাল ঠুকছে। অবিশ্যি লুকিয়ে দেখবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না, টুকরো-টাক্‌রা দৃশ্যগুলো আপনি চোখে পড়ে গেল। আলো যেমন আপনা থেকেই চোখে এসে লাগে এও তেমনি।
যাক, এতক্ষণে টেলিফোন কথা বলে উঠল। প্রফেসরের কথা জিগগেস করলুম। নার্স জবাব দিল, 'দুঃখিত, প্রফেসর জাফে বেরিয়ে গেছেন।' আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। পরক্ষণেই আবার হাতুড়ির ঘায়ের মতো বুক ধড়ফড়-ধড়ফড় করতে লাগল। 'কোথায় গেছেন তিনি ? ওঁর সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার।'
'কোথায় গেছেন তা তো জানিনে। হয়তো বা ক্লিনিকে যেতে পারেন।'
'দয়া করে একবার ক্লিনিকে ফোন করে খোঁজ নিন না। আমি অপেক্ষা করছি—আপনাদের আলাদা আর একটা টেলিফোন নিশ্চয় আছে।'
'আচ্ছা তবে এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে লাফিয়ে উঠলুম। দেখি আমার পাশেই ঢাকনা-দেওয়া একটা খাঁচাতে একটা ক্যানারি পাখি। সেটাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওদিকে টেলিফোনে আবার নার্সের গলা পাওয়া গেল, 'প্রফেসর জাফে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেছেন।'
'কোথায় গেলেন ?'

'সে তো বলতে পারছিনে।'
নাঃ, বৃথা চেষ্টা, হতাশ হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলুম।
'হ্যালো,' নার্স বলছে, 'আপনি শুনছেন তো ?'
'হ্যাঁ, শুনুন, উনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন ?'
'তার কিচ্ছু ঠিক নেই।'
'বলেন কি, বেরোবার আগে উনি বলে যান না কখন ফিরবেন ? হঠাৎ কিছু ঘটলে আপনারা ওঁকে খবর দেন কেমন করে ?'
'ক্লিনিকে আর একজন ডাক্তার আছেন।'
'আচ্ছা তাহলে···নাঃ, ওতে কিচ্ছু ফল হবে না, উনি ঠিক বুঝবেন না···"
ক্লান্তিতে আমার শরীর মন অবসন্ন হয়ে এসেছে। নার্সকে বললুম, 'আচ্ছা, এক কাজ করবেন—প্রফেসর জাফে ফিরে এলেই ওঁকে একবার এখানে রিং করতে বলবেন।' নার্সকে নম্বরটা বলে দিলুম। 'দেখবেন, খুব জরুরী কিন্তু—একজনের বাঁচা-মরা নিয়ে কথা।'
'ঠিক আছে, আমি ভুলব না।'
ওখানটাতেই একলা দাঁড়িয়ে আছি, বিয়ার পিনেওয়ালা লোকগুলো, টাক-মাথা, পাশের ঘরের ব্রোচ সমস্তই বহু-বহু দূরের জিনিস বলে মনে হচ্ছে। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। আর তো কিছু করবার নেই ; শুধু এদের কাউকে বলে যাওয়া টেলিফোন কল্ এলে আমাকে যেন ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন জানিনে টেলিফোনটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। হাতে পাওয়া লাইফ-বেল্ট ছেড়ে দিতে মনের যেমন অবস্থা হয় এও তেমনি। তাই তো, ঠিক মনে পড়েছে। আবার রিসিভারটা তুলে নিয়ে কোষ্টারের নম্বর বললুম। ও নিশ্চয় কারখানায় আছে, না থেকেই পারে না।
হ্যাঁ, ঐ তো কোষ্টারের শান্ত গম্ভীর গলা। আমারও উদ্বেগ উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল, ধীর স্থির ভাবে সব কথা ওকে খুলে বললুম। বেশ বুঝতে পারছি ও সব নোট করে নিচ্ছে। বলল, 'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ওঁর খোঁজে। পরে রিং করব। কিচ্ছু ভেব না, আমি যেমন করে পারি খুঁজে বের করবই।'
ব্যস্, কি যেন এক মোহমন্ত্রে ক্ষণিকের জন্য বিশ্বসংসার থমকে দাঁড়িয়েছিল, সে মোহজাল ছিঁড়ে গেছে। ছুটলুম এবার বাড়ির দিকে।
ডাক্তার জিগগেস করল, 'কেমন, পেলেন ওঁকে ?'
'না, কিন্তু কোষ্টারকে পেয়েছি।'

'কোষ্টার? কই তাঁর নাম তো কখনো শুনিনি। কি বললেন তিনি? তাঁর চিকিৎসাটা কি?'

'চিকিৎসা? না, না, সে চিকিৎসা-টিকিৎসা করে না। বলেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে।'

'কাকে?'

'কেন জাফেকে।'

'হা ভগবান, আপনি কী বলছেন…ঐ কোষ্টারটি তাহলে কে?'

'ওঃ তাই তো…মাপ করবেন…কোষ্টার হচ্ছে আমার বন্ধু। ও গেছে প্রফেসর জাফের খোঁজে। তাঁকে টেলিফোনে পেলুম না কিনা।'

ডাক্তার প্যাট্-এর দিকে ফিরে বসে বলল, 'তবে তো বড় মুশকিল হল।'

বললুম, 'কোষ্টার ঠিক তাঁকে খুঁজে বের করবে। ডাক্তার নিজে যদি মরে না গিয়ে থাকেন তবে সে তাঁকে বের করে তবে ছাড়বে।'

ডাক্তার আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল—নিশ্চয় ভাবছে লোকটা পাগল নয় তো?

ঘরের আলোটাও যেন মুখ গোমড়া করে আছে। ডাক্তারকে জিগগেস করলুম কিছু করবার আছে কিনা। ডাক্তার মাথা নেড়ে নিষেধ করল। জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে একবার তাকালুম। প্যাট্ আবার কাশতে শুরু করেছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালুম। চোখ রয়েছে রাস্তার দিকে।

হঠাৎ শুনলুম, কে চেঁচিয়ে বলছে, 'টেলিফোন।'

ডাক্তারকে বললুম, 'টেলিফোন এসেছে আমি যাই।'

ডাক্তার লাফিয়ে উঠে বলল, 'না আমিই যাচ্ছি, আপনার চাইতে আমিই ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারব। আপনি ততক্ষণ এখানটায় বসুন কিচ্ছু করতে হবে না। আমি এই এলুম বলে।'

বিছানার একধারে প্যাট্-এর পাশটিতে বসলুম। আস্তে-আস্তে বললুম, 'প্যাট্, আমরা তো রয়েছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু তোমার ভয় নেই, কিচ্ছুটি না। প্রফেসর টেলিফোনে কথা বলছেন। কি করা না করা সব তিনি বাতলে দেবেন। আর কালকে তিনি নিজেই এসে পড়বেন, সে সব আমরা ঠিক করে ফেলেছি। উনি এলে দুদিনে তুমি সেরে উঠবে। তোমার এমন অসুখ আমাকে আগে বলনি কেন? তা হোক, এক-আধটু রক্ত গেলে কিচ্ছু হয় না প্যাট্। ঐটুকু

রক্ত ফিরে আসতে কদিন লাগে? কোষ্টার প্রফেসরকে খুঁজে বের করেছে, বুঝলে প্যাট্, আর কোনো ভয় নেই।'

ডাক্তার ফিরে এল, বলল, 'প্রফেসর টেলিফোন করেননি। করেছিলেন আপনার এক বন্ধু—লেন্‌ত্‌স।'

'তাহলে কোষ্টার ওঁকে খুঁজে পায়নি!'

'পেয়েছেন বৈকি। জাফে তাঁকে কি করতে হবে না হবে সব বলে দিয়েছেন। আপনার বন্ধু লেন্‌ত্‌স তিনি সবই আমাকে বললেন। সব কথা বেশ স্পষ্ট হুবহু বলে গেলেন। আচ্ছা, উনি ডাক্তার নাকি?'

'না। তবে ডাক্তার হবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোষ্টারের কথা কিচ্ছু বলল না?'

ডাক্তার এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, লেন্‌ত্‌স আপনাকে বলতে বললেন—কোষ্টার এই কয়েক মিনিট আগে প্রফেসরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, দু-ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে।'

বিছানায় হেলান দিয়ে বসলুম, মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে এল, 'অটো!'

ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ, ঐ একটি কথাই ভুল বলেছে। রাস্তাটা আমার জানা কিনা। খুব তাড়াতাড়ি এলেও তিন ঘণ্টা লাগবে। যাকৃগে—'

আমি বললুম, 'দু-ঘণ্টা যদি বলে থাকে তো ঠিক দু-ঘণ্টাতেই এসে পৌছবে।'

'অসম্ভব। রাস্তাটা ভীষণ এঁকে-বেঁকে এসেছে, বাঁক ঘুরতে-ঘুরতেই—তাছাড়া যা অন্ধকার।'

'আচ্ছা দেখুন কি হয়।'

'যাকৃগে, আসতে যদি পারেন—আর উনি যে আসছেন সেইটেই মস্ত কথা।'

আমার ধৈর্যে আর বাঁধ মানছে না। মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। বাইরে খুব কুয়াশা হয়েছে। দূরে সমুদ্রের গর্জন। কুয়াশায় ভেজা গাছ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখলুম। হঠাৎ মনে হল আর তো আমি একলা নই। ঐ দূর দিগন্তে কোথাও একটা এঞ্জিন শোঁ-শোঁ শব্দে এগিয়ে আসছে। কত দূরান্তের পথ অতিক্রম করে কুয়াশার আবছা ভেদ করে, আসছে আমার বিপদের সহায়, আমার বিপদের বন্ধু—হেডলাইটের ঘোলাটে আলো, টায়ারের হিস্‌হিস্ শব্দ আর দুই বজ্র মুষ্টিতে ষ্টীয়ারিং হুইলটি ধরা, চোখের দৃষ্টি সুমুখের অন্ধকারে প্রসারিত ধীর স্থির শান্ত—কার সেই চোখ? আমার বন্ধুর, আমার জীবন-সাথীর…

পরে জাফের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছিলুম। আমার টেলিফোন পাওয়ামাত্র কোষ্টার লেন্‌ত্‌সকে রিং করেছিল তক্ষুনি তৈরি হয়ে নিতে! কারখানা থেকে কার্লকে বের করে লেন্‌ত্‌সকে নিয়ে ছুটেছে জাফের ক্লিনিকে। নার্স বলল, 'প্রফেসর বোধকরি সান্ধ্যভোজনে গেছেন।' কোথায়-কোথায় যেতে পারেন তারই কয়েকটা আস্তানার ঠিকানা নিয়ে কোষ্টার তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় সকল রকম ট্রাফিকের রীতি লঙ্ঘন করে ও ছুটেছে, পুলিসের হুমকি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গাড়ি নয় তো ঠিক যেন একটি বুনো ঘোড়া। তিন জায়গায় ঢুঁ মারবার পরে চতুর্থ এক রেস্তঁরায় প্রফেসরকে পাওয়া গেল। রোগীকে চিনতে প্রফেসরের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না: পুরোপুরি খানা শেষ না করেই উঠে পড়লেন। ওঁর বাড়ি গিয়ে দরকারী জিনিসপত্তর নেওয়া হল। এই সময়টুকু শুধু কোষ্টার একটু হুঁস করে গাড়ি চালিয়েছিল, নইলে ডাক্তার পাছে গোড়াতেই ভড়কে যান। বাড়ি যাবার পথে জাফে জিগগেস করেছিলেন প্যাট্ কোথায় আছে। কোষ্টার ইচ্ছে করেই মাইল চল্লিশ দূরে একটা জায়গার নাম করেছিল! প্রফেসরকে একবার জিনিসপত্তর সমেত গাড়িতে তুলতে পারলে হয়, তারপরে যা করবার সে করবে। জিনিস গোছাতে-গোছাতে জাফে টেলিফোনে কী-কী ব্যবস্থার কথা বলতে হবে লেন্‌ত্‌সকে তাই এক-এক দফা করে বুঝিয়ে বললেন। তারপরে কোষ্টার সমেত গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

কোষ্টার বলল, 'আপনার কি মনে হয়, খুব সাংঘাতিক কিছু?'

জাফে বললেন, 'সাংঘাতিক বৈকি।'

ব্যস্, পর মুহূর্তেই কার্ল এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তার বুকে। একটা শাদা প্রেতমূর্তি যেন রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। এমন কি শর্ট কাট্ করবার জন্য কোষ্টার শহরের নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। ট্রাফিকমুখর রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে প্রাণটা যাবার যোগাড়। একটা প্রকাণ্ড বাসের ঠিক একেবারে নাকের তলা দিয়ে কোষ্টার শাঁ করে বেরিয়ে গেল। প্রফেসর ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাগল হলেন নাকি, মশাই। আস্তে চালান, আস্তে চালান, রাস্তায় একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট করে কী লাভ হবে?'

'আপনার ভয় নেই, অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না।'

'হবে না কি মশাই? হল বলে। এভাবে গাড়ি চালালে দু-মিনিটের মধ্যে একটা কিছু হবে।'

একটা ইলেকট্রিক ট্রামকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে কোষ্টার বলল,

'কিচ্ছু হবে না, দেখে নিন।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে নিরাপদে ওখানে গিয়ে পৌছনো আমার নিজের গরজ, কাজেই ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'কিন্তু এ ভাবে রেস্ দেবার মানে কী? বড় জোর কয়েক মিনিট আগে গিয়ে পৌছবেন, এই তো?'

একটা লরিকে প্রায় গা ঘেঁষে কাটিয়ে দিয়ে কোষ্টার বলল, 'উহুঁ, আমাদের এখনো দুশো চল্লিশ কিলোমিটার আন্দাজ যেতে হবে।'

'অ্যাঁ, কি বললেন?'

'হ্যাঁ, দুশো…' গাড়িটা একটা মেল-ভ্যান আর একটা মোটর বাস্-এর মাঝখান দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল, 'আপনাকে ইচ্ছে করেই আগে বলিনি।'

'বললে কিছু দোষ হত না। কারণ একবার কাজ হাতে নিলে আমি মাইলের হিসেব করি না। তা এক কাজ করুন, রেল ইষ্টিশানে চলুন। ট্রেনে এর চাইতে তাড়াতাড়ি পৌছনো যাবে।'

কোষ্টার ততক্ষণে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে এসে পৌচেছে। বলল, 'না, সে খবর আমি আগেই নিয়েছি। ট্রেন ছাড়তে এখনো ঢের দেরি'—বলে জাফের দিকে এক নজর তাকাল। ডাক্তার ওর মুখ দেখে কী বুঝল কে জানে। জিগগেস করলেন, 'মেয়েটির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি বলুন তো, আপনার প্রণয়িনী নাকি?'

কোষ্টার মুখে কোনো জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়ল। শহর ছাড়িয়ে ও এখন খোলা রাস্তায় এসে পড়েছে। গাড়ি ছুটিয়েছে বায়ুবেগে। ডাক্তার উইণ্ড্ স্ক্রিন্-এর পিছনে গুড়িসুড়ি মেরে এক কোণে বসে আছেন। কোষ্টার নিঃশব্দে চামড়ার হেলমেটটি ওঁর দিকে এগিয়ে দিল।

গাড়ির হর্ন অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে। পথে কোনো গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়লে বাধ্য হয়ে গাড়ির গতিটা কিঞ্চিত শিথিল করতে হয়। এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত গ্রাম প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, আর হেডলাইটের আলোতে দুধারে ছোট-ছোট বাড়িগুলো অন্ধকারের মাঝখানে প্রেতমূর্তির মতো হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, পরমুহূর্তে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

টায়ারগুলো হিংস্র জানোয়ারের মতো ক্যাঁচ্ ম্যাঁচ হিস্‌হিস্ শব্দ করছে, এঞ্জিনটা তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চলেছে। আর কোষ্টার হুইল ধরে বসে আছে সুমুখের পানে একাগ্র দৃষ্টি, কান দুটো অসম্ভব রকমে সজাগ, সমস্ত অন্তরাত্মা

দিয়ে যেন ও শুনছে, এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে খচ্ করে এতটুকু একটু শব্দ হলেও ও শুনতে পাবে—এঞ্জিন এতটুকু যদি বিগড়োয় তবে আর রক্ষা নেই, মৃত্যু অবধারিত।

রাস্তাটি ভিজে। এক জায়গায় বেশ খানিকটা দূর কাদা-কাদা মতো হয়ে আছে। গাড়িটা হঠাৎ সেখানে পিছলে গিয়ে এক ধারে গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। কোঙারকে তখন বাধ্য হয়ে স্পীড্ একটু কমাতে হয়েছিল। সেই ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য বিদ্যুদ্বেগে বাঁক ঘুরতে লাগল। এখন ও বেমালুম চোখ-মুখ বুজে গাড়ি চালাচ্ছে, একেবারে আন্দাজে। বাঁক ঘুরবার সময় হেডলাইটের আলোতে বাঁকের সবটুকু দেখা যায় না; মোড় নেবার বেলায় অন্ধকারে আন্দাজেই নিতে হয়। ডাক্তারের মুখে আর কথাটি নেই, চুপটি করে বসে আছেন।

হঠাৎ অবস্থাটা আরো সঙিন হয়ে উঠেছে, কুয়াশায় চারদিক ঢেকে ফেলেছে। কোঙ্টারের মতো বেপরোয়া মানুষও প্রমাদ গুনল। জাফে বলছিলেন রুদ্ধ আক্রোশে কোঙ্টার বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল। হেডলাইটের আলোতে এখন কিছুই দেখা যায় না। চোখের সুমুখে শুধু যেন শাদা তুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তা বলে কিছু নেই, আকাশের ছায়াপথের মতো একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার। নেহাত কপাল ঠুকে বিলকুল আন্দাজে চলতে হচ্ছে। বাড়িঘর কিম্বা গাছপালার অস্পষ্ট ভূতুড়ে মূর্তি পলকের জন্য দেখা দিয়ে পরমুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিনিট দশেক এভাবে চলবার পরে ঘন কুয়াশাটা কেটে গেল। ততক্ষণে কোঙ্টারের মুখ একেবারে শাদা পাংশুটে হয়ে গেছে। জাফের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আবার কী বলল। তারপরে আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিল পুরোদমে —আগের মতো ধীর স্থির শান্ত মূর্তি…

ঘরের ভিতরে ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া একটা সিসের তালের মতো ভারি ঠেকছে। ডাক্তারকে জিগগেস করলুম, 'বৃষ্টিটা থামল?'

ডাক্তার বলল, 'না।'

প্যাট্ আমার দিকে তাকাল। আমি হেসে বললুম, 'আর আধঘণ্টার মধ্যে ওরা এসে যাবে।'

ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু-ঘণ্টা না হলেও আরো অন্তত দেড়-ঘণ্টা। বৃষ্টি যে হচ্ছে খেয়াল আছে?'

বাগানের গাছের পাতায় বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম, কিছুই দেখা যায় না। এই কদিন আগে প্যাট্ আর আমি রাত্তির বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে ঐ বাগানে গিয়ে বসেছিলুম, ফুলের সারির মাঝখানে। আজ মনে হচ্ছে সে যেন কতকাল আগের কথা। প্যাট্ বসে বসে গুনগুন সুরে ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছিল। চাঁদের আলোয় বাগানের পথ গিয়েছিল ভেসে আর প্যাট্ বনহরিণীর মতো ঝোপে-ঝাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল।
শতবার করে ঘরে বাইরে পায়চারি করতে লাগলুম। জানি এতে লাভ কিছু হবে না, তবু সময় যে কাটতে চায় না। কুয়াশাটা এখনো কাটেনি। কোষ্টারকে এতে যে কতখানি বেকায়দায় ফেলেছে তাই ভেবে মন দমে যেতে লাগল। অন্ধকারে হঠাৎ একটা পাখি ডেকে উঠল। মেজাজ গেল বিগড়ে। থাম, ব্যাটা থাম, অলক্ষুণে পাখি কোথাকার! পরক্ষণেই আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, না, না, বাজে কথা। কোথায় যেন একটা ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ শব্দ করছে, কিন্তু কাছে কোথাও নয়, দূরে। একটানা সুরে ঝিঁঝিঁ শব্দ করে যাচ্ছে—এই থেমে গেছে—নাঃ, ঐ তো আবার, হ্যাঁ, আবার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ শরীরটা আমার কেঁপে উঠল—এ তো ঝিঁঝিঁ পোকা নয়, এ যে গাড়ির শব্দ, ঠিক যেন মনে হচ্ছে কোথাও বাঁক ঘুরছে দারুণ স্পীডে। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম। ঐ যে আবার…একটা ক্রুদ্ধ বোলতার মতো বন্‌বন্ শব্দ। এখন আরো স্পষ্ট, এমন কি কম্প্রেসারের শব্দটাও আমি কানে ঠিক ধরতে পারছি—তারপরে অকস্মাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ পথটা যেন দিগন্ত অবধি প্রসারিত হয়ে গেল —আঃ কি শান্তি, কি স্বস্তি। রাত্রির অন্ধকার, মনের ভয়-ভাবনা সব মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। ছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। 'ডাক্তার, প্যাট্, ওরা এসে গেছে, আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি, ওরা আসছে।'
ডাক্তার সেই সন্ধ্যে থেকেই ভাবছে আমি বদ্ধ পাগল। উঠে এসে সেও শব্দটা খানিকক্ষণ শুনল। তারপরে বলল, 'ও অন্য কোনো গাড়ি হবে।'
'না, এ এঞ্জিন আমার চেনা।'
ডাক্তার বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকাল। ও মনে করে ও গাড়ির একজন খুব সমঝদার। প্যাট্-এর বেলায় দেখছি ও যেন প্রকৃতি-মাতার মতো ধৈর্যশীল; কিন্তু যেই না আমি গাড়ির কথা বলেছি ও চশমার ফাঁক দিয়ে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল, ভাবটা যেন, থাক গাড়ির কথা আমাকে শেখাতে এস না। বলে উঠল, 'অসম্ভব!' আর কোনো কথার অবসর না দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

আমি তখনো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি। উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। কার্ল, কার্ল মা হয়ে যায় না।’ একটা চাপা গোঙানির মতো শব্দ···গাড়ি নিশ্চয় এখন গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে, সারি-সারি বাড়ির ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। শব্দটা আবার একটু মৃদু হয়ে এল, নিশ্চয় বনটার পিছনে পড়েছে বলে···ঐ আবার শব্দ, কি দুরন্ত বেগ। আসছে বিজয়ী বীরের মতো—হেডলাইটের আলোটা কুয়াশা ভেদ করে দেখা দিয়েছে, আর সে কি গর্জন। ডাক্তারের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্ত মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলো আমাদের দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিল, সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে ব্রেক্ কষে গাড়িটা এসে বাগানের গেটের সুমুখে দাঁড়াল।

ছুটে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। প্রফেসর গাড়ি থেকে বেরোলেন। আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, সোজা এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের দিকে। তাঁর পিছনে কোষ্টার। আমাকে জিগগেস করল, ‘কেমন আছে প্যাট্ ?’

‘এখনো রক্তবমি হচ্ছে।’

‘যাক, এখন সেরে উঠবে, আর কোনো চিন্তা নেই।’

আমার মুখে কোনো জবাবই এল না। ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। কোষ্টার বলল, ‘একটা সিগারেট দাও তো।’

সিগারেট দিয়ে বললুম, ‘অটো, তুমি যে এসেছ—কি আর বলব।’

সিগারেটে কয়েকবার জোরে-জোরে টান দিয়ে কোষ্টার বলল, ‘তাই ভেবেই তো এলুম।’

‘দারুণ স্পীডে এসেছ।’

‘হ্যাঁ, তা এক রকম। ঐ কুয়াশাটাতে একটু মুশকিল বাধিয়েছিল।’

দুজনে পাশাপাশি বাগানের ভিতরে বসলুম। ‘কী বল, ও সেরে উঠবে ?’

‘উঠবে বৈকি, রক্তবমি তো এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।’

‘ও আগে ঘুণাক্ষরে আমাকে কিছু বলেনি। যাকৃগে, আশা করি সেরে উঠবে, কী বল, অটো ?’

কোষ্টার এ-কথার জবাব দিল না। বলল, ‘আর একটা সিগারেট দাও, আমার সিগারেট আনতে ভুলে গিয়েছি।’

বললুম, ‘যে করেই হোক্ ওকে সেরে উঠতেই হবে, নইলে জীবন বৃথা।’

প্রফেসর বেরিয়ে এলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই উনি কোষ্টারকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘আর যদি কোনো দিন আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে চাপি !’

কোষ্টার বলল, 'আমি দুঃখিত ; কি করব বলুন, ও আমার বন্ধুর স্ত্রী।'
এতক্ষণে জাফে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ, তাই নাকি ?'
ওঁকে জিগগেস করলুম, 'কেমন বুঝছেন ? একটু ভালো ?'
আমার দিকে একটু কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন, 'ভালো না হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতুম ?'
আমার চোখে জল এসে গেল, 'মাপ করবেন, আপনি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।'
জাফে হেসে বললেন, 'যা করবার তাড়াতাড়িই করতে হয়।'
আটোকে বললুম, 'ভাই, মনটা কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না।'
কোষ্টার আমাকে ধরে ধাক্কিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে দিল, 'যাও দেখে এস গে, অবিশ্যি প্রফেসর যদি আপত্তি না করেন।'
প্রফেসরের দিকে ফিরে বললুম, 'একবার যেতে পারি ?'
জাফে বললেন, 'আচ্ছা যান, কিন্তু কথা বলবেন না, তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। রোগী যেন কোনো কারণে উত্তেজিত না হয়।'
আমার চোখে তখনো জল গড়াচ্ছে। ঘরের আলোটা যেন জলের উপরে চক্‌চক্ করছে চোখের জলটা মুছেও ফেলতে পারছিলুম না, পাছে প্যাট্ ভাবে আমি কাঁদছি। জোর করে মুখে হাসি টেনে আনলুম। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।
কোষ্টার প্রফেসরকে বলল, 'কি বলেন আপনাকে এনে ভালো করিনি ?'
'হ্যাঁ, তা এক রকম ভালোই হয়েছে।'
'কাল সকাল বেলায় উঠেই আবার আপনাকে নিয়ে যাব।'
জাফে বললেন, 'সেটি হবে না।'
'যেভাবে এসেছি সেভাবে অবিশ্যি গাড়ি চালাব না।'
'নাঃ, কালকের দিনটা থেকে যাওয়া দরকার।' তারপর আমাকে বললেন, 'আপনার বিছানাটা আমি ব্যবহার করিতে পারি ?' আমি তক্ষুণি রাজী।
'ব্যাস্, তাহলে আমি এখানেই ঘুমোব। আপনারা গ্রামের ভিতরে কোথাও শোবার ব্যবস্থা করতে পারবেন ?'
'তা পারব বৈকি। আপনাকে টুথব্রাস্ এবং পাজামা এনে দেব ?'
'দরকার নেই। আমি সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সময়-অসময়ের জন্য সব ব্যবস্থা আমার সঙ্গেই থাকে। অবিশ্যি গাড়িতে রেস্ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না।'

কোষ্টার বলল, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উপরে রাগ করেননি তো?'
'না, না, রাগ করিনি।'
'আপনাকে গোড়াতে সত্যি কথাটি বলিনি বলে আমি দুঃখিত।'
জাফে হেসে বললেন, 'ডাক্তার মানুষদের আপনারা ভালো করে চেনেন না। আচ্ছা, এবার আপনারা যান। আমি এখানটায় রইলুম।'
কোষ্টার আর নিজের জন্য কিছু জিনিস হাতের কাছে যা পেলুম নিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা হলুম, 'তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত।'
ও বলল, 'নাঃ, ক্লান্ত আবার কি? এস কোথাও গিয়ে একটু বসি।'
ঘণ্টাখানেক পরেই আমার মনের অস্বস্তি আবার বেড়ে উঠল। অটোকে বললুম, 'ডাক্তার যখন থেকে যেতে চাইছেন তখন অবস্থাটা নিশ্চয় সাংঘাতিক। নইলে থাকবেন কেন, বল?'
কোষ্টার বলল, 'সাবধানের মার নেই, এই ভেবে থাকছেন। তাছাড়া প্যাট্-এর প্রতি ওঁর একটা টান আছে। রাস্তায় আমাকে সে কথা বলছিলেন। উনি প্যাট্-এর মাকেও চিকিৎসা করেছেন।'
'তাঁরও? ...'
কোষ্টার তাড়াতাড়ি বলল, 'সে আমি জানিনে। বোধ করি অন্য কোনো অসুখ-বিসুখ হবে। আচ্ছা, এখন ঘুমুলে কেমন হয়?'
'তুমি যাও, অটো। আমি আর একবারটি...বুঝাকেই তো পারছ...এই দূর থেকে একটু...'
'বেশ চল, আমিও যাচ্ছি।'
ও নাছোড়বান্দা, সঙ্গে যাবেই। কম্বল আর কুশনগুলো সঙ্গে করে আবার কার্লের কাছে ফিরে এলুম। সিট্‌গুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে গাড়ির ভিতরে দিব্যি শোবার জায়গা হল। কোষ্টার বলল, 'লড়াইয়ের সময় ফ্রন্টে যে অবস্থায় কাটিয়েছি তার চাইতে এ ঢের ভালো।'
তখনো কুয়াশা রয়েছে। জানালা দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায়। জাফে মাঝে-মাঝে ঘরের ভিতর নড়া-চড়া করছেন। দুজনে বসে-বসে এক প্যাকেট সিগারেট নিঃশেষ করলুম। খানিক বাদে ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। এক কোণে শুধু একটি ছোট্ট ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। যাক, তাহলে তেমন ভয়ের কারণ নেই।
গাড়ির হুড্ থেকে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে।

অটোকে বললুম, 'আমার কম্বলটা তুমি নাও।'
'না, না, আমি বেশ আরামে আছি।'
'জাফে লোকটি কিন্তু বেশ, কি বল ?'
'হ্যাঁ, ভালোমানুষ, ও দিকে কাজেও খুব পাকা।'
'তা তো বটেই।'

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের অবস্থা থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসলুম। বাইরেটা ধোঁয়াটে মতো দেখতে, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। দেখি অটো আগে থেকেই জেগে আছে। 'কি অটো, ঘুম হয়নি বুঝি ?'
'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি তো।'
গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। পা টিপে-টিপে বাগানের রাস্তাটি পার হয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্যাট্ শুয়ে আছে, চোখ দুটি বোজা। হঠাৎ দেখে ভয় হয়ে গেল, মরে যায়নি তো ? পরক্ষণেই দেখলুম ডান হাতটি নড়ছে। মুখের চেহারা বিষম ফ্যাকাশে কিন্তু রক্তবমিটা বন্ধ হয়েছে। ডান হাতটি আর একবার একটু নড়ল। জাফে আমার বিছানায় শুয়ে ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনিও জেগে উঠলেন। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, কিছু করবার থাকলে উনিই করবেন। কোষ্টারকে বললুম, 'অটো, চল সরে পড়া যাক। আমরা এখানে বসে পাহারা দিচ্ছি জানলে প্রফেসর আবার চটে যেতে পারেন।'
অটো জিগগেস করল, 'ভিতরে সব খবর ভালো ?'
'হ্যাঁ, যদ্দুর মনে হল, ভালোই। আমাদের প্রফেসরের ঘুমটি তো বেশ। কানের কাছে কামান দাগালেও ঘুমের ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু তাঁর ব্যাগ্-এর কাছে যদি একটি ছুঁচো কিম্বা ইঁদুর খচমচ করল তবে তক্ষুনি জেগে যাবেন।'
কোষ্টার বলল, 'আচ্ছা, একটু সাঁতার কাটলে কেমন হত। আবহাওয়াটা চমৎকার হয়েছে।'
আমি বললুম, 'যাও না তুমি।'
'না, তুমিও চল।'
আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ধূসর মেঘের ফাঁক দিয়ে ঈষৎ কমলা রঙের আভা দেখা দিয়েছে।
দুজনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগলুম। সমুদ্রের রঙটাও কিছু-বা ধূসর কিছু-বা লালচে। বেশ খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে বাড়ি ফিরে এলুম।

ফ্রাউলিন মুলার আগেই জেগেছে, সব্জির বাগানে সব্জি তুলছে। হঠাৎ আমার কথা কানে যেতে চমকে উঠল। কালকে মাথার ঠিক ছিল না, ওর প্রতি ব্যবহারটা নিশ্চয় রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইলুম। শুনে বেচারী কেঁদেই ফেলল, 'আহা, অমন সুন্দর মেয়েটা, আর ঐ তো বয়েস।'

বললুম, 'দেখ না, ও একশো বছর বেঁচে থাকবে।' মনে-মনে বিরক্ত হলুম। ও ভেবেছে প্যাট্ মরে যাবে, তাই কাঁদতে শুরু করেছে। না, না, মরবে কি? সকালের আলোয় আর সদ্য সমুদ্রে স্নান করে আমার মনে নতুন বল এসেছে। আমার মন বলছে প্যাট্ মরবে না। আমি যদি আশা ছেড়ে দিই তবেই সে মরবে···কোষ্টার রয়েছে···আমি রয়েছি, আমরা প্যাট্-এর সাথী···আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ ও মরবে কেন? আগেও তো তাই হয়েছে। কোষ্টার বেঁচে আছে বলেই তো আমিও বেঁচে আছি। আর আমরা যখন বেঁচে আছি তখন প্যাট্ই বা মরবে কেন?

বুড়ি বলল, 'কপালের লিখন তো মানতেই হয়।' ওর কথায় একটু তিরস্কারের সুর আছে। আমি যে মনে-মনে ওর ওপর বিরক্ত হয়েছি তা ও বুঝতে পেরেছে। বললুম, 'কেন, মানতে হবে কেন? তাতে কী লাভ? জীবনটা তো ফাঁকতালে পাওয়া নয়, তার জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। এখন অদৃষ্টের খামখেয়াল মানতে যাব কেন?'

'কিন্তু মেনে নেওয়াই ভালো···সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

মনে-মনে বললুম, 'হুঁ! অদৃষ্টকে মেনে আমার বড় লাভ! মানব না, লড়াই করব, লড়াইতে শেষ পর্যন্ত হারি, সেও ভালো। জীবনে এক রত্তি জিনিসও যদি ভালোবেসে থাকি, বিনা যুদ্ধে তা ছাড়ব না।'

কোষ্টার এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে কথা জুড়ে দিল। বুড়ির মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে, অটোকে জিগগেস করছে লাঞ্চের জন্য কী রান্না করবে।

অটো আমাকে বলল, 'দেখলে তো, এই হল এ যুগের শিক্ষা। হাসি-কান্না মিশেই আছে···এই হাসি, এই কান্না।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আপন মনেই বলল, 'কিছু-কিছু শেখা ভালো।'

দুজনে একবার বাড়ির চারদিকটা ঘুরে এলুম। আমি বললুম, 'ও ঘুমোক্, যতক্ষণ ঘুমোয় ততক্ষণই লাভ।'

বাগানে ফিরে এসে দেখি ফ্রাউলিন মুলার ব্রেকফাস্টের যোগাড় করে ফেলেছে। গরম কফি পান করা গেল। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কনকনে ভাবটা দূর হয়ে গেল।

বৃষ্টি-ধোয়া গাছের পাতায় সূর্যের আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করতে লাগল। সমুদ্রের দিক থেকে সামুদ্রিক পাখির রব শোনা যাচ্ছে।

ক্রাউলিন্‌ মুলার এক গোছা গোলাপ ফুল টেবিলে এনে রাখল। বলল, 'পরে ফুলগুলো ওঁকে দেওয়া যাবে।'

সন্ত-ফোটা ফুল, গন্ধটি ভারি মিষ্টি।

অটোকে বললুম, 'ভাই, মনে হচ্ছে আমিই যেন অসুস্থ···সত্যি বলতে কি, আমি ঠিক আগের মানুষটা আর নেই। অবিশ্যি মাথাটা ঠাণ্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে বিপদের সময় কোনো কাজ করা যায় না।'

'সব সময়ে মাথা ঠিক রাখা যায় না, বব্‌। আমার নিজের বেলাতেও দেখছি। মানুষের বয়স যত বাড়ে, ভয়-ভাবনাও তত বাড়তে থাকে। ক্রমাগত হারতে থাকলে জুয়াড়ীর যেমন অবস্থা হয়, এও তেমনি।'

দরজা খুলে জাফে বেরিয়ে এলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠতে গিয়ে আমি ব্রেকফাস্ট টেবিলটা প্রায় উল্টে দিয়েছিলুম। তাই দেখে জাফে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু না, কোনো ভাবনা নেই, সব ঠিক আছে।'

'আমি একবার ভিতরে যেতে পারি?'

'এখন নয়। ঝি রয়েছে ওখানে, ধুয়ে মুছে ঠিকঠাক করছে।'

ওঁকে কফি ঢেলে দিলুম। সূর্যের আলোয় ওঁর চোখ মিট্‌মিট্‌ করছে। কোষ্টারের দিকে ফিরে বললেন, 'একটি কারণে অন্তত আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এক দিনের জন্য হলেও একটু শহর ছেড়ে বাইরে আসবার সুযোগ পেলুম।'

কোষ্টার বলল, 'কেন, এলেই তো পারেন। সন্ধ্যেবেলায় এসে পরদিন আবার ফিরে যেতে পারেন।'

জাফে বললেন, 'পারি বৈকি, খুব পারি। কিন্তু দেখছেন তো, আমাদের যুগটাই হচ্ছে নিজের উপরে জুলুমবাজি। কতই তো আছে, ইচ্ছে করলে করতে পারি কিন্তু করি না। অথচ কেন যে করি না, ভগবান জানেন। কত অসংখ্য লোকের কোনোই কাজ নেই, একেবারে বেকার। আর বাকিদের শুধু কাজ আর কাজ, কাজ ছাড়া তারা কিচ্ছু জানে না। দেখুন তো জায়গাটি কি সুন্দর, অথচ কতকাল এখানে আসিনি। এদিকে আমার দু-দুটো গাড়ি, দশ-রুমওয়ালা প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট আর টাকার তো ছড়াছড়ি···কিন্তু অত সব থেকে আমার কী হয়েছে? গ্রীষ্মের সকালবেলাটিতে এমন একটি জায়গার তুলনায় ওসবের মূল্য কী? শুধু কাজ, কাজ আর কাজ···পশুর জীবন! সারাক্ষণ মনকে ভোলাচ্ছি—আসবে, আসবে,

সুদিন আসবে। কিন্তু দিন আর বদলায় না। আশ্চর্য, জীবনকে নিয়ে আমরা এমন হেলাফেলা করি!'

আমি বললুম, 'ডাক্তারদের অন্তত জীবনের মূল্যটা বোঝা উচিত, নইলে ধরুন ব্যাঙ্কের কেরানি কী বুঝবে?'

জাফে বললেন, 'দেখুন, ওটা হল গিয়ে রুচির কথা। সেটি না থাকলে কি বা ডাক্তার কি বা ব্যাঙ্কের কেরানি।'

কোষ্টার বলল, 'ঠিক কথা। তাছাড়া চাকরির সঙ্গে রুচির কোনো যোগ নেই। যার-যার রুচি অনুযায়ী তো আর লোকে চাকরি পায় না।'

জাফে বললেন, 'হ্যাঁ, এসব বড় প্যাঁচালো ব্যাপার।' এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি একবার যেতে পারেন···কিন্তু ওঁকে কথা-টথা বলতে দেবেন না।'

চারদিকে বালিশ দেওয়া, এমন অসহায় ভঙ্গিতে ও শুয়ে আছে! মুখের রঙ একেবারে ফ্যাকাশে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে, ঠোঁট দুটি বিবর্ণ। শুধু চোখ দুটি আগের মতোই বড়-বড় আর জলজলে। এখন আরো যেন বড় দেখাচ্ছে। ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলুম।

'প্যাট্···' বলবার মতো কথা খুঁজেই পাচ্ছি না। ওর পাশটিতে বসতে যাচ্ছি, দেখি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঝি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ধমকে বললুম, 'ওখানে কী করছ, এখন যাও।'

ও বলল, 'জানালার পরদা টেনে দিচ্ছি।'

'বেশ, টেনে দিয়ে চলে যাও।'

ঝি আস্তে-আস্তে পরদা টেনে দিল, কিন্তু যাবার নাম নেই, আবার পিন দিয়ে আটকাচ্ছে।

বললুম, 'ওকি খেলা হচ্ছে নাকি? যাও এখান থেকে।'

সেও চটে গিয়ে বলল, 'এই মাত্র বলা হল পিন আটকে দিতে আবার এক্ষুনি বলছেন আটকাতে হবে না।'

প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'তুমি পিন লাগিয়ে দিতে বলেছিলে নাকি? চোখে আলো লাগছে বুঝি?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, পাছে তুমি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাও···'

'ছিঃ প্যাট্···জানো, তোমার কথা বলা নিষেধ। আর সে কথাই যদি বল উঠে গিয়ে দরজাটি দিলুম, ঝিও কাজ সেরে চলে গেল।

আবার ওর পাশটিতে এসে বসলুম, 'কিছু ভেব না প্যাট্, এই দেখ না, সেরে উঠলে বলে।'

খুব আস্তে ঠোঁট নেড়ে ও বলল, 'কালকে ভালো হয়ে যাব ?'

'কালকে না হলেও দু-চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এখানে না এলেই ভালো হত। এখানকার আবহাওয়া তোমার সহ্য হয়নি।'

অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে ও বলল, 'কিন্তু আমার কোনো অসুখ করেনি, রবি। এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট…'

ওর মুখের দিকে তাকালুম। ওর অসুখটা ও কি বোঝেনি, না বুঝতে চায় না ? ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—' প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি ও আমাকে অত করে কেন অভয় দিচ্ছে। ওর চোখে একটা দুশ্চিন্তার আভাস।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল। ওঃ, বুঝেছি ও কি ভাবছে। ও ভেবেছে ওর এই অসুখ দেখে আমি বিষম ভয় পেয়ে গেছি। বললুম, 'কি তোমার ছেলেমানুষি প্যাট্—এই জন্য বুঝি তোমার অসুখের কথা আগে আমাকে বলনি !'

ও কোনো জবাব দিল না, কিন্তু বুঝতে পারলুম আমি ঠিকই ধরেছি। বললুম, 'ছি-ছি, তুমি আমাকে কী ভেবেছ বল দিকিনি।' ওর মুখের উপরে ঝুঁকে বললুম, 'চুপ করে থাক তো, নড় না।' বলে ওর শুষ্ক তপ্ত ঠোঁটে চুমু খেলুম। উঠে সোজা হয়ে যখন বসলুম, তখন দেখি ও কাঁদছে। নিঃশব্দে কাঁদছে, দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

'ছিঃ, অমন করতে নেই, প্যাট্—'

মৃদু কণ্ঠে প্যাট্ বলল, 'আমার যে সুখের অন্ত নেই।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সুখ ! মুখের একটা কথা মাত্র। কিন্তু এমন করে ও-কথাটা আগে কখনো বলতে শুনিনি।

এর আগেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু সেগুলো একটা ক্ষণিকের উত্তেজনা, একটু আমোদ-ফুর্তি, অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো—হয়তো কোনো নির্জন সন্ধ্যার শূন্যতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা কিম্বা শুধু হতাশ মনের আকুলি-বিকুলি। সত্যি বলতে কি এর বেশি কোনো দিন চাইওনি। আমি ভাবতুম নিজের বাইরে, বড় জোর আমার আপন সাথীদের বাইরে, সংসারে আর কোনো

বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়স্থল নেই। আজই হঠাৎ আবিষ্কার করলুম আর একজন মানুষের কাছে আমার একটা আলাদা মূল্য আছে। আমি আছি বলেই তার জীবনে সুখ আছে। আমি পাশে এসে বসলে, সে আনন্দ পায়। কথাটা অমনি শুনতে এমন কিছুই নয়, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এর অন্ত পাওয়া যায় না। এ যে কি যাদুমন্ত্র—এক মুহূর্তে মানুষের রূপ যায় বদলে। এ তো শুধু প্রেম নয়, তার চাইতেও বেশি। সংসারে শুধু প্রেম নিয়ে কেউ বাঁচে না, রক্ত-মাংসের একান্ত আপনার কোনো মানুষকে নিয়েই বাঁচে।

ভাবলুম ওকে একটা কিছু বলি, কিন্তু বলতে পারলুম না। যখন অনেক কথা বলবার থাকে তখনই বলার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি বা কথা জিভের ডগায় এসে যায় তবে আবার লজ্জায় মুখ দিয়ে কথা সরে না। সে সব কথা প্রকাশ পেত আদিকালের ভাষায়। এ যুগের মনের কথা প্রকাশ করবার ভাষা এখনো তৈরি হয়নি। আমরা শুধু উপস্থিত প্রয়োজনে কথা কইতে পারি, এ ছাড়া সব কথাই আমাদের মুখে মিথ্যে শোনায়।

বললুম, 'প্যাট্রি, তোমার এত সাহস—'

ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যাকে এসে ঘরে ঢুকলেন। দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'আপনি আচ্ছা মানুষ তো মশাই, আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলুম।'

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে কি একটা বলতে গেলুম, তার অবসর না দিয়ে উনি এক রকম জোর করেই আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন।
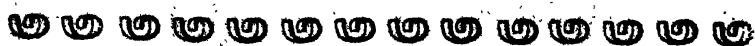
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক হপ্তা পরের কথা। প্যাট্ ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, ওকে নিয়ে বাড়ি ফেরবার মতলবে আছি। জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। এখন গট্‌ফ্রিড্ লেন্‌ত্‌স-এর অপেক্ষায় আছি। ও এসে গাড়িটা নিয়ে যাবে, আমি আর প্যাট্ যাব ট্রেনে।

দিনটা বেশ গরম। আকাশে তুলো-পেঁজা মেঘ। গরম হাওয়া বালির স্তূপের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে বয়ে যাচ্ছে। আর সমুদ্রটা পড়ে আছে যেন একটি সীসের পাত—ঈষৎ কম্পমান ধূম্রজালে আবৃত।

লাঞ্চের পর গট্‌ফ্রিড্ এসে হাজির হল। লেন্‌ত্‌সকে অনেক দূর থেকেই চিনতে পেরেছিলুম। বাগানের বেড়ার উপর দিয়ে ওর মাথাটা দেখা যাচ্ছিল। বাঁক ঘুরে ঠিক আমাদের ভিলার সামনে রাস্তায় যখন ঢুকেছে তখন দেখলুম ও একা নয়, পিছনে কে যেন একজন আসছে—রীতিমতো মোটর-রেসওয়ালার মতো চেহারা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা চেকের টুপি—মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, চোখে মস্ত বড় গগ্‌ল্‌স্, গায়ে ঢোলা জামা। লাল চকচকে দুই কান দুদিকে খাড়া হয়ে আছে।

দেখে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'জাপ্ না হয় তো কি বলেছি।'

'আজ্ঞে, যা বলেছেন, হের লোকাম্প।' জাপ্ সব কটি দাঁত বের করে হাসছে।

'কিন্তু এই পোশাকটা কেন? এর কারণ তো বুঝতে পারছিনে।'

লেন্‌ত্‌স আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, 'বুঝতে পারছ না? ওকে যে রেসিং-এ হাতে-খড়ি দেওয়া হচ্ছে। গত আটদিন ধরে ওকে ড্রাইভিং শেখাচ্ছি। আজকে আমাকে নেহাত ধরে পড়েছে, আমার সঙ্গে আসবেই। ভালো সুযোগ পেয়েছে কিনা, একটি ক্রস্‌কান্ট্রি টুর হয়ে যাবে।'

জাপ্ বলে উঠল, 'দেখুন না, হের লোকাম্প্, রেকর্ড ব্রেক করে তবে ছাড়ব।'

গট্‌ফ্রিড্‌ হেসে বলল, 'হ্যাঁ দেখ, কিভাবে রেকর্ড ব্রেক করে। বাবাঃ, আমি এমন দস্যির মতো গাড়ি চালাতে কাউকে দেখিনি। প্রথম দিন একটু শেখানোর পরেই ও করেছে কি জানো? আমাদের পুরোনো ট্যাক্সিটা নিয়ে ও এক মার্সিডিস্‌ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেবার তালে ছিল। দস্যি আর কাকে বলে?'
জাপ্‌-এর খুশি আর ধরে না। লেনত্‌স-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আর একটু হলেই ওকে তামাশাখানা দেখিয়ে দিতুম। হের্‌ কোষ্টার-এর মতো বাঁক ঘুরবার বেলাতেই ওকে ছাড়িয়ে যেতুম।'
ওর কথা শুনে হেসে ফেললুম, 'তুমি যে দেখছি শুরুতেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছ।'
গট্‌ফ্রিড্‌ তার ছাত্রের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এখন এক কাজ কর, বোঝাপত্তরগুলো নিয়ে স্টেশনে চলে যাও তো।'
'অ্যাঁ, আমি একলাই যাব!' শ্রীমান একেবারে আনন্দে ফেটে পড়বার মতো। 'তাহলে স্টেশন অবধি গাড়িটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারি?'
গট্‌ফ্রিড্‌ হ্যাঁ বলতে না বলতে জাপ্‌ ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল।
ট্রাঙ্কগুলো একটা-একটা করে বের করে দিলুম। তারপরে প্যাট্‌কে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। গাড়ি ছাড়তে তখনো মিনিট পনেরো দেরি। প্ল্যাটফর্মে লোকজন নেই, কতগুলো দুধের ভাঁড় পড়ে আছে।
আমি বললুম, 'এবার তোমরা রওনা হয়ে যাও, নইলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে না।'
জাপ্‌ স্টীয়ারিং-এ বসে আছে। আমার কথাটা মনঃপুত হয়নি। লেন্‌ত্‌স তাই বুঝে বলল, 'কি হে, ওর কথা শুনে বুঝি তোমার রাগ হচ্ছে?'
জাপ্‌ সোজা হয়ে বসে বলল, 'হের লোকাম্প্‌, আমি ঠিক হিসেব করে দেখেছি, আটটার আগেই আমরা স্বচ্ছন্দে কারখানায় পৌঁছে যাব।'
লেন্‌ত্‌স ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। তা ওর সঙ্গে না হয় একটা বাজি ধরে ফেল। কিছু না হোক্‌ এক বোতল সোডা।'
জাপ্‌ বলল, 'না, সোডা নয়, তবে এক প্যাকেট সিগারেট বাজি ধরতে রাজী আছি।'
আমি বললুম, 'রাস্তা যে খুব খারাপ, সেটা তোমার খেয়াল আছে?'
'সে আমি ধরেই নিয়েছি।'
'কত যে বাঁক ঘুরতে হবে সে তো তুমি জানো না?'
'বাঁক-টাক আমি ভয় পাই না, ও সব ভয়-ডর আমার নেই।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, তবে তোমার সঙ্গে বাজি রইল। কিন্তু একটা কথা, হের্ লেন্ত্স যেন রাস্তায় ড্রাইভ না করেন।'

জাপ্ তৎক্ষণাৎ রাজী, 'না, না, তা কি হয়, এই বুকে হাত রেখে বলছি।'

'বেশ, বেশ। আরে, তোমার হাতে ওটা কি, দেখি?'

'আজ্ঞে, ওটা হচ্ছে আমার স্টপ-ওয়াচ্। রাস্তায় স্পীডটা একবার দেখতে হবে তো।'

লেন্ত্স হেসে উঠল, 'দেখলে তো, কোনো দিকে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। আর আমাদের সিত্রয়ঁাটি জাপ্-এর হাতে পড়ে দেখ এখন থেকেই যেন উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে।'

জাপ্ লেন্ত্স-এর ঠাট্টা কানেই তুলল না। মাথার টুপিটা তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিয়ে বলল, 'হের্ লেন্ত্স, তাহলে এখন রওনা হওয়া যাক। বাজিটা যখন রাখাই হল।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসি তবে প্যাট্। বব্ পরে দেখা হবে'খন,' বলে লেন্ত্স গাড়িতে উঠে বসল। 'ওহে ভাবী ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান! একবার ভদ্রমহিলাকে তোমার স্টার্টটা দেখিয়ে দাও তো।'

জাপ্ গগ্ল্সটা ভালো করে চোখে লাগিয়ে নিল, বিদায়ের ভঙ্গিতে একবার হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িটা হুস্ করে রাস্তায় গিয়ে নামল।

•

প্যাট্ আর আমি স্টেশনের সামনে একটা বেঞ্চের উপর খানিকক্ষণ বসে রইলুম। প্ল্যাটফর্ম ঘিরে একটা কাঠের দেয়াল। রোদের তাপে দেয়ালটা গরম হয়ে উঠেছে। বাতাসে একটা লোনা গন্ধ। প্যাট্ পিছনের দিকে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। একটুও নড়ছে-চড়ছে না, সূর্যের দিকে মুখ করে চুপচাপ বসে আছে।

'কি, তোমার ক্লান্তি লাগছে নাকি?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, বব্।'

'ঐ যে ট্রেন এসে পড়েছে।'

একদিকে বিরাট সমুদ্র, তার পাশে কালো এঞ্জিনটাকে এতটুকু ছোট্ট দেখাচ্ছে। আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম। গাড়ি একরকম খালি। এঞ্জিনের মুখে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে-ছাড়তে গাড়ি ছেড়ে দিল। দুধারের দৃশ্যগুলো দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল—কোথাও গ্রামের কুঁড়েঘর, কোথাও মাঠে গরু-ঘোড়া

চরছে আর ঐ ওখানটায় বালির স্তূপের পিছনে ফ্রাউলিন্ মুলার-এর বাড়িটি যেন গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে।
প্যাট্ দাঁড়িয়ে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। রেল-লাইনটা বেঁকে গিয়ে বাড়ির খুব কাছ দিয়ে চলে গিয়েছে। ঘরের জানালাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। বিছানাগুলি বাইরে রোদ্দুরে মেলে দেওয়া হয়েছে। প্যাট্ বলে উঠল, 'ঐ যে ফ্রাউলিন্ মুলার!'
'হ্যাঁ, তাই তো।' সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। প্যাট্ জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রুমাল ওড়াতে লাগল।
আমি বললম, 'তোমার রুমাল বড্ড ছোট, ও দেখতেই পাবে না। এই নাও আমার রুমাল।' প্যাট্ তাড়াতাড়ি আমার রুমালটা নিয়ে নাড়তে লাগল। ফ্রাউলিন্ মুলার দেখতে পেয়েছে আর প্রাণপণে হাত নাড়ছে।
মুলার-এর বাড়ি আর বালির বাঁধ পিছনে ফেলে গাড়ি অনেকটা এগিয়ে এসেছে। মাঝে-মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের নীল-জল এক-আধবার চোখে পড়ে। আর একটু এগিয়ে আমরা খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। দুধারে সবুজ মাঠ। যতদূর চোখ যায় গমের ক্ষেত—সোনালী শিষগুলো হাওয়ায় দুলছে।
রুমালটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে প্যাট্ এক কোণে বসে পড়ল। জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আমিও ঠিক হয়ে বসলুম। মনে একটা স্বস্তির ভাব এসেছে। যাক্, এ যাত্রায় কোনো রকমে ফাঁড়াটা কেটে গেছে। সমস্তটাই একটা স্বপ্নের মতো লাগছে—একটা মস্ত বড় দুঃস্বপ্ন।

ছ'টার একটু আগে আমরা শহরে এসে পৌছলাম। জিনিসপত্র একটা ট্যাক্সিতে তুলে প্যাট্‌কে নিয়ে তার বাড়িতে এলুম। প্যাট্ জিগগেস করল, 'তুমি উপরে আসবে তো?'
'নিশ্চয়।' ওকে উপরে পৌছে দিয়ে জিনিসগুলো নেওয়ার জন্ত আবার নিচে নেমে এলুম। ফিরে এসে দেখি প্যাট্ তখনো হল-ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে, লেফটেনাণ্ট-কর্নেল হাকে আর তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে।
ওকে সঙ্গে করে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। তখনো অন্ধকার হয়নি, সবে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। টেবিলের উপরে একটি কাঁচের পাত্রে কয়েকটা লাল গোলাপ। প্যাট জানালার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ফিরে জিগগেস করল, 'আচ্ছা বব্, কদ্দিন ওখানে ছিলুম বল তো?'

'ঠিক আঠারো দিন।'

'মোটে আঠারো দিন? মনে হচ্ছে আরো বেশি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। বাইরে কোথাও ছুটি কাটালে অমনি হয়।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'আমি সে কথা বলছিনে—'

দরজা খুলে ও বারান্দায় বেরিয়ে গেল। ওখানটায় একটা শাদা ডেক্-চেয়ার ভাঁজ করে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখা হয়েছে। চেয়ারটা খুলে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার যখন ঘরের ভিতরে এল তখন লক্ষ্য করলুম, ওর মুখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেছে, চোখ দুটি গভীর কালো।

আমি বললুম, 'দেখেছ, গোলাপগুলো কোষ্টার পাঠিয়েছে, এই যে—পাশেই ওর কার্ড রয়েছে।'

কার্ডটা হাতে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপরে আবার টেবিলে রেখে দিল। ফুলগুলোর দিকে ও তাকিয়ে আছে, কিন্তু ওদিকে যে ওর মন নেই সেটা বেশ বোঝা যায়! ও তখনো ডেকচেয়ারের কথাই ভাবছে। ভেবেছিল ওটার থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু আবাব শুরু হল। কতকাল আবার শুয়ে থাকতে হবে কে জানে!

ভাবুক। আমি কিছুই বললুম না। অন্য একটা কথা তুলে ওর মনটাকে হয়তো ঘোরানো যেত, কিন্তু কি লাভ? ভাবতে যখন হবেই তখন এক্ষুনি ভাবুক, যতক্ষণ আমি কাছে আছি। বাজে কথা বলে না হয় ভাবনাটাকে খানিকক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখা যেত, কিন্তু দুদিন আগে আর পরে ঘুরে ফিরে ভাবনাটা আসবেই। বরং যত বেশি দেরি হবে তত কঠিন হয়ে বাজবে।

মুখ নিচু করে খানিকক্ষণ ও টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, আমি চুপ করে রইলুম, কিছুই বললুম না। ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল।

'কী, কিছু বলছ?'

জবাব না দিয়ে ও আমার কাঁধের উপরে ঝুঁকে পড়ল। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, 'তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, আমরাই তো রয়েছি।' মাথার চুলে হাতটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ও বলল, 'না বব্, ভাবছি না তো, এই মুহূর্তের জন্য কথাটা একবার মনে এসেছিল।'

'জানি।'

দরজায় টোকা পড়ল। ঝি চায়ের ট্রলিটা ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্যাট্ খুশি হয়ে বলল, 'এই যে, চা এসে গেছে।'
জিগগেস করলুম, 'তুমি চা খাবে নাকি?'
'না, বেশ কড়া করে কফি খাব।'
আধ-ঘণ্টাখানেক ওখানে বসলুম। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চোখ দেখলেই বোঝা যায়। বললুম, 'এবার একটু ঘুমিয়ে নাও।'
'আর তুমি কি করবে?'
'আমিও বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘণ্টা দুই পরে সাপারের সময় হলে তোমাকে এসে নিয়ে যাব।'
আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'তোমাকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'
'হ্যাঁ, একটু ক্লান্ত বৈকি। ট্রেনে বড্ড গরম লেগেছিল। তার উপরে একবার আমাকে ওয়ার্কশপেও যেতে হবে।'
ও আর কোনো প্রশ্ন করল না। ক্লান্তিতে ওর শরীর অবশ হয়ে এসেছে। ওকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। শুতে না শুতেই ঘুম। ফুলগুলো এনে ওর পাশে রেখে দিলুম। কোষ্টার-এর কার্ডটিও রাখলুম এক পাশে। জেগে উঠেই যেন ভাববার মতো একটা কিছু হাতের কাছে পায়। তার পরে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।
রাস্তায় একটা টেলিফোন-ঘর দেখে থামলুম। জাফেকে একবার টেলিফোন করা দরকার। আমার ওখান থেকে টেলিফোন করা এক ফ্যাসাদ, বাড়িসুদ্ধু লোক হাঁ করে শুনতে থাকবে। রিসিভার তুলে নিয়ে ক্লিনিকের নম্বরটা বললুম। একটু পরেই জাফের গলা পাওয়া গেল। বললুম, 'আমি লোকাম্প, কথা বলছি; আমরা আজকেই ফিরে এসেছি, এই ঘণ্টাখানেক আগে।'
জাফে জিগগেস করলেন, 'মোটরে এলেন নাকি?'
'না, ট্রেনে।'
'আচ্ছা, তা কেমন বোধ হচ্ছে?'
'ভালোই।'
উনি কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিলেন, তারপরে বললেন, 'কালকে একবার ফ্রাউলিন্ হোলম্যান্‌কে পরীক্ষা করতে চাই। এই ধরুন এগারোটা আন্দাজ। ওঁকে তাই বলে দেবেন।'
আমি বললুম, 'না, আমি যে আপনাকে ফোন করেছি সে কথা ওকে জানাতেই

চাইনে। নিশ্চয় ও নিজেই কালকে আপনাকে রিং করবে। তখন আপনিই ওকে বলে দেবেন।'

'বেশ, তবে ঐ কথা রইল। আমি ওঁকে বলব।' চারদিকের দেয়ালে অসংখ্য টেলিফোন নম্বর—পেন্‌সিল দিয়ে হিজি-বিজি করে লেখা। মোটা নোংরা দাগ-পড়া টেলিফোন বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম। সেটা একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটু ইতস্তত করে বললুম, 'তাহলে কালকে বিকেলের দিকে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?' জাফে জবাব দিলেন না। বললুম, 'ওর অবস্থাটা একবার জানতে ইচ্ছে করছে কিনা।'

জাফে বললেন, 'সে তো কালকে বলা সম্ভব নয়। এখন অন্তত হপ্তাখানেক ওঁকে দেখতে হবে। তবে বোঝা যাবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। তখন বরং আপনাকে বলব।'

'ধন্যবাদ।' সামনের ডেস্কটার দিকে তাকিয়ে আছি। তার উপরে কে যেন একটা ছবি এঁকে রেখেছে—ইয়া মোটা এক মেয়ে, মাথায় স্ট্র হ্যাট্—নিচে আবার যাচ্ছেতাই কি সব লেখা। আবার জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা, ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু করবার আছে?'

'সে কালকে দেখা যাবে'খন। ওখানটায় ওঁর যত্ন-আত্তির কোনো ত্রুটি হবে না, আশা করি।'

'সে তো আমি জানিনে। শুনলুম ওখানে যাঁরা এ্যাদ্দিন ছিলেন তাঁরা আসছে হপ্তায় চলে যাচ্ছেন। তাহলে তো ওকে একেবারে একলা থাকতে হবে, শুধু ঝি থাকবে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা কালকে এ বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

টেলিফোন বইটা টেনে এনে ডেস্কের ছবিটা ঢেকে দিলুম। 'আচ্ছা দেখুন, হঠাৎ আবার সে রকম রক্তবমি-টমি হবে না তো?'

জাফে আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপরে বললেন, 'হওয়া অসম্ভব নয়।' একটুক্ষণ পরে আবার বললেন, 'তবে সম্ভাবনা কম। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে তবেই বলা চলবে। পরে আপনাকে ফোন করে বলব।'

'ধন্যবাদ, অবিশ্যি ফোন করবেন।'

রিসিভার রেখে দিলুম। বেরিয়ে এসে রাস্তায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালুম। রাস্তায় ধুলো আর কেমন একটা অস্বস্তিকর গরম। আস্তে-আস্তে বাড়ি-মুখো চলতে লাগলুম। দরজার মুখে ঢুকতে গিয়ে আর একটু হলেই ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে ঠোকাঠুকি

হয়ে যেত। ফ্রাউ বেওার-এর ঘর থেকে বুড়ি একটি কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরুচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, 'অ্যাঁ, এরই মধ্যে ফিরে এলেন?'

'দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর, এদিককার খবর কি?'

'আপনার কোনো খবর নেই। চিঠিপত্রও আসেনি। খবরের মধ্যে ফ্রাউ বেওার এখান থেকে চলে গেছেন।'

'তাই নাকি? কেন?'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি কোমরে দুহাত রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। 'কেন আর? দুনিয়া হয়েছে যত জোচ্চোরের মেলা। বেচারী ক্রিশ্চিয়ান হোম-এ উঠে গেছে। বেড়ালটা নিয়েছে সঙ্গে আর সম্বলের মধ্যে ছাব্বিশটি মার্ক।' ওর কথা থেকে বুঝলুম ফ্রাউ বেওার যে অনাথাশ্রমে নার্সের কাজ করত সেটা উঠে গেছে। ওখানকার কর্মকর্তা এক পাদ্রী সাহেব স্টক-এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলে অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। মাঝখান থেকে ফ্রাউ বেওার বেচারীর চাকরিটি গিয়েছে। দুমাসের মাইনে বাকি, তা পাবার আশা নেই।

বোকার মতো জিগগেস করলুম, 'আর কোনো চাকরি-বাকরি জুটেছে?' ফ্রাউ জালেওয়াস্কি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, তা চাকরি আর কোত্থেকে জুটবে?'

'অবিশ্যি আমি ওঁকে বলেছিলুম ইচ্ছে করলে এখানেই থেকে যেতে পারেন, টাকার জন্য কোনো তাগিদ নেই। তা উনি রাজী হলেন না।'

বললুম, 'গরীবরা দেখবেন টাকার ব্যাপারে খুব খাঁটি। কক্ষনো গোলমাল করে না। আচ্ছা তাহলে ও ঘরটাতে এখন কে যাচ্ছে?'

'হেসিরা যাবে বলছে। ওরা যে ঘরটাতে আছে তার চাইতে এটার ভাড়া একটু কম কিনা।'

'আর হেসিদের ঘরে?'

খুব হতাশ মুখভঙ্গি করে বুড়ি বলল, 'দেখা যাক্ কে আসে। নতুন ভাড়াটে পাব বলে তো মনে হয় না।'

'ওর ঘর কবে থেকে খালি হবে?'

'কালকে থেকেই। হেসিরা আজকেই এ ঘরে চলে আসছে।'

জিগগেস করলুম, 'ও ঘরটার ভাড়া কত?' হঠাৎ আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

'সত্তর মার্ক।'

'সত্তর ? বাবাঃ, সে তো ভয়ানক বেশি।'

'বাঃ রে, সকালবেলার কফি, দুখানা রুটি আর এতখানি পরিমাণ মাখন সমেত বেশি হল ?'

'সে তো বুঝলুম, কিন্তু ঐ কফির দামটা একটু কম ধরতে হবে—অর্থাৎ পঞ্চাশ মার্ক, তার এক পয়সা বেশি নয়।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'তার মানে ? আপনি ঘরটা নিতে চান নাকি ?'

'তাই ভাবছি।' বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। হেসিদের ঘর আর আমার নিজের ঘরের মাঝখানে একটি দরজা রয়েছে, সেইটের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত প্যাট্‌কে জালেওয়াস্কির আস্তানায় এনে ওঠাব ! ব্যাপারটা খুব প্রীতিকর ঠেকছে না।

তবু খানিক পরে ঘুরে ফিরে গিয়ে ওদের দরজায় টোকা মারলুম।

ফ্রাউ হেসি ঘরেই ছিল। ঘরের অর্ধেক আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা আয়নার সুমুখে বসে ফ্রাউ হেসি মুখে পাউডার ঘষছে। ওকে নমস্কার এবং কুশল প্রশ্নাদি করতে-করতেই একবার ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে দেখে নিলুম। ঘরটা তো বেশ বড়ই বোধ হচ্ছে। আগে ঠিক বোঝা যেত না। এখন আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়াতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেওয়ালের ওয়াল-পেপার সাধারণ গোছের হলেও জিনিসটা তেমন পুরোনো নয়। দরজা-জানালাগুলো নতুন রঙ করা হয়েছে। সামনের বারান্দাটিও বেশ ভালো, দিব্যি বড়সড়।

ফ্রাউ হেসি বলল, 'শুনেছেন তো উনি কি মতলব করেছেন ? আমাকে নাকি এখন ও ঘরে যেতে হবে। কি লজ্জা ! কি লজ্জা !'

'কেন, লজ্জার কি হল ?'

ফ্রাউ হেসি রেগে-মেগে বলে উঠল, 'লজ্জা নয় তো কি ? সবাই জানে ও ঘরের বাসিন্দেটিকে আমি একেবারে সইতে পারতুম না, এখন কিনা আমাকে ওর ঘরটিতেই আশ্রয় নিতে হবে। আর ঘরের কি ছিরি ! বারান্দাটুকুও নেই, একটি মাত্র জানালা। ভাড়া না হয় একটু কম, তাই বলে—ভাবুন দেখিনি আমার দশা দেখে ও যখন ক্রিশ্চিয়ান্ হোম্-এ বসে মনে-মনে হাসবে তখন কেমন হবে।'

'না, তা, উনি হাসতে যাবেন কেন ?'

'হাসবেন না আবার ! এখুনি হাসছেন। ভারি তো মানুষ—বাপ-মা-মরা ছেলে-

মেয়ের নার্স। আরো কি দেখুন, ও পাশের ঘরেই আবার আবুনা বোনিগ। তাছাড়া ঘরের মধ্যে বেড়ালের গন্ধ।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তা কেন, বেড়াল তো এমন কিছু নোংরা জীব নয়। বরং দেখতে শুনতে দিব্যি সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

ক্রাউ হেসি রীতিমতো রেগে উঠে বলল, 'তাই বুঝি? তা সবার নাক তো আর একরকম নয়। যাকৃগে, আমি কিছু জানিনে। আসবাবপত্র ও যেমন করে পারে টেনে-হিঁচড়ে নিকৃগে। আমি এই বেরুচ্ছি। মানুষ আর কত সইতে পারে? হাড় জালাতন হয়েছে।' বলেই উঠে দাঁড়াল।

রাগে মুখ-চোখ সব কাঁপছে, তাতে মুখের আলগা পাউডারগুলো ঝরে গিয়ে রীতিমতো এক পশলা পাউডার বৃষ্টি হয়ে গেল। ঠোঁটে খুব এক চোট রঙ মেখেছে আর এসেন্সের গন্ধে চারদিক আমোদিত। দ্রুতপদে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেল মনে হল গোটা একটা গন্ধদ্রব্যের দোকানের সৌরভ যেন ওর সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে।

ও বেরিয়ে যেতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। এবার তাহলে ঘরটা একবার ভালো ভাবে যাচাই করে দেখা যাক্। ধর, প্যাট্ যদি আসে তবে কেমন করে ঘরটা সাজানো যাবে, কোথায় কি আসবাব থাকবে, ইত্যাদি। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারলুম না। প্যাট্ এখানে আসবে, আমার পাশে থাকবে, সারাক্ষণ তাকে কাছে পাব—একথা যেন ভাবাই যায় না। ও সুস্থ থাকলে ওকে এখানে আনবার কথা হয়তো ভাবতুমই না। যাক, তবু একবার দরজাটা খুলে বারান্দাটা পা ফেলে-ফেলে মেপে দেখলুম। তারপরে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

প্যাট্-এর ঘরে এসে দেখি ও তখনো ঘুমুচ্ছে। খুব আস্তে আরাম কেদারাটা বিছানার কাছে টেনে এনে চুপচাপ বসে পড়লুম। ও কিন্তু তক্ষুনি জেগে গেল। বললুম, 'আহা, আমি বুঝি তোমাকে জাগিয়ে দিলুম।'

ও জিগগেস করল, 'তুমি সারাক্ষণ এখানেই বসে আছ নাকি?'

'না, এইমাত্র ফিরে এলুম।'

আড়মোড়া ভেঙে সন্ত-ভাঙা ঘুমের জড়তাটা কাটিয়ে নিল। তারপরে একটু এগিয়ে এসে মুখখানা আমার হাতের উপরে রেখে শুয়ে রইল। বলল, 'তাই ভালো, ঘুমিয়ে থাকলে পাশে বসে কেউ দেখে, সে আমি পছন্দ করিনে।'

'সে আমি বেশ বুঝি। আমি নিজেও সেটা পছন্দ করিনে। বসে-বসে তোমাকে

দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তুমি হঠাৎ জেগে না যাও তাই শুধু চেয়েছিলুম।
তা আর একটু ঘুমোবে নাকি?'
'না, ঢের ঘুমিয়েছি। এবার উঠে পড়ব।'
আমি উঠে পাশের ঘরে চলে গেলুম। ও ততক্ষণ কাপড়-চোপড় বদলে নিল।
বাইরে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। সুমুখের একটা বাড়িতে গ্রামোফোনে
হোহেনফ্রিড্‌বার্গ-মার্চ-এর রেকর্ড বাজছে। একটি টেকো-মাথা লোক গ্রামোফোন
বাজাচ্ছে, জানালা দিয়ে তাই দেখা যায়। লোকটি ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক
পায়চারি করছে আর বাজনার তালে-তালে পা ফেলছে। সন্ধ্যের আবছা
অন্ধকারে ওর টাক-মাথা চক্‌চক্‌ করছে। আর কোনো কাজ নেই বলেই
লোকটিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছি।
মনটা ভালো লাগছে না, হঠাৎ কেমন মনটা দমে গেছে।
প্যাট্ এসে ঢুকল। ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখে এতটুকু ক্লান্তির আভাস
নেই, সদ্যফোটা ফুলটির মতো সজীব। দেখে অবাক হয়ে গেলুম। বললুম,
'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।'
'হ্যাঁ, শরীরটা ভালোই লাগছে, বব্। রাত্তিরে খুব ভালো ঘুম হলে যেমনটা হয়
তেমনি। আমার একটুতেই খুব পরিবর্তন হয়ে যায়।'
'তাই তো দেখছি। এত দ্রুত পরিবর্তন যে বিশ্বাস করা দায়।'
আমার কাঁধে হেলান দিয়ে হেসে বলল, 'খুব দ্রুত নাকি, রবি?'
'না, না, তা কেন? অমনিতেই আমার বুঝতে একটু দেরি হয় কিনা, তাই
দ্রুত ঠেকছে।'
'ধীরে-সুস্থে বুঝলেই ঠিক বোঝা হয়, সেই বোঝাটাই ভালো।'
আমি বললুম, 'শোলা যেমন সহজে জলে ভাসে আমি তেমনি সোজাসুজি
বুঝে নিই।' ও মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, তুমি যাই বল না কেন বুঝবার সময়
ঠিক বোঝ। নিজের সম্বন্ধে তোমার ভয়ানক ভুল ধারণা। নিজেকে অমন ভুল
বুঝতে আমি আর কাউকে দেখিনি।'
ওর কাঁধ থেকে আমার হাত সরিয়ে নিলুম। ও বলল, 'কেমন, যা বললুম সত্যি
নয়? কিন্তু চল এবার বেরোই, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় দেখা যাক।'
'হ্যাঁ, কোথায় যাবে, বল?'
'আলফন্‌স-এর দোকানে। আবার সব পরিচিত জায়গাগুলি দেখে নিতে হবে।
মনে হচ্ছে কত যুগ পরে ফিরে এসেছি।'

'বেশ, কিন্তু তোমার যথেষ্ট খিদে পেয়েছে তো? খিদে না পেলে আলফন্‌স-এ গিয়ে লাভ নেই। খেতে না পারলে ও তোমাকে তাড়িয়ে দেবে।'
প্যাট্ হেসে বলল, 'আমার বিষম খিদে পেয়েছে।'
'তাহলে চল বেরিয়ে পড়ি।' হঠাৎ আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে।

দোকানে ঢুকতেই আলফন্‌স ছুটে এসে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করল। পরমুহূর্তেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন ফিরে এল তখন দেখি গলায় পরেছে শক্ত কলার আর সবুজ রঙের টাই। এমন জোরে গলরজ্জু পরেছে যে বেচারার দম আটকে যাবার দশা। স্বয়ং জার্মাণ সম্রাট এলেও বোধকরি সে এমন অপরূপ পোশাক করত না। সাবেকি কায়দা দেখাতে গিয়ে বেচারা নিজেই যেন লজ্জিত বোধ করছে।
দু-কনুই টেবিলের উপর রেখে প্যাট্ বলল, 'আলফন্‌স, ভালো কি-কি খাবার আছে বল দেখিনি।'
খুদে চোখ আরো খুদে করে গম্ভীর মুখে আলফন্‌স বলল, 'আপনাদের ভাগ্যি ভালো। আজ কাঁকড়ার মাংস আছে।'
শুনে আমাদের মুখের ভাবটা কেমন হয় দেখবার জন্য এক পা পিছিয়ে গেল। ইষৎ হেসে ফিসফিস করে বলল, 'আর সেই সঙ্গে এক গ্লাশ করে নতুন মোজেল পানীয়।' বলেই আর এক পদ পশ্চাদপসরণ। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার দিক থেকে সজোরে করতালি ধ্বনি। ফিরে দেখি একমাথা আলুথালু হলদে চুল, রোদে-পোড়া প্রকাণ্ড নাক আর সারা মুখে হাসি নিয়ে আমাদের রোমান্টিক-প্রবর দাঁড়িয়ে আছেন।
আলফন্‌স চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে গট্‌ফ্রিড্ যে! অ্যাঁ, সত্যি-সত্যি তুমি? আজ কি সৌভাগ্য! এস ভাই এস, বক্ষে এস।'
আমি প্যাট্‌কে বললুম, 'নাও, এবার একটা দেখবার মতো দৃশ্য দেখে নাও।'
ছুটে এসে একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরল। আলফন্‌স লেন্‌ত্‌স-এর পিঠ চাপড়াচ্ছে। তার যা শব্দ, ঠিক যেন কামারের দোকানে হাতুড়ি পেটানো হচ্ছে। ওয়েটারকে ডেকে বলল, 'হ্যান্‌স, নেপোলিয়নটা নিয়ে এসো তো।' তারপর গট্‌ফ্রিড্‌কে টানতে-টানতে বার্-এর কাছে নিয়ে গেল। ওয়েটার ইয়া বড় এক বোতল নিয়ে এল। আলফন্‌স দু-গ্লাশ ঢেলে নিয়ে বলল, 'হতচ্ছাড়া গট্‌ফ্রিড ব্যাটা দীর্ঘজীবী হোক।'

গট্‌ফ্রিড বলল, 'ব্যাটা জোচ্চোর আলফন্‌সটা বেঁচে থাক।'

ব্যস, এক ঢোঁকে দুটি গ্লাশ নিঃশেষ। গট্‌ফ্রিড্‌ বলে উঠল, 'চমৎকার।'

আলফন্‌স সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি চমৎকার জিনিস। দুঃখের বিষয় এমন জিনিসটা রসিয়ে খাওয়া গেল না, এক ঢোঁকে গিলে ফেললুম। কিন্তু কি করি বল, ফুর্তির সময় কি আর রয়ে-সয়ে খাওয়া যায়। এসো বরং আর এক গ্লাশ হোক।'

উভয়ের গ্লাশ তুলে ধরে আবার পূর্ববৎ শুভেচ্ছা বিনিময় হল। দুই দফা হয়ে যাবার পর আলফন্‌স আনন্দে গদগদ! 'গট্‌ফ্রিড্‌ ভায়া, আর এক গ্লাশ, কি বল?'

লেন্‌ত্‌স গ্লাশ এগিয়ে দিল, বলল, 'চলুক, মেঝেতে যতক্ষণ গড়াগড়ি না যাচ্ছি ততক্ষণ কনিয়াক্‌-এ আমার আপত্তি নেই।'

'এই তো কথার মতো কথা।' আলফন্‌স তৃতীয় গ্লাশ ঢালতে লাগল।

এবার লেন্‌ত্‌স আমাদের টেবিলের কাছে ফিরে এল। ও তখন হাঁপাচ্ছে। ঘড়ি বের করে বলল, 'গাড়ি নিয়ে ঠিক আটটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে কারখানায় পৌঁচেছি। এখন, কি বলবে বল?'

প্যাট্‌ বলে উঠল, 'রেকর্ড বটে। বেঁচে থাক্‌ আমাদের জাপ্‌। আমি নিজে ওকে এক বাক্স সিগারেট উপহার দেব।'

গট্‌ফ্রিড্‌-এর সঙ্গে-সঙ্গে আলফন্‌সও এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আর তুমি পাবে কাঁকড়ার মাংস এক ডিস্‌।' বলে আমাদের দুজনের হাতে একটা করে টেবিলক্লথ-এর মতো জিনিস দিয়ে বলল, 'এবার কোট খুলে ফেলে এটি বেশ করে জড়িয়ে নিন তো।' প্যাট্‌-এর দিকে ফিরে জিগগেস করল, 'আশা করি আপনারও এতে আপত্তি নেই।'

প্যাট্‌ বলল, 'আপত্তি কেন, ওটা নেহাত দরকার।'

আলফন্‌স খুশি হয়ে বলল, 'জানি আপনি ঠিক বুঝবেন, অন্য মেয়েদের মতো নন তো। দেখুন কাঁকড়াই যদি খেতে হয় তো আরাম করেই খাওয়া দরকার। কোথায় ঝোল পড়বে, দাগ হবে ভাবলে কি আর খাওয়া হয়। অবিশ্যি আপনার জন্য এর চাইতে ভালো জিনিসই আসছে, দাঁড়ান।'

ওয়েটার হ্যানস্‌ শাদা ধবধবে একটি এপ্রন এনে দিল! আলফন্‌স ভাঁজ খুলে সেটি প্যাট্‌-এর গায়ে পরিয়ে দিল। নিজেই তারিফ করে বলল, 'আপনাকে বেশ মানিয়েছে।' প্যাট্‌ হেসে বলল, 'ঠিক এমনটিই চেয়েছিলুম।'

আলফন্‌স খুশিতে গলে গিয়ে বলল, 'ব্যস, আপনার পছন্দ হয়েছে, এর বেশি আর কি চাই?'

পট্‌ফ্রিড্‌ টেবিলক্লথটা গলায় জড়াতে-জড়াতে বলল, 'কিন্তু আলফন্‌স ভায়া, তোমার দোকানটি যে এখন রীতিমতো নাপিতের দোকানের মতো দেখাচ্ছে।'

'এ আর কতক্ষণ, এক্ষুনি তো আবার এগুলো খুলে ফেলব। কিন্তু খাওয়ার আগে একটু গান-টান হলে ভালো হত না?' বলেই গ্রামোফোনের কাছে উঠে গিয়ে 'পিলগ্রিম্‌স্‌ কোরাস' রেকর্ডটা চাপিয়ে দিল। আমরা সবাই নিঃশব্দে শুনতে লাগলুম।

গান শেষ হতে না হতে ওয়েটার হ্যানস্‌ একটা বিরাট পাত্র করে কাঁকড়ার মাংস টেবিলে এনে হাজির করল। পাত্রটা কম পক্ষে বাচ্চাদের ছোটখাটো একটা চানের গামলার মতো হবে। মাংসে ভরতি, গরম, ধোঁয়া উঠছে। বেচারী আনতেই হাঁপিয়ে গেছে। আলফন্‌স বলল, আচ্ছা, আমার জন্যও একটা ন্যাপ্‌কিন নিয়ে এসো তো দেখি।'

লেন্‌ত্‌স চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ, তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে নাকি? আমাদের যে মহা সৌভাগ্য।'

'অবিশ্যি ভদ্রমহিলাটির যদি আপত্তি না থাকে।'

'সে কি আলফনস! খুব খুশি হব।' বলে প্যাট্‌ নিজের চেয়ার সরিয়ে নিয়ে জায়গা করে দিল। আলফন্‌স ওর পাশেই চেয়ার নিয়ে বসল। বলল, 'হ্যাঁ, আপনার পাশে বসাই ভালো। আমি ও জিনিসটা পরিবেশনে খুব ওস্তাদ, মেয়েদের পক্ষে এটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার ' বলেই ক্ষিপ্র হস্তে কাঁটা দিয়ে একটা কাঁকড়া তুলে প্যাট্‌-এর প্লেটে দিয়ে দিল। এমন দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে দিয়ে যেতে লাগল যে দেখে আমরা অবাক। প্যাট্‌-এর খুব খিদে পেয়েছিল। দিতে না দিতেই মুখে পুরে দিল।

'কেমন, খেতে ভালো হয়েছে?'

'চমৎকার!' প্যাট্‌ তার গ্লাশ উঁচিয়ে ধরে বলল, 'আলফন্‌স এর স্বাস্থ্য পান করা যাক্‌।'

আলফন্‌স খুশি হয়ে গ্লাশে গ্লাশ ঠেকিয়ে ধীরে-ধীরে গ্লাশটি নিঃশেষ করে দিল। আমি প্যাট্‌-এর দিকে তাকিয়েছিলুম। ব্র্যাণ্ডি না হয়ে অন্য পানীয় হলে আমি খুশি হতুম। ও আমার চাউনিটার অর্থ বুঝতে পেরে বলল, 'তোমার স্বাস্থ্য, বব্‌।' ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, খুশিতে যেন ঝলমল করছে। বললুম, 'তোমার স্বাস্থ্য, প্যাট্‌,' বলে এক চুমুকে গ্লাশ নিঃশেষ করলুম।

আমার দিকে আবার তাকিয়ে প্যাট্‌ বলল, 'কেমন, ভালো লাগছে না?'

'তা আর বলতে!' আর এক গ্লাশ ঢেলে নিয়ে বললুম, 'প্যাট্-এর উদ্দেশ্যে।' ওর মুখে খুশি আবার উপচে পড়ছে। বলল, 'বব্, তোমার স্বাস্থ্য আর তোমার গট্‌ফ্রিড্।'

আর একবার গ্লাশ খালি হল। লেন্‌ত্‌স বলল, 'হ্যাঁ, পানীয়র মতো পানীয় বটে।' আলফন্‌স বলল, 'এটা খুব দামী জিনিস, খুব পুরোনো ব্র্যাণ্ডি। জিনিসটার কদর বুঝেছ দেখে খুশি হলুম।' পাত্রটা থেকে একটা কাঁকড়ার দাড়া তুলে প্যাট্‌কে দিতে গেল।

প্যাট্ বলল, 'না, না, ওটা তুমিই নাও, আলফন্‌স। নইলে তোমার ভাগে আর কিছু থাকবে না।'

'আমি পরে নেব'খন। খাওয়ার ব্যাপারে আমি আপনাদের সবার চাইতে ওস্তাদ।'

'আচ্ছা, তবে দাও।' আলফন্‌স খুশি হয়ে আরো খানিকটা মাংস ওর প্লেটে তুলে দিল।

ওঠবার আগে আর এক দফা নেপোলিয়ন ব্র্যাণ্ডি পান করে আমরা আলফন্‌স-এর কাছে বিদায় নিলুম। প্যাট্ খুব খুশি। বলল, 'চমৎকার খাওয়া-দাওয়া হল। অনেক ধন্যবাদ আলফন্‌স।' বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আলফন্‌স কি যেন বিড়-বিড় করে বলে হাতখানা ধীরে টেনে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করল। দেখে তো লেন্‌ত্‌স-এর চক্ষুস্থির। আলফন্‌স বলল, 'শিগগির আবার একদিন আসুন। তুমিও এসো ভাই, গট্‌ফ্রিড্।'

বাইরে ল্যাম্পপোস্টের কাছে আমাদের ক্ষুদ্রকায় সিত্রয়াঁটি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওটাকে দেখে প্যাট্ অবাক, 'আরে গাড়িটা এখানে নাকি!'

গট্‌ফ্রিড গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'আজকে ও যা স্পীড্ দেখিয়েছে, তাই দেখে আমি ওর নতুন নাম দিয়েছি—হারকিউলিস্। আচ্ছা, এখন তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেব নাকি?'

প্যাট্ বলল, 'না।'

আমিও তাই ভাবছিলুম। 'বেশ, কোথায় যাওয়া যায় তবে?'

'বার্-এ, কি বল রব্বি,' বলে প্যাট্ আমার দিকে তাকাল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—একবার বার্-এ না গেলে হয়?'

লেন্‌ত্‌স খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে চলল। শীত নেই, আকাশ পরিষ্কার। প্রত্যেক

কাফের সামনে দলে-দলে লোক বসে আছে। গানের সুর ভেসে আসছে। প্যাট্ আমার পাশে বসে হাসছে। ও যে ভয়ানক অসুস্থ এ কথাটা কেন যেন আর বিশ্বাস হচ্ছে না। চেষ্টা করেও কথাটা মনে আনতে পারছিনে।

বার্-এ ফার্ডিনাণ্ড আর ভ্যালেন্টিন-এর সঙ্গে দেখা। ফার্ডিনাণ্ড-এর যেমন দস্তুর—দেখেই লাফিয়ে উঠে প্যাট্-এর দিকে এগিয়ে এল। 'এই যে, বনদেবী বন থেকে ফিরে এসেছেন।' প্যাট্-এর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রণরঙ্গিণী, ধনুধারিণী, কী পানীয় চাই আজ্ঞা করুন।'

গট্‌ফ্রিড্ কাঁধ থেকে ফার্ডিনাণ্ড-এর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'মানুষের চোখের জল নিয়ে যার ব্যবসা তার কি আর কখনো বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে? তুমি একটি আস্ত বলীবর্দ, দু-দুটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেটা বুঝি তোমার চোখেই পড়ল না?'

ফার্ডিনাণ্ড ওর কথা আমলেই আনল না। বলল, 'রোম্যান্টিকরা কখনো সঙ্গী হয় না, তারা শুধু অনুচর।

লেন্ত্স হেসে প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এবার তোমাকে একটা পাঁচমিশেলি ককটেল্ তৈরি করে দিই। একে বলে কলিব্রি ককটেল্—এটা ব্রেজিল-এ খুব চলতি।' কাউণ্টারের কাছে গিয়ে হরেক রকম জিনিস মিশিয়ে ককটেল্ তৈরি করে আনল। প্যাট্-এর হাতে দিয়ে বলল, 'খেতে কেমন লাগছে?'

প্যাট্ বলল, 'একটু জোলো-জোলো, কিন্তু ব্রেজিলিয়ান তো বটে।'

গট্‌ফ্রিড্ হেসে বলল, 'জোলো হলে কি হবে, খুব তেজ আছে, রাম্ আর ভড্‌কা দিয়ে তৈরি কিনা।'

জিনিসটার দিকে এক নজর তাকিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি যে ওর মধ্যে রাম্‌ও নেই ভড্‌কাও নেই—ওটা আসলে ফলের রস, নেবু, টোমেটো আর কয়েক ফোঁটা টনিক ওষুধ। মোটের উপর মাদক বর্জিত ককটেল্। ভাগ্যিস প্যাট্ কিছু বুঝতে পারেনি। পর-পর ও তিন গ্লাশ কলিব্রি ককটেল্ খেয়ে ফেলল। ওকে যে আমরা রোগী বলে ভাবছি না তাই দেখে ও ভারি খুশি। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সবাই উঠে পড়লুম, শুধু ভ্যালেন্টিন থেকে গেল।

লেন্ত্স ইচ্ছে করেই ফার্ডিনাণ্ডকে গাড়িতে ডেকে নিল। নইলে প্যাট্ হয়তো মনে করত ও অসুস্থ বলেই আমরা তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি। লেন্ত্স খুব ভেবে-চিন্তেই সব কিছু করছিল, তবু কেন যে মনটা হঠাৎ আবার বিষম দমে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে প্যাটু আমার হাতে হাত দিয়ে চলতে লাগল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওর চলবার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। ওর হাতের উষ্ণ স্পর্শটি বেশ লাগছে। গ্যাসলাইটের আলো ওর মুখে উপর দিয়ে যখন কেঁপে-কেঁপে খেলে যায় তখন ওকে এমন সজীব দেখায়—ও যে অসুস্থ একথা কিছুতেই ভাবতে পারিনে। দিনের বেলায় বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এমন উষ্ণ মদির রাত্রে ও কথাটাকে মনে আমল দিতেই ইচ্ছে করে না। ওকে জিগগেস করলুম, 'একবার আমার ওখানটায় যাবে ?'

বলবামাত্র ও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

হোটেলের কাছে এসে দেখি আমাদের প্যাসেজের আলোটা জ্বলছে। দুত্তোর, এ আবার কি জ্বালা। ওকে বললুম, 'এক মিনিট দাঁড়াও তো দেখি ব্যাপারটা কি ?' দরজা খুলে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলুম। ফ্রাউ বেওার-এর ঘরটা খোলা, সেখানেও আলো জ্বলছে। হেসি বেচারি করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একটা সিল্কের শেড্ দেওয়া ভারি টেবিল ল্যাম্প। আস্তে-আস্তে পা ফেলে এগোচ্ছে। বললুম, 'এই যে নমস্কার। এত দেরি যে ?'

লোকটা ল্যাম্পের ভারে প্রায় নুয়ে পড়েছে। গোঁফওয়ালা ফ্যাকাশে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, 'আর বলেন কেন. এই সবে ঘণ্টাখানেক আগে আপিস থেকে ফিরেছি। জিনিসপত্তরগুলো এঘরে আনতে হবে তো। রাত্তিরে ছাড়া আর সময় কোথায় ?'

'ওঃ, আপনার স্ত্রী ঘরে নেই বুঝি ?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওঁর পরিচিত একটি মেয়ের ওখানে গেছেন। তবু বাঁচোয়া, একটি বন্ধু জুটেছে। বেশির ভাগ সময় ওঁর কাছেই থাকেন।' নির্বিকার-চিত্তে একটু হেসে ও আবার গুটি-গুটি পা ফেলে এগিয়ে গেল। প্যাটুকে ভিতরে নিয়ে এলুম। ঘরে ঢুকে বললুম, 'আলোটা আর জ্বালব না, কি বল ?'

'না, লক্ষ্মীটি, একবার জ্বাল। এই একটুক্ষণ, তারপরে আবার নিবিয়ে দিও।' হেসে বললুম, 'তোমার আর আশ মেটে না।' তীব্র আলোতে ক্ষণকালের জন্য সিল্কের পোশাক ঝলমল করে উঠল। একটু পরেই আলোটা নিবিয়ে দিলুম। জানালাগুলো খোলা। রাস্তার ওধারে গাছগুলোর ভিতর দিয়ে বাতাস সশব্দে এসে ঢুকছে। 'আঃ, চমৎকার,' বলে প্যাটু জানালার ধারেই কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল। জিগগেস করলুম, 'জায়গাটা তোমার ভালো লাগে ?'

'লাগে বৈকি বব্, গ্রীষ্মকালে বিস্তীর্ণ পার্কে বসে থাকতে যেমন আরাম এও তেমনি। ভারি সুন্দর।'

জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা, করিডর দিয়ে আসবার সময় আমাদের পাশের ঘরটা বোধকরি লক্ষ্য করে দেখনি ?'

'না তো, কেন ?'

'বাঁ ধারে যে সুন্দর বারান্দাটি দেখছ সেটা ঠিক ওঘরের লাগাও। দু-দিকটা দেয়াল ঘেরা আর সামনেটা ফাঁকা। ও ঘরটায় তুমি যদি থাক তবে গায়ে রোদ লাগাতে হলে গাত্রাবরণ না থাকলেও চলে।'

'হ্যাঁ, যদি থাকা যেত– '

নেহাত ভালোমানুষের মতো বললুম, 'তা ইচ্ছে করলে থাকতে পার। ও ঘরটা দু-একদিনের মধ্যেই খালি হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সেটা কি আমাদের পক্ষে ভালো হবে, সারাক্ষণ দুজনে একসঙ্গে থাকা ?'

আমি বললুম, 'কেন, সারাক্ষণ তো একসঙ্গে থাকব না। এই ধর, সারাদিন তো আমি বাইরেই থাকব। মাঝে-মাঝে রাত্তিরেও ফেরা হবে না। তাছাড়া দুজনে এক জায়গায় থাকলে আমাদের আর মিছিমিছি রেস্তঁরায় গিয়ে বসে থাকতে হয় না। তাও একটু বাদেই আবার ছাড়াছাড়ি, যেন সারাক্ষণ শুধু পথে-ঘাটেই দেখা।'

জানালার কোণটিতে ও একটু নড়ে-চড়ে বসল। বলল, 'মনে হচ্ছে যেন এসব কথা তুমি আগেভাগেই ভেবে-চিন্তে রেখেছ।'

'হ্যাঁ, ভেবেছি বৈকি। আজকে সারা সন্ধ্যা তাই ভেবেছি।'

সোজা হয়ে বসে প্যাট্‌ বলল, 'রব্বি, তুমি সত্যি-সত্যি আমাকে আসতে বলছ ?'

'সত্যি না তো কি ? এতক্ষণ দেখেও বুঝতে পারছ না ?'

ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল। 'আচ্ছা বব্, বল তো—' ওর গলার স্বর খুব গম্ভীর। 'বল তো, আজকেই হঠাৎ কেন কথাটা তুললে ?'

'কেন বললুম, শুনবে ?' আমারও গলার স্বর আপনি গম্ভীর হয়ে এল। কারণ বলতে গিয়ে মনে হল শুধু ঘরটাই একমাত্র কারণ নয়, তার চাইতেও বড় তাগিদ রয়েছে। বললুম, 'আজকে যে বলছি তার কারণ, গত কয়েক সপ্তাহ একত্র থেকে আমি বুঝেছি এর চাইতে বড় সুখ সংসারে আর নেই। এই ক্ষণে-ক্ষণে ছাড়াছাড়ি আর আমি সইতে পারিনে। তোমাকে আরও বেশি করে আমি পেতে চাই।

সারাক্ষণ তুমি আমার কাছটিতে থাকবে। যাই বল, ভালোবাসায় লুকোচুরি খেলা আর আমার ভালো লাগে না। এ আমার অসহ্য হয়েছে। আমি শুধু তোমাকেই চাই, আর কিছু না শুধু তুমি আর তুমি আর তুমি, এক মুহূর্ত আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

ওর নিঃশ্বাস জোরে-জোরে উঠছে আর পড়ছে। জানালার কোণটিতে তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। হাত দুটি হাঁটুর উপর রাখা, নির্বাক মূর্তি। রাস্তার ওপারে যে বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্রটা চলছে গাছের উপর দিয়ে তারই লালচে আলো ওর চকচকে জুতোর উপরে এসে পড়েছে। আলোটা আস্তে-আস্তে সরে গিয়ে ওর হাতে, ক্রমে ওর গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। বললুম, 'আমার কথা শুনে তুমি বোধহয় মনে-মনে হাসছ।'

'হাসছি ! কেন, হাসব কেন ?'

'এই বললুম কিনা, সারাক্ষণ তোমাকে চাই। চাওয়াটা তো একতরফা হলে চলবে না। তোমাকেও চাইতে হবে।'

ও একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'দেখছি এরই মধ্যে তোমার আগের মতামত বদলে গেছে।'

'কই, না তো।'

'তোমার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। বলছ আমাকে তোমার চাই। আমার মতের তো অপেক্ষা রাখছ না, শুধু নিজের দাবিটাই জানাচ্ছ।'

'সে আর এমন কি নতুন কথা হল ? তোমার যদি মত না হয় তবে মানা করবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। আমার চাওয়াতে তো কিছু এসে যায় না।'

হঠাৎ ও আমার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'কিন্তু মানা করতে যাব কেন, বব্ ' গলার স্বরে অনেকখানি আবেগ ঢেলে দিয়ে বলল, 'আমিও তো কাছেই পেতে চাই—'

ওর কথা শুনে আমিই অবাক হয়ে গেলুম। দুহাত বাড়িয়ে ওকে বাহুবন্ধনে টেনে নিলুম। ওর নরম চুলের স্পর্শ আমার মুখে এসে লাগছে।

'সত্যি বলছ, প্যাট্ ?'

'সত্যি না তো কি ?'

'যাক বাঁচালে, ভেবেছিলুম তোমাকে রাজী করাতে কত না সাধ্য-সাধনা করতে হবে।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, তুমি যা বলবে তাই হবে।' বলে এক হাতে

আমার গলা জড়িয়ে ধরল। 'ভালোই হল কিচ্ছু আর ভাবতে হবে না, কিচ্ছু আর করতে হবে না। শুধু তোমার উপর ভর করে থাকব। কি বল লক্ষ্মীটি, এর চাইতে সহজ আর কিচ্ছু হতে পারে না, মিথ্যে নিজের বোঝা নিজে টেনে কী লাভ?'

ওর মতো মেয়ের মুখে এমন কথা শুনব কখনো ভাবিনি। বললুম, 'ঠিক বলেছ, প্যাট্‌ ঠিক বলেছ।'

খানিকক্ষণ দুজনেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। বললুম, 'তোমার দরকারী জিনিসপত্তর সবই এখানে পাবে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, দেখ। এমন কি তোমার জন্য একটা চায়ের ট্রলিও যোগাড় করা যাবে। আমাদের ফ্রিডাকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব।'

প্যাট্‌ বলল, 'ট্রলি তো আমাদের রয়েছে, ওটা আমার নিজের কেনা।'

'তাহলে তো ভালোই হল। কালকে থেকেই ফ্রিডাকে ট্রেনিং দিতে শুরু করব।'

ও আবার ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাথাটি আমার কাঁধে এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে আমি একটু শুয়ে নিই।' বলেই চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু ঘুমোয়নি। চোখ দুটি মেলা। ওপারের বিজ্ঞাপনের আলোটা দেওয়ালে ঠিকরে বিছানার উপরে এসে পড়ে আর ওর চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে জলে ওঠে। চারদিকটা নীরব। পাশের ঘর থেকে মাঝে-মাঝে এক-আধটা শব্দ আসছে। হেসি বেচারি তার ঘর-সংসারের টুকরো-টাকরা নিয়ে হুটোপুটি করছে। ওর দাম্পত্য জীবনের ভগ্নস্তূপের মাঝখানে ও যেন একটা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বললুম, 'আজ তুমি এখানেই থেকে যাও।'

ও উঠে বলল, 'না, লক্ষ্মীটি, আজকে নয়।'

'থাকলে খুশি হতুম—'

'না, আজ নয়, কালকে—'

বিছানা ছেড়ে উঠে ও অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। সেই প্রথম যেদিন ও আমার এখানে এসেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাপড়-জামা পরে নিয়ে ও ঘরের মধ্যে এমনি নিঃশব্দে পায়চারি করছিল।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য। কিন্তু কেন জানিনে অনেকদিন আগের একটা যেন

ভুলে-যাওয়া দিনের স্মৃতি হঠাৎ অশ্রুসিক্ত হয়ে মনটাকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অন্ধকারে পায়চারি করতে-করতে কখন ও একসময় আমার কাছে এসে দুহাতে আমার মুখ তুলে ধরল। বলল, 'জীবনটা বড় মধুর লাগছে, বব্। এই যে তোমাকে পেয়েছি, এর চাইতে বড় কথা আর কিছু হতে পারে না।'
ওর কথার কোনো জবাব দিলুম না, জবাব দেবার কিছু ছিলও না।

ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বার্-এ ফিরে গেলুম। দেখি কোষ্টার বসে আছে। আমাকে বলল, 'এস. খবর-বার্তা কী, শুনি।'
'খবর বিশেষ কিছু নেই, অটো।'
'তোমার জন্য একটা কিছু পানীয় দিতে বলব ?'
'না ভাই, পান করতে গেলে আমার অল্পেতে হবে না। এখন আর তা করতে চাইনে। তার চাইতে বরং অন্য কাজ-টাজ থাকলে করতে পারি। গট্‌ফ্রিড্ কি ট্যাক্সিটা নিয়ে বেরিয়েছে ?'
'না।'
'ব্যস, তাহলে আমিই ট্যাক্সিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'
কোষ্টার বলল, 'চল, আমিও যাচ্ছি।'
দুজনে কারখানায় এলুম। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে আমি সোজা চলে গেলুম ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে। দুটো গাড়ি আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। আমি যাবার পরে গুস্তাভ্ আর সেই অভিনেতা ছোকরা টমিও এসে হাজির হল। খানিক পরেই প্রথম দুটো গাড়ি ভাড়া পেয়ে চলে গেল। এবার আমার পালা। এক ভদ্রমহিলা যাবে ভিনেটায়। ভিনেটা একটা নাচঘর। অন্যান্য নাচঘর ছাড়িয়ে ওটা একটা গলির ভিতরে ঢুকে। ওখানটায় পৌঁছে মেয়েটি হাতব্যাগ হাতড়ে একটা পঞ্চাশ মার্কের নোট বের করল। আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, 'দুঃখিত, আমার কাছে তো নোটের ভাঙানি হবে না।'
নাচঘরের পোর্টার এগিয়ে এল। মেয়েটি জিগগেস করল, 'ভাড়া কত হয়েছে ?'
'এক মার্ক সত্তর ফেনিগ।'
মেয়েটি পোর্টারের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ভাড়াটা মিটিয়ে দিও। আমার সঙ্গে এস, আমি ক্যাশিয়ারের ওখান থেকে নোট ভাঙিয়ে দিচ্ছি।' পোর্টার গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে ক্যাশিয়ারের ঘরের দিকে চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বলল, 'এই নাও তোমার টাকা—'

আমি টাকা গুনে নিয়ে বললুম, 'এ যে এক মার্ক পঞ্চাশ ফেনিগ—'
'বাজে বোকো না। তুমি দেখছি হালচাল জানো না, নতুন লোক বুঝি? পোর্টারকে যে বকশিশ দিতে হয়, জানো? যাও ভাগো—'
সময়-সময় পোর্টারকে বকশিশ দিতে হয় বৈকি, কিন্তু সেটা হল ওরা যদি আমাকে ভাড়া জুটিয়ে দেয় তবেই। আমি নিজে যখন ভাড়াটে নিয়ে এলুম তখন ওকে বকশিশ দিতে যাব কেন? বললুম, আমি অত কচি খোকা নই, দাও আমার পুরো ভাড়া চাই।'
লোকটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'হুঁ, দেব না? দেব তোমার থুতনিতে। বাপু হে, এটি হচ্ছে আমার নিজের স্ট্যাণ্ড্, ভেবে-চিন্তে কথা কয়ো।'
টাকার জন্যে আমি মোটেই পরোয়া করছিলুম না, কিন্তু ও যে বাজে চাল দিয়ে ঠকাবে সে আমি সইতে রাজী নই। বললুম, 'ও সব আমি শুনছিনে, দাও বাকি টাকা দিয়ে দাও।'
পোর্টার ব্যাটা এমন হঠাৎ এক ঘুঁষি মেরে বসল যে আমি ঘুঁষিটা ঠেকাবার কোনো চেষ্টাই করতে পারলুম না। গাড়ির সিটে বসেছিলুম, মাথাটা নিচু করে যে ঘুঁষিটা এড়াব তারও জো ছিল না। মাথাটা গিয়ে লাগল ষ্টীয়ারিং হুইল-এ। কয়েক মুহূর্ত চোখে অন্ধকার দেখছিলুম, কিন্তু সহজেই সামলে নিলুম।
লোকটা তখনো আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে ঠেস মেরে বলল, 'কি হে বোকারাম, আর একটা চাই নাকি?'
মনে-মনে অবস্থাটা পলকের মধ্যে আঁচ করে নিলুম। নাঃ, সুবিধে হবে না। লোকটা আমার চাইতে ঢের বেশি জোয়ান। ওকে অতর্কিত অবস্থায় না পেলে ঠিক কায়দা করা যাবে না। তাছাড়া গাড়ির থেকে ঘুঁষি মেরে লাভ নেই, ও তার গায়েই লাগবে না। আর গাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই ঘুঁষির পর ঘুঁষি মেরে আমাকে ঠাণ্ডা করে দেবে। লোকটার নিঃশ্বাসে বিয়ারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমাকে শাসিয়ে বলল, 'ফের কথাটি বলেছ তো বউটি বিধবা হবে, বলে রাখছি।' আমি নড়ছি-চড়ছিনে, একদৃষ্টে ওর লালচে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাগে আমার রক্ত টগবগ করছে। ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি, ঠিক কোনখানটাতে মারতে হবে। চোখ দিয়ে ওকে রীতিমতো গিলে খাচ্ছি। খুব জোরালো কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন গায়ের প্রত্যেকটি রোম-কূপ দেখা যায় ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তেমনি আমি দেখতে পাচ্ছি।
হঠাৎ কোত্থেকে এক পুলিস এসে হাজির। হাঁক দিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে ওখানে?'

পোর্টার মুহূর্তে কাচুমাচু। 'কিছু না, সেপাইজি, কিছু না।'
সেপাই আমার দিকে তাকাল। আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, কিছু না।'
'তোমার মুখে যে রক্ত?'
'ও কিছু নয়, অমনি চোট লেগেছে।'
পোর্টার এক-পা পিছিয়ে গেল। ওর চোখের কোণে হাসি। ও ভেবেছে আমি ভয়ে ওর বিরুদ্ধে বলছিনে।
সেপাই বলল, 'বেশ, তবে যাও শিগগির চলে যাও।'
এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে স্ট্যাণ্ডে চলে এলুম।
আমাকে দেখেই গুস্তাভ্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ কি চেহারা তোমার!'
'হ্যাঁ, নাকটাতে একটু লেগেছে।' আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ওকে বললুম। গুস্তাভ্ বলল, 'এস ঐ রেস্তোরাঁয় চল। আরে ভায়া আমিও সার্জেন্টের চাকরি করে এসেছি। বাছাধনকে দেখিয়ে দেব না মজাটা। লোকটা বসে আছে—তাকে ঘুঁষি মেরে দেওয়া!'
আমাকে নিয়ে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ওখান থেকে খানিকটা বরফ নিয়ে আধঘণ্টা ধরে শুশ্রূষা চলল। বলল, 'এই দেখ না, একটু আঁচড়ের দাগও থাকবে না।'
অনেকক্ষণ ঘষাঘষির পরে জিগগেস করল, 'এখন মাথাটা কেমন লাগছে? ভালো? বেশ তবে আর সময় নষ্ট করা নয়।'
ইতিমধ্যে টমিও এসে গেল। বলল, 'ওঃ, ভিনেটা নাচঘরের কাছে যে জোয়ান মতো পোর্টার ব্যাটা থাকে তারই কাজ বুঝি? ব্যাটা ঘুঁষোঘুঁষির বেলায় খুব ওস্তাদ। ওকে একবারটি শিক্ষা না দিলে আর হচ্ছে না।'
গুস্তাভ্ বলল, 'শিক্ষাটা এক্ষুনি হবে।'
আমি বললুম, 'কিন্তু ভাই শিক্ষাটা আমি নিজের হাতেই দেব।'
কথাটা গুস্তাভ্-এর পছন্দ হল না। বলল, 'তুমি গাড়ি থেকে বেরোবার আগেই—'
বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি একটা মতলব এঁটে রেখেছি। অবিশ্যি আমি যদি সুবিধে করে উঠতে না পারি তখন তোমরা না হয় চেষ্টা করে দেখ।'
'বেশ, তাই হবে।'
মাথায় গুস্তাভ্-এর টুপি চড়িয়ে তারই গাড়ি নিয়ে রওনা হলুম, পোর্টার ব্যাটা যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে। তাছাড়া গলিটাও অন্ধকার, অমনিতেই আলো করে মুখ দেখতে পারবে না।

নাচঘরের সুমুখে এসে পৌঁছুলুম।

রাস্তায় দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। গুস্তাভ্ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। হাতে কুড়ি মার্ক-এর নোট। ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে বলল, 'কি মুশকিল রে, ভাঙানি তো নেই। ওহে পোর্টার, শোনো তো। অ্যাঁঃ, কত বললে, এক মার্ক সত্তর ফেনিগ তো? আচ্ছা ওকে দামটা মিটিয়ে দাও। আমি ক্যাশিয়ারের কাছে নোট ভাঙিয়ে নিচ্ছি।' বলে এগিয়ে গেল।

পোর্টার এগিয়ে এসে এক মার্ক পঞ্চাশ ফেনিগ আমার হাতে গুঁজে দিল। আমি বাকি পয়সার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলুম। লোকটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'যাও, ভাগো—'

আমিও তেমনি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'শালা, শূয়ারকা বাচ্চা, দাও বলছি বাকি পয়সা।' লোকটা কয়েক মুহূর্ত হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে জিভটা একবার ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিয়ে ধীরভাবে বলল, 'মুখ সামলে কথা কও বলছি, নইলে মাস-খানেকের জন্য একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব।' বলেই ঘুঁষি উঁচিয়ে এল। ঘুঁষিটা লাগলে আর রক্ষে ছিল না। কিন্তু আমি তৈরিই ছিলুম, মাথাটা পলকে সরিয়ে নিলুম। বাঁ হাতের মুঠোতে খুব চোখা-চোখা পেরেকওয়ালা একটা চাকা মতো জিনিস আগে থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলুম। সেটা দিলুম বাড়িয়ে আর ওর প্রচণ্ড ঘুঁষিটা এসে পড়ল সেই পেরেকের উপর। লোকটা আর্তনাদ করে তিন-পা পিছিয়ে গেল, একটা ষ্টীম-এঞ্জিনের মতো ফোঁসফোঁস করছে আর হাতটা ক্রমাগত ঝাড়ছে।

সুযোগ বুঝে আমি গাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলুম। 'কেমন হে বাছাধন, এখন আমাকে চিনতে পারছ?' বলেই পেটে এক ঘুঁষি। লোকটা ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গেল।

গুস্তাভ্ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক, দুই গুনতে শুরু করেছে। পাঁচ গুনতে না গুনতে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁচের মতো ফ্যাকাশে মুখ। সেই আগের বারে যেমন একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম আবার তেমনি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ইয়া বড়, হোঁৎকা মুখটা জানোয়ারের মতো দেখতে।

হঠাৎ রাগে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পেয়ে গেল। লোকটার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুঁষির উপর ঘুঁষি চালাতে লাগলুম। গত কদিন, ক'সপ্তাহ ধরে আমার মনের যত সঞ্চিত জ্বালা সব নিঃশেষে ওর উপর ঝেড়ে দিলুম। একধার থেকে মেরেই চলেছি, কে যেন পিছন থেকে টেনে আমাকে ছাড়িয়ে নিল—

গুস্তাভ্ বলছে, 'আরে, লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি ?'

ফিরে দেখি পোর্টারটা কোনো রকমে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাকে মুখে রক্ত গড়াচ্ছে। তারপর লোকটা হঠাৎ ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে নাচঘরের দরজার দিকে এগোতে লাগল— যেন একটা প্রকাণ্ড পোকা আস্তে-আস্তে গড়িয়ে চলেছে।

গুস্তাভ্ বলল, 'যাক, ব্যাটা এখন থেকে সাবধান হবে, আর যখন-তখন ঘুঁষি চালাবে না। এস এখন তাড়াতাড়ি ভেগে যাই, কে আবার এসে পড়বে। একেবারে খুনোখুনি কাণ্ড করে বসেছ।'

টাকাগুলো ফুটপাথে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে দুজনে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান।

গুস্তাভ্‌কে জিগগেস করলুম, 'দেখ তো আমার কোথাও কেটেকুটে গেছে নাকি, না কি পোর্টারের রক্তই লেগেছে।'

ও বলল, 'তোমার নাকেই আবার লেগেছে। আমি দেখেছি তো, ব্যাটা বেশ এক ঘা তোমার নাকে বসিয়েছিল।'

'আশ্চর্য, আমি কিচ্ছু টেরই পাইনি।'

গুস্তাভ্ হেসে উঠল।

আমি বললুম, 'জানো, এখন আমার মনটা ভারি ভালো লাগছে।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বার্-এর সামনে আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ভিতরে গিয়ে গট্‌ফ্রিড্-এর কাছ থেকে চাবি আর কাগজপত্তর নিয়ে নিলুম। গট্‌ফ্রিড্ আমার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল। জিগগেস করলুম, 'আজকের রোজগার কেমন হল ?'

'তেমন কিছু নয়। রোজই দেখি হয় ট্যাক্সির ছড়াছড়ি না হয় তো চড়নদারেরই অভাব। কালকে তোমার কেমন হল ?'

'ভালো না। সারারাত বসে-বসে কুড়ি মার্কও রোজগার হয়নি।'

গট্‌ফ্রিড্ ভুরু কুঁচকে বলল, 'বড্ড খারাপ সময় পড়েছে। তা তোমার বোধহয় তেমন তাড়া নেই কি বল ?'

'না, তাড়া আর কি ? কেন ?'

'তাহলে আমাকে একটু নিয়ে চল।'

'বেশ।' দুজনে ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম। 'কোথায় যাবে বল ?'

'ক্যাথিড্রেলের দিকে।'

'অ্যাঃ ! কি বললে বুঝতে পারছিনে। ক্যাথিড্রেল বললে যেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ, ক্যাথিড্রেলেই যাব।' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন ? চালাও।'

'বেশ, চল।'

শহরের পুরোনো অঞ্চলে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্যাথিড্রেল ; চারিদিকে পাদ্রি-সাহেবদের বাড়ি। বড় গেটের সামনে এসে গাড়ি থামালুম। গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'আর একটু এগিয়ে চল, ঘুরে ওদিকটায় যেতে হবে।' পিছন দিকে একটা ছোট্ট গেটের কাছে থামাতে বলল। গট্‌ফ্রিড্ নামতেই বললুম, 'মনে হচ্ছে যেন এতদিন অকম্ম-কুকম্ম যা করেছ তাই কবুল করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছ ?'

ও বলল, 'এস না আমার সঙ্গে।'

আমি হেসে উঠলুম, 'না ভাই আজকে না। সকাল বেলাতেই একবার যীশুর নাম করে নিয়েছি, ওতেই সারাদিনের কাজ হয়ে গেছে।'

'যাও-যাও, ফাজলামো করো না। এখন এস দিকিনি, একটা মজার জিনিস দেখবে।'

শুনে কৌতূহল হল। গাড়ি থেকে নেমে ওর সঙ্গে-সঙ্গে চললুম। গেট পার হয়েই গির্জার হাতার মধ্যে ঢুকলুম। মস্ত বড় একটি চৌকোনা জায়গা। চারদিকে সারি-সারি গ্র্যানাইট পাথরের থাম, তার উপরে পর-পর কয়েকটা তোরণ তৈরি হয়েছে। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় একটা ফুলের বাগান। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে যীশুর মূর্তি সমেত বহুদিনের পুরোনো একটা ক্রস। যত্ন আর তদারকের অভাবে বাগানটা রীতিমতো একটি জঙ্গল হয়ে উঠেছে, চারদিকে অজস্র ফুল ফুটে আছে।

শাদা আর লাল গোলাপের প্রকাণ্ড দুটো ঝোপের দিকে দেখিয়ে গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'এইটে দেখাবার জন্যই তোমাকে এনেছি। কেমন, ফুলগুলো চিনতে পারছ?'

আবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

'চিনতে পারছি বৈকি। ওঃ, তাহলে এখান থেকেই তুমি ফুল চুরি কর। শেষটায় গির্জেয় ডাকাতি শুরু করেছ।'

এই এক হপ্তা আগে প্যাট্ যেদিন ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বোর্ডিং-হাউসে উঠে এল সেদিন সন্ধ্যায় গট্‌ফ্রিড্ জাপ্-এর হাত দিয়ে প্যাট্-এর জন্য এত-এত গোলাপ ফুল পাঠিয়েছিল। জাপ্ বেচারী একবারে সবগুলো আনতেই পারেনি। দুবারে দু-পাঁজা ভর্তি করে তবে ঘরে এনে পৌছল। গট্‌ফ্রিড্ কোত্থেকে অত ফুল জোটাল অনেক ভেবেও তার কিনারা করতে পারিনি। কারণ আমি জানি ও কস্মিনকালে পয়সা দিয়ে ফুল কেনে না। আর শহরের পার্কেও এ ফুল কখনো দেখিনি।

মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ, একটা ভালো জিনিস আবিষ্কার করেছ বৈকি।'

গট্‌ফ্রিড্ খুশি হয়ে বলল, 'রীতিমতো একটি সোনার খনি।' গম্ভীরভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমাকে স্বেচ্ছায় অংশীদার করলুম। অবিলম্বে এর সদ্ব্যবহার শুরু কর।'

'অবিলম্বে কেন?'

'কারণ আপাতত ম্যুনিসিপ্যাল পার্কটি ফুলশূন্য। এ যাবত ওটাই তো তোমার একমাত্র ভরসা ছিল।'

মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

গট্‌ফ্রিড্‌ বলল, 'এমন ভাণ্ডার হাতে থাকলে আর তোমাকে পায় কে? এই দিয়েই বাজি মাত করতে পারবে।'

আমি হেসে বললুম, 'সে তো যেন হল। কিন্তু গট্‌ফ্রিড্‌ ভায়া, ধরা পড়লে কি হবে? এখানে তো পালাবার পথ প্রশস্ত দেখছিনে, আর এ সব ধার্মিক লোকদের চোখে এ তো মহাপাপ।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'তুমিও যেমন, এখানে জনপ্রাণী কোথাও দেখতে পাচ্ছ? লড়াইয়ের পর থেকে লোকে গির্জেয় আসা ছেড়ে দিয়েছে। পলিটিকাল মিটিং-এ যায় তবু গির্জায় আসে না।'

'সেটা সত্যি কথা। কিন্তু পাদ্রিসাহেবরা তো রয়েছেন।'

'ওঃ, ফুলের জন্য পাদ্রিসাহেবদের কত দরদ! তাই যদি হত তবে কি বাগানের এমন দশা হয়। আরে, এই ফুল দিয়ে যদি একজনকে খুশি করতে পার তবে বিধাতাপুরুষ খুশিই হবেন। যাই বল, ভগবান এদের মতো নন। ওঁর রসজ্ঞান আছে, নিশ্চয়ই এককালে সৈনিক ছিলেন।'

'ঠিক বলেছ।' প্রকাণ্ড ঝোপটার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ভালোই হল, হপ্তা দুয়েক এখন এতেই চলে যাবে।'

গট্‌ফ্রিড্‌ বলল, 'দু-হপ্তা কি? ঢের বেশি। এগুলো খুব ভালো জাতের গোলাপ, আরো অনেকদিন ধরে ফুটবে। চাই কি সেপ্টেম্বর মাস অবধি কাটিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া ওখানটায় ক্রিস্যানথিমাম্‌ও রয়েছে। এস, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাগানের ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। ফুলের গন্ধে বাতাস আকুল। মৌমাছির ঝাঁক ফুলে-ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আরে শহরের মধ্যিখানে এখানটায় অত মৌমাছি এল কোত্থেকে? ধারে কাছে তো মৌচাক দেখছিনে, না কি পাদ্রিসাহেবরা তাদের বাড়ির ছাদে মৌচাক করেছে।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'না হে ভায়া, শহরের বাইরের কোথাও ফার্ম-টার্ম আছে. নিশ্চয়ই সেখান থেকে ওরা আসে। দেখলে তো, ওরা ঠিক জায়গাটি চিনে নিয়েছে, আমরাই শুধু আসল জায়গার পথ চিনিনে।'

ঘাড় নেড়ে বললুম, 'সবাই না চিনতে পারে, কিন্তু কেউ-কেউ চেনে, অন্তত তুমি তো চিনেছ।'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, আমাদের চেনবার তাড়াই নেই। বড় বেশি বুর্জোয়া হয়ে পড়েছি কিনা।'

অতি প্রাচীন ক্যাথিড্রেলটা নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শুদ্ধ মূর্তি, সোয়ালো পাখির দল চূড়োর চারদিকে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। বললুম, 'জায়গাটা কি নিস্তব্ধ।'

লেন্‌ত্‌স মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এখানটায় এলে মনে হয়, শুধু সময়ের অভাবেই ভালো মানুষ হতে পারলুম না।'

আমি বললুম, 'সময়ের অভাব আর নিস্তব্ধতার অভাব। নির্জনতারও প্রয়োজন আছে!'

লেন্‌ত্‌স হেসে বলল, 'লগ্ন খুইয়ে এখন সুবুদ্ধি হয়েছে। নাঃ, এখন আর হয় না। নির্জন জায়গায় এলে দম আটকে আসে। চল-চল বেরিয়ে পড়ি, হৈচৈ হট্টগোল চাই।'

গট্‌ফ্রিড্‌কে বাড়ি পৌছে দিয়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে ফিরে চললুম। যাবার পথে ইচ্ছে করেই কবরখানার পাশ দিয়ে গেলুম। ভেবেছিলুম প্যাট্ নিশ্চয়ই উপরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে। বার কয়েক হর্ন বাজালাম, কিন্তু কারো কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। অগত্যা আবার ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চললুম। একটু এগিয়েই দেখি সামনে ফ্রাউ হেসি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। সিল্কের বসনে দেহটি আবৃত। হঠাৎ বাঁক ঘুরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই দিকেই গাড়ির মোড় ফেরালুম। জিগগেস করে দেখি কোথায় যাচ্ছে, দরকার হয় তো পৌছে দিয়ে যেতে পারি।

মোড়ের মাথায় এসে দেখি ও একটা গাড়িতে উঠে বসছে। পুরোনো ঝরঝরে একটা মার্সিডিস্ গাড়ি। হাঁসের মতো নাকওয়ালা, রঙ-বেরঙের চেক স্যুট পরা একটা লোক ষ্টীয়ারিং-এ বসে। চলন্ত গাড়িটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। হুঁ, সারাদিন যে স্ত্রীলোক একলা ঘরে বসে থাকে তার পরিণাম এই হয়। এই কথাটাই ভাবতে-ভাবতে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড-এ এসে পৌছলুম।

গাড়ির হুড রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একটি-একটি করে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড ছেড়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না, বসে-বসেই ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ফ্রাউ হেসির কথাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিনে। প্যাট্-এর অবস্থাটা যদিও ফ্রাউ হেসির মতো নয় তবু সে বেচারিকেও সারাদিন একলাই থাকতে হয়—

ট্যাক্সি থেকে নেমে গুস্তাভ্-এর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। আমার দিকে একটা

ফ্লাস্ক এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে এস, এক পেয়ালা খেয়ে দেখ কি চমৎকার ঠাণ্ডা। বুদ্ধিটা নিজেই মাথা থেকে বের করেছি—বরফ দেওয়া কফি। এই গরমেও বেশ কয়েক ঘণ্টা ঠাণ্ডা থাকে। যাই বল, গুস্তাভ্ লোকটার বুদ্ধি আছে!'

ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে বললুম, 'তা বুদ্ধির কথাই যদি বল তো তোমার কাছে একটা পরামর্শ জিগগেস করি। ধর, একটি মেয়েকে যদি সারাদিন একলা-একলা থাকতে হয় তাহলে কি ভাবে তাকে ফুর্তিতে রাখা যায় বল দিকিনি।'

'ও, এই কথা!' আমার প্রশ্নটা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে গুস্তাভ্ বলল, 'আরে ছোঃ, এটা কি একটা প্রশ্ন হল। কেন ভায়া, একটি সন্তান নয়তো একটি কুকুরের ব্যবস্থা করে দাও। ব্যস্, সমস্যা চুকে গেল। হুঁ, এসব কথা দিয়ে আমাকে ঠকাবে, তুমিও যেমন।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'অ্যাঁঃ, কুকুর! হ্যাঁ, ঠিকই তো বলেছ। তাই তো, কথাটা আগে ভেবেই দেখিনি। হ্যাঁ, একটা কুকুর থাকলে আর সঙ্গীর অভাব হয় না।' ওকে একটা সিগারেট দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা শোনো দেখি, তুমি তো এসব খবর-টবর রাখ, একটা মংগ্রেল কিনতে কি খুব বেশি দাম পড়বে?'

গুস্তাভ্ বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, 'রবার্ট ভায়া, তোমার এই বন্ধু রত্নটিকে এখনো চিনলে না। জানো, আমার ভাবী শ্বশুর ডবারম্যান টেরিয়ার ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। তোমাকে বিনি পয়সাতেই একটা বাচ্চা এনে দিতে পারি। গুচ্ছের রয়েছে ওখানটায়, আজে-বাজে নয়, সব কুলিনের বাচ্চা।'

গুস্তাভ্ মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি। ওর ভাবী শ্বশুর কুকুরের খবরদারি তো করেই, তার উপরে আবার একটি রেস্তোরাঁ চালায়। আর ওর ভাবী পত্নী হল লণ্ড্রীর মালিক। গুস্তাভ্-এর ভারি মজা। খাওয়া-দাওয়াটা চলে শ্বশুরের উপর দিয়ে, আর ভাবী স্ত্রীকে দিয়ে জামা-কাপড় ইস্তিরি করায়। কিন্তু বিয়ে করার দিকে তাড়া নেই। বলে, 'বিয়ে করলেই হাঙ্গামা।'

গুস্তাভ্‌কে বললুম, 'দেখ, তোমার ঐ ডবারম্যান-ট্যান আমার পোষাবে না। ও হল গিয়ে বড়মানুষি কুকুর, ওর উপর আস্থা নেই।'

সৈন্যজাতীয় মানুষের মাথায় হঠাৎ-হঠাৎ বুদ্ধি গজায়। এক মুহূর্ত কি একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, 'আচ্ছা এস দিকিনি আমার সঙ্গে। মাথায় একটা মতলব এসেছে, এক জায়গায় একটু টোপ ফেলে দেখা যাক। খবরদার, তুমি কোনো কথাটি বলবে না।'

'বেশ।'

আমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। জানালার ধারে জলের পাত্র, তাতে সমুদ্রের শেওলা। একটা বাক্সের উপরে বসে আছে গোটা কতক গিনিপিগ, এক পাশে খাঁচায় রয়েছে কয়েকটা গোল্ড ফিঞ্চ আর ক্যানারি পাখি—সারাক্ষণ লাফাচ্ছে আর পাখা ঝাপটাচ্ছে।

বাদামী রঙের সোয়েটার গায়ে একটি বেঁটে-খাটো লোক আমাদের দেখে এগিয়ে এল। পা দুটো ফাঁক করে হাঁটে, চোখ দুটি জলো-জলো, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, নাকের আগাটি টকটকে লাল—দেখলেই মনে হয় বিয়ার আর রাম্ খেয়ে-খেয়ে ঐ চেহারা হয়েছে। গুস্তাভ্ বলল, 'এই যে অ্যাণ্টন্ কি খবর ?' মনে হল দুজনে অনেককালের বন্ধু। ঘরোয়া সম্বাদ-টম্বাদ জিগগেস করে গুস্তাভ্ আলাপটা জমিয়ে নিল।

দোকানের পিছন দিকটাতে কুকুরের ডাক আর কেঁই-কেঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে। গুস্তাভ্ সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। খানিক পরে দুহাতে দুটো ছোট্ট টেরিয়ার ঘাড়ে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। বাঁ হাতেরটা শাদায় কালোয় মেশানো, ডান হাতেরটা লালচে বাদামী রঙের। অ্যাণ্টন্-এর অলক্ষ্যে ডান হাতটা ঈষৎ একটু নাড়াল। আমি ইশারাটা বুঝে নিলুম।

লালচে বাদামী রঙের বাচ্চাটা দেখতে চমৎকার। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, সোজা মজবুত ঠ্যাঙ, মাথাটি লম্বাটে, বেশ সপ্রতিভ চেহারা। গুস্তাভ্ বাচ্চা দুটোকে হাত থেকে নামিয়ে বাদামী রঙের বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এটা বেশ মজার দেখতে তো, ব্যাটাকে পেলে কোথায় ?'

অ্যাণ্টন বলল কোন এক ভদ্রমহিলা নাকি এটাকে সাউথ আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছেন। গুস্তাভ্ হো-হো করে হেসে উঠল। অবিশ্বাসের হাসি হেসে কথাটাকে ও উড়িয়ে দিতে চায়। মনে-মনে রুষ্ট হয়ে অ্যাণ্টন্ কুকুরটার বংশ-গৌরব সম্বন্ধে যে লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করল, তাতে মনে হল ওর আদিপুরুষ স্বয়ং নোয়ার আর্কে স্থান পেয়েছিল। গুস্তাভ্ বলল, 'থাক অত কথা শুনতে চাইনে।' এবারে ও শাদা-কালোয় মেশানোটার দিকেই নজর দিলে। অ্যাণ্টন্ বাদামীটার দরুন একশো মার্ক দর হেঁকেছিল। গুস্তাভ্ বলল, 'পাঁচ। যাই বল ওর বংশে নিশ্চয় খুঁত আছে, নইলে ল্যাজটা অমন হবে কেন ? আর কান দুটোও ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত তেমন নয়। তার চাইতে এই শাদা-কালোটাই বেশ, ওর কিচ্ছু খুঁত-টুত দেখছিনে।'

আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিলুম। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার টুপি ধরে টানছে! অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটি হনুমান উপরটাতে বসে আছে। গায়ের রঙ হলদে, মুখটি ভারি বিষণ্ণ। গোল-গোল চোখের চারদিকটা কালো আর মুখের ভাবটা ঠিক একটি বুড়ি মেয়েমানুষের মতো। অবিকল মানুষের মতো ছোট-ছোট দুটি হাত।

আমি একটুও নড়লুম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। হনুমানটা আর একটু কাছে এগিয়ে এল। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল। খুব যে আমাকে অবিশ্বাস করছে এমন নয়, অথচ পুরোপুরি বিশ্বাসও করছে না। তারপর আস্তে-আস্তে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি একটা আঙুল ওর হাতে গুঁজে দিলুম। হাতটা একবার একটু সরিয়ে নিয়ে কি ভেবে আবার আঙুলটা মুঠোর মধ্যে নিল। ঠিক যেন ছোট্ট একটি শিশুর হাত, ভারি অদ্ভুত লাগছিল। ঐ অদ্ভুত দেহটার মধ্যে যেন একটা অসহায়, বোবা মানুষ আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে। ওর ঐ বিষণ্ণ চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না।

এদিকে গুস্তাভ্ তখনো কুকুরের বাংশাবলী আলোচনায় ব্যস্ত। বলল, 'আচ্ছা অ্যাণ্টন, তবে ঐ ঠিক হল। তোমাকে এর বদলে ডবারম্যান-এর একটা বাচ্চা দেওয়া হবে। এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'বাচ্চাটা এক্ষুনি নিয়ে যেতে চাও নাকি?'

'কি দাম ঠিক হল?'

'দাম আবার কেন? তোমাকে আগে যে ডবারম্যান-এর বাচ্চার কথা বলছিলুম তারই একটা দিয়ে এটা নেওয়া হবে। কেমন, দেখলে তো গুস্তাভ্ লোকটা কেমন, সুযোগ পেলে সে কী করতে পারে!'

ঠিক হল, পরে এসে কুকুরটাকে নিয়ে যাব, এখন তো ট্যাক্সি নিয়েই ঘুরতে হবে। বাইরে বেরিয়ে গুস্তাভ্ বলল, 'যা জিনিস বাগিয়ে এনেছি কি বলব, এ জিনিস দৈবাৎ মেলে। খাঁটি আইরিশ টেরিয়ার, বংশ একেবারে প্রথম শ্রেণীর, ওর বংশ-পরিচয়-পত্রটা না দেখাই ভালো, দেখলে ওকে কিছু বলতে হলে প্রত্যেকবার আগে কুর্নিশ করতে ইচ্ছা করবে।'

গুস্তাভ্‌কে বললুম, 'আমার মস্ত উপকার করেছ ভাই। এখন এস এক পাত্র পুরোনো কনিয়াক্ পান করা যাক।'

গুস্তাভ্ বলল, 'না ভাই, আজকে নয়। আজ রাত্তিরে ক্লাবে আমার স্কিটল্ খেলা আছে, হাত নড়লে-চড়লে চলবে না। রাত্তিরে এস না একবার সময় করে, খেলা

দেখবে। ওখানটায় সব হোমরা-চোমরার মেলা হে, এমন কি একজন পোস্ট-মাস্টার পর্যন্ত আসেন।'

আমি বললুম, 'আসব বৈকি, তোমার ঐ পোস্টমাষ্টার আসুন আর নাই আসুন।'

ছ'টার একটু আগে কারখানায় ফিরে এলুম। দেখি কোষ্টার আমার অপেক্ষায় বসে আছে। বলল, 'জাফে বিকেলবেলায় টেলিফোন করেছিলেন। বলেছেন তুমি ফিরে এলে যেন ওঁকে রিং করা হয়।'

হঠাৎ যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। 'অ্যাঁ, আর কিছু বললেন উনি ?'

'না তো, এমন কিছু নয়। শুধু বললেন উনি পাঁচটা অবধি তাঁর কন্‌সালটিং-রুমে থাকবেন। পাঁচটার পরে যাবেন ডরোথিয়া হাসপাতালে, কাজেই এখন ওখানেই ফোন করতে হবে।'

তাড়াতাড়ি আপিসের ভিতরে ঢুকলুম। ঘরের ভিতরটায় ভ্যাপ্‌সা গরম, তবু আমার শরীর যেন হিম হয়ে আসছে। হাতের মুঠোতে রিসিভারটা রীতিমতো কাঁপছে। আরে, এ তো বড় জ্বালা! কনুইটা বেশ শক্ত করে টেবিলের উপর চেপে ঠিক করে ওটা ধরলুম। জাফেকে পেতে একটু দেরি হল। জাফে জিগগেস করলেন, 'আপনার এখন কোনো কাজ নেই তো ?'

'না।'

'তাহলে এখানেই চলে আসুন। দেরি করবেন না, আমি আর ঘণ্টাখানেক মাত্র এখানে আছি।'

একবার মনে হল জিগগেস করি প্যাট্-এর কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে কিনা। কিন্তু জিগগেস করতে পারলুম না। বললুম, 'আচ্ছা বেশ, আমি দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে পরমুহূর্তেই আবার বাড়িতে ফোন করলুম। চাকরানী এসে ফোন ধরল। প্যাট্-এর কথা জিগগেস করলুম। ফ্রিডা তিরিক্ষি গলায় বলল, 'জানিনে তো উনি ঘরে আছেন কিনা, আচ্ছা একবার দেখে আসি।'

রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছি। সময় যেন আর কাটছে না। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। আঃ, ঐ যে প্যাট্-এর গলা—'রব্বি'—

আরামে চোখ বুজলুম, 'কেমন আছ প্যাট্ ?'

'বেশ ভালো! সারাক্ষণ বারান্দায় বসে-বসে বই পড়ছিলুম। একটা খুব মজার বই পেয়েছি।'

'মজার বই? খুব ভালো কথা। বলছিলুম কি, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে আমার একটু দেরি হবে। তোমার বই কি শেষ হয়ে গেছে?'

'না, অর্ধেকটা পড়েছি। আরো ঘণ্টা দুই লাগবে শেষ করতে।'

'ওঃ, আমি তার ঢের আগেই ফিরে আসছি। বেশ, তাড়াতাড়ি বই শেষ করে নাও।'

অটোকে বললুম, 'কিছুক্ষণের জন্য কার্লকে নিয়ে বেরোতে পারি?'

'নিশ্চয়। দরকার হয় তো আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি, এখানে আমার আর কোনো কাজ নেই।'

'না, তার প্রয়োজন নেই। এমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয়, বাড়িতেও ফোন করে দিয়েছি।'

কার্লকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। আঃ, কি চমৎকার আলো। সন্ধ্যার মৃদু আভা বাড়ির ছাতে-ছাতে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এমন মুহূর্তে বোঝা যায় জীবন কি অপূর্ব সুন্দর।

জাফের জন্য কয়েক মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হল। একটি নার্স এসে আমাকে ছোট একটি ঘরে নিয়ে বসাল। কতগুলো পুরোনো ম্যাগাজিন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। জানালার উপরে ফুলের টব, কোনোটায় বা লতা। ডাক্তারদের বসবার ঘরে আর হাসপাতালে সর্বত্র এই একই দৃশ্য—ঠিক এমনি বাদামী রঙের মোড়কে ম্যাগাজিন আর জানালায় এমনি বিচ্ছিরি রকমের লতা।

একটু বাদেই জাফে এসে ঢুকলেন। গায়ে ধবেধবে শাদা ওভারঅল্ সন্থ ধোপার পাট ভাঙা। কিন্তু ভদ্রলোক আমার সুমুখের চেয়ারটিতে বসতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ওঁর জামার ডান হাতায় টকটকে একটি রক্তের দাগ। রক্ত জিনিসটা আমার কাছে নতুন নয়, জীবনে ঢের রক্ত দেখেছি। কিন্তু বহু রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ দেখেও কোনোদিন যা হয়নি আজ এই ছোট্ট রক্তের দাগটি দেখে মনের ভিতরটাতে এমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল, কি বলব। মনটা যাও বা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, এক মুহূর্তেই আবার নেতিয়ে পড়ল। জাফে বললেন, 'আপনাকে ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান-এর অবস্থাটা বুঝিয়ে বলব বলেছিলুম।'

ঈষৎ মাথা নেড়ে সুমুখের টেবিলক্লথটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। টেবিল-ক্লথের বিচিত্র ঘর-কাটা নক্সাটাকে অতিশয় মনযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছি। ওঁর মুখের দিকে তাকাবার ভরসা পাচ্ছিনে।

জাফে বললেন, 'বছর দুই আগে উনি ছমাস স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন। সে কথা আপনি জানেন?'
চোখ না তুলেই বললুম, 'না তো।'
'তাতে ওঁর শরীর অনেকটা সেরে উঠেছিল। যাক, আমি খুব ভালো করে ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আসছে শীতের সময় ওঁকে আবার স্যানাটোরিয়ামে যেতে হবে। শহরে ওঁকে কিছুতেই রাখা চলবে না।'
আমি তখনো টেবিলক্লথের ঘর-কাটা নক্সার দিকে তাকিয়ে আছি। ঘরগুলো যেন একটার গায়ে আর একটা মিশে গিয়ে আমার চোখের সুমুখে নাচতে শুরু করেছে। জিগগেস করলুম, 'কখন যেতে হবে?'
'শরৎকাল পড়লেই। বেশি আগে না হোক, ধরুন অক্টোবরের শেষ দিকে।'
'রক্তবমিটা তাহলে একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়?'
'না।'
এতক্ষণে আমি চোখ তুলে ওঁর দিকে তাকালাম। জাফে বললেন, 'আপনাকে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন, এটা এমন ব্যারাম, কিছুই বলা যায় না কিনা—এই বছরখানেক আগে মনে হয়েছিল দিব্যি সেরে গেছে, আর কোনো গোলমালই হবে না। ফুসফুসে আবার একটু প্যাচ্ দেখা দিয়েছে, হয়তো এটুকু আবার সেরে যাবে। কথার কথা বলছিনে—সত্যি এমনি হয়। কত রোগীকে দেখলুম আশ্চর্য রকম সেরে গিয়েছে।'
'আবার খারাপ হতেও তো দেখেছেন?'
কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তাও দেখেছি।' তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে সবিস্তারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'দেখুন, দুটো ফুসফুসেই গোলমাল রয়েছে। ডান দিকেরটায় একটু কম বাঁ দিকেরটা একটু বেশি।' বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে নার্সকে ডাকলেন, 'আমার পোর্টফোলিয়োটা একটু এনে দিন তো।'
নার্স পোর্টফোলিয়োটা এনে দিল। জাফে তাই থেকে দুখানা বড় ফটোগ্রাফ বের করলেন। খাম থেকে খুলে নিয়ে জানালার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই যে এখানটাতে ভালো দেখতে পাবেন, এই দুটো হচ্ছে এক্স-রে প্লেট।'
উঠে গিয়ে দেখলুম। ধোঁয়াটে রঙের মসৃণ প্লেটের উপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শিরদাঁড়ার খানিকটা, দু-কাঁধের হাড়, কণ্ঠার হাড়, দু-হাতের দু-বগল আর সারি-সারি পাঁজরার হাড়—সব মিলিয়ে একটি কঙ্কাল। ফটোগ্রাফের ধোঁয়াটে অস্পষ্ট রেখা

ছাপিয়ে একটা বিসদৃশ কঙ্কালমূর্তি ক্রমেই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাও আর কারো নয়—প্যাট্-এর কঙ্কাল-মূর্তি।

একটি ফরসেপ্ হাতে নিয়ে জাফে প্রত্যেকটি রেখা এবং রঙের খুঁটিনাটি আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। ওঁর খেয়ালই নেই যে আমি আর ফটোর দিকে তাকাচ্ছিই না। বৈজ্ঞানিকদের যেমনটা হয়, একটা পরীক্ষার বিষয় পেলে আর কোনো খেয়াল থাকে না। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন বুঝলেন তো?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

'ও কি, আপনার কি হয়েছে?'

'কিচ্ছু না, তবে ওটার দিকে আমি ভালো করে তাকাতে পারছিনে।'

'ও, তাই।' ডাক্তার তক্ষুনি ফটো দুখানা খামে ভর্তি করে সরিয়ে রেখে দিলেন। চশমাটি পরে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। 'দেখুন, এই নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না।'

'ভাবছিনে তো। তবে একদিক থেকে ব্যাপারটা বড় মর্মান্তিক। সংসারে এত লোক আছে সবাই সুস্থ সবল। আর যত গোলমাল এই একটির বেলায়?'

জাফে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সে কথার জবাব কেউ দিতে পারে না।'

হঠাৎ মনটা গেল বিগড়ে। রাগের মাথায় বলে উঠলুম, 'হ্যাঁ, তার জবাব কেউ দিতে পারে না। তা পারবে কেন? মানুষের দুঃখ দুর্দশা মৃত্যুর জবাব কারো কাছে মেলে না। মৃত্যুকে রোধ করবার শক্তিও কারো নেই।' জাফে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, 'মাপ করবেন। নিজের মনকে কিছুতেই ভোলাতে পারিনে সেই হয়েছে মুশকিল।' জাফে সেইভাবে তাকিয়েই রইলেন, তারপরে বললেন, 'আপনার এখন কোনো কাজ নেই তো?'

বললুম, 'না, কাজ কিচ্ছু নেই।'

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে এখন, আমার রোগীদের একবার ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে। একটা ওভারঅল্ পরে নিতে হবে—তাহলে রোগীরা মনে করবে আপনি আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট্।' ওঁর মতলবটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না, তবু নার্স ওভারঅল্ এনে দিতেই সেটি পরে নিলুম।

লম্বা করিডোর দিয়ে হেঁটে চললুম। জানালা দিয়ে সন্ধ্যার লালচে আভা এসে

পড়েছে—অত্যন্ত মৃদু অস্পষ্ট ধরনের আলো। কেমন যেন একটা অবাস্তব আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছে। বাতাসে ভারি মিষ্টি লেবু-ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। জাফে একটা ঘরের দরজা খুলতেই একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ নাকে এসে লাগল। দেখলুম একটি স্ত্রীলোক অত্যন্ত শীর্ণ একটি হাত উপরের দিকে তুলল। মাথাভরা সোনালী চুল সন্ধ্যার আলো পড়ে চকচক করছে। কপালের দিকটাতে সম্ভ্রান্ত চেহারার ছাপ আছে কিন্তু চোখের ঠিক নিচেই একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজে সমস্ত মুখটা ঢাকা। জাফে আস্তে ব্যাণ্ডেজটি খুলে দিলেন। দেখি কি, মেয়েটির নাকটাই নেই। নাকের জায়গাতে একটা লাল দগদগে ঘা আর দুটো ছিদ্র। জাফে আবার ব্যাণ্ডেজটি বেঁধে দিলেন। মিষ্টি করে শুধু বললেন, 'ঠিক আছে।' বলেই দরজাটি বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন। আমি বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত সন্ধ্যার রঙিন আলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। জাফে ডেকে বললেন, 'এই যে আসুন,' বলেই পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন!

ঢুকেই শুনি কে যেন খুব কাশছে, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ আর সঙ্গে-সঙ্গে ভুল বকুনি। একটা লোক—মুখের রঙ ফ্যাকাশে, মাঝে-মাঝে লাল মতো দাগ হয়ে আছে। মুখটা হাঁ-করা, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ছটফট করছে আর হাত দুটো বিছানার উপরে একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুঁড়ছে। রোগী একেবারে বেহুঁস। চার্টের দিকে তাকিয়ে দেখলুম জ্বরের তাপ ১০৪° ডিগ্রিতেই রয়েছে। একটি নার্স বিছানার পাশে বসে কি একটা বই পড়ছিল। জাফেকে দেখে তাড়া-তাড়ি বই রেখে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার চার্টের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'ডবল নিমোনিয়া আর প্লুরিসি। আজ পনেরো দিন যাবৎ প্রাণপণ লড়াই করছে। এই দ্বিতীয় দফায় অসুখে পড়েছে। প্রায় সেরে উঠেছিল। ভালো করে সুস্থ না হতেই গেল কাজে। স্ত্রী রয়েছে, চারটি বাচ্চা। এখন যা অবস্থা কোনো আশা নেই।' ডাক্তার বুক পরীক্ষা করলেন, নাড়ী টিপে দেখলেন। লোকটা শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে বিছানার চাদরটা ধরে কেবল আঁচড়াচ্ছে। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনো শব্দ নেই। জাফে নার্সকে বললেন, 'তোমাকে আজ সারারাত এর কাছেই থাকতে হবে।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সন্ধ্যার গোলাপী আভাটা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমি বলে উঠলুম, 'কি ছাইয়ের আলো!'

জাফে বললেন, 'কেন?'

'এ দুইয়ের মধ্যে মিলটা কোথায়? ভিতরে ঐ দৃশ্য আর বাইরে এই আলো।'

জাফে বললেন, 'কেন, বেশ তো খাপ খেয়ে গেছে।'

তার পরের ঘরটাতে একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে, খুব কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলছে। এই বিকেলবেলাতেই ওকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মেয়েটি বিষ খেয়েছে। আগের দিন ওর স্বামী অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে। আহত অবস্থায় তাকে বাড়িতে আনা হয়েছিল। পিঠের দিকটা ভেঙে চেপ্টে গিয়েছে, তখনও পুরো জ্ঞান আছে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা ভুগে রাত্তির বেলায় মারা যায়।

জিগগেস করলুম, 'মেয়েটি সেরে উঠবে?'

'খুব সম্ভব।'

'সেরে লাভ?'

জাফে বললেন, 'গত ক'বছরে ঠিক এ রকমের পাঁচটা কেস্ পেয়েছি। তার মধ্যে একজন মাত্র একবার সেরে আবার দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল এবং সেবার তাকে বাঁচানো যায়নি। আর বাকিদের মধ্যে দুজন তো পরে আবার বিয়ে করেছে।'

এর পাশের ঘরে একটি লোক, আজ বারো বৎসর ধরে পঙ্গু হয়ে আছে। মোমের মতো গায়ের চামড়া, পাতলা দাড়ি, বড়-বড় চোখ। জাফে জিগগেস করলেন, 'কেমন আছ?' লোকটি জানালার দিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হলে ঘুমটা একটু ভালো হয়।' সুমুখের বিছানার উপরে একটা দাবার ছক পড়ে আছে। তার পাশে গুচ্ছের বই আর ম্যাগাজিন।

রোগীর পর রোগী দেখে চললুম। একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে, চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, ঠোঁট নীল। সদ্য সন্তান-প্রসবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, পাশেই পঙ্গু সন্তান, বাঁকা শীর্ণ দুটি পা। একটা লোককে দেখলুম, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি কিচ্ছু নেই। এক জায়গায় এক পাকা-চুল বুড়ি, প্যাঁচার মতো দেখতে, সারাক্ষণ কাঁদছে, তার আত্মীয়স্বজনরা নাকি তার কোনো খোঁজখবরই করে না। বুড়ি মরে-মরে করেও মরছে না। একটা অন্ধ লোক, তার ধারণা তার চোখের দৃষ্টি আবার ফিরে আসবে। সিফিলিস আক্রান্ত একটি শিশু—পাশে বাপ বসে আছে। একটি স্ত্রীলোক—আজ সকালেই তার একটি স্তন কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর একজন গিটে বাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ঘরে-ঘরে ঐ একই দৃশ্য—কাতরানি আর গোঙানি, প্রত্যেকটি মুখে আতঙ্ক আর নৈরাশ্যের ছাপ। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেই গোধূলির সেই গোলাপী আভাটা চোখে পড়ে—ঘরের মধ্যে

বিভীষিকা আর বাইরে এই আলোর ছটা, ঠিক বোঝা যায় না এটা বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস না তাঁর প্রসন্ন মুখের সান্ত্বনা।

অপারেশন ঘরের দোরে এসে জাফে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। দরজার ঘষা কাচ ভেদ করে ভিতরে তীব্র আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। দুজন নার্স একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল। একজন স্ত্রীলোক ওর মধ্যে শুয়ে আছে। তার চোখের দিকে তাকালুম। ও কিন্তু আমাকে দেখতেই পায়নি, ওর দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। ধীর স্থির মূর্তি, চোখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

জাফেকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনাকে এসব দেখিয়ে ভালো করলুম কিনা কে জানে, কিন্তু মুখের কথায় আপনাকে বোঝানো কষ্ট হত। আপনি বিশ্বাসই করতেন না। এখন দেখলেন তো এরা অনেকেই আপনার প্যাট্-এর চাইতে ঢের বেশি অসুস্থ। মনে-মনে দূরাশা পোষণ করা ছাড়া এদের আর কোনো ভরসা নেই। অথচ দেখবেন, ওদের মধ্যে অনেকে দিব্যি সেরে উঠবে। সে কথাটাই আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম।'

মাথা নেড়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'এই তো দেখুন, ন'বছর আগে আমার স্ত্রী মারা গেলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস। চমৎকার স্বাস্থ্য, একদিনের জন্য একটু অসুখ করেনি। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে মারা গেলেন।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন বললুম, বুঝলেন তো?'

আমি আবার মাথা নাড়লুম।

'আসল কথা, আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। যার সেরে ওঠবার কোনোই আশা নেই সেও সেরে ওঠে, আবার সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ হঠাৎ মরে যায়। এই তো জীবনের রহস্য।' ডাক্তারের মুখ বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। একজন নার্স এসে কানে-কানে কি বলল। জাফে শরীরটাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, আমাকে এখন অপারেশন ঘরে ঢুকতে হবে। দেখবেন, আপনার মনে যতই উদ্বেগ থাকুক, প্যাট্ যেন কিচ্ছু জানতে না পারে। সেটাই আসল কথা, পারবেন তো?'

'পারব বৈকি।'

হ্যাণ্ডশেক্ করে ডাক্তার তাড়াতাড়ি নার্সের সঙ্গে অপারেশন ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। যতই নিচে নামছি ততই অন্ধকার বাড়ছে। নিচের তলায় ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই

শকুনের সেই দোকানের জুয়েলারী শোকেসের মতো, একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তবে চারদিক সুন্দর হয়ে এল।'

কারখানায় ফিরে এসে দেখি কোটায় আমার অপেক্ষায় গেট-এ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই বললুম, 'তুমি বুঝি আগেই জানতে?'

'হ্যা, জানতুম। তবে তাকে বলেছিলেন উনি নিজেই তোমাকে বুঝিয়ে বলবেন।'

অটো চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেই বললুম, 'অটো, আমি তো আর ছেলেমানুষ নই যে একেবারে মুষড়ে পড়ব—এখনো আশা ছাড়িনি। কিন্তু ভয় হচ্ছে আজকে রাত্তিরটা যদি প্যাট্-এর সঙ্গে একলা থাকতে হয় তবে পাছে আমার উদ্বেগটা ওর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কালকে নাগাদ আমার মন ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজ রাত্তিরে সবাই মিলে কোথাও গেলে হয় না?'

'খুব হয়। আমি সেকথা আগেই ভেবেছি, গট্‌ফ্রিড্‌কে বলেও রেখেছি।'

'তাহলে আরো কিছুক্ষণের জন্য কার্লকে চাই। বাড়ি গিয়ে প্যাট্‌কে নিয়ে আসি, তারপরে এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার ওখানে পৌঁছে যাব।'

'বেশ, তাই হবে।'

আবার গাড়ি নিয়ে রওনা হলুম। নিকোলাইস্ট্রাসে এসে হঠাৎ মনে পড়ল কুকুরটা তো আনা হয়নি। তক্ষুনি গাড়ি ঘুরিয়ে সেই দোকানের দিকে ছুটলুম। দোকানের দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে না। গিয়ে দেখি এ্যান্টন্ ঘরের পিছনে একটা ক্যাম্প-খাটে বসে আছে। হাতে একটি বোতল। আমাকে দেখে বলল, 'গুস্তাভ্ ব্যাটা আমাকে ফাঁকতালে ঠকিয়েছে।' কথার সঙ্গে-সঙ্গে মুখ থেকে পুরোপুরি একটি ভাটিখানার গন্ধ বেরুচ্ছে।

বাচ্চা টেরিয়ারটা আমাকে দেখেই লাফিয়ে এগিয়ে এল, বার দুই শুঁকে দেখল, তারপর আমার হাত চাটতে লাগল। এ্যান্টন্ দাঁড়িয়ে উঠে কি ভেবে কান্না জুড়ে দিল, 'আহা বাছারে, শেষে তুইও আমাকে ছেড়ে চললি, একে-একে সবাই ছেড়ে যাচ্ছে—থিল্‌ডা তো মরেই গিয়েছে, মিনাও গেছে—আপনিই বলুন না মশাই, আমাদের মতো হতভাগার বেঁচে কি লাভ?' বলে, ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

অদ্ভুত একটা আবহাওয়া—শেওলার পচা গন্ধ, কচ্ছপগুলো নড়েচড়ে উঠেছে, পাখিগুলো পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে আর ওদিকে বেঁটে-খাটো লোকটার মুখ থেকে শুঁড়িখানার গন্ধ বের হচ্ছে।

'সত্যি মশাই, আমাদের মতো লোকের বেঁচে কি লাভ, কুকুরের মতো বেঁচে

থাকা যে তো নয়!' হনুমানটা একটা দাঁড়ের উপর বসে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল আর পাগলের মতো একবার এদিক একবার ওদিক লাফাতে লাগল। বেঁটে লোকটা আর একদফা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'কোকো, এখন থাকবার মধ্যে তো কেবল তুই-ই আছিস, আয় এদিকে আয়,' বলে বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। হনুমানটা দিব্বি হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল।

আমি বললুম, 'ও কি করছেন, মদ খেয়ে বেচারা যে মারা পড়বে।'

ও বলল, 'মরলেই বা। শেকল-বাঁধা জীবন, মরা বাঁচা দুই-ই সমান।'

কুকুরের বাচ্চাটা আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, আর বাক্যব্যয় না করে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলুম লম্বা-লম্বা পা ফেলে, লেজ নাড়তে-নাড়তে ও আমার সঙ্গে গাড়িতে এসে বসল।

বাড়ি পৌঁছে কুকুরটাকে নিয়ে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠলুম, করিডরে দাঁড়িয়ে একবার আয়নায় মুখটা দেখে নিলুম—না, মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। প্যাট্-এর দরজায় এসে টোকা দিলুম, তারপর আস্তে দরজাটা একটু খুলে কুকুরের বাচ্চাটাকে ঢুকিয়ে দিলুম। শেকলটা ধরে আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কার কথা শুনে মনে হল এ তো প্যাট্-এর গলা নয়, এ যে ফ্রাউ জালেওয়াস্কি। যাক বাঁচা গেল, প্যাট্-এর সঙ্গে একলা দেখা হলে কি বলে ফেলি তাই নিয়ে ভাবনা ছিল। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি থাকাতে ব্যাপারটা সহজ হল।

টেবিলের পাশে গ্যাঁট হয়ে বুড়ি বসে আছে, পাশে কফির পেয়ালা আর টেবিলের উপর একগোছা তাশ সাজানো রয়েছে, বড়-বড় চোখ করে প্যাট্ পাশে বসে। তাশ দিয়ে বুড়ি প্যাট্-এর ভাগ্য গণনা করছে। খুব খুশি হয়ে বলে উঠলুম, 'গুড-ইভনিং!'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠল, 'ঐ যে উনি আসছেন, পাশে একটি কালো মতো ভদ্রলোকও দেখা যাচ্ছে।'

কুকুরটা এতক্ষণে ঘেউ-ঘেউ করে উঠে আমার দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল। প্যাট্ লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে, এ যে আইরিশ টেরিয়ার!'

আমি বললুম, 'হুঁ, ঠিক তোমার যুগ্যি অথচ একঘণ্টা আগেও এর কথা ভাবিনি!'

প্যাট্ ঝুঁকে পড়ে ওকে আদর করতে লাগল। কুকুরটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেবলই ওর গায়ে লাফিয়ে উঠতে চায়। 'আচ্ছা, ওর নামটা কি, বল তো বব্?'

'তা তো ভাবিনি। তা ওর আগের মালিকের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখতে হলে হুইস্কি কিম্বা কনিয়াক বলে ডাকতে হয়।'

'কিন্তু এটা সত্যি-সত্যি আমাদের কুকুর বলছ ?'

'সত্যি নয় তো কি, একেবারে আমাদের !'

প্যাট্-এর খুশি আর ধরে না।

'তাহলে বব্, ওর নাম রাখব বিলি। আমার মা যখন ছোট্ট মেয়ে তখন ওঁর একটা কুকুর ছিল, তার নাম ছিল বিলি। মা প্রায়ই ওর কথা বলতেন।'

'তাহলে তো খুব ভালোই হয়।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি জিগগেস করল, 'আদব-কায়দা শিখেছে তো ?'

আমি বললুম, 'ওর যা বংশকৌলীন্য সে প্রায় যে কোনো ডিউকের মতো।'

'বয়স কত ?'

'আট মাস। তার মানে যোলো বছরের মানুষের যতখানি বুদ্ধিশুদ্ধি হয় ততখানি অন্তত হয়েছে।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না।'

'ওকে একটু মেজেঘষে দুরস্ত করতে হবে এই যা।' প্যাট্ দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাতে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির গলা জড়িয়ে ধরল। আমি প্রথমটা এর মানে বুঝতে পারলুম না, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। প্যাট্ বলল, 'কুকুরটা আমাদের রাখতে দেবেন তো, আপনার তো কোনো আপত্তি নেই ? আমার বড় কুকুরের শখ।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, কি বলবে ভেবে উঠতে পারছে না। তারপরে বলল, 'হ্যাঁ, তা আপত্তি আর কি। আর এটা আপনার তাশেই দেখা যাচ্ছে যে আজ একটা নতুন কিছু আপনার বরাতে আছে।'

আমি বললুম, 'তাহলে তাশে নিশ্চয়ই এটাও রয়েছে যে আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমরা কোথাও বেরুচ্ছি।'

প্যাট্ হেসে উঠল। 'না বব্, অদ্দুর আমরা এখনো অগ্রসর হইনি, আমাদের ভবিষ্যগণনা সবে তোমাতে এসে ঠেকেছিল।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি তাশগুলো তুলে নিয়ে বলল, 'আমার কথা ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করবেন, না হয় করবেন না। কিম্বা যদিবা বিশ্বাস করেন আমার স্বামীর মতো কথার মানেটা নিজের ইচ্ছে মতো করে নিতে পারেন। জালেওয়াস্কিকে বলতুম তরল পদার্থ ওর পক্ষে অশুভ। তা ও তরল পদার্থ বলতে বুঝত জল, আসলে কিন্তু তরল পদার্থ মানে রাম্।'

ও চলে যাবার পরে প্যাট্‌কে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'প্যাট্, সারাদিনের

পরে ফিরে এসে তোমাকে পেয়ে কি যে আনন্দ লাগে কি বলব! এ যেন বিশ্বাসের অতীত। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে বুক কাঁপতে থাকে কি জানি যদি সত্যি না হয়।'

প্যাট্ আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। আমি এ ধরনের কথা বললে ও কখনো জবাব দেয় না। অবিশ্যি জবাব দেয় এ আমি চাইওনে। আমার মতে মেয়েদের কখনো মুখ ফুটে কাউকে ভালোবাসার কথা বলা উচিত নয়। প্যাট্-এর চোখ দুটি শুধু আনন্দের আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষাতেই অনেক বেশি কথা প্রকাশ পেল।

অনেকক্ষণ ওকে বুকে চেপে রাখলুম। ওর দেহের উত্তাপটি অনুভব করছি, চুলের মৃদু সৌরভটি পাচ্ছি। বুকের মধ্যে ওকে যত জোরে চেপে ধরছি তত বেশি করে ওকে অনুভব করছি। আঃ, মনের অবসাদ দূর হয়ে গেল। এই তো ও বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস ফেলছে, কই কিছুই তো ওর হারায়নি। আমার মুখের কাছে মুখ এনে প্যাট্ জিগগেস করল, 'আমরা সত্যি বেরুচ্ছি নাকি, রবি?'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই। কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌সও আসছে। কার্ল তোমার জন্য দরজায় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বিলির কি হবে?'

'কেন, বিলিও যাবে। নইলে আমাদের ভুক্তাবশিষ্টের কি দশা হবে? তুমি কি আগেই খেয়ে নিয়েছ নাকি?'

'না তো, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।'

'না, না, আমার জন্যে কক্ষনো অপেক্ষা কোরো না। কারো জন্যে অপেক্ষা করতে নেই।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'রবি, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। সংসারে কারো জন্য যদি অপেক্ষা করে বসে থাকতে না হয় তো সমস্ত দুনিয়াই মিথ্যা।'

আয়নার ধারে আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে ও বলল, 'নাও, এবার আমি জামা-কাপড় পরে নিই, নইলে আর তৈরি হব কখন? তুমি কাপড় বদলাবে না?'

'সে পরে হবে'খন। আমার আর কতক্ষণ লাগবে? তোমার আপত্তি না হলে আর একটু এখানটায় বসি।'

কুকুরটাকে কাছে ডেকে নিয়ে জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় বসলুম। চুপচাপ বসে প্যাট্-এর বেশ পরিবর্তনের পর্বটা দেখছি। স্ত্রীলোকের যে চিরন্তন

রহস্য সেটা এই বেশ পরিবর্তনের সময় যেমন বোঝা যায় এমন আর কখনো নয়। প্রতি দেহভঙ্গিটি নারীত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বোধ করি ও নিজেও জানে না, ওর অন্তর্বাসিনী নারীরূপটি ধীরে-ধীরে উন্মাটিত হচ্ছে। অন্ত সময় যদিবা স্ত্রীলোকের যৌন-বোধটি নিদ্রিত থাকে বেশ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আয়নার সুমুখে দাঁড়ালেই সে প্রবৃত্তিটি আস্তে-আস্তে সজাগ হয়ে ওঠে। নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে ঢেলে সাজানোর মধ্যেই সৌন্দর্য। মেয়েরা পোশাক বদলানোর সময় হাসবে, কথা কইবে, মুখে খই ফুটবে এ আমি ভাবতেই পারিনে। স্ত্রীলোকের সবটুকু রহস্য, সবটুকু মাধুর্য ওখানেই মাটি হয়ে যায়। আয়নার সুমুখে প্যাট্-এর সহজ শোভন ভঙ্গির হাত-পা নাড়াটুকু ভারি সুন্দর লাগছে। ঐ যে ক্ষিপ্র হস্তে চুলটা একটু ঠিক করে নিল, তুলিটা তুলে ভুরুতে লাগাল, দেখতে কি যে সুন্দর লাগছে কি বলব। খানিকটা বা চঞ্চলা হরিণীর মতো আবার খানিকটা রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনার মতো। একেবারে আপন ভোলা ভাব, মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মুখখানি তুলে আয়নার দিকে ঝুঁকে যখন দেখছিল মনে হল এ তো ওব প্রতিমূর্তি নয়, যেন দুজন স্ত্রীলোক একে অন্যের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে আছে।

খোলা জানালার ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার নিঃশ্বাস-পরিমলটুকু ভেসে আসছে। চুপচাপ বসে আছি। বিকেলবেলায় যে দুঃসংবাদটি জেনে এসেছি সেটা যে ভুলে গিয়েছি এমন নয়, বরং বেশ ভালো করেই মনে আছে। কিন্তু প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, যে উদ্বেগটা মনের মধ্যে গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল সেটা যেন আশার মৃদু সঞ্চালনে কতকটা লঘু হয়ে এসেছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। দুঃখ, সুখ, সন্ধ্যার আভা, বাতাসের সুবাস আর সর্বোপরি ঐ মনোহর নারীমূর্তি মিলে মনে হল এই হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ। শুধু তাই নয়, বোধকরি একেই বলে সুখ—প্রেমে, ভয়ে, বেদনায় মেশা এক অপূর্ব অনুভূতি।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। গুস্তাভ্ এসে ঠিক আমার পিছনেই গাড়ি দাঁড় করাল। জিগগেস করল, 'কুকুরের বাচ্চাটার খবর কি ববার্ট ?'

বললুম, 'বেশ আছে।'

'তুমি কেমন আছ ?'

আমার মন মেজাজ ভালো ছিল না। বললুম, 'পয়সা কামাই করতে পারলে আমিও ভালোই থাকতুম। এই দেখ না সারাদিনে দুটি মাত্র ভাড়া পেয়েছি পঞ্চাশ ফেনিগ করে।'

ও মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে, সব দিক থেকেই। আরো খারাপ হবে মনে হচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি, কিন্তু আমার যে টাকার বিষম দরকার; অল্পে-সল্পে চলবে না, অনেক টাকা চাই।'

গুস্তাভ্ দাড়ি চুলকতে-চুলকতে বলল, 'অনেক টাকা? সৎ পথে থেকে অনেক টাকা রোজগারের তো কোনো উপায় নেই। জুয়ো খেলতে পার তো হতে পারে। কি বল, পারবে নাকি? আজকে রেস্ আছে আর খুব ভালো জুয়োর আড্ডাও আমার জানা আছে। এই তো সেদিন এক মার্ক দিয়ে আটাশ মার্ক জিতে এলুম।'

'জুয়োই হোক আর যাই হোক টাকা এলেই হল। রোজগারের আশা আছে কিনা সেটাই হল আসল কথা।'

'আগে কখনো রেস্ খেলেছ ?'

'না তো।'

'তাহলে তো ভালোই। গোড়ার দিকে সবারই বরাত খুব ভালো থাকে। দেখি না তোমার বরাতের জোরে কিছু করে নিতে পারি কি না।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবে নাকি, তাহলে এক্ষুনি যেতে হয়।'

'বেশ চল।' কুকুরের বাচ্চাটা খাগাবার পর থেকে গুস্তাভ্-এর উপরে আমার যথেষ্ট আস্থা হয়েছে।

বেশ বড়সড় একটা ঘর, সেইখানেই জুয়োর আড্ডা। ঘরের ডান দিকটাতে চুরুটের দোকান, বাঁ দিকটাতে জুয়াড়িদের বাজির চার্ট। দেয়ালের গা ঘেঁষে লম্বা কাউণ্টার, তার উপরে কাগজপত্র লেখার সরঞ্জাম। কাউণ্টারের পিছনে তিনটি লোক, তিনজনেই মহা ব্যস্ত। একজন অনবরত টেলিফোনে কথা বলছে, আর একজন কতকগুলো স্লিপ হাতে করে কেবল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। তৃতীয় ব্যক্তি কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে বাজির হিসাব রাখছে। টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, একটা মোটা ব্রেজিলিয়ান চুরুট মুখে। গায়ে কোট নেই, গাঢ় বেগুনী রঙের শার্ট তার আস্তিন গোটানো। খুব জোর ব্যবসা চলছে, আমি তো দেখে অবাক। আর যারা এসে ভিড় করেছে তারা খুব সাধারণ লোক—ছুতোর, কামার, মিস্ত্রির দল, কিছু গরিব কেরানি, কয়েকজন বেশ্যাজাতীয় স্ত্রীলোক আর বাদ বাকি নিষ্কর্মা ভবঘুরের দল। দরজায় একটা লোক দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত ময়লা ট্রাউজার পরা, মাথায় সোলা-হ্যাট, গায়ে শতচ্ছিন্ন কোট। আমাদের ডেকে বলল, 'ও মশাই শুনছেন, আমার নাম ফন্ বাইলিং, টিপস্ চান তো বাতলে দিতে পারি। একেবারে নির্ঘাত লেগে যাবে।'

গুস্তাভ্ বলে উঠল, 'যাও-যাও, ওসব গিয়ে তোমার ঠান্‌দির কাছে বল, আমাদের কাছে নয়।' এখানে এসেই দেখছি গুস্তাভ্-এর হালচাল বিলকুল বদলে গেছে।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশি নয় মশাই, মাত্র পঞ্চাশ ফেনিগ্ দিলেই হবে। যা বলে দেব তার আর মার নেই। স্বয়ং ট্রেইনারের সঙ্গে আমার চেনাজানা আছে কিনা।'

গুস্তাভ্ ওর দিকে কোনো নজর না দিয়ে কাউণ্টারে গিয়ে কয়েকটা ঘোড়ার নাম জিগগেস করে নিল, একবার মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ফর্দটা পড়ল, তার পরে বলল, 'এস, ট্রিস্টান-এর উপরে প্রথমে দু-মার্ক করে দুজনেই ধরি। ও ঠিক এসে যাবে।' আমি জিগগেস করলুম, 'ওটার সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো নাকি?'

'জানি না আবার! প্রত্যেকটি ঘোড়ার খুর সুদ্ধ আমার জানা আছে।'

পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল, 'তাহলে জেনে-শুনে ট্রিস্টান-এর উপর টাকা ধরছেন যে বড়? আরে মশাই, স্পিপারি লিৎস-ই একমাত্র ভরসা। অলি

বার্নস-এর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে।' গুস্তাভ্ ওর কথা গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'আরে বাপু, আমি হলুম আস্তাবলের মালিক। তোমার চাইতে ঢের বেশি জানি।'

কাউন্টারে গিয়ে গুস্তাভ্ যথারীতি আমাদের নাম, বাজি ইত্যাদি লিখিয়ে নিল। আমাদের দুজনের হাতে দুটি স্লিপ দেওয়া হল। হল্-এর মাঝখানে কতগুলো চেয়ার-টেবিল রাখা আছে। স্লিপ হাতে করে সেখানে গিয়ে বসলুম। চারদিকে বিচিত্র সব নাম শুনছি। কাছেই কয়েকজন মজুর ইতালির ঘোড়দৌড়ের গল্প করছে, দুজন পোস্ট আপিসের পিওন প্যারিস থেকে সদ্য পাওয়া আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করছে। এক বুড়ো কোচম্যান্ পুরনোকালের জুড়ি-গাড়ির ইতিবৃত্ত বলছে। একটি মোটা মতো লোক—মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া—অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে একটার পর একটা রুটি খেয়ে যাচ্ছে। আর দুজন লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাই দেখছে। দুজনের হাতে দুটো টিকিট। অত্যন্ত শুকনো মুখ, দেখলে মনে হয় কদিন খাওয়া জোটেনি।

খুব জোরে টেলিফোন বেজে উঠল। একমুহূর্তে সবার কান খাড়া। এ্যাসিস্টেণ্টটি একটার পর একটা নাম বলে যাচ্ছে। কই, ট্রিস্টান-এর তো নাম গন্ধ নেই। গুস্তাভ্-এর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। 'দূর ছাই, সোলোমন পেয়ে গেল যে। কি কাণ্ড, ভাবতেই পারিনি।' ফন্ বাইলিং লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'দেখলেন মশাই, আমার কথা যদি শুনতেন—আমি ঐ সোলোমনের কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, তা যাক, এর পরের রেসটাতে যদি—' গুস্তাভ্ ওর কথা কানেই তুলছে না। ও ততক্ষণে স্লিপারি লিৎস-এর সঙ্গে আলোচনায় মেতে গেছে।

বাইলিং আমাকে জিগগেস করল, 'আপনি ঘোড়া সম্বন্ধে কিছু জানেন-টানেন?'

'কিছুমাত্র না।'

'তাহলে আমার কথা শুনুন, অন্তত, এই আজকের দিনটির জন্য। এর যে কোনো একটা ঘোড়া ধরুন—কিং লিয়ার অথবা সিলভার মথ্ নয়তো লরা ব্লু, যেটা আপনার খুশি, আমি টাকা চাইনে। যদি জেতেন তো ইচ্ছে হলে কিছু দেবেন।' পাকা জুয়াড়িদের যেমনটা হয়, উত্তেজনায় ওর ঠোঁট কাঁপছে। পোকার খেলায় লোকে বলে, নয়া খেলোয়াড়ের বরাত জোর বেশি। সে কথা মনে করে আমি বললুম, 'আচ্ছা বেশ, কোন ঘোড়ার উপর ধরব বলুন।'

'যেটা আপনার খুশি—'

বললুম, 'লয়া ব্লু নামটা বেশ লাগছে, দশ মার্ক ওটার উপরেই ধরা যাক্।'

গুস্তাভ্ বলল, 'ক্ষেপেছ নাকি?'

বললুম, 'না তো।'

'দশ মার্ক ঐ ঘোড়ার উপর! ওটা কি একটা রেস্-এর ঘোড়া? ওটাকে কেটে বরং সসেজের মাংস করলে হত।'

স্লিপারি লিৎস-ও এগিয়ে এসে লম্বা-চওড়া বুলি ছাড়তে লাগল, 'এঁ্যা, লয়া ব্লুর উপরে ধরছেন? আরে মশাই, ওটা তো ঘোড়া নয়, ওটা গরু। যে ড্রিম-এর কাছে ও লাগে, কিম্বা জিপ্‌সি সেকেণ্ড-এর কাছে?'

বাইলিং এক পাশে দাঁড়িয়ে কাতর ভাবে কেবলই আমাকে ইশারা করছে। আমি বললুম, 'না, আমি আর বদলাচ্ছি না—একবার যখন বলে ফেলেছি লয়া ব্লু তখন আর—' মনে-মনে ভাবলুম জুয়ো খেলায় ক্ষণে-ক্ষণে মত বদলাতে নেই। ভায়লেট রঙের শার্ট পরা লোকটা আমার হাতে স্লিপ দিয়ে দিল। গুস্তাভ্ আর স্লিপারি লিৎস এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেন সত্যি-সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দুজনে হাসতে-হাসতে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজ-নিজ ঘোড়ার নাম লিখিয়ে দিল।

চারদিকে সবাই ব্যস্ত। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে ফিরে দেখি একটা লোক ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। রোগাটে মতন যে দুজন লোক দেয়ালের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, দেখি তারই একজন মেঝের উপরে পড়ে আছে। পোস্ট আপিসের পিওন দুটি তাড়াতাড়ি ওকে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। লোকটার ফ্যাকাশে মুখ, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে।

বেশ্যা স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল, 'কি কাণ্ড! শিগগির একজন কেউ এক গ্লাশ জল নিয়ে এস।'

আমার দেখে ভারি অবাক লাগল যে অধিকাংশ লোকই ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করল না। এক নজর তাকিয়ে আবার যার-যার বাজি ধরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুস্তাভ্ বলল, 'এ রকম হামেশাই হচ্ছে। চাকরি-বাকরি নেই—যৎসামান্য পুঁজি ঐ জুয়োতেই ঢালছে, তাও কোনো কালে এক পয়সা জেতে না।'

বুড়ো কোচম্যান্ চুরুটের দোকান থেকে এক গ্লাশ জল নিয়ে এল। বেশ্যা মেয়েটি নিজের রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে লোকটির চোখে, কপালে দিতে লাগল। খানিক বাদে লোকটি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকাল। কেমন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে যেন চোখ দুটো ওর নয়, আর কারো চোখ। মেয়েটি জলের গ্লাশটা

নিয়ে একটুখানি ওকে খাইয়ে দিল। মা যেমন ছোট্ট শিশুকে কোলে করে খাওয়ায় ঠিক সেই ভাবে ওকে ধরেছে। সেই যে খাড়াচুল লোকটি নির্বিকারভাবে টেবিলে বসে খাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে সেখান থেকে একটি স্যাণ্ডুইচ নিয়ে ওর মুখে ধরল। 'নাও, এটা খেয়ে নাও তো—আরে আস্তে-আস্তে—আমার আঙুল কামড়ে দিও না যেন—ব্যস্, এবার আর একটু জল খাও তো—'

স্যাণ্ডুইচ-এর মালিক আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। অপর লোকটির মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা একটু কমেছে। আস্তে-আস্তে স্যাণ্ডুইচটি খেয়ে নিয়ে ও দাঁড়াল। মেয়েটি তখনো ওকে ধরে আছে। তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে চুপিচুপি হ্যাণ্ডব্যাগটি খুলে বলল, 'এই নাও, এবার ভাগো। গিয়ে কিছু কিনে খাও, খবরদার জুয়ো খেলা আর কক্ষনো নয়।'

মাথায় স্পোর্টস্ ক্যাপ, পায়ে পেটেণ্ট জুতো—ফুলবাবু মতন একটা লোক এতক্ষণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, একবার এদিকে ফিরেও তাকায়নি। এখন হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল. 'কত দিলে ওকে?'

'কিচ্ছু না, এক গ্রোসেন মাত্র।'

মেয়েটার বুকে একটা কনুয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'হুঁ, তার ঢের বেশি দিয়েছ। আমাকে জিগগেস না করে কাউকে কিচ্ছু দিয়ো না।'

পাশের সঙ্গীটি বলল, 'যেতে দাও না।' আগের লোকটা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'সত্যি কথাই তো বলছি।' বেশ্যা মেয়েটি পাউডার বাক্স খুলে নিয়ে ঠোঁটে একটু রঙ মেখে নিল। ওর কথার কোনো জবাব দিল না।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। আমি সেই ফুলবাবুটির দিকেই তাকিয়েছিলুম। টেলিফোনে কি কথা হচ্ছিল শুনতেই পাইনি। হঠাৎ শুনি গুস্তাভ্ চেঁচিয়ে বলছে, 'আরে, একেই বলে বরাত!' বলেই আমার কাঁধে প্রচণ্ড এক চাপড়। 'আরে ভায়া, কেল্লা ফতে, এক ধাক্কায় একশো আশি মার্ক মেরে দিয়েছ। তোমার ঐ কিম্ভূতকিমাকার উটটাই এসে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'এঁ্যা, সত্যি নাকি?'

কাউণ্টারের পিছনে চমকা রঙের শার্ট পরা লোকটা মোটা চুরুট দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে বলল, 'আপনাকে টিপ দিলে কে?' লোকটির মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস। বাইলিং পিছনে দাঁড়িয়েছিল, দু-পা এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীত হাসি হেসে বলল, 'এঁজ্ঞে আমি—'

'ওঃ—' লোকটা বাইলিং-এর দিকে ফিরেও তাকাল না। আমার হাত থেকে

টিকিটটা নিয়ে আমাকে টাকা দিয়ে দিল। ঘরসুদ্ধ লোক নীরব। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। এমন কি যে লোকটা নির্বিকারভাবে বসে-বসে খাচ্ছিল সেও একবার মুখ তুলে তাকাল।

আমি নোটগুলো নিয়ে পকেটে পুরলুম। বাইলিং কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বলল, 'এবার চেপে যান। আজ আর খেলবেন না।' উত্তেজনায় ওর মুখ লাল। আমি দশ মার্ক নিয়ে ওর হাতে গুঁজে দিলুম।

গুস্তাভ্-এর সারা মুখে হাসি। আমার বুকের পাঁজরায় প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মেরে বলল, 'কেমন দেখলে তো বলেছিলুম না। পয়সা কামাই করতে হয় তো গুস্তাভ-এর পরামর্শ শুনে চলবে।' এই একটু আগে যে সে জিপ্সি সেকেণ্ড-এর উপরে টাকা ধরেছিল তা আর তাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম না। গুস্তাভ্ বলল, 'চল যাওয়া যাক্। পাকা জুয়াড়িদের আজকে বরাত খুলবে না।' দুজনে মিলে পাশের রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকলুম। লরা ব্লুর স্বাস্থ্য কামনা করে দু-গ্লাশ পান করা গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার রেস্-এর আড্ডায়। দেখতে-দেখতে তিরিশ মার্ক খসে গেল। বেগতিক দেখে বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার মুখে বাইলিং আমার হাতে একটা কার্ড গুঁজে দিল। বলল, 'আমি এদের এজেণ্ট, যদি কখনো দরকার হয় তো—' দেখি ওটা একটা ঘরোয়া সিনেমার বিজ্ঞাপন। আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ডেকে বলল, 'আমার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড পোশাকের ব্যবসা আছে।'

কারখানায় যখন ফিরে এলুম তখন প্রায় সাতটা বাজে। উঠোনে কার্ল দাঁড়িয়ে, এঞ্জিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। কোষ্টার আমাকে দেখে সোল্লাসে বলে উঠল, 'এই যে বব্ এসে গেছ, ভালোই হয়েছে। কার্লকে নিয়ে একটু দৌড়ের কসরত করাতে যাচ্ছি। এস. আমাদের সঙ্গে যাবে।'

সবাই কার্লকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অটো ইতিমধ্যে গাড়ির কলকব্জা কিছু-কিছু অদল-বদল করে ওটাকে আর একটু মজবুত করে নিয়েছে। শিগগিরই একটা পাহাড়ীয়া রেস্ হবে। সেই রেস্-এ কার্লের নাম পাঠানো হয়েছে। আজকে তারই জন্য পাহাড় বাইবার প্রথম মহড়া হবে।

আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলুম। কোষ্টার-এর পাশে জাপ্. চোখে ইয়া বড় গগলস্। ওকে সঙ্গে না নিলে বেচারী বড্ড নিরাশ হয়। লেন্ত্স আর আমি বসেছি পিছনের সিট-এ। স্টার্ট দিতেই কার্ল তো এক ঝম্পে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। শহরের রাস্তা ছাড়িয়ে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। গাড়ির স্পীড্ উঠেছে একশো-চল্লিশ কিলোমিটার। লেন্ত্স আর আমি সামনের সিট দুটোর

পিছনে কোনো রকমে মাথা গুঁজে দিয়ে বসে আছি। এমন প্রচণ্ড বাতাস যে মাথা উড়িয়ে নেবার জোগাড়। দুধারের পপলার গাছগুলো সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এঞ্জিনের যা গর্জন কি বলব।

মিনিট পনেরো পরে দেখি দূরে একটা কালো মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা ক্রমেই বড় হচ্ছে, আসলে ওটা একটা বড়সড় গাড়ি। আশি থেকে একশো কিলোমিটার স্পীডে আসছে। গাড়িটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঠিক সোজা আসছে না, যেন ডাইনে বাঁয়ে হেলে-দুলে আসছে। রাস্তাটা সরু, কোস্টার তাই দেখে গাড়ির স্পীড্ কমিয়ে দিল। সামনের গাড়িটা যখন বেশ কাছে এসে গেছে, হঠাৎ দেখি একজন মোটর সাইকেলওয়ালা ডানদিকের ছোট রাস্তা থেকে এদিকে বেরিয়ে আসছে। পরমুহূর্তেই সাইকেলওয়ালা একটা খড়ের গাদার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। লেন্‌ত্‌স বলে উঠল, 'এইরে! এবার সেরেছে।'

সাইকেল-আরোহী তো বিদ্যুৎবেগে বড় রাস্তার উপরে এসে পড়ল। সামনের গাড়িটা থেকে বড় জোর কুড়ি মিটারের ব্যবধান। বড় গাড়িটা যে অত দ্রুত এসে যাবে ও নিশ্চয় তা ভাবেনি। কোনো রকমে ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁ দিকে মোচড় মারল। ওদিকে গাড়িটাও ওকে বাঁচাবার জন্য একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে করছে। আর যাবে কোথায়? গাড়ির মাডগার্ডের সঙ্গে সাইকেলের লেগে গেল ধাক্কা। সাইকেলওয়ালা ছিটকে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ল। আর বড় গাড়িটা টাল সামলাতে না পেরে প্রথমটায় ধাক্কা খেল এক সাইনপোস্টে, তারপর ল্যাম্পপোস্টে, শেষটায় হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল একটা গাছের উপরে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমাদের গাড়িও কিছু কম স্পীডে আসছিল না, কাজেই মুহূর্তমধ্যে আমরাও এসে গেলুম। স্পীড্ একেবারে থামাতে না পেরে কোস্টার কি কষ্টে যে গাড়িটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে পার করে আনল কি বলব। একদিকে পড়ে আছে সাইকেল, আর একদিকে সাইকেলের আরোহী, আবার রাস্তার উপরে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। আর একটু হলেই সাইকেলওয়ালার হাতের উপর দিয়েই আমাদের গাড়ির চাকা চলে যেত। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আবার বড় গাড়িটার ক্যারিয়ারে ধাক্কা লাগবার উপক্রম। কোনো রকমে অঘটন বাঁচিয়ে খুব করে ব্রেক চেপে গাড়ি থামানো গেল। লেন্‌ত্‌স চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস অটো! ওস্তাদ বটে!'

সবাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে অপর গাড়িটার দিকে ছুটলুম। এঞ্জিনটা

তখনো আওয়াজ করছে। হ্যাচকা টানে দরজা খুলে ফেললুম। কোষ্টার এঞ্জিনটা বন্ধ করে দিতেই কার যেন গোঙানির শব্দ শুনতে পেলুম।

গাড়ির জানালাগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার, অস্পষ্ট আলোকে একটি স্ত্রীলোকের রক্তমাখা মুখ দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই একটি লোক স্টীয়ারিং-হুইল আর সিট-এর মাঝখানে চাপা পড়ে আছে। আগে স্ত্রীলোকটিকে তুলে নিয়ে রাস্তায় শুইয়ে দিলুম। মুখের এখানে-ওখানে অনেকটা কেটে গিয়েছে, দু-একটা কাঁচের টুকরো তখনো আটকে আছে আর রক্ত পড়ছে অবিরাম। ওর ডান হাতের অবস্থা আরো খারাপ। শাদা ব্লাউজের হাতাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে, টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে। লেনৎস হাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। গলগল করে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল। শিরাটা কেটে গেছে। লেনৎস নিজের রুমালটা সলতের মতো করে পাকিয়ে কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল রক্ত বন্ধ করবার জন্যে। আমাদের বলল, 'তোমরা ঐ লোকটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনো, আমি এদিকে দেখছি। কাছাকাছি কোথাও হাসপাতাল থাকলে এক্ষুনি সেখানে নিয়ে যেতে হবে, বিলম্ব চলবে না।'

গাড়ির সিট খুলে নিয়ে তবে লোকটিকে বের করতে হল। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি ছিল, তাতেই সহজে হল। দেখা গেল লোকটিও রক্তাক্ত কলেবর, বুকের কয়েকটি পাঁজরা ভেঙে গিয়েছে। গাড়ি থেকে বের করে আনার পরে লোকটা বার দুই কাতরোক্তি করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। লোকটার হাঁটুটাও জখম হয়েছে, দুঃখের বিষয় আমরা নিরুপায়, কিছুই করবার নেই।

কোষ্টার আস্তে-আস্তে কার্লকে পিছন দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি তাই দেখেই পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। গাড়িটাকে কাছে আসতে দেখেই ওর ভয়, যদিও কার্ল অতি আস্তে এগিয়ে আসছে। সামনের সিট-এর পিঠের দিকটা খুলে ফেলে লোকটিকে গাড়িতে শুইয়ে দিলুম আর পিছনের সিট-এ রাখলুম স্ত্রীলোকটিকে। গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে আমি কোনো রকমে ওকে ধরে আছি। লেনৎস ওদিকের পাদানি থেকে লোকটিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

লেনৎস জাপ্‌কে বলল, 'তুমি এখানেই থাক, গাড়িটাকে পাহারা দাও।'

আমি বললুম, 'আরে তাই তো, সাইকেলওয়ালার কী হল। ওকে তো দেখা হয়নি।'

জাপ্ বলল, 'ও নিজেই উঠে চলে গেছে, আমরা তখন এদিকে ব্যস্ত ছিলুম।'

কোষ্টার আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে চলল। পাশের গ্রামটা পার হয়ে গেলেই

একটা ছোট্ট স্যানাটোরিয়ম। এপথে যেতে আসতে অনেক সময় ওটা আমরা দেখেছি। পাহাড়ের গায়ে শাদা মতো একটা বাড়ি। শুনেছি ওটা কোনো সরকারী ব্যাপার নয়, পয়সাওয়ালা রোগীদের জন্ত কোনো ডাক্তার বোধকরি ঘরোয়া গোছের একটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করেছেন। তা যাই হোক রোগী যখন রয়েছে তখন ডাক্তার নিশ্চয়ই থাকবে, কাটা-ছেঁড়া ঘা ব্যাণ্ডেজ করার ব্যবস্থাও নিশ্চয় আছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ওখানটায় পৌঁছে ঘণ্টা টিপলুম। বেশ সুন্দর দেখতে একটি নার্স বেরিয়ে এল। হঠাৎ রক্ত-টক্ত দেখে বেচারী বিষম ভড়কে গেল, কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ পলায়ন। পরমুহূর্তেই আর একজন নার্স দেখা দিল। এর একটু বয়েস-টয়েস হয়েছে। গম্ভীর ভাবে বললে, 'মাপ করবেন, এ ধরনের এ্যাক্সিডেন্ট-এর জন্য এখানটাতে কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। আপনারা এক কাজ করুন, ভারচাউ হাসপাতালে চলে যান, এখান থেকে বেশি দূর হবে না।'

কোষ্টার বলল, 'খুব কম হলেও এখান থেকে এক ঘণ্টার রাস্তা।'

নার্সের চোখে বিরক্তির আভাস, ভাবটা যেন—এখানে হবে না মশাই। মুখে বলল, 'কি করব বলুন, এখানে তো এসবের জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেই—তাছাড়া ডাক্তারও নেই।'

লেন্‌ত্‌স খপ করে বলে উঠল, 'আপনারা তো তাহলে বেআইনি কাজ করছেন। একজন স্থায়ী ডাক্তার ছাড়া তো এরকম স্বাস্থ্যনিবাস রাখবার নিয়ম নেই। আপনাদের টেলিফোনটা কোথায় বলুন তো, আমি একবার পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে চাই—একটা খবরের কাগজেও—

নার্সের ভাবভঙ্গি মুহূর্তে বদলে গেল। কোষ্টার মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আপনার যা প্রাপ্য তা আমরা দেব। আমাদের এখন দরকার একটা স্ট্রেচার। আর একজন ডাক্তার নিশ্চয় আপনি ডেকে আনতে পারবেন।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'হ্যাঁ, একটা স্ট্রেচার—স্ট্রেচার, প্রাথমিক পরিচর্যার সরঞ্জাম ইত্যাদি তো আইন মাফিক রাখতে হবে।'

লেন্‌ত্‌স এত সব খবর রাখে দেখে নার্স তো আরোই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে নার্স বেরিয়ে গেল। আমি বললুম, 'বাবাঃ, এও তো ফ্যাসাদ কম নয়।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'বড়-বড় হাসপাতালেও এ-ই অবস্থা। প্রথমে তো টাকা, তারপরে নিয়ম-কানুন—লাল ফিতের উপদ্রব—তবে রোগীর হেপাজত।'

ফিরে গিয়ে গাড়ি থেকে স্ত্রীলোকটিকে নামিয়ে নিলুম। বেচারী কিছুই বলছে না, শুধু নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার কাছে ছোট্ট একটা ঘর—সেখানেই ওকে নিয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে স্ট্রেচার এল। এবার অপর লোকটিকে স্ট্রেচারে তুলে দিলুম। লোকটি একবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। তারপরে বলল, 'এই এক মিনিট—' চোখ বুজে অতি কষ্টে বলল, 'দেখুন, ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ পেয়ে যায়, এ আমি চাইনে।'

কোষ্টার বলল, 'আপনার তো কিচ্ছু দোষ নেই, আমরা ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছি, দরকার হয় তো আমরা আপনার সাক্ষী দেব।'

লোকটা বলল, 'না, সেজন্য বলছিনে, আরো অনেক কারণ আছে যেজন্য ব্যাপারটা গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। বুঝতেই তো পারছেন—' বলে স্ত্রীলোকটিকে আমরা যে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলুম সে দিকে একবার ফিরে তাকাল।

লেন্‌ত্‌স বলল, 'তাহলে তো খুব ভালো জায়গাতেই এসেছেন! এটা প্রাইভেট হাসপাতাল কিনা। কোনো গোলমাল হবে না। এখন শুধু পুলিস টের পাবার আগে গাড়িটা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই হয়।'

লোকটা কোনোমতে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যা, হ্যাঁ পারবেন সেটা করতে? কোনো গেরাজ্‌-এ না হয় ফোন করে দিন। আর হ্যাঁ, দয়া করে আপনাদের ঠিকানাটা রেখে যাবেন—আপনারা আমার মস্ত উপকার করেছেন।'

কোষ্টার মাথা নেড়ে জানাল ওসবের দরকার নেই। ভদ্রলোক আবার ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না. না, আপনারা আমার—'

এবার লেনত্‌স জবাব দিল, 'তা বেশ তো, আমাদের নিজেদেরই মোটর মেরামতের কারখানা আছে। গাড়িটা সেখানেই না হয় নিয়ে যাই, যেমনমত যা করবার আমরাই করব। তাতে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ।'

'খুব ভালো কথা। আমার ঠিকানা আপনারা রাখতে পারেন—কিম্বা আমি নিজে গিয়েই গাড়ি নিয়ে আসব, না হয়তো আর কাউকে পাঠাব।'

কোষ্টার একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে ওর পকেটে ফেলে দিল। এবার ভদ্রলোককে নিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলুম। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেছে, খুব ছোকরা মতো দেখতে। ডাক্তার স্ত্রীলোকটির রক্তমাখা মুখ বেশ করে ধুয়ে মুছে দিয়েছে, কাটা দাগগুলো এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুমুখেই একটা চক্‌চকে নিকেলের পাত্র। মেয়েটি একহাতে ভর দিয়ে একটু উঠে চক্‌চকে পাত্রটার গায়ে

নিজের মুখখানা একবার দেখে নিল, দেখেই আঁতকে উঠে 'মা গো' বলে তক্ষুনি আবার শুয়ে পড়ল।

ঐ গ্রামে ফিরে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও গেরাজের খোঁজ করা গেল। খুঁজে পেতে পাওয়া গেল এক কামারের দোকান। কুড়ি মার্ক তাকে দিতে হবে। তার কাছ থেকে কিছু হাতিয়ার সংগ্রহ করা গেল। সে লোকটা কিন্তু আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। বলল, 'গাড়িটা আমি দেখতে চাই।' ওকে সঙ্গে নিয়েই রওনা হলুম।

জাপ্ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে। ও ডাকবার আগেই ব্যাপারটা আমরা কিঞ্চিত আঁচ করেছি। রাস্তার ধারে একটা বডোসড় মার্সিডিস গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আর জন চারেক লোক ভাঙা গাড়িটাকে নিয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করছে। কোষ্টার বলল, 'বাবাঃ, খুব সময়মতো এসে পড়া গেছে।' আমাদের কামার সঙ্গীটি বলল, ওঃ, এ যে দেখছি ভগ্‌ট্ গুষ্টির ভাই কটা। ওরা সাংঘাতিক লোক মশাই। এই কাছেই থাকে। একবার কিছু হাতে পেলে ওদের কাছ থেকে খসিয়ে নেওয়া বড় কঠিন।'

কোষ্টার বলল, 'সে আমরা দেখব'খন।'

জাপ্ কোষ্টার-এর কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আমি ওদের সব কথা বুঝিয়ে বলেছিলুম, ব্যাটারা শুনতেই চায় না। আসলে আমাদের মতো ওদেরও মোটর মেরামতের ব্যবসা। ওরা গাড়িটাকে ওদের কারখানায় নিয়ে যেতে চায়।'

'বেশ, এখন তুমি ওখানটায় একটু দাঁড়াও তো—' বলে কোষ্টার ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বড় ভাইটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। গাড়িটা যে আমাদের সে কথা বলাই উদ্দেশ্য।

আমি লেন্‌ত্‌সকে জিগগেস করলুম, 'তোমার কাছে শক্ত, মজবুত জিনিস-টিনিস কিছু আছে?'

'থাকবার মধ্যে চাবির গোছাটা আছে, ওটা আমারই দরকার হবে। তুমি বরং একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি কিছু নাও।'

আমি বললুম, 'না, না, শেষটায় একটা খুন-খারাবি কাণ্ড হয়ে যাবে। মুশকিল করেছি বড্ড হাল্কা জুতো পরে এসেছি। মজবুত বুট থাকলে লাথি মেরেই কাবু করা যেত।'

লেন্‌ত্‌স আমাদের কামার সঙ্গীকে জিগগেস করল, 'তুমি আসছ তো আমাদের সঙ্গে? তাহলে সমানে সমানে হবে। ওরাও চারজন আমরাও চারজন।'

'না মশাই, আমি ওর মধ্যে নেই। ও ব্যাটারা কালকেই গিয়ে আমার দোকান চুরমার করে দেবে। আমি কোনো দলেই নই।'

জাপ্ বলে উঠল, 'আমি তো রয়েছি আপনাদের দলে।'

আমি বললুম, 'থাক, তোমাকে লড়াই করতে হবে না। তুমি শুধু নজর রাখ— কোনো দিক থেকে লোকজন আসছে কিনা, তাহলেই হবে।'

কামার আমাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—সেইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য।

হঠাৎ শুনি ওদিক থেকে বড় ভাইটা চেঁচিয়ে কোষ্টারকে বলছে, 'বাজে বোকো না। আমরা আগে এসেছি, আমরাই নেব। ব্যস্। যাও এখন ভাগো।'

কোষ্টার আবার ওকে বুঝিয়ে বলল যে গাড়িটা বাস্তবিক আমাদের। বিশ্বাস না হয় তো স্যানাটোরিয়মে চলুক, ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে। ভগ্‌টু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল। লেন্‌ত্‌স আর আমি ততক্ষণে ওদের কাছে এগিয়ে এসেছি। ভগ্‌টু ঠাট্টা করে বলল, 'তোমাদের নিজেদেরই বুঝি হাসপাতালে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।' কোষ্টার ওর কথার জবাব না দিয়ে গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। তাই দেখে ভগ্‌টু পুঙ্গবরা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চারজনেই কাছাকাছি জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোষ্টার আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'যাও তো, আমাদের গাড়িটা নিয়ে এস।' বড় ভাইটা রাগে চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার বলছি।' লোকটা কোষ্টারের চাইতে হাত খানেক লম্বা হবে। কোষ্টার নির্বিকার ভাবে বলল, 'তা যাই বল, গাড়ি আমাদের নিতেই হবে।' লেন্‌ত্‌স আর আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটু-একটু করে এগোচ্ছি। কোষ্টার আপন মনে ঝুঁকে গাড়িটা দেখছে। ভগ্‌টু লোকটা হঠাৎ ধাঁই করে এক লাথি মারল। অটো কিন্তু আগে থেকেই সেটি আঁচ করে রেখেছে। যেই না লাথি মারা ও খপ করে ব্যাটার ঠ্যাং ধরে ফেলে ওকে এক ঝট্‌কায় চিত করে ফেলে দিল। ওর পাশে যে ভাইটা দাঁড়িয়েছিল সে ব্যাটা একটা লোহার হ্যাণ্ডেল তুলতে যাচ্ছিল। অটো মারল ওর পেটে এক ঘুঁষি। ব্যস্, সেটাও চিতপাত। ব্যাপার দেখে লেন্‌ত্‌স আর আমিও বাকি দুটোর উপর লাফিয়ে পড়লুম। মারলুম একটার মুখে ঘুঁষি, ঘুঁষিটা বেশ জোর হয়েছিল বটে কিন্তু একতরফা নয়, আমারও নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমার দ্বিতীয় ঘুঁষিটা গেল ফস্কে, ওর দাড়ির কাছটার একটু লেগে বেরিয়ে গেল। এদিকে ওর ঘুঁষি এসে লাগল আমার চোখে। বেকায়দায় পড়ে আমি ওর মার এড়াতে পারছিলুম না। পেটে এক ঘুঁষি মেরে ব্যাটা দিল

আমাকে ফেলে। পাথুরে রাস্তার উপর ফেলে আমার টুঁটি চেপে ধরল। পাছে ও আমার দম একেবারে আটকে দেয় এই ভয়ে ঘাড়ের পেশিগুলোকে প্রাণপণে শক্ত করে রাখলুম। এপাশ-ওপাশ মোড়ামুড়ি করে ওকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিলুম। পা-দুটো একবার ছাড়িয়ে আনতে পারলেই শুর পেটে এক লাথি মেরে ওকে ফেলে দিতে পারতুম। কিন্তু লেন্‌ত্‌স আর ভগ্‌টুদের আর একটা ভাই হুড়োহুড়ি জড়াজড়ি করে পড়বি তো পড় আমারই পায়ের উপর পড়েছে। কাজেই পা কিছুতেই ছাড়িয়ে আনতে পারছি না। এদিকে ঘাড় শক্ত করে রাখলে কি হবে আমার দম প্রায় আটকে আসছে। নাকের জখমে রক্ত জমে আমি ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে পারছিনে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। হঠাৎ যেন মনে হল জাপ্‌ আমার পাশেই রাস্তার ধারের নর্দমাটায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আর একটু হলেই আমার প্রায় হয়ে গিয়েছিল। জাপ্‌ সুযোগ বুঝে মেরেছে ওর কব্জিতে এক ঘা। আর এক ঘা মারতেই ব্যাটা আমাকে ছেড়ে জাপ্‌-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাপ্‌ কিন্তু সুড়ুত করে সরে গিয়ে এবারে ওর মাথা সই করে মেরেছে। আমি তত্ক্ষণে উঠে গিয়ে জাপ্টে ধরে ব্যাটাকে মাটিতে ফেলেছি। এবার আমার পালা। এখন আমিই ওর টুঁটি চেপে ধরেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বিকট আর্তনাদ করে উঠল, 'গেলুম-গেলুম, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।'

এটা ভগ্‌টুদের সেই বড় ভাইটা। কোষ্টার ওটাকে মাটিতে ফেলে ওর একটা হাত পিঠের দিকে এনে এমন মুচড়ে ধরেছে আর বলবার নয়। লোকটা জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছে। কোষ্টার তবু ছাড়ছে না। জানে একটা হেস্তনেস্ত না হলে ব্যাটা সায়েস্তা হবে না। হঠাৎ এক হেঁচকা টানে হাতটা মট করে ভেঙে দিয়ে ওকে ছেড়ে দিল। ভগ্‌টু বেচারা মাটিতে পড়ে আছে। ওর একটা ভাই পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু দাদার অবস্থা দেখে ভায়ের লড়াইয়ের সাধ আপনি মিটে গিয়েছে। কোষ্টার গর্জে উঠে বলল, 'এখান থেকে তোমরা ভাগো বলছি, নইলে আমি আবার মার শুরু করব।

আমি যে ভাইটাকে চেপে ধরেছিলুম সেটার মাথা বারকয়েক মাটিতে ঠুকে দিয়ে আমিও ছেড়ে দিলুম। লেন্‌ত্‌স কোষ্টার-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোট ছিঁড়ে গেছে, মুখের কোণে রক্ত লেগে আছে। মনে হচ্ছে ওদের লড়াইতে হার-জিত সাব্যস্ত হয়নি, কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বীটিও কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে রক্ত লেগে আছে। বড় ভাই হেরে যাওয়াতেই এরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কারো মুখে

আর কথা নেই। সবাই মিলে ধরাধরি করে বড় ভাইটাকে নিয়ে গাড়িতে তুলল। একটা ভাইয়ের বিশেষ কিছুই লাগেনি, আস্তে-আস্তে এসে এঞ্জিনে স্টার্ট দেবার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে কোষ্টারের দিকে তাকাচ্ছে, কোষ্টার মানুষ না দৈত্য-দানব তাই ভাবছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের মার্সিডিস গাড়ি ঘটাঘট্ শব্দ করতে-করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে আমাদের কামার বন্ধু সাহস করে এগিয়ে এসেছে। বলল, 'আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন, মশাই। শিগগির ওরা এমন জব্দ হয়নি। জানেন, বড় ভাইটা খুনের দায়ে একবার জেল খেটে এসেছে।'

কেউ ওর কথার জবাব দিল না। কোষ্টার কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বলল, 'ধ্যাৎ, যত সব বিচ্ছিরি ব্যাপার। এস এবার কাজে লাগা যাক।' জাপ্ দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি।' সে তখন আমাদের হাতিয়ারের ট্রলিটা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসছে।

ওকে ডেকে বললুম, 'এ-ই শোনো আজ থেকে তোমাকে লান্স-কর্পোরেল-এর পদ দেওয়া গেল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চুরুট খাওয়ারও অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি। চাও তো খেতে পার।'

গাড়িটাকে ঠেলে সোজা করে মোটা তার দিয়ে কার্লের পিছনে বেঁধে নিলুম। কোষ্টারকে জিগগেস করলুম, 'এতে কার্লের ক্ষতি হবে না তো? ও তো আর মোট বইবার খচ্চড় নয়, ও হল গিয়ে রেস-এর ঘোড়া।'

কোষ্টার মাথা নেড়ে বলল, 'বেশি দূর নয় তো, আর রাস্তাও তেমন উঁচুনিচু নয়।' লেনত্‌স গিয়ে বসল ভাঙা গাড়িটাতে, কোষ্টার আস্তে-আস্তে ড্রাইভ করে চলল। আমি নাকে রুমাল গুঁজে বসে আছি। দূরে মাঠের প্রান্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। চারদিকে কি অগাধ শান্তি! ঐ যেখানে মানুষ পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করছে, প্রকৃতিদেবী সেদিকে ফিরেও তাকান না, মানুষের দ্বন্দ্ব-কোলাহলের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্ষুদ্রচিত্ত মানুষ কি ভাবছে আর কি করছে তাতে কি আসে যায়? তার চাইতে ঢের বড় কথা সূর্যাস্তের মেঘে ঐ কাঞ্চনের আভা, দিগন্তের বলয় থেকে সন্ধ্যারানীর নিঃশব্দ পদসঞ্চরণ আর ততোধিক ধীর পদক্ষেপে রাত্রির সগাম্ভীর আবির্ভাব।

কারখানার প্রাঙ্গণে এসে ঢুকতেই লেনত্‌স ভাঙা গাড়িটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। থিয়েটারী ঢঙে মাথার টুপি খুলে নিয়ে বলল, 'প্রিয়ে, তোমাকে নমস্কার।

অপঘাতের ফলে পথ ভুল করে আমাদের ঘরে এসেছ। ভাগ্যদেবী যদি সুপ্রসন্ন হন তবে তোমার দৌলতে কমসে কম তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার মার্ক ঘরে আসবে। অতএব এখন আমার জন্য এক গ্লাশ চেরি ব্রাণ্ডির যোগাড় দেখ আর জলদি বড় দেখে এক টুকরো সাবান দাও—ভগ্‌টু গুষ্ঠির গন্ধটা এক্ষুনি গা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করতে হবে।' সবাই এক-এক গ্লাশ করে পান করলুম। তারপরে আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি ভাঙা গাড়িটাকে নিয়ে আমরা কাজে লেগে গেলুম। মেরামতের কাজ শুধু মালিকের কাছ থেকে আদায় করলেই চলে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানি হঠাৎ এসে বলতে পারে—এখানে নয়। ওদের তাঁবেদার কোনো কারখানায় মেরামত করাবে। কাজেই সব খুলে ফেলে যত তাড়াতাড়ি ওটাকে অচল করে রাখা যায় ততই সুবিধে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি যদি আসেও তবে দেখবে আবার কলকব্জা সব লাগিয়ে এটাকে খাড়া করতে যা খরচা পড়বে তার চাইতে আমাদের দিয়ে মেরামত করানোই ওদের পক্ষে লাভজনক।

আমাদের কাজ যখন সমাধা হল তখন রীতিমতো অন্ধকার হয়ে গেছে। জিগগেস করলুম, 'আজকে আর ট্যাক্সি নিয়ে বেরোবে?'

গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'আরে না, না। ব্যবসায় কক্ষনো অতিরিক্ত লোভ করতে নেই। আজকের পক্ষে এই গাড়িটাই যথেষ্ট।'

আমি বললুম, 'উঁহুঁ, তুমি না গেলে আমিই যাচ্ছি।'

গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না বাপু। এই গ্লাশটার মধ্যে তাকিয়ে একবার তোমার নাকটার অবস্থা দেখ তো। ঐ নাক দেখেই তো কেউ তোমার গাড়িতে উঠতে চাইবে-না। তার চাইতে এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা জলের পটি দাও।'

ও ঠিকই বলেছে। এ নাক নিয়ে বেরোনো চলে না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলুম। রাস্তায় হেসির সঙ্গে দেখা। বাকি পথটুকু ওর সঙ্গেই হেঁটে-হেঁটে গেলুম। বেচারা আগের চাইতেও যেন মুষড়ে গেছে। বললুম, 'আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন।'

ও মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আজ কতদিন যাবৎ রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা যাচ্ছে। স্ত্রীর কোথায় সব বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় থাকে, অনেক রাত করে ফেরে। তা একরকম ভালোই হয়েছে, বেচারী তবু একটু ফুর্তিতে থাকে। তবে ওর নিজের অবিশ্যি—হ্যাঁ, এই দেখুন না, আপিস

থেকে ফিরে রাত্তিরে কি আর রান্নাবান্না করা পোষায়? যা ক্লান্ত হয়ে ফিরি— আর খিদে বোধ-টোধ থাকে না।'

লোকটির মুখের দিকে এবার তাকালুম। ঘাড় নিচু করে আমার পাশে হেঁটে চলেছে। ওর স্ত্রীর আসল রহস্যটা ও বোধকরি জানেই না, না জানাই ভালো। তবু ওর কথা শুনে মনে বড় কষ্ট হল। শুধু অভাবের তাড়নায়, সামান্য দুটো পয়সার অভাবে এমন নির্ঝঞ্ঝাট গোবেচারী ভালোমানুষটির বিবাহিত জীবন কণ্টকিত হয়ে গেছে। ওর মতো এমন কত লক্ষ-লক্ষ মানুষ আছে, পয়সার অভাবে, একটু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে তাদেরও জীবন বিষাক্ত। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। এই যে আজ বিকেলবেলায় লড়াইটা করে এলুম, আর তাছাড়া আজ পর্যন্ত জীবনে যা কিছু দেখেছি, করেছি, সবই তো কেবলমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা। ভাবতে-ভাবতে প্যাট্-এর কথা মনে হল। আমিই কি ওকে পাব? অসম্ভব। মাঝখানে দুস্তর বারিধি। এই নিষ্করুণ সংসারে সুখের প্রত্যাশা বৃথা। জীবন তো সুখের নীড় নয়, কণ্টকশয্যা।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে উঠলুম। সিঁড়ির মাথায় উঠে হেসি একমুহূর্ত একটু থামল, বলল, 'আচ্ছা. তবে আসি।'

আমি বললুম, 'রাত্তিরে কিছু খাবেন না?'

বেচারী অত্যন্ত কুণ্ঠিত মুখে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, পরমুহূর্তেই অন্ধকার শূন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। খানিকক্ষণ ওখানটায় দাঁড়িয়ে শূন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ শুনি কে যেন মৃদু কণ্ঠে গান করছে। প্রথমটায় ভেবেছিলুম আর্না বোনিগ-এর গ্রামোফোনে বুঝি গান হচ্ছে। তা তো নয়, এ যে প্যাট্-এর গলা। একলা ঘরে বসে-বসে ও গান করছে। করিডর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে দুই করতল যুক্ত করে বলে উঠলুম, 'দূর ছাই, অত ভাবনার কি আছে? সংসার হলই বা কণ্টকশয্যা, নাইবা হল সুখের নীড়, যতক্ষণ দুটি প্রাণ একসূত্রে বাঁধা ততক্ষণ কোনো বিচ্ছেদ ঘটতে দেব না। বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু শক্ত বলেই বিশ্বাস করব। বিশ্বাসের অতীত বলেই তো সুখ অত নতুন, অত বিচিত্র, অত বিহ্বলকারী।'

নিঃশব্দে যখন ঘরে ঢুকলুম, প্যাট্ আমার আগমনবার্তা জানতেও পারল না। বড় আয়নাটার সুমুখে ও লেপটিয়ে মেঝের উপরে বসে আছে, একটা কালো রঙের টুপি মাথায় পরে দেখছে কেমন মানিয়েছে। পাশে কার্পেটের উপরে ছোট একটি

ল্যাম্প। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার আধো-আলো আধো-ছায়া। ল্যাম্পের আলোটি উজ্জ্বল হয়ে শুধু ওর মুখখানিকে আলোকিত করেছে। পাশে একটা চেয়ার, তার হাতল থেকে এক টুকরো সিল্কের কাপড় ঝুলছে, চেয়ারের উপরে একটা কাঁচি, আলো পড়ে চকচক করছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে নীরবে ওর টুপি তৈরি-করা দেখছি। ও প্রায়ই এমনি মেঝেতে লেপ্‌টিয়ে বসে। অনেক সময় দেখেছি মেঝের এক কোণে ও ঘুমিয়ে আছে। পাশে হয় আধ-খোলা বই, না হয় কুকুরটা বসে আছে। আজকে কুকুরটা পাশে রয়েছে, হঠাৎ ওটা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

প্যাট্ মাথা তুলে তাকাতেই আয়নাতে আমাকে দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। ঐটুকু হাসিতেই সমস্ত সংসার যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে ওর পাশটিতে বসে সমস্ত দিনের ক্লেদ আর ক্লান্তি আর গ্লানি নিয়েই ওর শুভ্র, মসৃণ ঘাড়টিতে একটি চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিলুম। কালো টুপিটা তুলে ধরে প্যাট্ বলল, 'এই দেখ, টুপিটা কেমন বদলে দিয়েছি, তোমার পছন্দ হচ্ছে তো?' বললুম, 'চমৎকার হয়েছে।'

'হুঁ, তুমি মোটে তাকিয়েই দেখছ না। দেখেছ পিছন দিকে খানিকটা কেটে ফেলেছি আর সামনের ব্রিম্‌টা উপরের দিকে উল্টে দিয়েছি।'

আমার মুখ ওর ঘন চুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললুম, 'খুব দেখতে পাচ্ছি। তোমার এই টুপি দেখলে প্যারিসের ফ্যাশনেবেল্ টুপিওয়ালীর দল পর্যন্ত হিংসে করতে থাকবে।'

প্যাট্ হেসে উঠল। আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাজে বোকো না, বব্। তুমি এসবের কিচ্ছু বোঝ না। আর আমি কি পরি না পরি তা তুমি তাকিয়েও দেখ না।'

'দেখি না আবার! প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি দেখি।' বলে মেঝের উপরে ওর পাশটিতে বসে পড়লুম। একটু পিছন ঘেঁষে বসলুম যাতে আমার নাকটা সহজে ওর চোখে না পড়ে।

প্যাট্ বলল, 'তাই নাকি? আচ্ছা বল দেখি কালকে রাত্তিরে আমি কি পরেছিলাম?'

'কালকে রাত্তিরে? তাই তো—' মাথা চুলকোতে লাগলুম। আমার কিছু মনেই পড়ছে না।

'কেমন, বলেছিলুম না? তুমি আমার কিছুই জানো না, কিছুই বোঝ না।'

বললুম, 'ঠিক বলেছ, কিন্তু তাতেই ভালো হয়েছে। লোকে যত বেশি বুঝতে যায় তত বেশি ভুল বোঝে। একজন আর একজনের যত বেশি কাছে আসে তত বেশি দূর, তত বেশি পর হয়ে যায়। এই আমাদের হেসিদের কথাই ধর না। একজন আর একজনের সব কিছু জানে, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পারে না—দুজনের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান।'

কালো টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে ও আয়নায় নিজেকে বেশ করে দেখতে লাগল। বলল, 'রব্বি, তুমি যা বলছ তা পুরো সত্য নয়, আধা-সত্য।'

আমি বললুম, 'সব সত্যের বেলাতেই ঐ। এর বেশি আমরা পাইও না, চাইও না। এই মানুষের ধর্ম। অবশ্য ভগবান জানেন এই আধা-সত্যের দরুনই আমাদের যত গোলমাল। কিন্তু এও যদি বলি পুরো সত্য নিয়েও সংসারে বাস করা চলত না।' টুপিটা মাথা থেকে খুলে এক পাশে রেখে দিল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে মুখ করে বসল। যেই না বসা অমনি আমার নাকের দিকে ওর নজর পড়েছে। আঁতকে উঠে বলল, 'ও কি হয়েছে?'

বললুম, 'ও কিছু নয়। গাড়ির তলায় কাজ করছিলুম, কি একটা নাকের উপর পড়ে গেল।'

তাকানোর ভঙ্গিতেই বুঝলুম আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি। 'কি জানি বাপু, কি হয়েছে তুমিই জানো। আমার কথা যেমন তুমি জানো না, তোমার কথাও তেমনি আমি জানি না।'

আমি বললুম, 'সেই সব চেয়ে ভালো।'

প্যাট্ উঠে গিয়ে একটা পাত্রে জল আর কিছু টুকরো কাপড় নিয়ে এল। আমার নাকে পটি বেঁধে দিল। বলল, 'দেখে ঘুঁষির ঘা বলে মনে হচ্ছে। তোমার কাঁধেও আঁচড়ের দাগ দেখছি। কোথাও বুঝি খুব বীরত্ব ফলিয়ে এসেছ?'

'আজকের সব চেয়ে বীরত্বের ব্যাপারটা এখনো বাকি আছে।'

প্যাট্ খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। 'এ্যাঁ, এই রাত্তিরে আবার বেরুচ্ছ নাকি?'

'মোটেই না।' জল-পটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওকে বুকে টেনে নিলুম। বললুম, 'আজ সারারাত তোমার কাছেই থাকব।'

ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত ত

পুরো অগাস্ট মাস কেটে গেছে। শীত বলতে গেলে পড়েইনি, আকাশ পরিষ্কার। সেপ্টেম্বর এসে গেল তবু গ্রীষ্মের রেশ যাই-যাই করেও যাচ্ছে না; কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ভালো করেই বাদল নামল। সারাদিন মেঘ করে থাকে, টিপটিপ বৃষ্টি, তারপর ঝড়ও শুরু হল। তারই মধ্যে একদিন রবিবার খুব ভোরে জেগে গেছি। জানালার ধারে গিয়ে কবরখানার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছগুলোর রঙ কেমন যেন হলদেটে হয়ে গেছে। পাতা-টাতা ঝরে গিয়ে ন্যাড়া-ন্যাড়া ডাল-পালা নিয়ে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ খানিকক্ষণ জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলুম। সেই প্যাট্‌কে নিয়ে সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে আসবার পর এই কটা মাস কি করে কেটে গেছে! শরৎকাল এলেই প্যাট্‌কে কোথাও পাঠাতে হবে এ কথা রোজই মনে হয়েছে, সব সময় ভেবেছি অথচ কেমন যেন ঠিক খেয়াল হয়নি। খুব জানা কথা আমরা জেনেও জানি না। এই যে বয়স বাড়ছে, আয়ু কমছে—একথা সবাই জানে কিন্তু কজনের খেয়াল থাকে! আজকের কথাটাই বড়, কালকের কথা কে ভাবে? এই যে প্যাট্ কাছে রয়েছে সেটাই বড় কথা, শরৎকাল এসেছে বলে তাকে যে দূরে যেতে হবে সেটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট। দুজনে কাছে আছি, এক সঙ্গে আছি—এর চাইতে বড় সুখ আর কি আছে?

বৃষ্টি-ধোয়া ভিজে স্যাঁতসেঁতে কবরখানাটার দিকে তাকিয়ে আছি। হলদে বিবর্ণ ঝরা পাতায় সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন। কুয়াশাটা যেন একটা রক্তপিপাসু জানোয়ারের মতো গাছ-লতা-পাতার সমস্ত সবুজ রসটুকু রাতারাতি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। গাছের ডাল থেকে নিষ্প্রাণ পাতাগুলো যেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঝুলছে। এক-একটা দমকা হাওয়া আসছে আর অসংখ্য পাতা ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনের ভিতরটা ব্যথায় টন-টন করে উঠল। তাই তো, আমাদের

বিচ্ছেদের আর বিলম্ব নেই তো। ঝরা পাতার পথে-পথে শরতের অলক্ষ্য আগমন যেমন নিঃসন্দেহ সত্য, আমাদের তুজনের ছাড়াছাড়িও তেমনি অনিবার্য সত্য।

পাশের ঘরে প্যাট্ তখনো ঘুমুচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনলুম। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কাশছে না তো। মুহূর্তের জন্যে মনে একটু আশ্বাস এল। কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে একদিন জাফে টেলিফোন করে বলবেন, প্যাট্কে কোথাও যেতে হবে না। ভাবতে লাগলুম কত দিন ধরে রাতের পর রাত ওর ঐ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি—একটা মৃদু চাপা শব্দ, বহুদূরাগত ক্ষীণ করাতের আওয়াজের মতো। কিন্তু মনের আশ্বাসটুকু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না—যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল।

আবার জানালার কাছে গিয়ে বাইরের মৃদু বর্ষণধারা দেখতে লাগলুম। তারপরে টেবিলের কাছে এসে আমার টাকা-পয়সা বের করে বসলুম। পুঁজি-পাটা হিসেব করে দেখতে হবে এতে প্যাট্-এর কদিন চলবে। মনটা আরো বেশি দমে গেল, টাকা-পয়সা সরিয়ে রেখে দিয়ে উঠে পড়লুম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাতটা বাজে। প্যাট্-এর বিছানা ছেড়ে উঠতে এখনো ঘণ্টা তুই দেরি। ভাবলুম ততক্ষণ গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক। ঘরে বসে তুশ্চিন্তা করার চাইতে সেটা ঢের ভালো।

প্রথমটায় গ্যারাজে গেলুম, সেখান থেকে গাড়ি বের করে খুব আস্তে-আস্তে ড্রাইভ করে চললুম। রাস্তায় লোকজন বড় একটা নেই। শ্রমিকদের পাড়া, লম্বা সারি দেওয়া বাড়িগুলোর জীর্ণ কুৎসিত মূর্তি অনেকটা যেন বয়স্কা বেশ্যার বিষণ্ণ মূর্তির মতো। বাড়িগুলোর সুমুখ দিকটা নোঙরা, দরজা জানালার রঙ কালচে হয়ে গেছে। দেখলেই মন দমে যায়। চুন-বালিখসা দেওয়ালের গায়ে গর্ত—ঠিক যেন বসন্ত রোগের দাগ।

শহরের পুরোনো অঞ্চল পার হয়ে ক্যাথিড্রালের কাছে এসে থামলুম। গেটের বাইরে গাড়ি রেখে নেমে পড়লুম। ওক্ কাঠের বিরাট দরজাটা বন্ধ, তারই ভিতর দিয়ে অর্গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলার উপাসনা চলছে। আন্দাজ করলাম উপাসনা শেষ হয়ে লোকজন বেরোতে এখনো মিনিট কুড়ি বাকি আছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানে ঢুকলুম। গোলাপের ঝাড় থেকে টপ্ টপ্ করে বৃষ্টির জল পড়ছে, কিন্তু গাছগুলো ফুলে বোঝাই হয়ে আছে। আমার বর্ষাতিটা দিব্যি

বড়সড়, ফুলের গোছা কেটে নিয়ে বেশ কিছু ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারব। রবিবার হলে কি হবে, ধারে-কাছে লোকজন নেই।

এক রাশ ফুল নিয়ে নির্বিবাদে গাড়ির ভিতরে রেখে আর এক কিস্তি আনবার জন্ম ফিরে গেলুম। ফুল তুলে নিয়ে সবে বর্ষাতির ভিতর ঢুকিয়েছি এমন সময় মনে হল কে যেন এদিকে আসছে। ফুলগুলো তাড়াতাড়ি দুহাতে চেপে ধরে সুমুখে যে ক্রশটা ছিল তারই দিকে মুখ করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলুম—যেন একান্তে যীশুর আরাধনায় মগ্ন।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কই চলে যাচ্ছে না তো। আমার কাছে এসে পায়ের শব্দ থেমে গেল। আমি তখন ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠছি, চোখ মেলে গভীর ভক্তিভরে সুমুখের পাথরের মূর্তিটির দিকে তাকালুম। তারপরে আড়ষ্ট হাতে ক্রশের ভঙ্গি করে পরবর্তী মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পায়ের শব্দ আবার আমার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে আসছে। এ তো মুশকিল হল, কি করা যায়! ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, নড়তে গেলেই ধরা পড়ে যাব। উপায়ান্তর না দেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। মুখে একটু বিরক্তির ভাব এনে ওর দিকে ফিরে তাকালুম, যেন ওর উপস্থিতিতে আমার প্রার্থনার ব্যাঘাত হচ্ছে। তাকাতেই দেখি গোলগাল ভারি ভালোমানুষ মতো একখানি মুখ—গির্জের পাদ্রি। আমার প্রার্থনায় বাধা দেবার উদ্দেশ্য ওর নেই। জানে দু-চার মিনিটের মধ্যেই আমার আরাধনা শেষ হবে; প্রার্থনান্তে দুটো কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। বৃথা বিলম্ব করে কি হবে। উপাসনার ভান তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিয়ে আস্তে গেটের দিকে পা বাড়ালুম।

পাদ্রি বললেন, 'এই যে নমস্কার, যীশুর জয় হোক্।' রোম্যান ক্যাথলিকদের রেওয়াজ মতো বললুম, 'তথাস্তু, জয় হোক যীশুর।'

লোকটি হাসি মুখে বলল, 'এ সময়ে তো এখানে কাউকে বড় একটা দেখা যায় না।' চোখের দৃষ্টি শিশুর মতো সরল।

আমি বিড়বিড় করে কি একটা বললুম। লোকটি বলতে লাগল, 'দুঃখের কথা বলব, এই সব ক্রশের সামনে দাঁড়িয়ে তো আজকাল কাউকেই উপাসনা করতে দেখি না। আজ আপনাকে দেখে বড় ভালো লাগল, সেইজন্যেই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। আপনার নিশ্চয় বিশেষ কোনো প্রার্থনা আছে, নইলে এই সকালবেলায় এমন বাদলায়—'

মনে-মনে বললুম, হ্যাঁ, প্রার্থনাটি হচ্ছে আপনি দয়া করে চলে গেলে বড় বাধিত

হই। যাক্, তবু একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল, ভদ্রলোক ফুলগুলো এখনো দেখতে পাননি। এখন এর কাছ থেকে যত শিগগির পার পাওয়া যায় ততই ভালো।

লোকটি আবার একটু মৃদু হেসে বলল, 'আমি এক্ষুনি উপাসনায় বসব। বলেন তো আপনার বিশেষ প্রার্থনাটি আমার প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারি।'

বললুম, 'ধন্যবাদ।' ওর কথা শুনে খুব অবাক লাগছে, অস্বস্তিও বোধ হচ্ছে!

'আপনি বোধকরি সদ্যমৃত কোনো আত্মীয়ের আত্মার সদ্গতি কামনা করছেন।'

ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি। এদিকে কোটের তলায় ফুলগুলো গড়িয়ে নামবার উপক্রম করছে। 'না, না, ওসব কিছু নয়,' বলে তাড়াতাড়ি দুহাতে কোটটাকে চেপে ধরলুম।

লোকটি তখনো শিশুর মতো সরল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি কিছু বলি কিনা তারই অপেক্ষায়। কিন্তু চেষ্টা করেও বলবার মতো কিছুই খুঁজে পেলুম না। তাছাড়া এমন লোকের কাছে বানিয়ে মিথ্যে বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, এমনিতেই ঢের হয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শেষটায় ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে আমি মোটামুটি আপনার বিপদ যাতে উদ্ধার হয় সেজন্য প্রার্থনা করব।'

বললুম, 'হ্যাঁ, সেই বেশ হবে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

লোকটি হেসে বলল, 'আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। ভগবানের উপরেই বিশ্বাস রাখবেন। একমাত্র তিনিই ভরসা। আমরা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারিনে, কিন্তু বিপদে তিনিই সহায়, তিনি সাহায্য করবেনই।' বলে নমস্কার করে ভদ্রলোক আস্তে-আস্তে চলে গেলেন।

আমি খানিকক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হুঁ, ভদ্রলোকও যেমন! অতই যদি সোজা হত। ভগবানই একমাত্র সহায়—কিন্তু কই, আমাদের বার্নার্ড ওয়াইজ্ যখন পেটে গুলি খেয়ে ছট্ফট্ করতে-করতে মারা গেল তখন ভগবান কি তার সহায় হয়েছিলেন? আর কাটসিনত্স্কিকে কি সাহায্য করেছিলেন ভগবান যখন সে মরল—ঘরে রুগ্না স্ত্রী আর দুধের শিশু; বেচারী ছেলেকে একবার চোখেও দেখতে পেল না। মুলার, লিয়ার, কেমারিক্, ফ্রিড্ম্যান, বার্গার, এমন কত লক্ষ-লক্ষ। ভগবান এসেছিলেন এদের রক্ষা করতে? আরে দূর ছাই ভগবানের উপর এই বিশ্বাস থাকার ফলেই সারা দুনিয়ায় বহু রক্তের স্রোত বয়ে গেছে।

ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। গাড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার কারখানায় যেতে হল। গাড়ি রেখে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরলুম। রান্নাঘর থেকে টাটকা তৈরি কফির দিব্যি গন্ধ বেরিয়েছে। কফির গন্ধে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। লড়াইয়ের পর থেকেই দেখছি—বড়-বড় ব্যাপার কিম্বা বড় জিনিসে তেমন আনন্দ পাইনে, অথচ খুব ছোটখাট জিনিসে মনে ফুর্তি হয়, মনে শান্তি পাই।

প্যাসেজে পা দিতেই হেসি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। হলদেটে মুখ ফোলা-ফোলা, চোখ দুটো লাল। দেখলে মনে হয় রাত্তিরে কাপড়-চোপড় না বদলে অমনি শুয়ে পড়েছিল।

আমাকে দেখে খুব নিরাশ হল। বিড়বিড় করে বলল, 'ও. আপনি!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আপনি কারো জন্য অপেক্ষা করছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—উনি তো রাত্তিরে ফেরেননি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'না তো। আমি এই ঘণ্টাখানেক মাত্র বেরিয়েছিলুম।'

'হ্যাঁ, তাও ভাবলুম যদি কোথাও দেখা হয়ে গিয়ে থাকে।'

বললুম, 'তা কি আর হয়েছে? এক্ষুনি হয়তো আসবেন! আপনাকে টেলিফোন করেননি?' বেচারী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'না, কাল সন্ধ্যেয় ওঁর বন্ধুদের কাছে গেলেন। আমি জানিও না, ওঁরা কোথায় থাকেন।'

'ওঁদের নাম জানেন তো? এন্‌কোয়ারি আপিসকে জিগগেস করতে পারেন।'

'তা জিগগেস করেছিলুম। ওরা কিছু বলতে পারল না।'

মার-খাওয়া নিস্তেজ কুকুরের মতো ওর চেহারা। বলল, 'ওঁর বন্ধুদের কথা আমাকে কিছু খুলে বলেন না। কিছু জিগগেস করতে গেলে আবার চটে ওঠেন। কাজেই আমি বেশি ঘাঁটাই না, চুপ করে থাকি। একা-একা থাকে তবু দু-চারজন সঙ্গী পেয়েছে। ভাবি এক রকম ভালোই হল। কখনো আপত্তি করিনি।'

বললুম, 'কিছু ভাববেন না। এই এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বেন। তবে পুলিসকে একবার জিগগেস করলে পারেন। ধরুন যদি কোথাও দুর্ঘটনা কিছু—বলা তো যায় না।'

'সে সব জিগগেস করা হয়ে গেছে। ওরা কিচ্ছু জানে না।'

বললুম, 'তাহলে আর মিথ্যে ভাবছেন কেন? হয়তো শরীর ভালো নেই, রাতটা ওখানেই থেকে গেছেন। ও রকম তো কত সময় হয়। দেখুন না, এই দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাচ্ছেন।'

'সত্যি বলছেন ?'

হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল, দেখি ফ্রিডা ট্রে হাতে করে বেরুচ্ছে।

জিগগেস করলুম, 'কার খাবার যাচ্ছে ?'

আমাকে দেখেই ফ্রিডার মুখে বিরক্তি দেখা দিয়েছে। বলল, 'ফ্রাউলিন্ হোল্‌ম্যান-এর খাবার।'

'উনি তাহলে উঠেছেন ?'

'উঠেছেন বৈকি। নইলে আর খাবার চেয়ে পাঠাবেন কেন ?'

বললুম, 'ফ্রিডা ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন। আহা কি লক্ষ্মী মেয়ে গো! আচ্ছা, আমার কফিটাও দিয়ে যাও না।'

ফ্রিডা বিড়বিড় করে কি একটা বলে অবজ্ঞাভরে গা দুলিয়ে চলে গেল। ঐটুকু ভঙ্গিতে এতখানি ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা আর কারো দেখিনি।

হেন্সি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা তাহলে—আর ঘণ্টা দুয়েক দেখুন, ভাববার কিচ্ছু নেই।'

হেন্সি হাত ঝাঁকুনি না দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়েই রইল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা একবার বেরিয়ে খোঁজ করলে হত না, দয়া করে আসবেন আমার সঙ্গে ?'

'কিন্তু উনি কোথায় আছেন তাই তো আপনি জানেন না।'

'তবু একবার খোঁজ করা যেত। আপনার গাড়িটা নিয়ে বেরোলে —অবিশ্যি পয়সা যা লাগবে আমিই দেব।'

বললুম, 'সে কথা হচ্ছে না। এতে লাভ কি হবে ? গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব ? এই সক্কালবেলায় কি আর ওঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবে।'

বেচারা হতাশভাবে বলল, 'তা তো জানিনে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখা আর কি।'

ফ্রিডা কফি দিয়ে ফিরে আসছে। বললুম, মাপ করবেন, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। আপনি মিথ্যে ভাবছেন। অবিশ্যি আপনার সঙ্গে যেতে আমার কিচ্ছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান শিগগিরই এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, আজকের দিনটা ওঁর সঙ্গে আমার কাটাবার কথা। এখানে এই বোধকরি ওঁর শেষ রবিবার। বুঝতে পারছেন তো, নইলে—'

ভদ্রলোককে দেখে খুবই কষ্ট লাগছিল। কিন্তু উপায় নেই। মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে, প্যাট্-এর কাছে যাবার জন্ত মনটা ছটফট করছে। বললুম, 'আপনি যদি নেহাত যেতে চান তো রাস্তায় নামলেই ট্যাক্সি পাবেন। কিন্তু আমি বলছি না যাওয়াই

ভালো। বরং একটু যদি অপেক্ষা করেন তো আমার বন্ধু লেন্‌ত্‌সকে রিং করে দিতে পারি, সে আপনার সঙ্গে যাবে।'

বেচারী বোধকরি আমার কথা শুনছিল না। হঠাৎ জিগগেস করল, 'আপনার সঙ্গে সকালবেলায় ওর দেখা হয়নি ?'

আমি বিষম অবাক হয়ে বললুম, 'বলছেন কি, দেখা হলে সে কথা এতক্ষণ আপনাকে বলতুম না ?'

ঈষৎ একটু ঘাড় নেড়ে অন্যমনস্কভাবে হেসি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

প্যাট্ আমার আগেই ঘরে ঢুকে ফুলগুলো দেখে নিয়েছে। আমাকে দেখেই হেসে উঠল। বলল, 'রব্বি, আমার কিন্তু দোষ নেই। ফ্রিডা বলছিল কি জানো, এ সময়টাতে তো গোলাপ ফুল ফোটে না। তাতেও যদি রবিবারের সকালবেলায় এমন তাজা ফুল ঘরে আসে তবে বুঝতে হবে সেটা চুরি-বিদ্যের জোরে। ও বলছিল এ জাতের গোলাপ নাকি এদিককার কোনো ফুলের দোকানেও পাওয়া যায় না।'

বললুম, 'তা তোমাদের যা খুশি ভাবতে পার। ফুল দেখে খুশি হলেই হল।'

'খুশি বৈকি, খুব খুশি। কিন্তু এর জন্য নিশ্চয় তোমাকে একটা কিছু দুঃসাহসের কাজ করতে হয়েছে।'

'দুঃসাহস! হ্যাঁ তা এক রকম দুঃসাহস বৈকি।' পাদ্রি সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। 'কিন্তু তুমি যে এই সকালবেলায় উঠে বসে আছ, কি ব্যাপার বল তো।'

'কি জানি, একবার ঘুম ভেঙে গিয়ে কিছুতেই আর ঘুমোতে পারলুম না। তা ছাড়া বাজে বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। ক্লান্ত চেহারা. চোখের তলায় কালি পড়েছে। জিগগেস করলুম, 'তুমি আবার কবে থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে ? আমি ভাবতুম ও ব্যাধিটা কেবল আমারই আছে।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'শরৎ এসে গেছে, টের পাওনি বুঝি ?'

বললুম, 'একে আমরা শরৎ বলি না, এটা গ্রীষ্মের শেষ। দেখছ না, গোলাপ এখনো ফুটছে। নতুনের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এই যা।'

প্যাট্ বলল, 'বৃষ্টি কি আজ শুরু হয়েছে, সেই কবে থেকে চলেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে জেগে যাই আর আমার মনে হয় বৃষ্টিতে আমি ডুবে গেছি।'

বললুম, 'উঁহুঁ, এ তো চলবে না, রাত্তিরে তুমি আমার কাছে এসে শোবে। তাহলে আর ওসব আজে-বাজে কথা মনে আসবে না। তাছাড়া অন্ধকার

রাত্তিরে বাইরে যখন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে তখন পাশে কেউ থাকলে অমনিতেই ভালো লাগে।'

আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসে প্যাট্ বলল, 'এটা বোধ হয় ঠিকই বলেছ।'

বললুম, যাই বল, রবিবারটাতে বৃষ্টি হলে আমার কিন্তু বেশ লাগে। এই দেখ না আমাদের ভাগ্যি। দুজনে একসঙ্গে আছি, দিব্যি আরামের ঘরখানি, তাতে আবার ছুটির দিন—ভাবতেই আরাম লাগছে।'

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, ভাগ্যি নয় তো কি ?'

'সত্যি, আমাদের মতো ভাগ্য কজনের ? বাবাঃ, আগে কি অবস্থায় ছিলুম, ভাবতেও ভয় লাগে। কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি জীবনে এত সৌভাগ্য হবে।'

'তোমার মুখে এসব কথা শুনতে ভালো লাগে। আরো কেন ঘন-ঘন এ কথা বল না ?'

'বলি না বুঝি ?'

'কই আর বল ?'

'হতে পারে। আমি বোধকরি তেমন করে ভালোবাসতেই জানিনে। কেন জানিনে ওসব আমার আসে না। কিন্তু সত্যি বলছি ভালোবাসতে খুব ইচ্ছে করে।'

'থাক, কিচ্ছু তোমাকে করতে হবে না। তুমি যা সে-ই আমার ভালো, তবে কিনা মাঝে-মাঝে মুখের কথাটুকু শুনতে বড় ইচ্ছে করে।'

'এখন থেকে হামেশাই বলব। বোকার মতো শোনালেও বলব।'

'বোকার মতো আবার কি ? ভালোবাসার মধ্যে বোকামি কিচ্ছু নেই।'

বললুম, 'সেই তো বাঁচোয়া। নইলে ভালোবাসা মানুষের যে কি দশা করে, ভাবতেও ভয় লাগে।'

একসঙ্গে বসে প্রাতরাশ খেয়ে নিলুম। প্যাট্ গিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ডাক্তারের তাই হুকুম। বিছানা-ঢাকাটা জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এখানটায় বসবে ?'

বললুম, 'হ্যাঁ, যদি তুমি চাও।'

'আমি তো চাই-ই, কিন্তু তোমাকে বসতেই যে হবে তা নয়—'

বিছানার এক পাশে এসে বসলুম। বললুম, 'আমি ওভাবে তো বলিনি। তুমিই একদিন বলেছিলে ঘুমোবার সময় কেউ কাছে বসে থাকলে তোমার ভালো লাগে না।'

'হ্যাঁ, সে অনেক দিন আগে বলেছিলুম বৈকি। কিন্তু এখন একলা থাকলে মাঝে-মাঝে কেমন আমার ভয় করে।'

'আমারও একবার ওরকম হয়েছিল। হাসপাতালে ছিলুম, অপারেশন হয়েছিল। রাত্তিরে ঘুমোতে গেলেই বিষম ভয় হত। জোর করে জেগে থাকতুম, পড়াশুনো করতুম নয়তো আবোল তাবোল ভাবতুম। দিনের আলো হলে তবে ঘুমোবার সাহস হত। কিন্তু মনের এ ভাবটা কেটে যায়।'

মাথাটি সরিয়ে এনে মুখখানা আমার হাতের উপর রাখল, 'রব্বি, কেন ভয় করে জানো, মনে হয় আমি আর ফিরে আসব না—'

বললুম, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু ফিরেও আসবে ভয়টাও যাবে। আমি নিজেই তার প্রমাণ। আর তুমি তো আগেও গেছ আবার ফিরেও এসেছ—হয়তো ঠিক আগের জায়গাতে ফেরনি, এই যা।'

চোখ আধবোজা, এরই মধ্যে ওর ঘুম পেয়ে গেছে। বলল, 'ঠিক বলেছ। সেটাও এক ভয়। এবার যাতে ঠিক জায়গাতে ফিরে আসি সে ভার তোমার উপরেই রইল, কেমন?'

'সে আমি দেখব'খন।' ওর কপালে, চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললুম, 'নইলে আর আমি সৈনিক কি? আমি পাহারা দিতে জানি।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ও পাশ ফিরে শুল। মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে অচৈতন্য।

জানালার কাছে সরে গিয়ে বসলুম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ঝাপটা জানালার কাঁচে এসে লাগছে। দিগন্তবিস্তৃত ধোঁয়াটে কুহেলিকার মধ্যে বাড়িটা যেন ছোট্ট একটা দ্বীপ। মনটা বড় মুষড়ে গেছে! অন্তত সকালের দিকে প্যাট্ কোনোদিনই এমন মন-মরা হয়ে থাকে না। মনে পড়ল এই সেদিন পর্যন্ত ও ফুর্তিতে টগবগ করত। তবে, হয়তো একটু ঘুমিয়ে উঠলেই ওর মেজাজ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ইদানীং ও ওর অসুখের কথা নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে। অবিশ্যি আমিও জানি—জাফে নিজেই বলেছেন- ওর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জীবনে আমি কত লোককে যে মরতে দেখেছি—ব্যারাম-পীড়াকে তাই আমল দিতে শিখিনি। যতক্ষণ ভুগছে ততক্ষণ বেঁচে তো আছে, আশাও আছে। লড়াইতে অস্ত্রাঘাতেই শুধু মানুষকে মরতে দেখেছি অল্পস্বল্প নয়, ঢের দেখেছি—কিন্তু সেই কারণেই যে মানুষটা রোগে ভুগছে অথচ বাইরে থেকে সুস্থ দেখাচ্ছে সে যে মরতে পারে, এ কথা আমি ভাবতেই পারিনে। এজন্য এসব ব্যাপারে কখনো মন খারাপ হলেও বেশিক্ষণ আমার মন দমে থাকে না।

দরজায় খুব আস্তে কে টোকা মারল। উঠে গিয়ে দেখি দরজার কাছে হেসি দাঁড়িয়ে। পাছে কথা বলে প্যাট্-এর ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এই ভয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে প্যাসেজ-এ গিয়ে দাঁড়ালুম। অপরাধীর মতো মুখ করে হেসি বলল, 'মাপ করবেন।'

বললুম, 'আসুন আমার ঘরে গিয়ে বসি।' হেসি ঘরে না ঢুকে দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানা শুকিয়ে আরো যেন ছোট হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে শাদা মুখ, রক্তের লেশমাত্র নেই। অতি কষ্টে বলল, 'আপনাকে শুধু বলতে এসেছিলুম, আর খুঁজতে যাবার কোনো দরকার নেই।' মনে হচ্ছে যেন মুখ বুজেই কথা বলছে।

বললুম, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন আসুন, ভিতরে আসুন। ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান্‌ ঘুমোচ্ছেন, কাজেই এখন আমার কোনো তাড়া নেই।'

হেসির হাতে একখানা চিঠি। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দয়া করে একবার পড়ে দেখুন।'

জিগগেস করলুম, 'আপনার কফি খাওয়া হয়েছে ?'

ও মাথা নেড়ে নিষেধ করল, 'আপনি আগে চিঠিখানা—'

বাইরে গিয়ে ফ্রিডাকে কফির কথা বলে এলুম। ফিরে এসে ওর চিঠি পড়লুম। ফ্রাউ হেসির চিঠি—সংক্ষেপে কটি লাইন মাত্র লেখা। লিখেছে জীবনের স্বাদ গন্ধ এখনো যেটুকু বাকি আছে সেটুকু অন্তত ও চেখে দেখতে চায়, কাজেই স্বামীর কাছে আর ফিরে আসছে না। একজন মানুষের সন্ধান পেয়েছে যে হেসির চাইতে তার কদর ঢের বেশি বুঝবে। কাজেই এ নিয়ে যেন হেসি আর মাথা না ঘামায়, কোনো মতেই ও আর ফিরে আসবে না। লিখেছে হেসির পক্ষেও এতে ভালোই হল। মাইনের টাকায় কুলোবে কি কুলোবে না, নিত্য আর এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যাক, তার জিনিসপত্র কিছু-কিছু সে নিয়েই গেছে, বাকি জিনিস সুবিধেমতো এক সময় এসে নিয়ে যাবে।

সোজাসুজি স্পষ্ট চিঠি। ভাঁজ করে চিঠিখানা হেসির হাতে ফিরিয়ে দিলুম। ও এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন এখন সব কিছু আমার উপরেই নির্ভর করছে। বলল, 'এখন কি করা যায় বলুন।'

'আগে কফিটুকু তো খেয়ে নিন। খাবার কিছু দিতে বলব ? মিথ্যে ছুটোছুটি করে তো কিছু ফল হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে ধীরে সুস্থে বসে ভাবুন, আপনিই একটা উপায় স্থির হবে।'

আমার কথামতো কফিটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নিল। বেচারার হাত কাঁপছে, খাবার কিছুই খেতে পারল না। আবার সেই কথাই জিগগেস করল, 'হ্যাঁ, কী করব, বলুন।'

আমি বললুম, 'কিছুই করবেন না, চুপ করে অপেক্ষা করুন।'

আমার কথায় বেচারা মোটেই আশ্বস্ত হল না, উস্‌খুস্ করতে লাগল। আমি জিগগেস করলুম, 'আপনি কী করতে চান তাই বলুন।'

'কী করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

চুপ করে বসে রইলুম। বলবার মতো কিছু খুঁজেও পাচ্ছি না। বড় জোর ওকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়—কিন্তু যা করবার তা ওর নিজেকেই করতে হবে। স্ত্রীর প্রতি ওর কোনো টান নেই, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে বহুদিন স্ত্রীর সঙ্গে থেকে অভ্যাস, সেটাকেই কাটিয়ে ওঠা দায়। ওর মতো কেরানির পক্ষে অভ্যাসের টান ভালোবাসার টানের চাইতে বড়।

খানিক বাদে ও নিজেই কথা বলতে শুরু করল। কথার কিচ্ছু মাথামুণ্ডু নেই। ও যে কতখানি বিচলিত হয়েছে আবোল তাবোল বকুনি শুনেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। সব দোষ ও নিজের ঘাড়েই নিচ্ছে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলল না। সমস্ত দোষ যে ওর নিজের সে কথাটাই আমাকে বোঝাতে চায়।

বললুম, 'কি সব বাজে বকছেন। এতে দোষগুণের কথাই ওঠে না। আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে গেছেন, আপনি তো তাকে ছাড়েননি। মিথ্যে কেন নিজেকে দোষ দিচ্ছেন?'

ও বলল, 'না, না, দোষ আছে বৈকি। আমি ওর সুখের জন্য কিছুই করিনি সেটাই মস্ত দোষ।'

ছোট্টখাট্ট রোগা মানুষটি, এমন করুণ চেহারা কি বলব। বললুম, 'ওর জন্যে আপনি কমই বা করেছেন কি?'

ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, রোজ-রোজ শুধু চাকরি যাবে, চাকরি যাবে, বলে ওর মাথাই খারাপ করে দিয়েছিলুম। সত্যি-সত্যি ওর জন্য কী করেছি? কিছুই না—' খানিকক্ষণ চুপ করে ও আকাশ-পাতাল কি ভাবতে লাগল।

আমি উঠে গিয়ে কনিয়াক্-এর একটি বোতল নিয়ে এলুম। বললুম, 'আসুন একটু পান করা যাক। অত ভাবছেন কেন, কি আর এমন হয়েছে?' ও একবার মাথা তুলে তাকাল। আমি আবার বললুম, 'এতে ভাববার কিচ্ছু নেই। মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

ও একবার মাথা নেড়ে গ্লাশের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু মুখে না দিয়ে গ্লাশটা আবার রেখে দিল। তারপরে খুব আস্তে-আস্তে বলল, 'জানেন, কালকে থেকে আমি আপিসের হেড্ক্লার্ক হয়েছি—হেড্ক্লার্ক আর এ্যাকাউণ্টেণ্ট্। ম্যানেজার

কালকেই আমাকে বললেন। গত কমাস ধরে ওভারটাইম করছিলাম কিনা, তারই পুরস্কার। ওদের দুটো আপিস এক হয়ে গেছে। পুরোনো হেড্‌ক্লার্ককে ছাড়িয়ে দিয়েছে। এ মাস থেকে আমার মাইনে পঞ্চাশ মার্ক বাড়বে।' তারপর খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমার স্ত্রী একথা জানলে ফিরে আসত না ?'

বললুম, 'মনে হয় না।'

'পঞ্চাশ মার্ক বেশি পাব, তার সমস্তটাই ওকে দিতে পারতুম, ওর যেমন খুশি ব্যয় করত। এছাড়া সেভিংস ব্যাঙ্কেও আমার বারোশো মার্ক জমেছে। ও টাকা দিয়ে এখন কি হবে। ভাবতুম চাকরি-বাকরি না থাকলে অসময়ে ওরই কাজে লাগবে। কিন্তু টাকা জমাতুম বলেই ও চলে গেল।'

আবার খানিকক্ষণ ও শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললুম, 'দেখুন, ও সব কোনো কারণই নয়। আপনি এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। চুপচাপ কটা দিন কাটিয়ে দিন তো। তারপরে আপনিই একটা না একটা উপায় মনে আসবে। আর আপনার স্ত্রীও হয়তো বা আজকালের মধ্যে একবার আসবেন। আপনি যেমন ভাবছেন উনিও তো তেমনি ভাবতে পারেন।'

হেসি বলল, 'ও কক্ষনো আসবে না।'

'সে আপনি বলতে পারেন না।'

'আমার যে মাইনে বেড়েছে ওকে বলতে পারলে, আর ধরুন, যা টাকা জমেছে তাই দিয়ে যদি একবার ওকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারতুম—'

'এ সবই বলতে পারবেন। লোকে কি আর অমনি এক কথায় বিদায় হয়ে যায়, দেখা হবেই।'

এদিকে আমার ভারি অবাক লাগছে যে এর মধ্যে তৃতীয় একটি ব্যক্তি আছে সে কথাটা ও আমলেই আনছে না। অতখানি ভাববার মতো ওর মনের অবস্থাই নয়। স্ত্রী চলে গেছে সেই ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত—বাকি সবকিছু ওর কাছে আবছা। একবার মনে হল বলি যে হপ্তা দুয়েক পরে ও নিজেই বুঝবে স্ত্রী গিয়ে ওর ভালোই হয়েছে। কিন্তু ওর মনের যা অবস্থা তাতে কথাটা বড় নিষ্ঠুর শোনাবে। সত্যি কথা সব সময়েই নিষ্ঠুর, বিশেষ করে যখন কারো আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আরো খানিকক্ষণ বসে ওর সঙ্গে কথা বললুম—শুধু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হল না, ও ঘুরে-ফিরে ঐ এক কথাই বলতে লাগল। কিন্তু আগের থেকে যে একটু শান্ত হয়ে এসেছে তা বুঝতে পারলুম।

পাশের ঘর থেকে প্যাট্-এর গলা শোনা গেল। বললুম, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

'আচ্ছা কিছু মনে করবেন না,' সঙ্গে-সঙ্গে হেসিও উঠে দাঁড়াল।

'বসুন না, আমি এলুম বলে।'

গিয়ে দেখি প্যাট্ বিছানায় উঠে বসে আছে। বেশ তাজা আর সুস্থ দেখাচ্ছে। বলল, 'আঃ, কি চমৎকার যে ঘুমিয়েছি বব্। বোধকরি দুপুর হয়ে গেছে।'

ঘড়ি দেখিয়ে বললুম, 'ঠিক একটি ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছ।'

ও হেসে বলল, 'তবে তো ভালোই হল। গল্প করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আমি এক্ষুনি উঠে পড়ছি।'

'বেশ, আমিও দশ মিনিটের মধ্যেই আবার আসছি।'

'তোমার কাছে কেউ এসেছেন নাকি?'

বললুম, 'বাইরের লোক নয়, আমাদের হেসি।'

ফিরে গিয়ে দেখি হেসি নেই। দরজা খুলে দেখলুম, প্যাসেজেও কেউ নেই। এগিয়ে গিয়ে ওর দরজায় টোকা দিলুম। ভিতর থেকে কোনো সাড়া পেলুম না। দরজা খুলে দেখি ও একটা দেরাজের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেরাজ টেনে-টেনে কি দেখছে। আমি বললুম, 'এক কাজ করুন, একটা ওষুদ-টষুদ খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন তো, আপনি বড্ড বেশি অস্থির হয়ে পড়েছেন।'

আমার দিকে ফিরে হেসি বলল, 'কি বলব, কোনো সঙ্গী নেই, একেবারে একলা—দিনের পর দিন রাতের পর রাত—কাল সারারাত বসে কাটিয়েছি, ভাবুন একবার।'

আমি বললুম, 'এ সবই সয়ে যাবে। কত লোক আছে—আপনার মতো তাদেরও একলাই দিনরাত কাটছে।' ও কোনো জবাব দিল না। বললুম, 'হয়তো দেখবেন সবই মিথ্যে ভাবনা, সন্ধ্যের দিকে আপনার স্ত্রী ফিরে আসবেন। যান এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।' ও সায় দিয়ে মাথা নাড়ল, এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক্ করল।

'আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলায় দেখা করব, এখন আসি।' বলে চলে এলুম। এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

প্যাট্ বসে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাকে দেখে বলল, 'বব্, আজকে একবার মিউজিয়মে গেলে হত।'

অবাক হয়ে বললুম, 'মিউজিয়মে! কেন?'

'ওখানটায় পার্শিয়ান কার্পেটের একটা প্রদর্শনী চলছে। তুমি বোধকরি মিউজিয়মে বড় একটা যাও না।'

'না তো, ওখানে গিয়ে কী লাভ ?'

'ঠিক বলেছ,' বলে প্যাট্ হাসতে লাগল।

দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'তা বেশ তো, এমন বৃষ্টির দিনটাতে একটু বিদ্যে লাভের চেষ্টা করা কিছু খারাপ কথা নয়।'

আর কথা নয়, তক্ষুনি কাপড়-জামা পরে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে চমৎকার লাগছিল, আর্দ্র বাতাসে ভিজে গাছপালার গন্ধ। 'ইনটারন্যাশনাল'-এর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম রোজা বার্-এ বসে আছে। প্রতি রবিবারের নিয়ম বাঁধা কোকোর কাপটি সুমুখে, পাশে ছোট একটি পার্শেল! নিশ্চয় মেয়েকে দেখতে যাবে, এটাও ওর রবিবারের বাঁধা নিয়ম। রোজাকে সেই আগের মতো নির্বিকার ভাবে ওখানটায় বসে থাকতে দেখে হঠাৎ কেমন অদ্ভুত লাগছিল। এই ক'মাসে আমার জীবনে এমন বিরাট পরিবর্তন হয়েছে যে আমি ভাবছিলুম বুঝি ইতিমধ্যে সমস্ত দুনিয়াই বদলে গেছে।

মিউজিয়মে এসে পৌছনো গেল। দেদার লোকের ভিড়, আমি তো অবাক। একজন ওয়ার্ডারকে জিগগেস করলুম, 'ব্যাপার কি ?'

ওয়ার্ডার বলল, 'কিচ্ছু না, ছুটির দিনে বরাবর এমনি ভিড় হয়।'

প্যাট্ বলল, 'দেখলে তো। লোকের মতি-গতি এখনো একেবারে নষ্ট হয়নি, এখনো ঢের লোক এসব জায়গায় আসে।'

ওয়ার্ডার মাথার টুপিটা পিছনদিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ব্যাপারটা তা নয়। এরা বেশির ভাগ বেকারের দল। এরা আর্টের ধার ধারে না। কিচ্ছু করবার নেই, এখানে এলে খানিকক্ষণ সময় কাটে। যাহোক একটা কিছু চোখের সামনে দেখতে পায় তো।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, এতক্ষণে বুঝলুম।'

ওয়ার্ডার বলল, 'এই যা দেখছেন, এ তো কিছুই নয়। শীতের সময় আসবেন, দেখবেন ভিড় কাকে বলে—একেবারে ভর্তি হয়ে যায়। কেন জানেন, ঘরের ভিতরটা গরম করে রাখা হয় কিনা, তাই।'

যেখানটায় কার্পেট সব ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেই গ্যালারিতে গেলুম। ভিড় ছাড়িয়ে ওটা একটু নিরিবিলি জায়গায়। জানালা দিয়ে সুমুখের বাগান দেখা যায়। বাগানের মধ্যে একটা বিরাট বাদাম গাছ। ডালপালা পাতা সব হলদে হয়ে গেছে। তার ফলে ঘরের ভিতরটাতে পর্যন্ত একটা হলদে আভা দিয়েছে। কার্পেটগুলো চমৎকার দেখতে। প্রায় চার-শো বছর আগের দুখানা চামড়ার

কার্পেট, কয়েকখানা ইস্পাহানের, কখানা বা পোলাণ্ডের—সিল্কের কাজ করা ঝলমলে সবুজ পাড় লাগানো। অনেককালের পুরোনো জিনিস- রোদ হাওয়ায় রঙ একটু কোমল হয়ে এসেছে, প্যাস্টেলে আঁকা বিরাট ছবির মতো দেখায়। ঐ কার্পেটগুলি ঘরখানাকে কালাতীত এমন একটা সঙ্গতি এনে দিয়েছে যা কোনো চিত্রই দিতে পারে না। বাগানে সেই হলদে গাছটার ছায়া আর আকাশের ধোঁয়াটে রঙ জানালার কাঁচে এসে মিশে গেছে, ওটাকেও বহু প্রাচীন একটা কার্পেটের মতো দেখাচ্ছে।

খানিকক্ষণ ওখানটায় থেকে, পরে বাকি গ্যালারিগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম। দেখছি ইতিমধ্যে ভিড় আরো বেড়ে গেছে। সত্যি এদের দেখলেই বোঝা যায় এরা আসলে মিউজিয়ম দেখতে আসেনি। শুকনো ফ্যাকাশে মুখ, শতছিন্ন পোশাক—দু-হাত পিছনের দিকে দিয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সসঙ্কোচ দৃষ্টি। রেনেশাঁস যুগের চিত্রচাতুর্য কিম্বা ভাস্কর্য শিল্প দেখবার মতো মনের অবস্থা এদের নয়। দুধারে গদি-আঁটা চেয়ারে অনেকে বসে আছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে- এখুনি হয়তো বা কেউ এসে উঠিয়ে দেবে। বিনি পয়সায় যে গদি-আঁটা চেয়ারে বসা যায় এটা যেন ওদের নিজেদের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকছে। সংসারে বিনামূল্যে কিছুই জোটে না, একথাটা ওরা খুব ভালো করে জেনে নিয়েছে।

লোকের ভিড় হলে কি হবে—কোথাও এতটুকু গোলমাল নেই, সব চুপচাপ। তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগল আমার চোখের সুমুখে বিরাট একটা লড়াই চলছে। বহু নিরন্ন মানুষের নিঃশব্দ সংগ্রাম—তারা ঘায়েল হয়েছে, কিন্তু হাল ছাড়েনি। এরা এদের কর্মক্ষেত্র, এদের প্রচেষ্টা ও ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়েছে—তাই পাছে হতাশায় পঙ্গু হয়ে পড়ে—আত্মরক্ষার আশায় এসেছে এই কোলাহলশূন্য, শিল্পসৃষ্টিতে পূর্ণ ঘরগুলিতে। হা অন্ন, হা অন্ন করে আর চাকরির চিন্তাতেই এদের দিন কাটে, তবু কয়েক ঘণ্টার জন্য দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে এখানে আসে। যেখানে রোমান যুগের নিখুঁত-কাটা পুরুষমূর্তি আর গ্রীক সুন্দরীদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ শ্বেতমর্মরে অমর হয়ে আছে, সেখানে এই উদ্দেশ্যহারা কুব্জপৃষ্ঠ রুগ্নদেহ মানুষগুলি পা টেনে-টেনে ঘুরে বেড়ায়—কি মর্মান্তিক এই অসঙ্গতি—যেন স্বাক্ষর দেয়—গত হাজার বছরের মধ্যে মানুষ কি পেরেছে আর কি পারেনি—একদিকে শিল্পচাতুর্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে মর্মর প্রস্তরে রেখেছে আপন মহিমার ছাপ ; অপরদিকে

তাদের অগণিত ভাইদের জন্য সামান্য আহারের সংস্থানটুকুও করতে পারেনি।

বিকেলের দিকে আমরা গিয়েছিলুম সিনেমায়। ছবি দেখে যখন বেরোলুম তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের রঙ কাঁচা আপেলের মতো সবুজ। রাস্তায়, দোকানে আলো জ্বলছে। দুধারের দোকান-পাট দেখতে-দেখতে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলুম।

একটা দোকানের জানালায় সুন্দর-সুন্দর ফার্-এর জামা ঝোলানো। দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। সন্ধ্যের দিকটাতে এরই মধ্যে একটু-একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। দোকানে বোঝাই শীতের গরম জামা সাজানো দেখে লোভ হতে লাগল। প্যাট্-এর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। ওর গায়ে একটা ছোট্ট ফার্-এর জ্যাকেট। পাতলা জামা—কড়া শীত মানবার কথা নয়।

প্যাট্‌কে বললুম, 'আমি যদি আজকে সিনেমার নায়ক হতুম তাহলে কি করতুম জানো? দোকানে ঢুকে এর একটা কোট তোমার জন্য কিনে ফেলতুম।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'কোনটা শুনি?'

যে জামাটা বাইরে থেকে দেখেই খুব গরম বোধ হচ্ছে সেইটে দেখিয়ে বললুম, 'ঐটে।'

প্যাট্ আবার হেসে বলল, 'তোমার পছন্দ খুব ভালো বলতে হবে, বব্। ও জিনিসটা ক্যানেডিয়ান মিঙ্ক-এর ফার্ দিয়ে তৈরি।'

'থাক, তোমার পছন্দ তো?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর দাম কত হবে আন্দাজ করতে পার?'

'মোটেই না, আন্দাজ করবার দরকারও নেই। তুমি যা চাও, তা যে ইচ্ছে করলে আমি দিতে পারি সেটা ভাবতেই ভালো লাগছে। সব কেবল অপর লোকেই পারবে আর আমরা বুঝি পারব না?'

ও আর এক দফা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু বব্, ও কোট আমি চাইনে।'

'আলবত চাও, ও কোট তোমাকে নিতে হবে। আর কোনো কথা নয়। কালই কোটটা পাঠিয়ে দিতে বলব।'

প্যাট্ মিষ্টি হেসে রাস্তার মাঝখানেই আমার মুখ চুমু খেল। বলল, 'আচ্ছা, এবার তবে তোমার পালা।' পাশেই একটা ছেলেদের পোশাকের দোকান, সেখানটায় গিয়ে দাঁড়াল। 'এই যে, এখান থেকে একটি টেইল-কোট তোমাকে নিতে হবে।

আমার ফার্-এর সঙ্গে এটাও যেন কালকেই বাড়িতে পাঠানো হয়। আর হ্যাঁ, একটি টপ্-হ্যাট্ও তোমার চাই। টপ্-হ্যাট্ পরলে তোমাকে কেমন দেখাবে তাই ভাবছি।'

বললুম, 'নিশ্চয় তোমার ঐ চিমনি-সাফ-করা ধাঙড়দের মতো দেখাবে।'

জানালায় সাজানো টেইল-কোটগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিলুম। দোকানের ভিতরটাও একবার দেখে নিলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত বসন্তে এ দোকান থেকেই বেশ একটা বাহারে টাই কিনেছিলুম। তখন সবে প্যাট্-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। হঠাৎ মনটা কেমন দমে গেল। সেই বসন্ত আর আজকের এই শরৎ—কে জানত এই দশা ঘটবে।

প্যাট্-এর শীর্ণ হাতখানা টেনে এনে আমার গালে ছোঁয়ালুম। বললুম, 'তোমারও আরো দু-একটা জিনিস দরকার। খালি-খালি একটা মিঙ্কের জামা—এঞ্জিন ছাড়া গাড়ির মতো। এর সঙ্গে গোটা দুই-তিন ইভ্নিং ড্রেস—'

'ইভনিং ড্রেস, হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছ—ইভ্নিং ড্রেস না হলে ঠিক চলে না।'

খুব ভালো দেখে তিনটি পোশাক বেছে নিলুম। বেশ বোঝা যাচ্ছে এ খেলার আমোদে প্যাট্ খুব মেতে গেছে। ইভনিং ড্রেস-এর প্রতি বরাবরই ওর একটু দুর্বলতা আছে। খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজেই পোশাক পছন্দ করল। পোশাকের সঙ্গে খুচরো আরো দু-একটা জিনিসও পছন্দ করা হল। খুশিতে প্যাট্-এর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। পাশে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছি, হাসছি আর মনে-মনে ভাবছি—একদিকে ভালোবাসা, অপরদিকে খালি পকেট—এ বড় দুর্দৈব। এক ঝটকায় মন থেকে এসব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, 'নাঃ, কিছু করতে হয়তো পুরোপুরি করাই ভালো। এস আমার সঙ্গে,' বলে ওকে নিয়ে এক গয়নার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। 'এই যে, এই পান্নার ব্রেসলেট জোড়া চাই। আর ঐ আংটি আর ইয়ারিং। উহুঁ, কোনো কথা শুনতে চাইনে। পান্নার গয়না তোমাকে যেমন মানাবে এমন আর কিছুতে নয়।'

'তাহলে তোমাকেও নিতে হবে ঐ প্লাটিনামের ঘড়ি আর তোমার শার্টের জন্য মুক্তোর বোতাম।'

'তোমার জন্য দোকান উজাড় করে সব কিনতে পারলে তবে আমার সাধ মিটত।'

প্যাট্ আমার গায়ে হেলান দিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, 'এমনিতেই ঢের হয়েছে গো, ঢের হয়েছে। এখন আমাদের দরকার শুধু কয়েকটি ট্রাঙ্ক কেনার, তারপরে

মালপত্তর বেঁধে-ছেঁদে এই শহর থেকে বেরিয়ে পড়া—সেই উদ্দেশ্যে—যেখানে শরৎ নেই, বৃষ্টি নেই।' ভাবলুম সত্যি তাই। একবার বেরোতে পারলেই ওর ব্যারাম পীড়া সব সেরে যাবে। জিগগেস করলুম, 'কোথায় যাওয়া যায় বল তো। ইজিপ্টে ? না আরো দূরে ? ভারতবর্ষ কিম্বা চীন দেশে ?'

'যেখানে হয়—যে দেশে অপর্যাপ্ত সূর্যের তাপ আর দক্ষিণে বাতাস, রাস্তার দুধারে তালগাছের সারি, পাহাড়, আর সমুদ্রের ধারে শাদা-শাদা বাড়ি। কিন্তু কে জানে হয়তো সেখানেও বৃষ্টি। বৃষ্টি ছাড়া কোনো দেশ কি আছে!'

'তাহলে আরোই দূরে চলে যাব যেখানে বৃষ্টি নেই—উষ্ণ মণ্ডলের কোনো দেশে—ধর প্যাসিফিক-এর কোনো দ্বীপে।'

হ্যামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের প্রকাণ্ড আপিস-বাড়িটার সামনে দাঁড়ালুম। মাঝখানটায় একটা জাহাজের ছোট্ট প্রতিরূপ—নীল ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন ভেসে চলেছে। আর ঠিক তার পিছনেই একটা ছবিতে ম্যানহ্যাটান-এর বিরাট বাড়িগুলো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জানালার কাছে রঙ-বেরঙের বড়-বড় ম্যাপ, তাতে সমুদ্রপথ লাল কালির রেখায় এঁকে দেওয়া হয়েছে।

প্যাট্ বলল, 'আমরাও আমেরিকাতেই যাব। যাব কেন্টাকি, টেক্সাস, নিউইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকো, হাওয়াই। সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায়। মেক্সিকো, পানামা খাল পার হয়ে যাব ব্যুনোস এয়ারিস। তারপরে রয়ো ডি জেনিরো হয়ে ফিরে আসব।'

'ঠিক বলেছ—'

প্যাট্ খুশিতে ঝলমল করছে।

বললুম, 'জানো আমি কোনোকালে ওখানে যাইনি। সেই তোমাকে যখন বলেছিলুম তখন আসলে মিথ্যে কথা বলেছিলুম।'

প্যাট্ বলল, 'আমি জানতুম।'

'জানতে নাকি ?'

'জানতুম বৈকি, তখনই বুঝতে পেরেছিলুম।'

'তখন আমার মাথা রীতিমতো গুলিয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই বোকার মতো কথা বলতুম। সেইজন্যই বানিয়ে মিথ্যে বলেছিলুম।'

'এখন মাথা একটু ঠিক হয়েছে তো ?'

'নাঃ, আরো বেশি গুলিয়ে গেছে—' জাহাজের প্রতিরূপটা দেখিয়ে বললুম, 'যাই বল, এ রকম জাহাজে না যেতে পারলে জীবনই বৃথা।'

প্যাট্ আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাই তো ভাবছি, ভগবান কেন যে আমাদের পয়সা দেননি? অথচ পয়সা খরচা করবার এমন সব চমৎকার মতলব মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আর দেখ না কেন—গুচ্ছের সব ধনী লোক রয়েছে ওরা কেবল ব্যাঙ্ক আর আপিস, আপিস আর ব্যাঙ্ক করে বেড়ায়।'

আমি বললুম, 'অবিশ্যি সেই কারণেই ওদের পয়সা হয়েছে। আমাদের হাতে পয়সা এলেও খুব বেশি দিন যে রাখতে পারতুম এমন মনে হয় না।'

'আমারও তাই মনে হয়। যেমন করে হোক টাকা আমাদের হাত গলিয়ে বেরিয়ে যেত।'

'আর পাছে টাকা ফুরিয়ে যায় সেই ভয়েতেই বোধ হয় কিছু করতে পারতুম না। টাকা জমানোটাই একটা ব্যবসা বিশেষ। আর সে ব্যবসা বড় সহজ ব্যবসা নয়।'

প্যাট্ বলল, 'তাও বটে, ধনী হওয়াও এক দিকদারি। তার চাইতে বরং কল্পনা করা যাক আমরা এককালে ধনী ছিলুম, এখন টাকা-পয়সা সব খুইয়ে বসেছি। ধর, এই হপ্তাখানেক আগে তুমি দেউলে হয়ে গেছ—বাড়ি-গাড়ি হীরে-জহরত সব বিক্রি করে দিয়েছ—কি বল?'

'অন্তত আজকাল তো হামেশাই তাই হয়ে থাকে।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'তবে চল। আমরা দুই দেউলে, এখন আমাদের কুঁড়েঘরে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে দুজনে বসে আমাদের সুদিনের গল্প বলব।'

'সে বেশ হবে'খন। তাই যাওয়া যাক।'

আমরা ধীরে-ধীরে হেঁটে চললুম। অন্ধকার নামছে, একটি-একটি করে আলো জ্বলে উঠছে। কবরখানাটার কাছে যখন পৌঁচেছি তখন মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন চলে গেল। কেবিনের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। বিরাট আকাশে একটা মাত্র এরোপ্লেন, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন কোন রূপকথার রাজ্য থেকে কি এক ব্যাকুল রহস্যের সন্ধানে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে চলেছে বিরাট এক পাখি। যতদূর দেখা গেল দাঁড়িয়ে- দাঁড়িয়ে পাখিটার গতিভঙ্গি আমরা দেখতে লাগলুম।

বাড়ি ফিরেছি বোধ করি আধঘণ্টার বেশি হবে না। হঠাৎ শোবার ঘরের দরজায় কে টোকা মারল। ভাবলুম নিশ্চয় হেসি—আবার দুঃখের কথা বলতে এসেছে। দরজা খুলে দেখি ক্রাউ জালেওয়াস্কি। ভয়ানক ব্যস্তসমস্ত ভাব। বলল, 'শিগগির আসুন একবার।'

'কি ব্যাপার ?'

ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'হেসির ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।'

'দাঁড়ান, এক মিনিট।'

ভিতরে গিয়ে প্যাট্‌কে বললুম একটু বিশ্রাম করতে, ইতিমধ্যে আমি হেসির সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।

ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। এরই মধ্যে হোটেল সুদ্ধ লোক হেসির ঘরের সুমুখে এসে জড়ো হয়েছে। চকমকে কিমোনো-পরা আর্না বোনিগ; মিলিটারি ঢঙের জ্যাকেট গায়ে এ্যাকাউনটেণ্ট ভদ্রলোক; অর্লফ বেচারী সবে এক চা পার্টি থেকে ফিরে এসে ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জর্জ ছোকরা ভয়ে-ভয়ে দরজায় টোকা দিচ্ছে আর চাপা গলায় হেসিকে ডাকছে। ভিড়ের মধ্যে ফ্রিডাও রয়েছে—ভয়ে উদ্বেগে উত্তেজনায় অস্থির।

জর্জকে জিগগেস করলুম, 'কতক্ষণ ধরে ডাকছ ?'

তড়বড় করে জবাব দিল ফ্রিডা, 'তা মিনিট পনেরো খুব হবে। ভদ্রলোক আজ বাড়ি থেকে বেরোননি। দুপুর থেকে দেখছিলুম সারাক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন। এখন কোনো সাড়াশব্দই নেই।'

জর্জ বলল, 'তালা বন্ধ, ভিতর থেকে চাবি দেওয়া, চাবিটা তালায় লাগানো।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে বললুম, 'চাবিটা খুঁচিয়ে খুলে ফেলতে হবে। আপনার কাছে আর চাবি আছে ?'

ফ্রিডা বলল, 'চাবির তাড়াটাই নিয়ে আসছি, একটা না একটা লেগে যেতে পারে।'

লোহার একটা শলা দিয়ে জোরে চেপে চাবিটাকে সোজা করা গেল, তারপরে বেশ করে খোঁচা দিতেই চাবিটা ঝন্ করে ভিতরের দিকে মেঝের উপরে পড়ে গেল। ফ্রিডা উত্তেজনায় একেবারে চেঁচিয়ে উঠল। ওকে ধমকে বললুম, 'তুই ভাগ এখান থেকে, আবার কাছে এসেছিস তো—'

একটা-একটা করে চাবি লাগিয়ে দেখতে লাগলুম—শেষ পর্যন্ত একটা লেগে গেল। ব্যস্ দরজা খুলে ফেললুম।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, প্রথমটায় প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। শাদা দুটি বিছানা, চেয়ারগুলো খালি, আলমারির কপাট বন্ধ। হঠাৎ ফ্রিডা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে উনি!' ও কখন ঠেলেঠুলে আবার এগিয়ে এসেছে। আমারই কাঁধের

উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে রসুনের গন্ধ। বলল, 'ঐ যে জানালার কাছে।'

অরলফ সবার আগে-আগে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ পিছিয়ে এসে বলল, 'না, না, ও কিছু নয়।' আমাকে আস্তে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ও হাত বাড়িয়ে দরজাটা টেনে ধরল, 'দেখুন, আপনারা বরং চলে যান, কিছু দেখে ভয়-টয় পেতে পারেন।'

ওর রুশ ভাষা আর জার্মান ভাষা মিশিয়ে ও ভাঙা-ভাঙা কথা বলছে। 'বাপ রে!' বলে ফ্রাউ জালেওয়াস্কি সবাগ্রে তিন পা পিছয়ে গেল। আরনা বোনিগ-ও পালাল। শুধু ফ্রিডা এগোবার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

অরলফ ওকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন আপনাদের ভালোর জন্যই—' হঠাৎ এ্যাকাউনটেণ্ট ভদ্রলোক চটেমটে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঃ রে! এ তো মজা মন্দ নয়। লোকটা বিদেশী হয়ে আমাদের উপর সর্দারি করতে এসেছে—'

অরলফ ওর কথা বড একটা গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'বিদেশী? বিদেশী আবার কি? এখানে বিদেশীর কোনো প্রশ্নই ওঠে না—'

ফ্রিডা চাপা গলায় জিগগেস করল, 'মরে গেছে নাকি?'

আমি ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে বললুম, 'আসুন আপনি—অরলফ আর আমি এখানটায় থাকি। বাকিদের না থাকাই ভালো।'

অরলফ বলল, 'একজন ডাক্তারকে এক্ষুনি আসতে টেলিফোন করুন।'

জর্জ আমাদের বলার অপেক্ষা রাখেনি, ইতিমধ্যেই টেলিফোন করে দিয়েছে। এদিকে এ্যাকাউনটেণ্ট রেগে লাল। বলল, 'আমি কিছুতেই যাচ্ছিনে, এখানেই থাকব। আর কিছু না হোক অন্তত জার্মান নাগরিক হিসেবে আমার থাকবার অধিকার আছে—'

অরলফ উপায়ান্তর না দেখে দরজা খুলে ধরল। তারপরে ঘরের লাইট জেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। জানালার কাছটাতে হেসি ঝুলছে, মুখ কালচে নীল, জিভ বেরিয়ে আছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'দড়িটা কেটে ওকে নামাও।'

অরলফ ধীর শান্ত গলায় বলল, কিচ্ছু লাভ নেই, ও আমি দেখেই বুঝতে পারছি, মরে গেছে—দু-চার ঘণ্টা আগেই—'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যেত—'

'না করাই ভালো, আগে পুলিস আসুক—'

ডাক্তার কাছেই থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল। রুগ্ন ক্লিষ্ট দেহটার প্রতি এক পলক তাকিয়েই বলল, 'এখন আর কিছু করবার নেই। তবু আসুন একবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটা চেষ্টা করে দেখা যাক। একটা ছুরি-টুরি কিছু দিন। আর হ্যাঁ, পুলিসকে রিং করুন।'

বেশ মোটা মতো একটা সিল্কের কটিবন্ধ গলায় জড়িয়ে ও ফাঁস লাগিয়েছে। জিনিসটা ওর স্ত্রীর। জানালার উপরের একটা আংটার সঙ্গে ওটা বেঁধেছে। নিশ্চয় জানালার পৈঠের উপরে দাঁড়িয়ে ফাঁসটা গলায় জড়িয়েছে, তারপরে পা দুটো নিচের দিকে ছেড়ে দিয়েছে। হাত দুটো মুঠো করা, মুখের চেহারা বীভৎস। সকালবেলায় যে পোশাকে দেখেছিলুম, এখন সে পোশাক নয়। অবিশ্যি এসব জিনিস দেখবার এখন সময় নয়, তবু লক্ষ্য করলুম এটিই ওর সবচেয়ে ভালো পোশাক, আগেও দু-এক সময় এ পোশাকটি ওকে যত্ন করে পরতে দেখেছি। দাড়ি কামিয়ে, পরিষ্কার পোশাকটি পরেছে। টেবিলের উপরে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে ওর ব্যাঙ্কের বই, চারখানা দশ মার্কের নোট আর কিছু খুচরো টাকা। পাশেই দুখানা চিঠি—একখানা স্ত্রীর নামে, আর একখানা পুলিসকে লেখা। স্ত্রীর চিঠির পাশে একটি রুপোর সিগারেট কেস আর ওর বিয়ের আংটি।

বেশ বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে-চিন্তেই সব করেছে, নিজ হাতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। ঘরের মধ্যে অগোছালো কিচ্ছু নেই। আর একটু খুঁজে পেতে দেখা গেল—হাত ধোবার জায়গাতে আরো কিছু টাকা রয়েছে, একটি কাগজের টুকরোতে লেখা আছে, এ মাসের বাদ বাকি ভাড়া।

গেট্-এর ঘণ্টা বেজে উঠল। পরমুহূর্তেই দুজন পুলিসের লোক এসে ঢুকল। ইতিমধ্যে মৃতদেহটা দড়ি থেকে কেটে নামানো হয়েছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'নাঃ, মরেই গেছে। আত্মহত্যা—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।'

পুলিসের লোক দুটি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতরটা খানাতল্লাসি করে দেখতে লাগল। দেরাজ থেকে কয়েকখানা চিঠি বের করে টেবিলের উপরকার চিঠির সঙ্গে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখল। এদের মধ্যে একজন একটু ছোকরা মতন দেখতে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনারা আত্মহত্যার কারণটা কি জানেন?'

আমি যেটুকু জানতুম সেটুকু বললুম। আর একবার মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটি আমার ঠিকানা লিখে নিল। ডাক্তার জিগগেস করল, 'মৃতদেহটা এখন সরিয়ে ফেলা যায় তো?'

পুলিসের লোকটি বলল, 'আমি এ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলে এসেছি। এক্ষুনি এসে যাবে।'

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরটা নিস্তব্ধ। ডাক্তার মৃত দেহটার পাশে মেঝের উপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে। জামা-কাপড়গুলো আলগা করে দিয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে বুকে ঘষছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা চালু করবার ব্যর্থ চেষ্টা। শরীরটাতে নাড়াচাড়া লাগছে আর নিষ্ক্রিয় ফুসফুসটাতে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, এ ছাড়া আর কিছুই না।

ছোকরা অফিসারটি বলল, 'এই নিয়ে এ সপ্তাহে বারোজন হল।'

আমি বললুম, 'একই কারণে নাকি?'

'না, বেশির ভাগই চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না বলে। এর মধ্যে দুজন বিবাহিত, একজনের আবার তিনটি ছেলেপিলে। গ্যাসে আত্মহত্যা। বিবাহিত লোকেরা বেশির ভাগ গ্যাসেই কাজ সেরে নেয়।'

ইতিমধ্যে এ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা স্ট্রেচার নিয়ে এসে গেছে। ওদের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রিডাও ভিতরে ঢুকে পড়েছে। হেসির অসহায়, অনাবৃত দেহের প্রতি ও কেমন যেন এক লালসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। চোখ মুখ লাল, বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। বয়স্ক পুলিশ অফিসারটি ওকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এখানে তোমার কি কাজ?'

ও চমকে উঠে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলুম আমাকে একটা জবানবন্দি দিতে হবে।'

অফিসার আরো বেশি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'যাও, বেরোও।'

এ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা মৃতদেহটাতে একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। একটু বাদে পুলিসের লোক দুটিও দরকারী কাগজপত্রগুলো সঙ্গে করে চলে গেল। ছোকরা অফিসারটি বলল, 'ভদ্রলোক টাকা-পয়সা স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন। স্ত্রী যদি আসেন তো থানায় খবর নিতে বলবেন। আর বাকি জিনিস-পত্রগুলো আপাতত এখানটায় থাকতে পারবে তো?'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি ঘাড় নেড়ে বলল, 'তা থাক, এ ঘর কি আর কখনো ভাড়া হবে?'

অফিসার দুটি বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। অরলফ দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিল। আমি বললুম, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে যত কম আলোচনা হয় ততই ভালো।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি বলল, 'আমারও তাই মত।'

ফ্রিডার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'বিশেষ করে তোমাকে বলছি—এ বিষয়ে কথাটি নয়।' ফ্রিডা আপন মনে কি যেন ভাবছিল, কথার জবাব দিল না। আমি আবার বললুম, 'ফ্রাউলিন হোল্ম্যান-এর কাছে এই নিয়ে একটি কথা বলেছ তো মুশকিল হবে।'

ফ্রিডা এতক্ষণে নিজমূর্তি ধারণ করে খেঁকিয়ে উঠল, 'আহা! আমি যেন আর বুঝিনে। ও ভদ্রমহিলা অমনিতেই যা অসুস্থ।'

কথার যা ছিরি—ইচ্ছে করছিল কষে দু-ঘা বসিয়ে দিই। অতি কষ্টে রাগটা চেপে গেলুম।

প্যাসেজটা রীতিমতো অন্ধকার। এ্যাকাউনটেণ্ট ভদ্রলোক কাছে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। ওঁকে বললুম, 'আপনি তখন মিছিমিছি কাউণ্ট অব্লফ-এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন। ওঁর কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই রেগেমেগে চিৎকার—'কেন? জার্মানরা আবার কারো কাছে ক্ষমা চায় নাকি? তাও তো ও আবার এশিয়াটিক্।' আর কোনো কথা না বলে গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এ ভদ্রলোক তো নেহাত গোবেচারী ভালোমানুষ ছিলেন—কাজের মধ্যে শুধু স্ট্যাম্প যোগাড় করে বেড়াতেন। হঠাৎ এঁর হল কি?' অন্ধকারের ভিতর থেকে জর্জ জবাব দিল, 'আজ কমাস ধরে উনি যত সব রাজনৈতিক সভায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'ও, তাই নাকি?'

অব্লফ আর আব্না বোনিগ আগেই চলে গেছে। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি হঠাৎ কান্না শুরু করে দিল। বললুম, 'আহা, কেন মিছিমিছি মন খারাপ করছেন? কেঁদে তো কিছু ফল হবে না, যা হবার হয়ে গেছে।'

বুড়ি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার। আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। এ দৃশ্য কি আমি কখনো ভুলতে পারব?'

'খুব পারবেন, সওয়ালেই সয়ে যায়। এককালে আমি কত শত লোক মরতে দেখেছি। দিব্যি সয়ে গেছে।'

জর্জ-এর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোটা জ্বালতে গিয়ে নিজের অজান্তেই চোখটা গিয়ে পড়ল জানালার উপরে।

প্যাট্-এর ঘরের দিকটাতে গিয়ে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলুম। প্যাট্ এখনো ঘুমুচ্ছে! আলমারি থেকে কনিয়াক্-এর বোতলটি নিয়ে এক গ্লাশ ঢেলে নিলুম। কনিয়াক্টা খেতে বেশ ভালো লাগল। এই বোতল থেকেই সকালবেলায় হেসিকে খেতে দিয়েছিলুম। এখন মনে হচ্ছে ওকে আজ একলা থাকতে দেওয়া উচিত হয়নি। মনটা খারাপ লাগছে অথচ নিজেকে তেমন দোষও দিতে পারছি না। জীবনে কত কাজ করলুম—ইচ্ছে করলে সব কিছুতেই নিজেকে অপরাধী মনে করা যায়, আবার আর একদিক থেকে কোনো কিছুতেই অপরাধের কিছু নেই। হেসিরই কপাল খারাপ, ব্যাপারটা ঘটল কিনা রবিবার। অন্যদিন হলে, আপিস যেত, কাজেকর্মে হয়তো ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারত।

আর এক গ্লাশ কনিয়াক্ ঢেলে নিলুম। নাঃ, এসব ভেবে কিচ্ছু লাভ নেই। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে। আজ যার জন্য কষ্ট হচ্ছে একদিন হয়তো প্রমাণ হবে সে-ই আর সবার চাইতে ভাগ্যবান।

পাশের ঘরে শব্দ শুনে বুঝলুম প্যাট্ জেগেছে। ওর ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বব্, আমার আর কোনো আশা নেই। এই দেখ না আবার এক চোট ঘুমিয়ে উঠলুম।'

আমি বললুম, 'সে তো ভালো কথা।'

কনুইতে ভর দিয়ে উঠে প্যাট্ বলল, 'না, অত ঘুমোতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'কেন? আমার তো এক-এক সময় মনে হয় পঞ্চাশ বছর এক ঘুমে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

'কিন্তু জেগে উঠে যখন দেখবে পঞ্চাশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে তখন কেমন লাগবে?'

'সে এখন কেমন করে বলব? তখন বরং বলা যাবে।'

প্যাট্ জিগগেস করল, 'তোমাকে কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে।'

বললুম, 'কই না তো। বরং উল্টো; ভাবছিলুম দুজনে এখন বেরিয়ে পড়ব, বাইরে কোথাও ইচ্ছে পুরিয়ে খেয়ে নেব। তোমার যা-যা খেতে ইচ্ছে করে, সব। তারপরে একটু মাত্রা ছাড়িয়ে পান করব, যেন একটু নেশা হয়।'

প্যাট্ বলল, 'খুব ভালো কথা। কিন্তু আমাদের দেউলে অবস্থার সঙ্গে কি সেটা তেমন খাপ্ খাবে?'

'নিশ্চয়, দেউলে হয়েছি বলেই তো এর প্রয়োজন।'

একবিংশ পর্ব
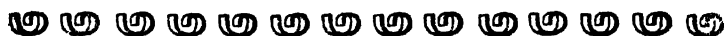
অক্টোবরের মাঝামাঝি জাফে একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন বেলা দশটা, কিন্তু দিনটা এমন মেঘলা যে দশটার সময়ও ডাক্তারের ক্লিনিকে আলো জ্বলছে। বাইরের আবছা কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে আলোর আভাটা কেমন যেন রুগ্ন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

জাফে একলা তাঁর মস্ত বড় কন্সালটিং রুম-এ বসে আছেন। আমি ঢুকতেই চক্চকে টেকো মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন। জানালার সার্সিতে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। গোমড়া মুখে সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখছেন কি বিদ্ঘুটে আবহাওয়া।'

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, 'কি আর করা যায়। দেখা যাক্ আবহাওয়াটা শিগগির বদলায় কিনা।'

'উঁহুঁ, ও বদলাবে না।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ডেস্ক থেকে একটা পেন্সিল বের করে তাই দিয়ে টেবিলের উপর ঠকঠক শব্দ করতে লাগলেন। তারপরে ওটা আবার রেখে দিলেন।

আমি কথা বললুম, 'আপনি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তা বুঝতে পারছি।'

জাফে বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না। বললুম, 'প্যাট্-এর বোধহয় এখন অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ',—গম্ভীর মুখে সুমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভেবেছিলুম অক্টোবরের শেষের দিকে গেলেই চলবে, কিন্তু যা আবহাওয়া চলছে—' পেন্সিলটার জন্য আবার হাত বাড়ালেন।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা সশব্দে এসে জানালার কাঁচে লাগল। শব্দটা যেন দূরাগত মেসিন গান্-এর আওয়াজের মতো। জিগগেস করলুম, 'আপনি ওকে

কখন যেতে বলেন ?' ডাক্তার চোখ তুলে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, 'কালকেই।'

মুহূর্তের জন্য মনে হল আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে যাচ্ছে। বাতাসটা তুলোর মতো আমার ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু খুব সহজে সামলে নিলুম। যতটা সম্ভব সহজ সুরেই জিগগেস করলুম, 'অবস্থাটা হঠাৎ কি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে ?' নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগছে, মনে হচ্ছে যেন আর কেউ কথা বলছে।

জাফে সজোরে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অত তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে গেলে কোথাও যাবার মতো শক্তিই থাকত না। উঁহুঁ, মোটামুটি ভালোর দিকেই যাচ্ছে। তবে আবহাওয়া এ রকম থাকলে প্রত্যেক দিনই বিপদের কথা—সর্দি, এ ও তা—বলা তো যায় না—'

ডেস্ক থেকে কতগুলো চিঠি বের করলেন। বললেন, 'আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। এখন আপনারা গেলেই হয়। স্যানাটোরিয়মের ডাক্তারের সঙ্গে আমার ছাত্রাবস্থা থেকে জানাশোনা। খুব ভালো ডাক্তার। আর রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক সব খবর ওঁকে জানিয়েছি।'

চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে দিলেন। চিঠি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলুম। ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দু-পা এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। খুবই কষ্টের কথা। সেইজন্যই যতটা সম্ভব দেরি করে আপনাকে বলেছি।'

বললুম, 'না, কষ্ট আর কি—'

ডাক্তার বললেন, 'দেখুন, আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে ?'

'না, সে কথা নয়। আমি শুধু একটি কথা জানতে চাই—ও কি আর ফিরে আসবে ?'

জাফে ভুরু কুঁচকে চকচকে চোখ দুটি আরো ছোট করে বললেন, 'ও কথা এখন জিগগেস করছেন কেন ?'

'ভাবছিলুম যদি ফিরেই না আসে তবে না যাওয়াই ভালো।'

'এ্যাঁ, কি বললেন ?'

'বলছিলুম তাহলে নাইবা গেল।'

ডাক্তার আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তার নিশ্চিত ফল কি হবে জানেন ?'

বললুম, 'জানি বৈকি। তাহলে ও একলা মরবে না।'
মনে হল জাফে ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠলেন। জানালার কাছে সরে গিয়ে খানিকক্ষণ বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখের ভাব থমথমে। আমার কাছে আবার ফিরে এসে জিগগেস করলেন, 'আপনার এখন বয়স কত ?'
বললুম, 'তিরিশ।' ডাক্তার কি বলতে চান ঠিক বুঝতে পারছিলুম না।
কতকটা আপন মনেই বললেন, 'তিরিশ, মোটে তিরিশ ?' ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলেন। তারপরে আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'আমার তো এই ষাট হতে চলল। তবু আমি কিন্তু ও রকম বলতে পারতুম না। আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখতুম। একেবারে কোনো আশা না থাকলেও চেষ্টা করে দেখতুম।'
আমি কোনো কথা না বলে চুপ করেই রইলুম। জাফেও খানিকক্ষণ আর কোনো কথা বললেন না। মুখের ভাব চিন্তামগ্ন। তারপরে ঈষৎ হেসে বললেন, 'নাঃ, দেখবেন শীতটা ওখানে ভালোই কাটিয়ে দেবেন।'
'শুধু শীতটা ?'
'আশা তো করছি শীতের পরে এখানে আবার ফিরে আসতে পারবেন।'
বললুম, 'আশা তো করছেন, কিন্তু সে আশার ভরসা কতটুকু ?'
'আশা তো রাখুন, সেটাই বড় কথা। তার বেশি এখন কিছু বলা যায় না। আর দেখুন না, ওখানটায় গিয়ে কেমন থাকেন। আমার তো খুব আশা শীতের পরে উনি এখানটায় ফিরে আসতে পারবেন।'
'ঠিক বলছেন তো ?
'বলছি বৈকি,' বলে পা দিয়ে ড্রয়ারটা এমন জোরে বন্ধ করে দিলেন যে সমস্ত জিনিসটা ঠকঠক করে নড়ে উঠল। বিড়বিড় করে বললেন, 'আপনাকে আর বলব কি মশাই, পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে বলে আমারই মন খারাপ লাগছে।'
একজন নার্স এসে ঘরে ঢুকল! জাফে হাতের ইশারায় ওকে চলে যেতে বললেন। নার্স কিন্তু নড়ল না, খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। মাথায় পাকা চুল, ডাল-কুত্তার মতো মুখ।
জাফে ধমকে বললেন, 'এখন নয় পরে এস।'
নার্স বেচারী অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করে চলে গেল, যাবার আগে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে গেল। এতক্ষণে দিনের আবছা ধোঁয়াটে মূর্তিটা ঘরের মধ্যে ধরা পড়ল। জাফের মুখের চেহারাটাও হঠাৎ বদলে গেছে, ভয়ানক পাংশু দেখাচ্ছে

বললেন, 'বুড়ি ডাইনি, ওকে আজ কুড়ি বছর যাবত তাড়াব-তাড়াব ভাবছি। কিন্তু কাজ এত ভালো করে যে তাড়াতে পারিনে।' তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কী স্থির করলেন ?'

আমি বললুম, 'আমরা আজকে রাত্তিরেই যাচ্ছি।'

'আজকে রাত্তিরে !'

'হ্যাঁ, যেতেই যদি হয় তাহলে যত আগে হয় ততই ভালো। আমি নিজেই নিয়ে যাব। ছুটিও কদিন পাওনা আছে।'

ডাক্তারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে দরজা পর্যন্ত রাস্তাটাই মনে হচ্ছিল অনেক দূরের পথ।

রাস্তায় এসে নামলুম। জাকের দেওয়া চিঠিগুলো তখনো আমার হাতে। কাগজের উপরে টপটপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। চিঠিগুলো মুছে বুক পকেটে রেখে দিলুম। একটা প্রকাণ্ড বাস্ এসে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো লোক ঠেলাঠেলি করে বাস্ থেকে নেমে পড়ল। বেশির ভাগ মেয়ে—কালো চক্চকে বর্ষাতি গায়ে। ছোকরা গার্ডের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে। ভাবলুম—আশ্চর্য, এ কেমন করে হয়, চারিদিকে এত প্রাণ, এত গান, এত হাসি, আর প্যাট্‌কেই শুধু সব ছেড়ে চলে যেতে হবে !

ঘণ্টা বাজিয়ে বাস্ আবার চলে গেল। চাকার ঘায়ে কতগুলো জল ছিটকে এসে ফুটপাতে পড়ল। আমি পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চললুম। কোষ্টারকে খবরটা দিয়ে টিকিট কিনে নিতে হবে।

বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। ব্যবস্থা সবই করে ফেলেছি, এমনকি স্যানাটোরিয়মে তারও করে দিয়েছি। দরজা থেকেই বললুম, 'প্যাট্, আজ সন্ধ্যের মধ্যে তোমার সব জিনিজপত্র গুছিয়ে নিতে পার ?'

'যেতেই হবে নাকি ?'

'হ্যাঁ, প্যাট্, যেতে হবে।'

'আমি একলা ?'

'না, আমরা দুজনেই যাচ্ছি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

প্যাট্-এর পাংশু মুখে একটু রঙের ছোপ দেখা দিল। বলল, 'কখন তৈরি হতে হবে ?'

'রাত দশটায় গাড়ি।'

'তুমি কি এখন আবার বেরোবে নাকি?'

'না, যাবার আগে আর বেরোব না।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্যাট্ বলল, 'তাহলে আর ভাবনা কি? কিন্তু এখনই কি গোছগাছ শুরু করে দেব?'

'তা, ঢের সময় আছে।'

'না. এখনই শুরু করে দিই, তাহলে সহজেই হয়ে যাবে।'

'বেশ।'

আমার নিজের যে কটা জিনিস দরকার গুছিয়ে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই বেঁধে ছেঁদে ফেললুম। তারপরে ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে গিয়ে বললুম যে আমরা আজই চলে যাচ্ছি। পয়লা নভেম্বর অবধি ও ঘরটার ভাড়া চুকিয়ে দিলুম, অবিশ্যি ইচ্ছে করলে আগেই কাউকে দিয়ে দিতে পারে। বুড়ি নানান কথা কেঁদে বসেছিল, অতি কষ্টে ওকে এড়িয়ে ঘরে ফিরে এলুম।

প্যাট্ তার পোশাকের ট্রাঙ্কের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। বিছানায় মেঝেতে ইতস্তত জামা-কাপড় ছড়ানো। সবে জুতোগুলো বাক্সবন্দী করছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, প্রথম যেদিন এখানে আসে সেদিনও এমনি হাঁটু গেড়ে বসে ও জিনিসপত্র খুলছিল। মনে হয় সে যেন কতকাল আগে, আবার মনে হয় এই তো মোটে কালকে।

মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকাল। জিগগেস করলুম, 'তোমার সেই রুপোলী পোশাকটা নিচ্ছ তো?' মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু বাকি জিনিস-গুলো কি হবে, বব্—আসবাবপত্রগুলো?'

'ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে ও কথা আমি বলেছি। কিছু-কিছু জিনিস আমার ঘরে সরিয়ে রেখে যাব। বাকিগুলো কোনো ফার্মের হেপাজতে রেখে যেতে হবে। তুমি ফিরে এলে আবার আনিয়ে নেব।'

প্যাট্ বলল, 'হুঁ, ফিরে এলে—'

বললুম, 'হ্যাঁ, শীতের পরে যখন ফিরে আসবে- রোদে পুড়ে গায়ের রঙটা যখন বাদামী হবে।'

এই বলে ওর বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করতে লেগে গেলুম। বিকেল নাগাদ জিনিস-পত্র সব গোছানো হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু একটা জিনিস বড় অদ্ভুত লাগছে। আসবাবপত্রগুলো আগের মতোই যার যার জায়গায় রয়েছে,

শুধু আলমারি আর দেরাজগুলো শূন্য। অথচ এরই মধ্যে ঘরটা কেমন ফাঁকা আর লক্ষ্মীছাড়া মনে হচ্ছে।

প্যাট্ বিছানায় বসে আছে, ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বললুম, 'আলোটা জ্বেলে দেব?'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'না, এমনি থাক।'

ওর পাশে গিয়ে বসলুম। জিগগেস করলুম, 'একটা সিগারেট দেব?'

'না, রব্বি, এই তো বেশ বসে আছি।'

উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালুম। রাস্তার আলোগুলো বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে, মিটমিট করে জ্বলছে, মাঝে-মাঝে বাতাসের ঝটকা এসে গাছ-গুলোকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রোজা আস্তে-আস্তে হেঁটে চলেছে 'ইন্টার-ন্যাশনাল'-এর দিকে। বগলে একটা ছোট্ট পার্শেল। নিশ্চয় ওর সেলাইয়ের জিনিসপত্র হবে। বাচ্চার জন্য বোধকরি উলের জামাটামা কিছু তৈরি করছে। ফ্রিত্‌সি আর ম্যারিয়নও যাচ্ছে ওর পিছন-পিছন। গায়ে শাদা রঙের নতুন বর্ষাতি। আর ঐ যে মিমিও আসছে—আহা বেচারা, কাপড়-জামা ভিজে চুপচুপে, কোনো রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে-টেনে চলেছে।

খানিক পরে যখন ফিরে তাকালুম তখন ঘরের ভিতরটা এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে প্যাট্‌কে আর দেখাই যায় না। শুধু ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কবরখানার পিছন দিকটাতে গাছের উপর দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক বিজ্ঞা-পনের ছবিগুলো একে-একে দেখা দিতে লাগল। বিদ্যুৎ-অক্ষরে জ্বলে উঠল সিগারেট আর মদ আর লণ্ড্রির বিজ্ঞাপন, লালচে আভা জানালার কাঁচ ভেদ করে ঘরের দেয়ালে ছাতে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল।

আটটা বেজে গেছে। বাইরে হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। আমি বললুম, 'ঐ যে গট্‌ফ্রিড্ ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে।' কথা ছিল ও এসে আমাদের খেতে নিয়ে যাবে। জানালার কাছে গিয়ে ওকে ডেকে বললুম, 'আমরা আসছি।' ছোট্ট পকেট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে আমি আমার ঘরে চলে গেলুম। তাড়াতাড়ি রাম্-এর বোতলটি নিয়ে ঢকঢক করে এক গ্লাশ খেয়ে নিলুম। কয়েক মিনিট একটা আরাম-কেদারায় চুপ করে বসে রইলুম। কি ভেবে আবার উঠে পড়লুম। ওয়াস্ স্ট্যাণ্ড-এর কাছে গিয়ে চুলটা আঁচড়াতে লাগলুম। কী যে করছি আমার নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ আয়নাতে নিজের মুখের উপর চোখ পড়ল। খুব নিবিষ্ট মনে

নিজেই নিজেকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। একবার ঠোঁট দুটো কুঁচকে তাকালুম তারপর আপন মনে হেসে ফেললুম। আয়নার ভিতরে প্রতিমূর্তিটাও দাঁত বের করে হাসতে লাগল। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। প্যাট্‌কে ডেকে বললুম, 'কেমন তৈরি? তাহলে চল যাই।'

ও বলল, 'হ্যাঁ তৈরি, কিন্তু একবারটি তোমার ঘরে যেতে হবে।'

বললুম, 'কেন, আবার ঐ ঝুপড়িটার মধ্যে কেন?'

প্যাট্‌ বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও আমি এলুম বলে।'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম। ও আসছে না দেখে দু-পা এগিয়ে দেখি ঘরের মাঝ-খানটায় ও দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে দেখে চমকে উঠল। ওর এমন নিঃস্ব, রিক্ত মূর্তি আগে কখনো দেখিনি, যেন এক ফুৎকারে ও একেবারে নিবে গেছে। বোধ-করি মুহূর্তমাত্র, তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল, বলল, 'এস, এবার যাই।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি রান্নাঘরে আমাদেরই অপেক্ষায় বসেছিল। পাকা চুল কোঁকড়া করে আঁচড়ানো। কালো সিল্কের জামার উপরে মৃত জালেওয়াস্কির মূর্তি-আঁকা ব্রুচটি পরতে ভোলেনি। প্যাট্‌-এর কানে-কানে বললুম, 'সাবধান, বুড়ি তোমাকে একটু আদর না করে ছাড়বে না।'

ব্যস্‌, বলতে না বলতে তার বিরাট আলিঙ্গনের মধ্যে প্যাট্‌ বেচারী রীতিমতো ডুবে গেল। প্যাট্‌কে বুকে চেপে ধরেছে, কান্নার আবেগে বুড়ির মুখ কুঞ্চিত। এইরে, এক্ষুনি চোখের জলের বাঁধ ভাঙবে আর প্যাট্‌কে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বললুম, 'মাপ করবেন। আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে। সময় হয়ে গেছে।'

'সময় হয়ে গেছে?' বুড়ি এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন একেবারে গিলে খাবে। 'ট্রেনের এখনো দু-ঘণ্টা বাকি। বুঝেছি, এখন মেয়েটাকে নিয়ে ছাইভস্ম গিলিয়ে মাতাল করে ছাড়বে, না?'

প্যাট্‌ হেসে বলল, 'না, ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, ওঁর বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা করে বিদায় নিয়ে যেতে হবে।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কি কথাটা তেমন আমল দিল না। 'এ ব্যক্তিটিকে তো ঠিক চেন না, বাছা। এ হচ্ছে একটি মদের স্বর্ণপাত্র। বড় জোর বলতে পার সোনালী রাম্‌-এর বোতল।'

আমি বললুম, 'উপমাটা ভালোই দিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে বুড়ির স্নেহ আবার উথলে উঠল। 'বাছা শিগগির-শিগগির ফিরে এস।

তোমার ঘর তোমারই থাকবে। স্বয়ং কাইজার এসে যদি ঘর দখল করেন, তাঁকেও তুমি ফিরে আসবামাত্র ঘর ছেড়ে দিতে হবে।'

প্যাট্ বলল, 'ধন্তবাদ, ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, অনেক ধন্তবাদ। আপনার সব কথা আমার মনে থাকবে। এমন কি তাশের খেলায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে কথাও ভুলছি না।'

'বেশ, বেশ, শরীরের যত্ন নিও, বাছা। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ফিরে এস।'

প্যাট্ বলল, 'নিশ্চয়, চেষ্টা করব বৈকি। বিদায় ফ্রাউ জালেওয়াস্কি, আসি ফ্রিডা।'

সিঁড়ির কাছটা অন্ধকার। লাইটগুলো জ্বলছে না। প্যাট্ নিঃশব্দে আস্তে-আস্তে নামছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর আবার লড়াইয়ের সীমান্তে ফিরে যাচ্ছি।

লেন্‌ত্‌স ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'দেখো, সাবধান।' দেখি গাড়ির ভিতরটা গোলাপ ফুলে ভর্তি। পিছনের সিট্-এ শাদা আর লাল গোলাপের প্রকাণ্ড দুটো তোড়া। দেখেই বুঝলুম এ ফুল ক্যাথিড্রেলের বাগান থেকে আনা।

গট্‌ফ্রিড্ বলল, 'এই শেষ। আজ বেশ একটু ফ্যাসাদে পড়া গিয়েছিল। গির্জার এক পুরুতের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।'

আমি জিগগেস করলুম, 'কেমন দেখতে বল তো? নীলচে চোখ, খুব ছেলেমানুষের মতো মুখখানা, কেমন তো?'

গট্‌ফ্রিড্ বলে উঠল, 'আহা, বুঝেছি, তুমিও তার ধরা পড়েছিলে। উনি তাহলে তোমার কথাই বলছিলেন। আমরা যে কি উদ্দেশ্যে ধম্ম করতে যাই তাই বুঝতে পেরে বেচারা বড় নিরাশ হয়েছেন। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন লোকের বুঝি আবার ধর্মে মতি ফিরে আসছে।'

আমি জিগগেস করলুম, 'তা উনি ফুলগুলো আনতে দিলেন?'

'হ্যাঁ, অনেক বলে কয়ে রাজী করানো গেল। শেষ পর্যন্ত উনি নিজেই কিছু ফুল তুলে দিলেন।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'সত্যি নাকি?'

গট্‌ফ্রিডও হেসে বলল, 'সত্যি বৈকি, ভদ্রলোক দিব্যি পাকা খেলোয়াড়ের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে উঁচু ডাল থেকে ফুল পাড়তে লাগলেন। দেখে বেশ মজা লাগছিল। আমাকে বলছিলেন ইউনিভার্সিটিতে থাকতে উনি নাকি ভালো ফুটবল খেলিয়ে ছিলেন।'

আমি বললুম, 'বাব্বাঃ, তুমি পুরুতঠাকুরকে চুরি করিয়ে ছাড়লে। তোমার অনন্ত নরকবাস হবে। যাক্‌গে, অটো কোথায়?'

'ও আগেই আলফন্‌স-এর ওখানে চলে গেছে। ওখানেই তো খাবার কথা, না?' প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, ওখানে বৈকি।'

'বেশ, তবে রওনা হওয়া যাক।'

ডোরা-কাটা ট্রাউজার, মর্নিং কোট আর ছাই রঙের টাই পরে আলফন্‌স আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। লেন্‌ত্‌স বলল, 'কি হে, কোথাও বে-থার নেমন্তন্ন আছে নাকি?'

আলফন্‌স বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী কী পোশাক পরতে হয় তা আমি জানি।' ঝুঁকে পড়ে প্যাট্-এর হাতে চুমু খেল।

জোয়ান শরীরে পুরোনো কোট এমন আঁট হয়েছে যে সেলাই খুলে যাবার উপক্রম। লেন্‌ত্‌স বলল, 'এখন বেশ কড়া দেখে একটা পানীয় দাও তো।'

আলফন্‌স খুব কায়দামাফিক ওয়েটারকে ইশারা করল। হ্যান্স তক্ষুনি ট্রে-ভর্তি গ্লাশ এনে হাজির। আলফন্‌স গট্‌ফ্রিড্‌কে বলল, 'নাও, তোমার যেটা খুশি দিতে বল! তবে খিদে বাড়াবার পক্ষে কুমেলের মতো জিনিস নেই।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'ধ্যেৎ, ভড্‌কার কাছে কিছু লাগে?'

অ্যালফন্‌স প্যাট্-এর দিকে ফিরে বলল, 'দেখুন না কেন, এই নিয়ে ওর সঙ্গে সেই ১৯১৬ সন থেকে ঝগড়া করে আসছি। সেই ভার্দুনে শুরু, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর গোঁ কিছুতেই ছাড়ল না। তা বেশ, আপনাদের যেটা ইচ্ছে খান।'

পানীয় এল। প্যাট্ বলল, 'সত্যি কুমেল খেতে চমৎকার—পাহাড়ী দুধের মতো ঠাণ্ডা।'

'শুনে খুশি হলুম। কুমেলের সমঝদার বড় একটা মেলে না।' কাউণ্টার থেকে বোতল নামিয়ে এনে বলল, 'আপনাকে আর এক গ্লাশ দিই?'

প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ দিন।'

আলফন্‌স গ্লাশ ভর্তি করে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খেতে হয় তো কুমেল খাবেন!' আধবোজা চোখ আবেশে জড়িয়ে এল।

প্যাট্ গ্লাশটি নিঃশেষ করে আমার দিকে তাকাল। গ্লাশটা ওর হাত থেকে নিয়ে আলফন্‌সকে বললুম, 'দাও দিকিনি এক গ্লাশ আমাকে।'

আলফন্‌স বলল, 'হ্যাঁ সবাই এক গ্লাশ খাব, তারপরে হবে খরগোসের মাংস, তার সঙ্গে বাঁধাকপি আর আপেলের চাটনি।'

আলফন্‌স গ্রামোফোনে কসাকদের কোরাস গান লাগিয়ে দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করল। গানের সুরটা ভারি মিষ্টি। বলতে গেলে একটি গলার গানই শোনা যাচ্ছে, বাকিরা শুধু সুর টেনে যাচ্ছে—ওদের মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিটা শোনাচ্ছে ঠিক যেন অনেক দূর থেকে আসা অর্গানের আওয়াজের মতো। বসে বসে মিষ্টি গলার গানটি শুনছি আর মনে হচ্ছে একটি বৃদ্ধ, ক্লান্ত লোক যেন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এক পাশে বসে নিজেরই তরুণ বয়সে গাওয়া কোনো গান শুনছে। গানের সুরটা ক্রমে মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো মিলিয়ে গেল। আলফন্‌স বলল, 'এ গানটা যখনই শুনি আমার কি মনে হয় জানো? ১৯১৭ সনে ইপ্রেসের কথা। মনে আছে গট্‌ফ্রিড্‌ মার্চ মাসের সেই রাত্তির যেদিন বার্টেলস্‌ম্যান—'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'আছে বৈকি, সেই রাত্তিরবেলায় চেরি গাছে—'

কোষ্টার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'সময় হয়ে গেছে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

আলফন্‌স বলল, 'এই শেষ, এক গ্লাশ কনিয়াক্‌, খাঁটি নেপোলিয়ন মার্কা। আপনাদের জন্যই বিশেষ করে আনিয়েছিলুম।'

কনিয়াক্‌ খেয়ে নিয়ে আমরা চটপট উঠে পড়লুম। প্যাট্‌ বলল, 'আচ্ছা তবে আসি, আলফন্‌স। এখানটায় এসে খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম,' বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আলফন্‌স দু-হাতে ওর হাত চেপে ধরল, বলল, 'বিদায়, কিন্তু আশা করছি শিগগিরই আবার দেখা হবে।' বলতে গিয়ে বেচারার গলা ধরে এল। কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌স আমাদের নিয়ে স্টেশনে চলল। রাস্তায় এক মিনিটের জন্য বাড়ির কাছে নেমে কুকুরটাকে নিয়ে এলুম। বোঝাপত্তরগুলো জাপ্‌ আগেই স্টেশনে নিয়ে গেছে। আমরাও স্টেশনে পৌঁচেছি আর গাড়িও এসে গেছে। কোনো রকমে উঠে বসতে না বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ লেন্‌ত্‌স পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা বোতল বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, 'এই নাও বব্‌, এইটে রেখে দাও। রাস্তায় এক-আধবার গলা ভেজাবার দরকার হবে।'

বললুম, 'থাক্‌ ভাই, ওটা তোমরাই আজ কাজে লাগিও। আমি সঙ্গে কিছু নিয়েছি।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'না, তুমিই নাও। সঙ্গে থাকলেই বা, অমৃতে কি আর তোমার অরুচি?' ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতে-ছুটতে বোতলটা আমার হাতে ছুঁড়ে দিল।

প্যাট্‌কে ডেকে বলল, 'আবার দেখা হবে প্যাট্। কাজকর্ম মন্দা হয়ে এলে আমরাও তোমাদের ওখানে চলে আসব। অটো স্কি করবে, আমি নাচ শেখাব, আর বব্ পিয়ানো বাজাবে। তোমাকে নিয়ে দল বেঁধে হোটেলে-হোটেলে ঘুরে বেড়াব আর ফূর্তি করব।'

ট্রেন জোরে চলতে শুরু করেছে। গট্‌ফ্রিড্ পিছনে পড়ে গেল। প্যাট্ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব একচোট হাত নাড়তে লাগল। ট্রেনটা একটা বাঁক ঘুরতেই স্টেশন অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্যাট্ যখন নিজের জায়গায় ফিরে এল তখন ওর চোখের কোণে জল চক্‌চক্ করছে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'এস, এখন এক গ্লাশ পান করা যাক। আজকের ব্যবহার তোমার একেবারে নিখুঁত।' মুখে কোনো রকমে হাসি টেনে প্যাট্ বলল, 'শরীরটা কিন্তু নিখুঁত লাগছে না।'

'আমারও না, সেজন্যই একটু পান করা প্রয়োজন হয়েছে।' কনিয়াক্-এর বোতলটি খুলে, এক কাপ ভর্তি করে ওকে দিলুম, 'কেমন লাগছে ?'

'বেশ,' বলে মাথাটি আমার কাঁধে এলিয়ে দিল।

আমি বললুম, 'কেঁদো না লক্ষ্মীটি। আজ সারাদিনে তুমি কাঁদনি বলে মনে-মনে আমি তোমার কত তারিফ করেছি।'

প্যাট্ মাথা নেড়ে বলল, 'কাঁদছি না তো।' বলতে না বলতেই শীর্ণ গাল দুটি বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

'এস, আর একটু খাও।' ওকে আরো জোরে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। বললুম, 'যাবার সময় প্রথমটায় একটু মন খারাপ হয়ই, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।' প্যাট্ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বব্, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি এক্ষুনি মন ঠিক করে নেব! তুমি আমার দিকে তাকিও না। আমি একটু চুপচাপ বসে থাকি, তাহলেই মনটা ঠিক হয়ে যাবে!'

'তা একটু কাঁদলেই বা দোষ কি ? সারাদিন তুমি বেশ শক্ত হয়ে ছিলে, এখন না হয় প্রাণভরে একটু কেঁদে নাও।'

'আসলে মনকে আমি শক্ত করতে পারিনি, তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি।'

'হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।'

প্যাট্ জোর করে আবার মুখে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করল। আমি ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললুম, 'যতক্ষণ অদৃষ্টের কাছে হার না মানছি ততক্ষণ অদৃষ্ট আমার কাছে পরাজিত। লড়াইয়ের এই হল রীতি।'

প্যাট্ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার মনে অতখানি সাহস নেই, বব্। বরং ভয় আছে প্রচুর। কেবলি মনে পড়ে যায়—শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর।'
বললুম, 'ভয় না থাকলে সাহস আসবে কোত্থেকে, প্যাট্?'
আমার গায়ে হেলান দিয়ে প্যাট্ বলল, 'ভয় কাকে বলে তুমি জানোই না, বব্।'
বললুম, 'জানি বৈকি, প্যাট্, খুব জানি।'

হঠাৎ কামরার দরজা খুলে গেল। টিকিট কালেক্টর টিকিট চাইল। টিকিট দেখে বলল, 'স্লিইপিং কার-এর টিকিট বুঝি ওঁর? তাহলে তো ওঁকে স্লিইপিং কার্-এ উঠে যেতে হচ্ছে। এ টিকিট অন্য কামরায় চলবে না।'
'বেশ, তাই হবে।'
'আর কুকুরটাকে লাগেজ্ ভ্যান-এ দিতে হবে, ওখানে কুকুরের বাক্স আছে।'
জিগগেস করলুম, 'স্লিইপিং কার্‌টা কোন দিকে বলুন তো।'
'পিছনে, ঠিক তিনটে কামরা পরেই। লাগেজ ভ্যানটা সামনের দিকে।'
বুকে একটা ছোট লণ্ঠন ঝুলিয়ে লোকটি চলে গেল, খনির অন্ধকারে খনির মজুররা যেমন ভাবে চলে ঠিক তেমনি।
প্যাট্‌কে বললুম, 'তাহলে তো এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়। দাঁড়াও, বিলিকে আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে তোমার ওখানে এনে দিচ্ছি। ঐ লাগেজ ভ্যান-এ ওকে রাখা চলবে না।'
আমি নিজের জন্য স্লিইপিং কার-এর টিকিট কিনিনি। এক রাত্তির গুড়িসুড়ি মেরে কাটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তাছাড়া, টাকাও কিছু বেঁচে যায়।
জাপ্ প্যাট্-এর বিছানাপত্তর আগে থেকেই স্লিইপিং কার্-এ রেখে দিয়েছে। কামরাটি বেশ চমৎকার, মেহগনি কাঠের রেলিং-দেওয়া। প্যাট্ এর জন্য নিচের বার্থটি রিজার্ভ করা হয়েছে। ওখানকার লোকটিকে জিগগেস করলুম, উপরের বার্থটি রিজার্ভ কিনা।
লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে রিজার্ভ।'
'ফ্রাঙ্কফোর্টে আমরা কটায় পৌঁচচ্ছি?'
'আড়াইটায়।'
লোকটার হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিলুম, ও আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে রইল। প্যাট্‌কে বললুম, 'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই কুকুরটাকে নিয়ে আসছি।'
'সে কেমন করে হবে? ঐ লোকটা যে এই কামরাতেই থাকবে।'

'হয় কিনা দেখ। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিও না যেন।'

পরের স্টেশনে কুকুরটাকে সঙ্গে করে স্লিইপিং কার্‌-এর পিছনের কামরাটাতে গিয়ে উঠলুম। একটু পরেই লক্ষ্য করলুম ঐ লোকটি গার্ড-এর সঙ্গে গল্প করবার জন্য উঠে গেল। ঠিক এই সুযোগটির অপেক্ষাতেই ছিলুম। তাড়াতাড়ি করিডর দিয়ে স্লিইপিং কার্‌-এ গিয়ে ঢুকলুম। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।

প্যাট্‌ একটি শাদা রঙের ঢিলে পোশাক পরে নিয়েছে, তাতে ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। আমাকে দেখে বলল, 'বব্‌, এখন আমার মন বেশ ঠিক হয়ে গেছে।'

'খুব ভালো কথা। কিন্তু এখন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো শুয়ে পড় দিকিনি। আমি তোমার পাশটিতে একটু বসি।'

'বেশ, কিন্তু'—উপরের বার্থটার দিকে ইঙ্গিত করে প্যাট্‌ বলল, 'ধর হঠাৎ যদি নারী-রক্ষা সমিতির সভাপতি গোছের কোনো ব্যক্তি দরজার মুখে দেখা দেন তাহলে—'

বললুম, 'ফ্রাঙ্কফোর্ট আসতে এখনো ঢের দেরি। ওদিকে আমি নজর রাখব। আমি তো আর ঘুমোচ্ছি না।'

ফ্রাঙ্কফোর্টে পৌঁছবার একটু আগেই আমি আমার নিজের কামরায় চলে গেলুম। জানালার ধারটিতে বসে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টে এক অদ্ভুত ব্যক্তি এসে গাড়িতে উঠল। মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফ। লোকটা উঠেই একটা পুঁটলি বের করে খেতে শুরু করে দিল। ঘণ্টাখানেক ধরে এমন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে খেয়ে গেল যে, আমার আর ঘুমোনোই হল না। আহার সমাধা করে লোকটা গোঁফটোঁফ মুছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুতে না শুতেই তার নাকে মুখে এমন বিচিত্র রাগিণী বের হতে লাগল যে এমন আমি জন্মে কখনো শুনিনি। তাকে নাক-ডাকানো বললে কিছুই বলা হয় না। সে এক বিচিত্র কলরব। তার মধ্যে এতটুকু যদি সুরতাল থাকত! বসে-বসে সেই নাসিকাগর্জন শোনা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। ভাগ্যিস লোকটা পাঁচটার সময় নেমে গেল, তাই রক্ষে।

ঘুম থেকে যখন জাগলুম তখন বাইরেটা একেবারে শাদা হয়ে গেছে। বাইরে অবিরাম তুষার পড়ছে, আর কামরার ভিতরটায় একটা আবছা প্রদোষালোকের সৃষ্টি হয়েছে।

গাড়িটা এখন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলেছে। বেলা প্রায় নটা বাজে।

আড়মোড়া ভেঙে মুখ ধোবার জন্য উঠে গেলুম, দাড়িটাও কামিয়ে নিলুম। ফিরে এসে দেখি প্যাট্ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে। জিগগেস করলুম 'ভালো ঘুম হয়েছে তো? আর হ্যাঁ, উপরের বাংক-এর বুড়ি ডাইনিটাকে কেমন দেখলে?'

প্যাট্ হেসে বলল, 'বুড়িও নয়, ডাইনিও নয়। অল্প বয়েস, দিব্যি সুন্দরী দেখতে। নাম হেল্‌গা গুট্‌ম্যান্। আমার মতো সেও ঐ একই স্যানাটোরিয়মে যাচ্ছে।'

'সত্যি নাকি?'

'সত্যি বৈকি। কিন্তু তোমার তো ভালো ঘুম হয়নি, বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক কাজ কর, এখন বেশ করে কিছু খেয়ে নাও।'

'হ্যাঁ, এখন কফি খাব, কফির সঙ্গে চেরি ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে।' দুজনে মিলে ডাইনিং কার-এ গেলাম। হঠাৎ আমার মনটা খুশি হয়ে উঠেছে। রাত্রিবেলায় মনটা দমে গিয়েছিল, এখন আর সে ভাবটা নেই।

হেল্‌গা গুট্‌ম্যান্ ইতিমধ্যেই ডাইনিং কার-এ এসে বসেছে। বেশ মেয়েটি, লম্বা ছিপছিপে, দক্ষিণাঞ্চলের মেয়েরা সাধারণত যেমনটা হয়, দিব্যি হাসি-খুশি ভাব। বললুম, 'যাই বল, এ বড় আশ্চর্য—একই স্যানাটোরিয়মে যাচ্ছ আর রাস্তায় এমনি ভাবে দেখা হয়ে গেল।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'এমন কিছু আশ্চর্য নয়। মরসুমি পাখির দল ঠিক সময়ে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়।' ডাইনিং কার-এর ওধারের কোণটা দেখিয়ে বলল, 'ঐ টেবিলটা দেখ না, যতজন বসেছে সবাই ঐ স্যানাটোরিয়মে যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'কেমন করে জানলে?'

'গেল বারেই ওদের সবার সঙ্গে ওখানে আলাপ হয়েছে। ওখানকার সবাই সবাইকে চেনে কিনা।'

ওয়েটার কফি নিয়ে এল। ওকে বললুম আমার জন্য বেশ বড় দেখে এক গ্লাশ চেরি ব্র্যাণ্ডি এনে দিতে। মনটা হাল্কা বোধ হওয়াতে পানীয়ের লোভ আরো বেড়েছে।

সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটা এখন খুব সহজ মনে হচ্ছে। এই তো, এত সব লোক দ্বিতীয় দফায় আবার স্যানাটোরিয়মে যাচ্ছে। কই এরা তো তাই নিয়ে কিছু শোরগোল করছে না। ঠিক যেন কোথাও ফুর্তি করে বেড়াতে যাচ্ছে। বোকার মতো মিছিমিছি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। এরা যেমন ফিরে এসেছিল প্যাট্ও তেমনি ফিরে আসবে।

অবিশ্যি এদের যে আবার ওখানে ফিরে যেতে হচ্ছে সে কথা ভাববার মতো আমার অবসর ছিল না—ফিরে আসাটাই বড় কথা—ফিরে এলেই আবার পুরো এক বছর দুজনে একসঙ্গে। এক বছর কি কম সময়? অনেক দেখে-দেখে এইটুকু অন্তত শিখেছি—সংসারে অল্প মেয়াদে যেটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়েই আসল জীবন।

পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দিগন্ত প্রসারিত বরফের আস্তরণের উপর সূর্যাস্তের আভা রাশি-রাশি সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকদিন এমন ঘন নীল আকাশ দেখিনি। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক হাজির। হাত নেড়ে কলকণ্ঠে নবাগতদের অভ্যর্থনা করছে, নবাগতরাও ট্রেন থেকে হাত নাড়ছে। হাসি-খুশি ফুর্তিবাজ এক ভদ্রমহিলা হেল্‌গা গুট্‌ম্যান্‌কে নিতে এসেছেন, সঙ্গে আরো দুটি লোক। দেখলুম হেল্‌গারও খুব ফুর্তি, হাসছে, কথা বলছে—ত্রস্ত-ব্যস্ত ভঙ্গি দেখলে মনে হবে যেন অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে এসেছে। বন্ধুদের সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠতে-উঠতে সে আমাদের দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'ওখানটায় গিয়ে দেখা হবে, এখন আসি।'
কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকজন সব চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম খালি। শুধু আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে। একজন কুলি এসে জিগগেস করল, 'কোন হোটেলে যাবেন?'
বললুম, 'ওয়ালড্‌ফ্রিডেন্‌ স্যানাটোরিয়ম্‌।'
কুলি ইশারা করতেই একজন গাড়োয়ান এগিয়ে এল। দুজনে ধরাধরি করে আমাদের মালপত্তর একটা নীল রঙের ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে তুলল। ধবধবে শাদা তেজিয়ান দুটো ঘোড়া। দুজনে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলুম।
ড্রাইভার বলল, 'ইচ্ছে করলে তারে-ঝোলা ট্রেনে উপরে উঠতে পারেন, না কি সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়িতেই যাবেন?'
'ঘোড়ার গাড়িতে কতক্ষণ লাগবে?'
'আধঘণ্টা আন্দাজ লাগবে।'
'তাহলে এই গাড়িতেই যাব।'
ড্রাইভার জিভে-টাকরায় চক্‌চক্‌ শব্দ করে ঘোড়া চালিয়ে দিল। রাস্তাটা গ্রাম ছাড়িয়ে এঁকে-বেঁকে উপরের দিকে উঠেছে। উপরে স্যানাটোরিয়মের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। মস্ত লম্বা শাদা একটা বাড়ি, গায়ে সারি-সারি জানালা। প্রত্যেক জানালার সুমুখে একটু করে বারান্দা। ছাত থেকে একটা নিশান বাতাসে উড়ছে।

ভেবেছিলুম বাড়িটা আদতে একটা হাসপাতালের মতো দেখতে হবে। কিন্তু নিচেরতলাটা মনে হয় ঠিক যেন একটি হোটেল। মস্ত বড় একটা হল্‌-ঘর, তাতে প্রকাণ্ড এক অগ্নিস্থলী। ছোট-ছোট টেবিল পাতা রয়েছে, তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম।

আমরা সোজা আপিস-ঘরে গিয়ে দেখা করলুম। একটি লোক আমাদের মাল-পত্তর নিয়ে এল। বয়স্কা মতো একজন ভদ্রমহিলা বললেন প্যাট্-এর জন্য ৭৯ নম্বর ঘর ঠিক হয়েছে। ওঁকে জিগগেস করলুম কয়েকদিনের জন্য আমি একটা ঘর পেতে পারি কিনা।

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, 'স্যানাটোরিয়মে তো হবে না, এর লাগোয়া আমাদের যে আলাদা বাড়ি রয়েছে তাতে হতে পারে।'

'সেটা কোথায়?'

'এই পাশেই।'

'তবে তো ভালোই। দয়া করে আমাকে ওখানে একটা ঘর দিন আর আমার জিনিসপত্র ওখানে পাঠিয়ে দিতে বলুন।'

লিফ্‌টে করে উপরের তলায় গেলুম। হ্যাঁ, উপরটা অনেকটা হাসপাতালের মতো বৈকি। অবিশ্যি ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা খুবই ভালো, কিন্তু তবু হাসপাতাল তো? শাদা দরজা, শাদা জানালা, শাদা দেয়াল। চকচকে কাঁচ আর নিকেল, সব কিছু তকতকে পরিষ্কার।

একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল, 'ফ্রাউলিন্ হোল্‌ম্যান তো?'

প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, আমার বোধকরি ৭৯ নম্বর ঘর।'

নার্স আগে-আগে গিয়ে একটি ঘরের দরজা খুলে দিল, 'এই আপনার ঘর।'

মাঝারি সাইজের সুন্দর ঘরটি। জানালা দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। টেবিলের উপরে একটি ফুলদানিতে লাল আর নীল রঙের এ্যাস্টর ফুল।

বাইরে বহুদূর বিস্তৃত বরফে ঢাকা প্রান্তর, তারই কোল ঘেঁষে ছোট্ট গ্রামটি যেন প্রকাণ্ড একটা শাদা কম্বল মুড়ি দিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আছে।

প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

চাকর বাক্সতোরঙ্গ নিয়ে এল। প্যাট্ নার্সকে জিগগেস করল, 'ডাক্তার কখন পরীক্ষা করবেন?'

'কালকে সকালবেলায়। আজকে খুব শিগগির-শিগগির শুয়ে পড়বেন। ভালো ঘুম হলে শরীরের গ্লানি কেটে যাবে।'

খাটের সঙ্গে একটি নতুন টেম্পারেচার চার্ট লাগিয়ে রাখা হয়েছে। প্যাট্ জিগগেস করল, 'ঘরে টেলিফোন নেই ?'

নার্স বলল, 'হ্যাঁ, টেলিফোনের ব্যবস্থা করা যায়, কানেক্শন তো রয়েছেই।'

প্যাট্ বলল, 'আমাকে এখন কিছু করতে হবে ?'

'না, কালকে ডাক্তার পরীক্ষা করে তবে সব ব্যবস্থা করবেন। দশটার সময় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ।' নার্স চলে গেল।

চাকরটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কিছু বকশিশ দিয়ে বিদায় করে দিলুম। ওরা চলে যাওয়াতে ঘরটা হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ মনে হতে লাগল।

প্যাট্ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওকে জিগগেস করলুম, 'শরীর খুব ক্লান্ত লাগছে নাকি ?'

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কই না তো।'

'কিন্তু তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'সে অন্য কারণে, বব্—যাক্‌গে—'

'এখন কাপড়-জামা ছাড়বে নাকি ? তার চাইতে বরং চল ঘণ্টাখানেক নিচে থেকে ঘুরে আসি।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

লিফ্‌টে করে আবার নিচে চলে এলুম। হল্-ঘরের এক ধারে ছোট একটি টেবিল দখল করে দুজনে বসলুম। একটু পরেই হেল্‌গা গুট্‌ম্যান্ তার বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে এসে জুটল। হেল্‌গা অতিরিক্ত খুশিতে যেন টগবগ করছে। মনে-মনে খুশিই হলুম। এ রকম বন্ধুবান্ধব পেলে প্যাট্-এর পক্ষে এখানে থাকা অনেক সহজ হবে। বিশেষ করে প্রথম দিনটাতে অমনিতেই মন বড় দমে থাকে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠিক এক সপ্তাহ পরে ওখান থেকে ফিরে এলুম। স্টেশন থেকে সোজা কারখানায় চলে গিয়েছিলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যাবার সময় যেমন দেখে গিয়েছিলুম এখনো তেমনি বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কত কাল আগে যে প্যাট্‌কে রেখে আসতে গিয়েছিলুম তার ঠিকানা নেই।

কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌স আপিসেই বসেছিল। আমাকে দেখেই গট্‌ফ্রিড বলে উঠল, 'যাক্, তুমি ঠিক সময়টিতে এসে গেছ।'

'কেন, কি ব্যাপার?'

কোষ্টার বলল, 'আগে লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দাও তার পরে কথা।'

ঘরে ঢুকে বসলুম। অটো জিগগেস করল, 'প্যাট্ কেমন আছে?'

'বেশ ভালোই আছে। কিন্তু তোমাদের গোলমালটা কি শুনি?'

'গোলমালটা হয়েছে সেই স্ট্যাৎস্ গাড়িটা নিয়ে। গাড়িটাকে মেরামত-টেরামত করে দিন পনেরো আগে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছিল। কালকে কোষ্টার গিয়েছিল টাকা আনতে। গিয়ে দেখে ইতিমধ্যে ব্যবসা ফেল পড়ে গাড়ির মালিক দেউলে হয়ে বসে আছে। পাওনাদারদের দাবি মেটাবার জন্য গাড়ি-টাড়ি সব এখন এ্যাসেট-এর লিস্টভুক্ত হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তাতে আমাদের কি ক্ষতি? ইন্সিওরেন্সের টাকাটা পেলেই আমাদের হয়ে যায়।'

লেন্‌ত্‌স নিরসভাবে বলল, 'আমরা তো তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু গাড়িটা মোটে ইনসিওর করাই ছিল না।'

'কি সব্বনাশ, তাই নাকি, অটো?'

অটো মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, আজকেই তো সবে জানতে পারলুম।'

লেন্‌ত্‌স বিড়বিড় করে বলল, 'দেখ না কেন, লোকের উপকার করতে গিয়ে কি

দশা! তার উপরে সেই ভাঙা গাড়ি লুকিয়ে আনার আর রাখার হুজ্জতটা একবার দেখ।'

অটোকে জিগগেস করলুম, 'তাহলে এখন কি হবে?'

'রিসিভারদের কাছে আমাদের দাবি-দাওয়ার কথা জানিয়ে এসেছি, তবে বিশেষ কিছু ফল হবে বলে মনে করিনে।'

গট্‌ফ্রিড্‌ বলল, 'দোকান বন্ধ করতে হবে আর কি। অমনিতেই ইনকাম ট্যাক্স-এর লোক বকেয়া ট্যাক্সের জন্য খা তাগিদ দিতে শুরু করেছে!'

কোষ্টার বলল, 'হ্যাঁ, বন্ধ হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।'

লেন্‌ত্‌স দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'বিপদের সময় সাহস আর ধৈর্য না থাকলে চলবে কেন? তাহলে আর আমরা সৈনিক কি?' বলে আলমারি থেকে কনিয়াক্‌-এর বোতলটি নিয়ে এল। আমি বললুম, 'এই কনিয়াকটুকু শেষ হবার পরে বোধকরি আরো বেশি সাহসের প্রয়োজন হবে, কারণ আমার যদ্দূর মনে পড়ছে এটিই আমাদের শেষ বোতল।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'যা সঙিন অবস্থা হয়েছে। ভাবলে হাসিও পায় কান্নাও পায়, কাজেই হেসে নেওয়াই ভালো।' তাড়াতাড়ি গ্লাশটি শেষ করে লেন্‌ত্‌স উঠে পড়ল। 'যাই, ট্যাক্সিটা নিয়ে একটু ঘুরে আসি, দেখি দু-চার পয়সা রোজগার হয় কি না।' লেন্‌ত্‌স বেরিয়ে গেল।

আমি আর কোষ্টার বসে রইলুম। অটোকে বললুম, 'আমাদের কপাল বড় খারাপ দেখছি। বিশেষ করে কিছুদিন থেকে সময় বড় খারাপ পড়েছে।'

কোষ্টার বলল, 'আর্মিতে থেকে এইটুকু শিখেছি যে কোনো বিষয় নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতে নেই। যাক্‌, পাহাড়ে কেমন লাগল?'

'চমৎকার, অসুখ-বিসুখের বালাই না থাকলে স্বর্গ বলতে হবে। যেমনি বরফ তেমনি সূর্যের আলো।'

'বরফ আর সূর্যের আলো শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগছে।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত বৈকি। ওখানটায় সবই অদ্ভুত।'

হঠাৎ কোষ্টার জিগগেস করল, 'রাত্তিরে কি করছ?'

'কি আর করব? মালপত্রগুলো তো আগে বাড়ি পৌঁছতে হবে।'

কোষ্টার বলল, 'আমি এখন ঘণ্টাখানেকের জন্য একবার বেরোচ্ছি। পরে একবার এস না, বার্‌-এ একটু গুলজার করা যাবে।'

বললুম, 'বেশ, এ ছাড়া কি-ই বা করবার আছে?'

স্টেশনে গিয়ে আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম, কারো সঙ্গে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। খুব ভাগ্যি যে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির পাল্লায় পড়ে যাইনি। খানিকক্ষণ ঘরেই বসে রইলুম। টেবিলের উপর চিঠি আর খবরের কাগজ পড়ে আছে। চিঠিগুলো নিশ্চয়ই কোনো সার্কুলার হবে, কারণ অমনিতে কেউ আমাকে চিঠিপত্র লেখে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হল, অবিশ্যি এখন একজন আছে যে মাঝে-মাঝে আমাকে লিখবে।

একটু পরে উঠে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-জামা ছেড়ে নিলুম। প্যাট্-এর ঘর এখনো কেউ ভাড়া নেয়নি, তবু ও-ঘরের দিকে আর পা বাড়ালুম না। পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলুম। যাক্ বাঁচা গেল।

প্রথমটায় গেলুম কাফে 'ইন্টারন্যাশানল'-এর দিকে, একটু কিছু খেয়ে নিতে হবে। ওয়েটার এলয়স্ দরজায় দাঁড়িয়েছিল, হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বলল, 'আপনি ফিরে এসেছেন ?'

বললুম, 'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে ফিরে আসতেই হয়।'

রোজা আর কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে একটা বড় টেবিল নিয়ে বসেছে। ওরা একবার রাস্তায় টহল দিয়ে এসেছে, দ্বিতীয়বার বেরোবার আগে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। রোজা আমাকে দেখে অবাক। 'কি কাণ্ড, রবার্ট যে, তোমাকে তো আজকাল দেখাই যায় না।'

বললুম, 'এতদিন আসিনি, সে কথা বলে কি লাভ। এখন যে এসেছি সেটাই বড় কথা।'

'তার মানে ? তাহলে এখন থেকে প্রায়ই আসছ ?'

'ভাবছি।'

মেয়েরা সবাই বলে উঠল, 'বেশ, বেশ।' রোজার পাশেই বসে আছে লিলি। এতক্ষণ ওকে লক্ষ্য করিনি। 'সে কি লিলি. তুমি এখানে ? তুমি না বে-থা করলে ? আমি ভেবেছিলুম বাড়িতে বসে দিব্যি ঘরকন্না করছ।'

লিলি কথার কোনো জবাব দিল না। জবাব দিল রোজা। কটুকণ্ঠে বলল, 'ঘরকন্না ! আর বোলো না। যদ্দিন বেচারীর পয়সা ছিল তদ্দিন লিলির কি আদর ! ওর পয়সায় খেয়ে-দেয়ে বাবুগিরি করে সোয়ামিটি তো ভদ্দরলোক সাজলেন। ছটি মাস—ব্যাস, শেষ পাইটি পর্যন্ত যখন শুষে খেয়েছে তখন সোয়ামি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন—তার স্ত্রী এককালে বেশ্যাগিরি করত। যেন আগে

তিনি কিছুই জানতেন না। ঐ অজুহাত দেখিয়ে লোকটা ওকে ডিভোর্স করে দিল। মাঝখান থেকে বেচারীর টাকাগুলো সব গেল।'

জিগগেস করলুম, 'কত টাকা আন্দাজ হবে ?'

'সে অল্প-স্বল্প নয়, চার হাজার মার্ক। ভেবে দেখ একবার কি কষ্টের রোজগার—এই টাকার জন্য কত মুখপোড়ার সঙ্গে কত রাত—'

চার হাজার মার্ক শুনে আমি অবাক! রোজা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এস, একটা কিছু আমাদের বাজিয়ে শোনাও। বাজে কথা বলে মিছিমিছি মনটা বিগড়ে গেল।'

'বেশ তাই হবে—অনেকদিন পর যখন সবার সঙ্গে দেখা হল।'

পিয়ানোতে গিয়ে বসলুম, পর-পর কয়েকটা গান বাজালুম। বাজাচ্ছি আর প্যাট্-এর কথা ভাবছি। হাতে যা টাকা আছে বড় জোর জানুয়ারী মাস অবধি ওর স্যানাটোরিয়মে থাকা চলবে। কাজেই এখন অনেক টাকা রোজগারের দরকার। নেহাত যন্ত্রচালিতের মতো বাজনায় হাত চালিয়ে যাচ্ছি। পাশের সোফাটায় বসে রোজা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে আর লিলির মুখে কি করুণ হতাশার ভাব। মৃতের মুখের চাইতেও পাংশু ওর মুখ।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে আমার বাজনার সুর আর ভাবনার ঘোর গেল কেটে। রোজা লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, মাথার টুপি একধারে সরে গেছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরোবার উপক্রম। কফির কাপ্‌টা উল্টে গেছে, কফি আস্তে-আস্তে গড়িয়ে ওর খোলা হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ঢুকছে, সেদিকে ওর লক্ষ্যই নেই। মুখ দিয়ে ভালো করে কথা সরছে না, 'এ্যাঁ, আর্থার, তুমি ?'

রোগা মতো একটা লোক ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে ঘরে ঢুকল। মাথার টুপিটা পিছনের দিক ঠেলে-দেওয়া। মুখ ফ্যাকাশে, মস্ত একটা নাক, মাথাটা ছোট্ট, ডিমের মতো আকৃতি। রোজা আবার বলল, 'আর্থার তুমি ?'

'আমি নয়তো কে ?'

'কি কাণ্ড! কোত্থেকে এলে ?'

'কোত্থেকে আর। দিব্যি রাস্তা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকলুম।'

বহুদিন পরে দুজনের সাক্ষাৎ; কিন্তু তাই বলে আর্থার-এর গলার স্বরে এতটুকু রসকষের আভাস পাওয়া গেল না। লোকটিকে বেশ একটু নিরীক্ষণ করে দেখলুম। হায়রে, এই তবে রোজার প্রিয়তমের মূর্তি, তার সন্তানের পিতা! লোকটাকে দেখলে মনে হয় এই সোজা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। রোজা

ওর মধ্যে কি দেখে যে ভুলেছে অনেক ভেবে-চিন্তেও তার হদিস পেলুম না। বোধকরি এমনিই হয়। মেয়েরা পুরুষ চরিত্রের কঠিন বিচারক। কেন যে কাকে নিয়ে মজে যায় সে রহস্য বোঝা ভার।

রোজার পাশের টেবিলে এক গ্লাশ বিয়ার ছিল। কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। আর্থার নির্বিবাদে গ্লাশটি তুলে ঢকঢক করে নিঃশেষ করে দিল। রোজা হাসিমুখে দেখছে। বলল, 'আরো চাই?'

আর্থার বাজখাঁই গলায় বলল, 'চাই বৈকি। বেশ বড় দেখে এক গ্লাশ।'

রোজা ওয়েটারকে ডেকে বলল, 'এলয়স্, ওকে আর এক গ্লাশ বিয়ার দাও। হ্যাঁ, আর্থার, আমাদের খুকু—এলভিরাকে তো তুমি আজ পর্যন্ত দেখইনি।'

'এ্যাঁ,' এতক্ষণে আর্থার একটু সজাগ হয়ে উঠল। হাত নেড়ে বিরক্তির স্বরে বলল, 'ওসব বাজে কথা বোকো না। ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। বলেছিলুম ওটাকে বিদেয় করতে। তাছাড়া আমি না থাকলেও ও তোমার হত...' মুখ গোমড়া করে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর বলল, 'বাচ্চাকাচ্চা খরচার ব্যাপার। যত দিন যায় খরচা তত বাড়ে...'

'না, আর্থার, এমন কিছু দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়। তাছাড়া ও তো মেয়ে।'

বিয়ার খেতে-খেতে আর্থার বলল, 'তাতে কি, মেয়েদের কি খরচা নেই? পয়সাওয়ালা খোশখেয়ালী বড়লোকের গিন্নিবান্নির কাছে মেয়েটাকে পুষ্যি দিয়ে দাও, ও তাকে পালবে'খন। তাহলে একটা উপায় হয়ে যায়।'

গোমড়া মুখে হাসি টেনে এনে লোকটা বলল, 'তোমার সঙ্গে টাকা আছে?'

রোজা কিছু করতে পারলে বর্তে যায়। তাড়াতাড়ি কম্পিতে ভেজা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে বলল, 'এই পাঁচ মার্ক মাত্র আছে, আর্থার। জানতুম না তো তুমি আসবে—বাড়িতে অবিশ্যি টাকা রয়েছে।' আর্থার বিনাবাক্যে টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরল। একটু পরেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'কিন্তু আরাম করে সোফায় বসে থাকলে তো আর পয়সা আসবে না।'

'এই যাচ্ছি, আর্থার। এখনো তো রাত বেশি হয়নি। এই তো সবে সন্ধ্যে।'

আর্থার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি এখন আসি।' টুপিটা কপালের দিকে একটু টেনে দিল। 'গোটা বারো আন্দাজ আবার এসে তোমার খোঁজ করব।' বলে আগের মতো ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বেরিয়ে গেল। রোজা এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু লোকটা একবার ফিরেও তাকাল না।

এলয়স্ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'শুয়ারকা বাচ্চা—'

রোজার কোনোদিকে খেয়ালই নেই। খুব গর্বের সঙ্গে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন দেখলে তো? আশ্চর্য মানুষ। ওর মনে যে কি আছে কিছু জানবার উপায় নেই। এতদিন কোথায় যে লুকিয়ে ছিল তাই ভাবি।'

ওয়ালি বলল, 'গায়ের রঙ দেখেই বোঝা যায় কোথায় ছিল—নিশ্চয় জেলখানায়। বদমায়েস আর কাকে বলে!'

'তোমরা ওর কিছু বোঝ না।' রোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'পুরুষমানুষ এমনি না হলে চলে—তোমাদের ঐ ছিঁচকাঁদুনেদের দলে নয়। যাক্‌, আমি চলি এবার।' ও যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। হাওয়ায় ভর করে মনের আনন্দে চলে গেল। পয়সা রোজগার করে হাতে তুলে দেবার মতো একটা লোক পেয়েছে। সে ব্যাটা তাই দিয়ে মদ খাবে, তারপরে ওকেই ধরে ঠ্যাঙাবে। কিন্তু এতেই রোজা খুশি। আধ-ঘণ্টার মধ্যে একে-একে সবাই উঠে চলে গেল। শুধু লিলি এখনো বসে আছে, পাথরের মতো নির্বিকার ওর মুখ। আমি আরো খানিকক্ষণ আপনমনে পিয়ানো বাজিয়ে গেলুম। তারপরে একটি স্যাণ্ডউইচ খেয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। লিলির সঙ্গে একলা ঘরে বসে থাকা বড় মুশকিল।

বৃষ্টিতে ভেজা অন্ধকার রাস্তায় অনেকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালুম। কারখানাটার কাছে স্যালভেশন আর্মির দল বরাবরকার মতো এসে দাঁড়িয়েছে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ধর্মসঙ্গীত জুড়ে দিয়েছে। রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। হঠাৎ পা যেন আর চলতে চায় না। মনে হল প্যাট্‌কে ছাড়া একলা এক পা চলবার সাধ্যি আমার নেই। এক বছর আগে কি ভয়ানক একলা ছিলুম, কিন্তু তখন প্যাট্‌ তো ছিল না। মনে-মনে বললুম এখন প্যাট্‌ সঙ্গে না থাকলে কি হবে, ও রয়েছে তো। কিন্তু বললে কি হবে, মন মানতে চায় না। মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারলুম না। পা-দুটোকে টেনে-টেনে কোনো রকমে ঘরে ফিরে এলুম। দেখি প্যাট্‌-এর কোনো চিঠিপত্র এল কিনা। বোকার মতো ভাবছিলুম কারণ এখনো ওর চিঠি আসার সময়ই হয়নি।

তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়লুম। দরজার কাছে অর্‌লফ-এর সঙ্গে দেখা। ড্রেস-স্যুট পরে ওদের হোটেলে নাচের পার্টিতে যাচ্ছে। ওকে জিগগেস করলুম ফ্রাউ হেসির কোনো খবর পেয়েছে কি না।

অর্‌লফ বলল, 'না তো, উনি এখানেও আসেননি। পুলিসের কাছেও যাননি। যাক্ গে, না আসাই ভালো।'

রাস্তায় একসঙ্গেই বেরোলুম। মোড়ের মাথায় একটা কয়লাভর্তি লরি। ড্রাইভার

গাড়ির বনেট্‌টা তুলে এঞ্জিনটাতে কি যেন করল। এঞ্জিনটা হঠাৎ বিষম আওয়াজ করে উঠল। অবুলফ আঁত্‌কে লাফিয়ে উঠল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখে রক্তের লেশ নেই। জিগগেস করলুম, 'কি হল, তোমার শরীর খারাপ নাকি?'
অবুলফ ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'না—ও আওয়াজটা হঠাৎ শুনলে আমার বিষম ভয় লাগে। রাশিয়াতে আমার বাবাকে যখন গুলি করে মারা হয় তখন ওরা সারাক্ষণ আমাদের বাড়ির পিছনে ওরকম এঞ্জিনের আওয়াজ করেছিল। গুলির আওয়াজ যাতে আমাদের কানে না আসে সেজন্যই ওরকম করা হয়েছিল। অবিশ্যি শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম।' অনাবশ্যক আবেগ প্রকাশ করে ফেলেছে ভেবে সলজ্জমুখে একটু হাসল। তারপরে বলল, 'মায়ের বেলায় অবিশ্যি ওরা অত খবরদারি করেনি। সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গুলি করে মেরে ফেলল। রাত্তির বেলায় আমি আর আমার ভাই কোনো রকমে পালিয়ে এলুম। ভাইটি রাস্তায় শীতে জমে মারা গেল।'
'বাবা মাকে কি অপরাধে মারা হল?'
'বাবা একটা কসাক রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন। লড়াইয়ের আগে একবার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর রেজিমেন্টের সংঘর্ষ হয়েছিল। তাঁর অদৃষ্টে কি আছে তিনি আগেই জানতেন। মনকে তৈরি করেই রেখেছিলেন। মা'র কথা অবিশ্যি আলাদা।'
কথা বলতে-বলতে ও যে-হোটেলে কাজ করে আমরা সেখানে পৌছে গেলুম। একটা বুইক্‌ গাড়ি থেকে জাঁদরেল গোছের এক ভদ্রমহিলা ওকে দেখে সাগ্রহে ছুটে এল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, একটু মুটিয়ে গেছে, পোশাকে রীতিমতো পারিপাট্য। দেখলে মনে হয় জীবনে কোনো কালে এদের ভাবনা-চিন্তা করতে হয়নি। অবুলফ বলল, 'মাপ করবেন, জরুরী কাজে—' ঝুঁকে পড়ে ভদ্রমহিলার হাতখানি নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল।

বার্‌-এ গিয়ে দেখি ভ্যালেন্‌টিন্‌, কোষ্টার আর ফার্ডিনাণ্ড গ্রাউ বসে আছে। একটু পরে লেন্‌ত্‌সও এসে জুটল। আমি এসেই আধ বোতল রাম্‌-এর অর্ডার দিলুম। মনটা তখনো দমে আছে।
ভীমাকৃতি ফার্ডিনাণ্ড তার ফোলা-ফোলা গাল আর নীলচে চোখ নিয়ে এক কোণে বসে আছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে পান করে সে রীতিমতো চুর হয়ে বসে আছে। আমার কাঁধে এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলল, 'কিহে বব্‌ ভায়া, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?'

বললুম, 'কিছুই নয়, সেই হয়েছে মুশকিল!'

'কিছুই নয়? আরে সেইটেই অনেক কিছু। কিছু-নার থেকেই দুনিয়ার সব কিছু।'

লেনৎস চেঁচিয়ে উঠল, 'অহো, সাধু! সাধু! একেবারে একটা নতুন কথা বলেছ!'

ফার্ডিনাণ্ড লেনৎস-এর দিকে ফিরে বলল, 'চুপ কর, গট্‌ফ্রিড্। তোমরা রোম্যান্টিকেরা দুনিয়াতে কেবল গঙ্গাফড়িঙের মতো লাফিয়ে বেড়াও। ঐ লাফানিতেই তোমাদের যা কিছু রোমাঞ্চ। তোমাদের মতো মগজহীনেরা কিছু-নার মর্ম কেমন করে বুঝবে!'

লেনৎস বলল, 'থাক, মগজ ভারি করবার শখ আমার নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা কিছু-না নিয়ে অত মাথা ঘামায় না।'

গ্রাউ ওর দিকে কটমট করে তাকাল। গট্‌ফ্রিড্ গ্লাশ তুলে বলল, 'আপাতত তোমার স্বাস্থ্য পান করা যাক্।'

ফার্ডিনাণ্ডও গ্লাশ তুলে বলল, 'তথাস্তু।' সবাই একসঙ্গে গ্লাশ নিঃশেষ করলুম। ফার্ডিনাণ্ড গ্লাশ দেখিয়ে ফ্রেড্‌কে ইশারা করল। ফ্রেড্ আর একটি বোতল নিয়ে এল।

প্রচুর রাম্ খেয়ে মনে হচ্ছে মাথায় কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। আস্তে উঠে গিয়ে ফ্রেড্-এর আপিস-ঘরে ঢুকলুম। ফ্রেড্ ঘুমোচ্ছিল। ওকে জাগিয়ে স্যানাটোরিয়মে একটা ট্রাঙ্ক-কল করে দিলুম।

ফ্রেড্ বলল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। রাত্তির বেলায় খুব তাড়াতাড়ি জবাব পাওয়া যায়।'

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই টেলিফোন বেজে উঠল। স্যানাটোরিয়ম থেকে কথা বলছে। বললুম, 'আমি ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান্-এর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'দাঁড়ান, আমি ও-ওয়ার্ডে কনেক্‌শন দিয়ে দিচ্ছি।'

নার্স এসে ফোন ধরল। 'ফ্রাউলিন্ হোল্‌ম্যান ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'ওঁর ঘরে টেলিফোন নেই?'

'না।'

'ওঁকে একটু জাগাতে পারেন?'

নার্স ইতস্তত করে বলল, 'না, ওঁকে আজ জাগানো ভালো হবে না।'

'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, হয়নি কিছু, তবে এখন কয়েকটা দিন একেবারে শুয়ে কাটাতে হবে।'

'ঠিক বলছেন তো, কিচ্ছু হয়নি ?'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। প্রথম ক'দিন সবাইকেই ঐ করতে হয়, বিছানায় থেকে থেকেই জায়গাটাকে সইয়ে নিতে হবে।'

রিসিভার রেখে দিলুম, মিছিমিছি রিং না করলেই হত। ফিরে গিয়ে আবার গ্লাশ ভর্তি করে বসলুম।

রাত দুটোয় আড্ডা ভাঙল। লেন্‌ত্‌স ট্যাক্সি নিয়ে ভ্যালেন্‌টিন আর ফার্ডিনাণ্ডকে পৌঁছতে গেল। কোষ্টার কার্লের এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে আমাকে বলল, 'তুমি এস আমার সঙ্গে।'

বললুম, 'এইটুকু তো পথ, হেঁটেই যেতে পারব।'

অটো বলল, 'উঁহুঁ, ভাবছি একটু বেড়াব।'

'বেশ' বলে উঠে বসলুম।

কোষ্টার বলল, 'তুমিই ড্রাইভ কর।'

'পাগল হয়েছ! আমার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে, মাথার ঠিক নেই।'

'তাতে কি, ড্রাইভ কর না। কিছু হলে আমি দায়ী থাকব।'

'বেশ তবে তাই।' এঞ্জিন গর্জন করে উঠল। ষ্টিয়ারিং হুইল ধরতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছে। রাস্তাটা কেবলি উঁচু-নিচু মনে হচ্ছে, দুধারের বাড়িগুলো যেন দুলছে আর ল্যাম্পপোস্টগুলো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'না, অটো, আমার দ্বারা হবে না, এক্ষুনি কিছুতে ধাক্কা মেরে বসব।'

অটো বলল, 'লাগুক না ধাক্কা।'

ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। নির্বিকার মুখ, কিন্তু খুব সজাগ দৃষ্টিতে সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। সিটে ঠেসান দিয়ে নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসলুম। দাঁত মুখ খিঁচে প্রাণপণে ষ্টিয়ারিং হুইলটাকে চেপে ধরে আছি। ক্রমে রাস্তাটা যেন আগের চাইতে একটু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জিগগেস করলুম, 'কোন দিকে যাবে, অটো ?'

'একদম সোজা, শহর ছাড়িয়ে।'

শহরের বাইরে বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। হেডলাইটের আলো কংক্রিটের রাস্তার উপরে দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে। একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন আমাকে এসে বিঁধছে। হাওয়ার ঝাপটা বিষম জোরে এসে লাগছে। আকাশ মেঘে ছাওয়া, মেঘগুলো নিচু হয়ে মাথার উপরে নেমে এসেছে। আমার

চোখের দৃষ্টি ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসছে। এঞ্জিনের গর্জনে দেহ অমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আর সিলিণ্ডারের ভটাভট শব্দে মস্তিষ্কের নির্জীব কোষগুলি ক্রমে সজাগ হয়ে উঠছে। গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়িটা তীরবেগে ছুটে চলেছে।

কোষ্টার বলল, 'আরো জোরে।'

গাছপালা, টেলিগ্রাফপোস্ট, এক-আধটা গ্রাম রাস্তার দুপাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল। মাথাটা এখন বিলকুল পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অটো বলল, 'আর একটু জোরে।'

'সামলাতে পারব তো? রাস্তা ভিজে।'

'খুব পারবে।'

এঞ্জিন দ্বিগুণ বেগে গর্জন করে উঠল। বাতাসের ঝাপটা এমন জোরে এসে চোখে মুখে লাগছে, উইণ্ডস্ক্রিনের পিছনে কোনো রকমে মুখ গুঁজে রাখতে হচ্ছে। এখন আমার বোধশক্তি প্রায় লুপ্ত, গাড়ির সঙ্গে আমার শরীর এক হয়ে মিশে গেছে। গাড়ির গতিটা আমার দেহের রক্তে বিদ্যুৎতরঙ্গ তুলছে।

ষ্টিয়ারিং হুইল বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছি। একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ পিছন দিকে পিছলে এল। কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে গাড়ির দম আরো বাড়িয়ে দিলুম। গাড়িটা মুহূর্তমধ্যে টাল সামলে উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলল।

কোষ্টার বলে উঠল, 'চমৎকার।'

বললুম, 'ভিজে পাতায় পিছলে গিয়েছিল। কত বড় বিপদ কেটে গেছে বেশ বুঝতে পারছি।'

কোষ্টার মাথা নেড়ে বলল, 'এই সময়টাতে বনের পথে গাড়ি চালাবার এই এক মস্ত বিপদ।' সিগারেট বের করে বলল, 'তোমাকে দেব?'

'হ্যাঁ, দাও।' গাড়ির স্পীড্ কমিয়ে দুজনে সিগারেট ধরালুম।

কোষ্টার বলল, 'চল, এবার ফেরা যাক্।'

শহরে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেই আটোকে বললুম, 'তোমার সঙ্গে গিয়ে ভালোই করেছি, অটো। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।'

অটো বলল, 'এর পরের বার তোমাকে আর একটা কায়দা শিখিয়ে দেব। সেটা অবিশ্যি ভিজে রাস্তায় চলবে না।'

'বেশ, কথা রইল। গুড্ নাইট, অটো।'

'গুড্ নাইট, বব্।'

বাড়ি ফিরে এলুম। শরীর খুব ক্লান্ত, কিন্তু মনটা খুব হাল্কা লাগছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নভেম্বরের গোড়াতেই আমাদের সিত্রয়া গাড়িটা বিক্রি করে দিলুম। কিছুদিন তো ঐ টাকাতেই কারখানা চলল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই অবস্থা আবার সঙিন হয়ে উঠল। শীত শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে লোক পেট্রল আর ট্যাক্স বাঁচাবার জন্য গাড়ি তুলে রেখেছে। মেরামতের কাজ একরকম নেই বললেই চলে। ট্যাক্সিটাই এখন প্রধান ভরসা, কিন্তু তাতেও রোজগার এত যৎসামান্য যে তিনজনের তাতে পোষায় না। ঠিক এই সময়টাতে 'ইন্টারন্যাশানাল' হোটেলের মালিক যখন আমাকে পিয়ানো বাজিয়ের কাজে আবার ডেকে পাঠাল তখন মনে মনে বর্তে গেলুম। ইদানিং ওর ব্যবসা ভালো চলছিল। গরু ব্যবসায়ীদের এ্যাসোসিয়েসন থেকে পিছনের একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে এখানটায় ওদের বৈঠক বসে। এদের দেখাদেখি ঘোড়ার ব্যবসায়ীরাও একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। সম্প্রতি কোথাকার এক সৎকার-সমিতি আর একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তাদের আপিস খুলেছে। আমার পক্ষে সব দিক দিয়েই ভালো হল। বিনা কাজে সন্ধ্যাবেলাটা যেন কাটতে চাইত না। এখন একটা হিল্লে হয়ে গেল। প্যাট্ এর চিঠি নিয়মমতোই পাচ্ছি। কিন্তু চিঠির দৌত্যে ব্যবধান ঘোচে না। বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসে কোনো-কোনো দিন যখন দুপুর বেলাতেও দিনের আলো দেখা দেয় না, তখন প্যাট্-এর কথা নিতান্তই অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে। যেন কতকাল আগে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই, কোনোকালে যে আবার ফিরে আসবে সে কথা ভাবাই যায় না। আর অব্যক্ত বেদনায় ভরা দীর্ঘ রজনী যখন আর কাটতে চায় না তখন দেহজীবিনীদের সঙ্গে বসে-বসে রাতভর মদ খাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। ক্রিসমাস-ইভ্-এ 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর মালিক হোটেল খোলা রাখবার অনুমতি পেয়েছে। পর্ব উপলক্ষে মস্ত বড় এক পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে। গরু ব্যবসায়ীদের

প্রেসিডেণ্ট ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ দুটো শুয়োর উপহার দিয়েছেন। ভদ্রলোক দরাজ দিলদার, পর্ব উপলক্ষে লোকজন নিয়ে একটু হৈচৈ করতে ভালোবাসেন।
বার্-এর কাছে ঘটা করে ক্রিসমাস-গাছ পোঁতা হয়েছে। রোজা, ম্যারিয়ন আর কিকি তিনজনে মিলে গাছ সাজাবার ভার নিয়েছিল। সেই দুপুরবেলা থেকে শুরু করে গাছটা বাস্তবিকই খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। আমি বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে দেখি অন্ধকার হয়ে গেছে। জেগে উঠে প্রথমটায় বুঝতেই পারছিলুম না—সকাল না সন্ধ্যে। কি যেন স্বপ্ন দেখছিলুম, কিন্তু স্বপ্নটা ঠিক মনে করতে পারছিনে। তখনো স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি, হঠাৎ শুনি কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। 'কে ?'
'এই আমি, হের্ লোকাম্প।'
এ যে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির গলা। ডেকে বললুম, 'আসুন দরজা খোলাই রয়েছে।'
ফ্রাউ জালেওয়াস্কি দরজায় মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'শিগগির একবার আসুন। ফ্রাউ হেসি এসেছেন। আমি ওঁকে কিছু বলতে-টলতে পারব না।'
বিছানায় শুয়ে-শুয়েই বললুম, 'ওঁকে পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দিন।'
ফ্রাউ জালেওয়াস্কি অনুনয় করে বলল, 'হের্ লোকাম্প, আপনি না এলে হবে না। বাড়িতে আর কেউ নেই।'
ও দরজা ছেড়ে নড়বে না। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আচ্ছা চলুন, আমি আসছি।'
কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে এলুম। ফ্রাউ জালেওয়াস্কি দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। জিগগেস করলুম, 'উনি এখনো কিছু জানেন না ? কোথায় উনি ?'
'ওঁদের সেই পুরোনো ঘরেই গিয়ে বসেছেন।'
ফ্রিডা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ভারি ব্যস্ত-সমস্তভাব। চাপা গলায় বলল, 'দেখুন গে, মাথায় কেমন চটকদার টুপি, তার উপরে আবার হীরের ব্রোচ।'
ফ্রাউ জালেওয়াস্কিকে বললুম, 'এ ফাজিলটাকে এদিকে ঘেঁষতে দেবেন না তো।' বলে হেসির ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।
ফ্রাউ হেসি জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমি ঢুকতেই ফিরে তাকাল। বেশ বোঝা যাচ্ছে আর কাউকে আশা করেছিল, আমাকে নয়। যদিচ ইচ্ছে ছিল না তবু আমার নজরটা প্রথমেই গিয়ে পড়ল ওর টুপি আর ব্রোচের উপরে। ফ্রিডা ঠিকই বলেছে, টুপিটা বেশ চটকদার। খুব ঘটা করে সেজেগুজে এসেছে, সর্বাঙ্গে যত্নকৃত প্রসাধনের ছাপ। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। বলতে চায়, দেখ না, আগের চাইতে

ঢের ভালো আছি। আসলেও ভালোই দেখাচ্ছে। আগের চাইতে ভালো আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'হেসি বুঝি আজ ক্রিস্‌মাস-ইভেও আপিস করতে গেছে?' গলার স্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে।

বললুম, 'না।'

'কোথায় তাহলে? ছুটিতে কোথাও গেছে নাকি?' কোমর দুলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। সুগন্ধে ঘর আমোদ করছে। জিগগেস করলুম, 'ওঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?'

'আমি এসেছি আমার জিনিসপত্তর নিতে। এর কিছু-কিছু জিনিস তো আমার। তার একটা হিসেব-নিকেশ দরকার।'

বললুম, 'হিসেব-নিকেশ আর করতে হবে না। এ সবই এখন আপনার।'

ফ্রাউ হেসি আমার দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

বললুম, 'উনি মারা গেছেন।'

ঠিক এভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি। আস্তে-আস্তে ওকে তৈরি করে বললে হত। কিন্তু কথাটা কি ভাবে পাড়ব তাই ভেবে পাচ্ছিলুম না। তাছাড়া অবেলায় ঘুমিয়ে মন মেজাজ অমনিতেই বিগড়ে ছিল। একবার ভয় হল হঠাৎ না ভির্মি খেয়ে পড়ে যায়। যাক পড়ে-টড়ে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধায়নি। শুধু হাবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। একবার শুধু বলল, 'এঁ্যা—তাই।'

চটকদার টুপির পালকগুলো একটু কেঁপে-কেঁপে উঠল। চোখের সামনে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম। রঙ-রুজ-গন্ধ-মাখা সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা দেখতে-দেখতে বয়সের ভারে নুয়ে পড়ল। কি দ্রুত পরিবর্তন—প্রতি নিমেষে যেন একটি করে বছর বেড়ে যাচ্ছে। এক ফুৎকারে সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিবে গেছে, মুখে বলিরেখা দেখা দিয়েছে। কোনো রকমে টলতে-টলতে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। এ যেন আর সে লোকই নয়, তার প্রেতাত্মা।

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে জিগগেস করল, 'কী হয়েছিল ওঁর?'

'বিশেষ কিছুই না, একরকম হঠাৎ মারা গেলেন।'

আমার কথা বোধ করি শুনলই না। আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'এখন আমার কি হবে? কী করব?'

প্রথমটায় কোনো জবাবই দিলুম না, মনটা বিস্বাদ লাগছে। শেষটায় বললুম,

'কেন, এমন লোক কেউ না কেউ নিশ্চয় আছে যার কাছে অনায়াসে যেতে পারেন। বিশেষ করে এখানে থাকার আর প্রশ্নই ওঠে না—'
ও আগের মতোই আপনমনে বলে যেতে লাগল, 'তাই তো, এখন কী করি?'
'যাবার মতো লোক নিশ্চয় আছে—তার কাছেই যান। ক্রিস্‌মাসের পরে একবার থানায় যাবেন। জিনিসপত্তর ওখানেই আছে। ব্যাঙ্কের হিসেবও ওখানে পাবেন। টাকাটা তুলতে হলে পুলিসের মারফত যেতে হবে।'
'টাকা? টাকা আবার কোথায়?'
'বেশ কিছু টাকা আছে—কমসে কম বারোশো মার্ক।'
মাথা তুলে এতক্ষণে আমার দিকে তাকাল। ঠিক পাগলের মতো তাকাচ্ছে আর বলছে, 'না, ও হতেই পারে না।'
আমি চুপ করে আছি।
ও অনুনয়ের সুরে বলছে, 'সে কি সম্ভব, আপনি বলুন।'
'কেমন করে বলব? হয়তো কষ্টেসৃষ্টে কিছু-কিছু জমাচ্ছিলেন, বিপদে-আপদে দরকার হবে বলে।'
ফ্রাউ হেসি উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর হাবভাব বদলে গেছে। দু-পা এগিয়ে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁত-মুখ খিঁচে বলল, 'হুঁ বুঝেছি, হতেও পারে। হতভাগা মিনসে, আমাকে এত কষ্টে এত অভাবে রেখেছে আর টাকা জমিয়েছে। বেশ, ও টাকা নিয়ে আমি এক রাত্তিরে উড়িয়ে দেব, ঐ রাস্তায় বসে ওড়াব, একটি পয়সা রাখব না, একটা কানাকড়িও না।'
আমি আর কথার জবাব দিলুম না। ঢের হয়েছে। প্রথম ধাক্কাটা ও সামলে নিয়েছে। হেসি যে মরেছে সেটা ও বুঝেছে। ব্যস্, এখন যা করবার তুমি গিয়ে কর। অবিশ্যি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে জানলে আর এক দফা চেঁচামেচি করবে। তা করুক। তোমার চেঁচামেচিতে তো হেসি আর ফিরে আসবে না।
কি মুশকিল, ও আবার কাঁদতে শুরু করেছে। একেবারে ছেলেমানুষের মতো অঝোরে কাঁদছে। কেঁদেই চলেছে। ভারি অস্বস্তি লাগছে। কান্নাকাটি আমি একেবারে সইতে পারিনে। নাঃ, একটা সিগারেট না খেলে আর চলছে না।
অনেকক্ষণ বাদে কান্না থামল। চোখ মুখ মুছে নিতান্ত অভ্যাস-মাফিক পাউডার-বক্স বের করে মুখে পাউডার মেখে নিল। ভাঙা গলায় বলল, 'কি জানি কিছু বুঝি না। হয়তো ও ভালো ভেবেই করেছিল। স্বামী হিসেবে বোধ করি ও খারাপ ছিল না।'

'আমি তো তাই মনে করি।' ওকে পুলিসের ঠিকানা দিয়ে বললুম, 'আজকে বোধ করি ওদের আপিস বন্ধ।' ভাবলুম ওকে এক্ষুনি ওখানে না পাঠানোই ভালো। আজকে অমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে।

ও চলে যেতেই ফ্রাউ জালেওয়াস্কি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমি চটেমটে বললুম, 'আমি ছাড়া বুঝি বাড়িতে আর লোক ছিল না।'

'একমাত্র হের জর্জ—তা ফ্রাউ হেসি কী বললেন?'

'কিছুই না, কী আর বলবে?'

'তবু ভালো। যাই বলুন ওর প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই।'

বললুম, 'সহানুভূতি দিয়ে ওরই বা কি লাভ হবে।' যাক্ ফ্রাউ জালেওয়াস্কির সঙ্গে এই নিয়ে আর আলোচনা করতে ভালো লাগছিল না। জিগগেস করলুম, 'কটা বাজে বলুন দিকিনি।'

'পৌনে-সাতটা।'

'সাতটার সময় আমি ফ্রাউলিন্ হোল্ম্যানকে একবার ফোন করতে চাই। কিন্তু কেউ যেন শুনতে না পায়, সেটা সম্ভব কিনা দেখুন তো।'

'বললুম তো, হের্ জর্জ ছাড়া আর কেউ বাড়িতে নেই। ফ্রিডাকে বাইরে পাঠিয়েছি কাজে। চান তো রান্নাঘরে বসেও কথা বলতে পারেন, টেলিফোনের কর্ডটা ওখান অবধি পৌছায়।'

'বেশ, সেই ভালো।'

জর্জ-এর দরজায় টোকা মারলুম। অনেকদিন ওর ঘরে আসিনি। টেবিলের ধারে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। চারিদিকে ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছড়ানো।

'নমস্কার, জর্জ,-বসে-বসে কী করছ?'

মৃদু হেসে বলল, 'হিসেব-নিকেশ করছি। ক্রিস্‌মাস কাটাবার পক্ষে অতি প্রশস্ত কাজ।' ঝুঁকে পড়ে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো তুলে নিলুম। কলেজের নোট বইয়ের পাতা—তাতে কেমিষ্ট্রির ফরমুলা লেখা।

'অনেক ভেবে দেখলুম, বব্, কিচ্ছু লাভ নেই।'

মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। জিগগেস করলুম, 'আজ কী খেয়েছ?'

'তা দিয়ে কি হবে? না, খাবার কথা ভাবছিনে। আসল কথা, এ আর চলছে না ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

'অবস্থা এতই খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাই।'

বললুম, 'জর্জ, আমার কথা একবার ভেবে দেখ। আমার মনে কি আর কোনো উচ্চাশা ছিল না? কাফে 'ইন্‌টারন্যাশনাল্'-এ বসে বেশ্যাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাব, এইটেই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল?'
জর্জ মুখ নিচু করে বলল, 'বুঝতে পারছি, বব্, কিন্তু তাতে কোনো সান্ত্বনা নেই। আমি জীবনে আর কিছু চাইনি, কিন্তু এখন দেখছি, ও হবার নয়। জীবনে কিছুই হল না। এই ভাবে বেঁচে থাকার কি মানে তাই বল।'
ওর কথা শুনে হাসি পেয়ে গেল। জীবনটাকে এমন কঠিন দৃষ্টিতে দেখছে বলেই জীবনের সুখ শান্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। বললুম, 'তুমি একটি গর্দভ, এই সোজা কথাটা এ্যাদ্দিনে তুমি বুঝলে? আর তুমি ভাবছ তুমি একলাই বুঝেছ। আর ভাই, সবারই এই এক দশা। এই দুর্দিনে কারো জীবনেই কোনো আশা পূর্ণ হবে না। যাক্, এখন এক কাজ কর। জামা-কাপড় পরে নাও। আমার সঙ্গে কাফে ইন্‌টারন্যাশানাল্-এ যাবে। তুমি এতদিনে সাবালক হয়েছ দেখছি, আজ তারই উৎসব হবে। এ্যাদ্দিন তো পাঠশালার পড়ুয়ার মতো নেহাত নাবালক ছিলে। আচ্ছা, আমি আধ-ঘণ্টাটাক পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'
ও একবার আপত্তি করল। আমি বললুম, 'উঁহুঁ, তোমাকে যেতেই হবে, এ আমার অনুরোধ! আজকের রাতটা আমি সঙ্গী ছাড়া কাটাতে চাইনে।'
জর্জ অগত্যা রাজী হয়ে বলল, 'আচ্ছা তবে—কি আর ক্ষতি হবে, এখন আর কিছুতেই যায় আসে না।'
বললুম, 'ব্যস্, এই তো ঠিক কথা বলেছ।'

সাতটার সময় টেলিফোনে প্যাট্‌কে ডাকলুম। সাতটার পরে টেলিফোনের চার্জ অর্ধেক, কাজেই ইচ্ছে করলে ঐ পয়সাতে দ্বিগুণ সময় কথা বলতে পারি। হল্-এ বসেই টেলিফোন করলুম। রান্নাঘরে আর যাইনি। ওখানটায় পেঁয়াজ রসুন আর ফরাসি সসের যা উগ্র গন্ধ, তার ভিতর প্যাট্‌কে টেনে আনতে ইচ্ছে করছিল না। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবার পর জবাব এল। প্যাট্-এর খোঁজ করতেই ও এসে রিসিভার ধরল। অতি পরিচিত গলার স্বরটা কানের কাছে বেজে উঠতেই আমার সমস্ত শরীরে কি যে উত্তেজনার সঞ্চার হল কি বলব। বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সে চাঞ্চল্য কিছুতেই চেপে রাখতে পারিনে। বললুম, 'প্যাট্, সত্যি সত্যি তুমি?'
প্যাট্ হেসে উঠল। 'কোত্থেকে কথা বলছ, বব্, আপিস থেকে নাকি?'

'না, ফ্রাউ জালেওয়াস্কির হল্-ঘরে বসে কথা বলছি। কেমন আছ ?'

'বেশ ভালো।'

'বিছানায় শুয়েই কথা বলছ নাকি, না উঠেছ ?'

'হ্যাঁ, জানালার ধারটিতে বসে আছি। কী পরেছি জানো ? আমার সেই শাদা রঙের ড্রেসিং-গাউনটা। বাইরে বরফ পড়ছে।'

ওকে যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। থোকা-থোকা তুষার থরে-থরে পড়ছে। আর ঐ তো ও বসে আছে, মাথাভরা সোনালী চুল, ঘাড়টি সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে। বললুম, 'কি আর বলব, প্যাট্, টাকাতেই সব মাটি করলে। নইলে এক্ষুনি এরোপ্লেনে চেপে বসতুম, এই রাত্তিরেই তোমার কাছে পৌঁছে যেতুম।'

'যা বলেছ—' হঠাৎ থেমে গিয়ে ও চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ডাকলুম, 'প্যাট্, কথা কইছ না কেন ? তুমি আছ তো ওখানটায় ?'

'আছি বব্, কিন্তু এসব কথা তুমি আর বোলো না। আমার মাথা ঝিম্ঝিম্ করছে।'

'আমারও মাথা ঝিম্ঝিম্ করছে। যাক্গে, এখন বল দেখি, ওখানে কেমন তোমার দিন কাটছে।'

প্যাট্ কথা বলতে শুরু করেছে ; কিন্তু ওর কথা আমি কিছুই শুনছি না। আমি শুধু ওর গলার স্বরটা শুনছি। অন্ধকার হল্-ঘরে টেবিলটার উপরে বসে আছি—হঠাৎ মনে হল দরজাটা খুলে গিয়ে গ্রীষ্মের ঈষৎতুষ্ণ হাওয়া আর অপর্যাপ্ত আলোতে সমস্ত ঘরটি ভরে গেছে। রূপে রসে স্বপ্নে সাধে মন আমার যৌবনরসে সিক্ত হয়ে উঠল। আমাদের এই জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গৃহকোণে এক মুহূর্তে কোথা থেকে গ্রীষ্ম তার সকল সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে—বাতাসের মৃদু শিহরণ, ঢেউ-খেলানো মাঠে সূর্যাস্তের রশ্মিচ্ছটা আর নির্জন বনপথে সবুজের আভা।

প্যাট্ এর কথা যখন শেষ হল তখন জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'প্যাট্, তোমার কথা শুনতে এত ভালো লাগছিল ! আজ রাত্তিরে ওখানে কি করছ ?'

'আজকে আমাদের ছোট-খাটো একটা পার্টি আছে। আটটায় শুরু হবার কথা। এক্ষুনি কাপড়-জামা পরে তৈরি হতে হবে।'

'কোন পোশাকটা পরছ ? সেই রুপোলী পোশাকটা তো ?'

'হ্যাঁ রব্বি। সেই মনে আছে—তুমি আমাকে কোলে করে প্যাসেজ পার হয়ে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে—সেদিনের সেই রুপোলী পোশাক।'

'কার সঙ্গে যাচ্ছ ?'

'কারো সঙ্গেই না। কারণ পার্টিটা আমাদের এই স্যানাটোরিয়মেই হবে। নিচের সেই হল্‌-ঘরটাতে। আমরা তো সবাই পরস্পরকে চিনি।'

'ঐ পোশাকটা পরলে আমার সঙ্গে মিথ্যাচারণ না করা খুব কঠিন, না ?'

প্যাট্ হেসে উঠল, 'জেনে রেখো, ঐ পোশাক পরে তোমার প্রতি মিথ্যাচরণ কখনো করব না। ওর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়ানো।'

'আমারও। তোমার ঐ পোশাক অপরের উপরে কতখানি ক্রিয়া করে সে তো আমি দেখেছি। যাক্, এই নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন করব না, তোমার ইচ্ছা হয় তো আমার প্রতি মিথ্যাচারণ কোরো, শুধু আমাকে না জানালেই হল। তারপরে ওখানকার পালা শেষ করে এখানে যখন ফিরে আসবে তখন আমিও কিছু বলব না, তুমিও কিছু বোলো না। কিছু যদি করেও থাক সব স্বপ্নর মতো মিথ্যে হয়ে যাবে। কারো মনে কোনো দাগ রাখবে না।'

খুব আস্তে গম্ভীর গলায় প্যাট্ বলল, 'কি যে বল বব্, তোমাকে আমি কি চোখে দেখেছি তুমি জানো না। তাহলে বুঝতে তোমার সঙ্গে মিথ্যাচরণ করা কতখানি অসম্ভব! এখানে আমরা কি ভাবে থাকি, তোমার ধারণা নেই। ছোট-খাটো চমৎকার একটি জেলখানা। ইচ্ছে মতো একটু আমোদ ফুর্তি করা যায়, এই যা তফাত। মাঝে-মাঝে যখন তোমার ঘরটির কথা মনে পড়ে যায় তখন আর মনকে বোঝাতে পারিনে। অস্থির লাগে, কখনো-কখনো চলে যাই স্টেশনের দিকে। গাড়ির যাওয়া-আসা দেখি—মনে মনে কল্পনা করি তুমি যেন আসছ, আমি তোমাকে নিতে স্টেশনে এসেছি। কখনো বা ভাবি এর একটা কামরায় উঠে বসলেই তোমার কাছে চলে যেতে পারি।'

আগে কোনোদিন ওকে এমনভাবে কথা বলতে শুনিনি।

বরাবর দেখে এসেছি ও ভয়ানক লাজুক। মনের গোপন কথাটি কখনো মুখের ভাষায় প্রকাশ করেনি। বড় জোর কোনো অলক্ষ্য ভঙ্গিতে কিম্বা নিমেষের চাহনিতে প্রকাশ করেছে। বললুম, 'প্যাট্, শিগগিরই একবার গিয়ে তোমাকে দেখে আসবার ব্যবস্থা করছি।'

'সত্যি বলছ, বব্ ?'

'হ্যাঁ, জানুয়ারীর শেষের দিকেই হয়তো যাব।'

অবিশ্যি মনে-মনে জানি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কারণ ফেব্রুয়ারি থেকে স্যানাটোরিয়মের টাকা যোগানোই মুশকিল হবে। তবু বলে দিলুম যাব,

বেচারী অন্তত আশায়-আশায় থাকতে পারবে। পরে না হয় এটা ওটা ওজর দেখিয়ে যাওয়াটা কেবলি পিছিয়ে দেব। তদ্দিনে ও নিজেই ফিরে আসবে। 'আচ্ছা প্যাট্, আজকের মতো বিদায় নিই। শরীরের যত্ন নিও। মনের আনন্দে থেকো। তুমি আনন্দে থাকলে আমিও আনন্দে থাকব।'

'হ্যাঁ, বব্, আমি তো আনন্দেই আছি।'

জর্জকে ধরে নিয়ে কাফে ইন্টারন্যাশনাল'-এর দিকে রওনা হলুম। বাপরে বাপ্, আমাদের সেই পুরোনো জঘন্য আস্তানাটাকে আর চেনাই যায় না। ক্রিস্‌মাস গাছে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আলো বার্ এর বোতল, গ্লাশ, নিকেলে, তামায় পড়ে ঝলমল-ঝলমল করছে। দেহজীবিনীর দল জমকালো সান্ধ্য পোশাক আর গিল্টি সোনার গয়না পরে টেবিল আলো করে বসেছে। ঠিক আটটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে গরু ব্যবসায়ীদের প্রেসিডেণ্ট—ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ তার ক্লাবের সভ্যবৃন্দকে নিয়ে প্রবেশ করল। গ্রিগোলিট্ ব্যাণ্ডমাস্টার-এর মতো হাত নেড়ে সুরের একটু মহড়া দিল, তারপরেই সভ্যবৃন্দ সমস্বরে গান জুড়ে দিল। 'পবিত্র রাত্রি, স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ…'

রোজার চোখে জল এসে গেল। চোখ মুছতে-মুছতে বলল, 'আহা, কি মধুর গান!'

গান শেষ হওয়ামাত্র করতালিধ্বনিতে হল্-ঘর মুখরিত হয়ে উঠল। গায়কবৃন্দ স্মিতহাস্যে নতমস্তকে শ্রোতাদের সাধুবাদ গ্রহণ করল। ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, 'বিঠোফেন কখনো পুরোনো হবার নয়।' ঘামে ভেজা রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এখন তবে আসল কাজে লাগা যাক।'

খাবার টেবিল পাতা হয়েছে বড় ক্লাব-ঘরটাতে। টেবিলের উপরে ছোট-ছোট স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলছে, প্রত্যেকটির উপর রুপোর ডিশে এক জোড়া করে আস্ত শুয়োর-ছানার রোষ্ট সাজানো। এলয়স্-এর পরনে মালিকের দেওয়া নতুন টেইলকোট। ডজনখানেক ঝারি এনে একে-একে গ্লাশ ভর্তি করতে লাগল। ওর সঙ্গে-সঙ্গে এল 'সৎকার সমিতি'র পটার। এসেই গুরুগম্ভীর চালে বলল, 'জগতে শান্তি হোক।' এই বলে রোজার পাশে গিয়ে বসল।

ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ নিজেই আমন্ত্রণ করে জর্জকে নিয়ে টেবিলে বসাল। তারপরে উঠে দাঁড়াল সমবেত নিমন্ত্রিতদের সম্বোধন করে কিছু বলবার জন্য। এর চাইতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা আর হতে পারে না। গ্রিগোলিট্ স্মিতহাস্যে একবার চতুর্দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, চকচকে জিন্‌-এর গ্লাশটি তুলে ধরে বলল, 'আপনাদের সকলের স্বাস্থ্য কামনা করছি।' বলেই বসে পড়ল। ইতিমধ্যে এলয়স্‌ প্রচুর আলুসিদ্ধ, বাঁধাকপির আচার, আর ভাজা মাংস নিয়ে এল। হোটেলওয়ালা স্বয়ং বড়-বড় গ্লাশভর্তি বিয়ার এনে হাজির।

জর্জকে বললুম, 'একটু বুঝে-সুঝে খেয়ো, এসব চর্বিওয়ালা মাংস তোমার পেটে সহজে হজম হবে না। আস্তে-আস্তে সইয়ে নিতে হবে।'

জর্জ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছি এখানকার সব কিছুই আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হবে। এর কিছুর সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।'

বললুম, 'সে বেশি দিন লাগবে না। আর কিছুর সঙ্গে এর তুলনা কোরো না। ব্যস্‌, তাহলেই দেখবে দিব্যি সয়ে গেছে।'

মাথা নেড়ে ও আবার খাবার প্লেট-এ মনোনিবেশ করলে।

হাস্য কোলাহলে টেবিল মুখরিত। মাঝখানটায় ছোট-খাটো একটা ঝগড়া বেধে গেল। একদিকে সৎকার সমিতির পটার, আর একদিকে চুরুট ব্যবসায়ী বুশ্‌। পটার বুশ্‌কে বলছে একটু মদ খেয়ে খিদেটাকে শানিয়ে নিতে। বুশ্‌ সে কথা শুনবে না। সে পানীয় দিয়ে পেট ভরাতে রাজী নয়, আহার্য দিয়ে পেট ভরাবে। কথায়-কথায় দুজনেরই মেজাজ গরম হয়ে উঠছিল। গ্রিগোলিট্‌ থামিয়ে দিয়ে বলল, 'উঁহুঁ, ক্রিস্‌মাস ইভ্‌-এ ঝগড়াঝাঁটি চলবে না।' উভয় পক্ষের কথা শুনে পাকা জজসাহেবের মতো রায় দিল যে ঝগড়া না করে ব্যাপারটা কার্যত প্রমাণিত হোক। দুজনকেই প্লেট ভর্তি করে প্রচুর পরিমাণে মাংস আর আলুসিদ্ধ দেওয়া হল। পটার তৎসঙ্গে যত ইচ্ছে পানীয় গ্রহণ করতে পারে। বুশ্‌ শুধু নিষ্পানীয় আহার্য গ্রহণ করবে। অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা উৎসাহ পেয়ে এ ওর পক্ষ হয়ে বাজি পর্যন্ত ধরতে লাগল। ব্যাপারটা বেশ জমে উঠল। পটার-এর চারদিকে বহুতর বিয়ারের গ্লাশ জমে গেছে আর বুশ্‌ কোনো দিকে না তাকিয়ে মুখ গুঁজে প্রাণপণে খেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ জর্জ বলল, 'আমার শরীরটা কেমন যেন করছে।'

ওকে বললুম, 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস।' ওকে নিয়ে বাথ্‌রুমটা দেখিয়ে দিলুম।

আমি ততক্ষণ বাইরের ঘরে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। বসে আছি— ওদিকে মোমবাতির গন্ধ আর পোড়া পাইন-কাঁটার গন্ধ মিশে সমস্ত বাড়িটা সুগন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হল এ যেন অত্যন্ত পরিচিত

প্রিয়জনের দেহ-সুরভি, যেন কার পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছি আর ঐ যে কার দুটি চোখ—দূর ছাই—লাফিয়ে উঠে পড়লুম—এ আমার হয়েছে কি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?
ঠিক সেই মুহূর্তে খাবারঘরে এক বিরাট উল্লাসধ্বনি উঠল। 'ব্রাভো পটার!' সৎকার সমিতিই তাহলে জিতেছে।

পিছনের ঘরে তখন ধূমপান এবং কনিয়াক্ পরিবেশন চলছে। আমি বার-কাউণ্টারের কাছে বসে আছি। মেয়েরা একে-একে ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগল।
জিগগেস করলুম, 'কী ব্যাপার?'
মারিয়ন্ বলল, 'এখন আমাদের উপহার নেবার পালা।'
'তাই নাকি?' বলে কাউণ্টারে হেলান দিয়ে যেমন বসেছিলুম তেমনি বসে-বসে আপনমনে ভাবতে লাগলুম—প্যাট্ এখন কি করছে কে জানে? স্যানাটোরিয়মের হল্‌টা কল্পনার চোখে ঠিক দেখতে পাচ্ছি। মাঝখানে অগ্নিস্থলী। প্যাট্ বসেছে জানালার ধারে একটি টেবিলে। সঙ্গে হেল্‌গা গুট্‌ম্যান্, হয়তো আরো দু-চারজন, তারা আমার অপরিচিত। কিন্তু ভাবলে কি হবে, মনে হয় দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কতদিন ভেবেছি একদিন হঠাৎ জেগে উঠে দেখব সব ভাবনার অবসান হয়ে গেছে। বিগত দিনের বিস্মৃত ঘটনার মতো সব দুর্ভাবনা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।
একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। মেয়েরা সবাই প্রাণপণে ছুটল বিলিয়ার্ড-রুমের দিকে। রোজা ওখানে দাঁড়িয়ে আমাকেও ইশারা করে ডাকছে।
ক্রিস্‌মাস গাছের নিচে বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরে সারি-সারি প্লেট সাজানো। প্রত্যেক প্লেটে নাম লেখা একটি স্লিপ, তার তলায় মোড়কে বাঁধা উপহার। মেয়েরা একে অন্যকে এসব উপহার দিয়েছে। রোজা নিজ হাতে সব সাজিয়ে রেখেছে। কে কি পেয়েছে তাই দেখবার জন্য ছেলেমানুষের মতো উদ্‌গ্রীব। ছুটে একজন আর একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে।
রোজা বলল, 'তোমার প্লেটটা এসে দেখবে না?'
'কিসের প্লেট?'
'তোমার। তোমাকেও যে আমরা উপহার দিয়েছি।'
তাই তো, সত্যি-সত্যি একটা প্লেটের উপরে লাল-কালো আখরে আমারই নাম

লেখা রয়েছে। আপেল, বাদাম, কমলালেবু—রোজা দিয়েছে একটি পুল-ওভার, নিজের হাতে বোনা, হোটেলওয়ালার স্ত্রী দিয়েছে সবুজ রঙের একটি টাই, কিকির দেওয়া এক জোড়া সিল্কের মোজা, সুন্দরী ওয়ালী দিয়েছে চামড়ার একটা বেল্ট, ওয়েটার এলয়স্ দিয়েছে আধ বোতল রাম্। মারিয়ন্, লীনা আর মিমি তিনজনে মিলে আধ ডজন রুমাল আর হোটেলওয়ালা নিজে দিয়েছে দু-বোতল কনিয়াক্।

বললুম, 'সে কি! আমি তো এসব ভাবতেই পারিনি।'

রোজা বলল, 'কেমন, তোমাকে অবাক করে দিলুম তো?'

অবাক বলে অবাক! সত্যি আমি বিস্ময়ে হতবাক। এদের এই স্নেহের স্পর্শটুকু মনকে কতখানি যে নাড়া দিয়েছে কি বলব। ওদের বললুম, 'ক্রিস্মাস-এর উপহার সেই কবে পেয়েছি ভালো করে মনেও পড়ে না। লড়াইয়ের আগে ছাড়া পরে তো নয়ই। কিন্তু ভাই, তোমাদের দিতে পারি এমন তো আমার কিছু নেই।' আমাকে যে ওরা এতখানি অবাক করে দিয়েছে তাইতেই ওদের মহা উল্লাস। লীনা একটু হেসে মুখ লাল করে বলল, 'তুমি আমাদের বাজনা বাজিয়ে শোনাও, তোমাকে দেব না তো কাকে দেব।' রোজা বলল, 'হ্যাঁ, আজকেও কিছু একটা বাজিয়ে শোনাও, সেটাই হবে তোমার উপহার।'

'বেশ, কী বাজাব, বল।'

মারিয়ন্ বলল, 'ছেলেবেলার কোনো গান।'

কিকি বলল, 'না, না, ওসব নয়, হালকা সুরের একটা ফুর্তির গান গাও।'

সবাই মিলে ওর কথা উড়িয়েই দিল। ওরা ওকে কখনো বড় একটা আমল দেয় না। আমি পিয়ানোয় গিয়ে বসলুম—আমার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে গান ধরল—'এমন দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—'

হোটেলওয়ালার স্ত্রী উঠে গিয়ে ইলেকট্রিক আলোগুলি নিবিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে শুধু মোমবাতির মৃদু আলো। বিয়ার ট্যাপ্-এর ঝরঝরানি শব্দ, বনপথে ঝরনার অস্ফুট কলকল শব্দের মতো শোনাচ্ছে। এলয়স্ খোঁড়া পা নিয়ে আধ-অন্ধকারে এদিক ওদিক আনাগোনা করছে—বনদেবতা প্যানের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চরণে। হাস্যমুখী মেয়ের দল পিয়ানো ঘিরে দাঁড়িয়ে গান করছে। আরে, ওখানটায় ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ্ করে কাঁদতে শুরু করছে কে? দেখ না, কেন—কিকি। আশ্চর্য, কিকি কাঁদছে।

আস্তে-আস্তে দরজা খুলে ক্লাব-ঘর থেকে পুরো দলটি এসে ঘরে ঢুকল। মৃদু গুঞ্জনে

তারাও গান ধরেছে। তালে-তালে পা ফেলে সার বেঁধে মেয়েদের পিছনে এসে দাঁড়াল। গ্রিগোলিট্ লম্বা একটা ব্রেজিলিয়ান চুরুট নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছে।

বিদায় নিয়ে গেনু যবে—ঘর ছিল মোর পূর্ণ,
ফিরে এসে দেখি ঘরে—আঁধার ঘর শূন্য…

ধীরে ধীরে গানের রেশ মিলিয়ে গেল। লীনা বলল, 'চমৎকার!' রোজা গিয়ে নতুন মোমবাতি জেলে দিল। ছর্‌ছর্‌ শব্দ করে মোমের ফোঁটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বলল, 'এবার একটা হাল্কা সুরের গান হোক্। কিকি বেচারার মন খারাপ হয়ে গেছে। ওকে একটু চাঙ্গা করা দরকার।'
ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ বলল, 'আমারও ভাই সেই দশা।'
রাত প্রায় এগারোটা, কোষ্টার আর লেন্‌ত্‌স এসে হাজির। জর্জকে নিয়ে বার্‌-এর কাছে একটা টেবিলে বসলুম। জর্জ বেচারীর মুখ শুকনো, অসুস্থ দেখাচ্ছে। লেন্‌ত্‌স ওর জন্যে দু-টুকরো শুকনো রুটির ব্যবস্থা করল। একটু বাদেই হৈরৈ হট্টগোলের মধ্যে লেন্‌ত্‌স কোথায় যে অদৃশ্য হল আর তার পাত্তা নেই। মিনিট পনেরো পরে দেখা গেল গ্রিগোলিট্ আর লেন্‌ত্‌স হাত ধরাধরি করে বার্‌-এ ঢুকছে। এরই মধ্যে দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।
গ্রিগোলিট্ বলল, 'ষ্টিফান।' লেন্‌ত্‌স বলল, 'গট্‌ফ্রিড্।' বলেই দুজনে একসঙ্গে কনিয়াক্-এর গ্লাশ নিঃশেষ করে দিল।
'দাঁড়াও, তোমার জন্যে কালকে লিভার সসেজ্ পাঠিয়ে দিচ্ছি, গট্‌ফ্রিড্। তোমার পছন্দ তো?'
লেন্‌ত্‌স গ্রিগোলিট্-এর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'পছন্দ নয় আবার!'
ষ্টিফান খুশিতে গদগদ। বলল, 'তোমার হাসিটি ভাই, চমৎকার। যারা মন খুলে হাসতে পারে তাদের আমার বড় ভালো লাগে। আমি নিজে পারি না কিনা, আমি বড় সহজে মুষড়ে পড়ি।'
লেনত্‌স বলল, 'আমিও তো তাই। সেজন্যেই তো জোর করে আরো বেশি হাসি। এই যে বব্, এদিকে এস, আমাদের সঙ্গে এসে এক গ্লাশ পান কর, আমরা সদা-হাসির ব্রত নিয়েছি।'
ওদের কাছে উঠে গেলুম। ষ্টিফান জর্জকে দেখিয়ে বলল, 'ও ছোকরার কি হয়েছে। অমন বেজার মুখ করে বসে আছে কেন!'

বললুম, 'ওকে খুশি করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বেচারার চাকরি নেই, চাকরি খুঁজছে।'

ষ্টিফান বলল, 'এ বাজারে চাকরি পাওয়া তো সহজ কথা নয়।'

'ও যে কোনো কাজ করতে রাজী আছে।'

ষ্টিফান গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে তো আজকাল সবাই রাজী।'

'মাসে পঁচাত্তর মার্ক হলেই ওর চলে যায়।'

'অসম্ভব, ওতে কারো চলে না।'

লেন্‌ত্‌স বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ঐ টাকাতেই চালিয়ে নেয়।'

গ্রিগোলিট্‌ বলল, 'গট্‌ফ্রিড্‌ ভায়া দেখছই তো, আমি হচ্ছি মদখোর মাতাল মানুষ। চাকরি-বাকরির ব্যাপার তো হাসি-খেলার ব্যাপার নয়। ও জিনিস আজকে দিয়ে কালকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যাকগে, ছোকরা যদি সত্যি ভালো ছেলে হয় আর তোমরা যা বলছ পঁচাত্তর মার্কে যদি তার পোষায়, তবে হয়তো ওর একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে। মঙ্গলবার আটটায় ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।'

'বেশ, কথা ঠিক থাকবে তো?'

'আরে ভায়া, এ হচ্ছে ষ্টিফান গ্রিগোলিট্‌-এর কথা।'

জর্জকে ডেকে বললুম, 'একবার এদিকে এস তো।'

সব শুনে জর্জ কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। বেচারা থরথর করে কাঁপছে। আমি ফিরে গিয়ে কোষ্টার-এর কাছে বসলুম। হঠাৎ ওকে জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা অটো, তোমাকে যদি আবার জীবনটা গোড়া থেকে শুরু করতে বলে, তুমি করবে?'

'কোন জীবন? যে জীবন এতদিন যাপন করেছি সেই জীবন?'

'হ্যাঁ, সেই জীবন।'

'না।'

আমি বললুম, 'আমারও সেই কথা।'

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এর হপ্তা তিনেক পরে একদিন রাত্তিরে 'ইনটারন্যাশনাল'-এ বসে আছি। জানুয়ারি মাস, বেশ শীত পড়েছে। হোটেলে জনমানব নেই, এমন কি দেহজীবিনীর দল পর্যন্ত আসেনি।

শহরে গোলমাল চলছে। রাস্তায় ক্রমাগত লোক যাচ্ছে দল বেঁধে-বেঁধে। কোনো দল রীতিমতো মিলিটারী কায়দায় মার্চ করে চলেছে, কোনো দল জাতীয় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে যাচ্ছে। আবার কখনো যাচ্ছে বিরাট শোভাযাত্রা—স্তব্ধ, মৌন হয়ে চলেছে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এরা। চাকরি চায়, খাদ্য চায়। ফুটপাথে অগণিত মানুষের পায়ের শব্দ ঠিক যেন বিরাট একটা ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের মতো শোনাচ্ছে।

বিকেলের দিকেই পুলিস আর ধর্মঘটিদের মধ্যে একবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সেই থেকে সারা শহরে পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। মাঝে-মাঝে এ্যাম্বুল্যান্স গাড়ি কর্কশ ধ্বনি তুলে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে।

হোটেলের মালিক আমার পাশে বসে। বলল, 'শান্তি নেই মশাই। সেই লড়াইয়ের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এক দিনের জন্য শান্তি দেখলুম না। অথচ সবাই কেবল বলছি, শান্তি চাই, এ এক আচ্ছা ক্ষ্যাপা দুনিয়া।'

আমি বললুম, 'দুনিয়া তো ক্ষ্যাপা নয়, মানুষই তো ক্ষেপে গেছে।'

মালিকের পিছনে এলয়স্ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে কথা বলল, 'ক্ষ্যাপা-ট্যাপা কিচ্ছু নয়, আসলে সব লোভীর দল। সবাই সবাইকে হিংসে করে। দেখুনগে দুনিয়াতে কোনো জিনিসের অভাব নেই, অথচ চোদ্দ আনা মানুষের কিছুই জোটে না। আসল গলদ হচ্ছে ভাগ বাঁটোয়ারার মধ্যে।'

বললুম, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু এ গলদটা নতুন নয়, এটা কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে।'

হোটেলের মালিক হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাঃ, এগারোটা বাজতে চলল। এবারে বন্ধ করে দাও, আজকে আর কেউ আসবে না।'

এলয়স্ বলল, 'না, ঐ যেন কে আসছে।'

দরজা খুলে গেল। দেখি কোষ্টার। জিগগেস করলুম, 'কি অটো, রাস্তায় কিছু নতুন খবর শুনলে?'

কোষ্টার ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, বক্সজিয়া হল্-এ মারামারি হয়ে গেছে। দুজন খুব সাংঘাতিক জখম হয়েছে, বেশ কিছু লোক অল্প-বিস্তর আহত হয়েছে আর শ-খানেক লোককে পুলিস ধরে নিয়েছে। শুনলুম শহরের উত্তর অঞ্চলে গুলি চলেছে। একজন পুলিস নাকি মারা গেছে। কিন্তু আসল গোলমালটা হবে বড় বড় সভাগুলি যখন ভাঙবে। এখানে তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমরা তো এই বন্ধ করতে যাচ্ছিলুম।'

'তাহলে চল আমার সঙ্গে।'

মালিকের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। মালিক বলল, 'দেখবেন, সাবধানে যাবেন।'

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে কেমন একটা বরফ-বরফ গন্ধ। বড়-বড় প্ল্যাকার্ডের কাগজ রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় প্রকাণ্ড বড় শাদা-শাদা প্রজাপতি মরে পড়ে আছে। কোষ্টার বলল, 'অনেকক্ষণ গট্‌ফ্রিড্-এর দেখা নেই। ও নিশ্চয় একটা না একটা মিটিং-এ গেছে। শুনছি মিটিংগুলো নাকি ভেঙে দেওয়া হবে। তাহলে একটা বিষম হাঙ্গামা হতে পারে। আর ওকে তো জানোই। মেজাজ ঠিক থাকে না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে না।'

জিগগেস করলুম, 'কোথায় গেছে জানো?'

'উহুঁ, তবে তিনটে বড় মিটিং হচ্ছে, নিশ্চয়ই তারই একটায় হবে। একবার সবগুলো ঘুরে দেখি চল। গট্‌ফ্রিড্‌কে খুঁজে বের করা শক্ত হবে না। হলদে চুলের ঝুঁটি দেখলেই চেনা যাবে।'

'বেশ চল।' গাড়িতে উঠে আমরা সভার উদ্দেশ্যে রওনা হলুম।

রাস্তায় লরী ভর্তি পুলিস। মাথায় হেলমেট কপালের উপরে টেনে দেওয়া। সভায় পৌছে দেখি জানালা থেকে নানা রঙের নিশান উড়ছে। হল-এর গেট্-এ ইউনিফর্ম-পরা একদল লোক ঠেলাঠেলি করছে। প্রায় সবাই অল্পবয়সী ছোকরা। টিকিট কিনে আমরা হল্-এ ঢুকে পড়লুম। কেউ ইস্তাহার বিক্রি করতে এল,

কেউ বা চাঁদার বাক্স নিয়ে এগিয়ে এল। কোনো রকমে তাদের হাত এড়িয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালুম। কোষ্টার সমস্ত হল্‌টায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বেশ জোয়ান গাছের একটা লোক সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। লোকটার গলার জোর আছে, হল্‌-এর যে-কোনো প্রান্ত থেকে কথা শোনা যায়। আর বলার এমন ভঙ্গি, যাই বলুক না তাতেই লোককে উত্তেজিত করতে পারে। নতুন কথা কিছুই না—নিত্যকার অভাব অভিযোগ, অনাহার, বেকার জীবনের দুর্দশা। গলা ক্রমেই চড়ছে, তারপর গর্জন করে বলে উঠল, 'এ সব চলবে না, এর একটা বিহিত করতে হবে।'

শ্রোতাদের মধ্যে কি উত্তেজনা! হল্‌ কাঁপিয়ে সে কি চীৎকার। করতালির শব্দে কানে তালা লাগবার যোগাড়। যেন এরই মধ্যে বিহিত করা হয়ে গেছে। বক্তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোলমাল থামলে পরে আবার বক্তৃতা শুরু হল। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কি লোভনীয় চিত্র! এ হবে, সে হবে, কোনো অভাব থাকবে না। একেবারে স্বর্গসুখ যেন লোকের হাতে-হাতে বেঁটে দেওয়া হচ্ছে। সকলের সমান সুযোগ, সমান অধিকার আর সব চাইতে বড় কথা—আজকের অন্যায়কারীদের উপরে প্রতিশোধ।

শ্রোতাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম: হরেক রকমের লোক—কেরানি, দোকানি, সরকারী চাকুরে, কারখানার মজুর আর মেলাই সব মেয়েদের দল। ঠেসাঠেসি গাদাগাদি করে বসে আছে। কত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, কিন্তু সকলেরই মুখের ভাব, চোখের চাউনি এক—অর্ধসুপ্ত মন যেন কোন অজানা স্বর্গের স্বপ্ন দেখছে। মনে কোনো প্রশ্ন নেই, দ্বিধা নেই। ঐ যে লোকটা কথা বলে যাচ্ছে তার সমস্ত কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করছে। সকল সমস্যার সমাধান ওরই কাছে, ওর হাতে স্বর্গের চাবি।

কোষ্টার আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'লেন্‌ত্‌স এখানে নেই, চল বেরিয়ে পড়া যাক্‌।' গেটের ধারে দু-একটি লোক আমাদের দিকে খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, খানিকটা দূর আমাদের পিছন-পিছনও এল।

রাস্তায় বেরিয়ে কোষ্টার বলল, 'লোকটা বেশ বলতে জানে হে, বেশ জমিয়েছে, না?' আমি বললুম, 'চমৎকার। এককালে প্রচারকার্যের ব্যবসা তো করেছি, আমি এর মর্ম বুঝি।'

কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে দুই নম্বর সভায় এসে পৌছলুম। একটু আলাদা রকমের নিশান, আলাদা ইউনিফর্ম, আলাদা হল্‌, এই যা। তা ছাড়া সব এক। শ্রোতা-

দের মুখে সেই এক ভাব—নির্বোধ দ্বিধাহীন আশা আর বিশ্বাসের ছবি। কিন্তু এখানকার বক্তাটি তেমন জোরালো কইয়ে-বলিয়ে নয়। বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় তথ্য প্রমাণ দিয়ে কথা বলছে। যা বলছে সবই সত্যি কথা। তবু শ্রোতাদের উপর এর প্রভাব আগের বক্তার তুলনায় কিছুই নয়।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই কোষ্টার বলল, 'চল যাই। লেন্‌ত্‌স দেখছি এখানেও নেই, মুশকিলেই ফেলল।'

আবার রওনা হলুম। হল্‌-এর ভিড় থেকে বেরিয়ে বাইরের হাওয়াটা বেশ লাগছে। খালের ধার দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার আলোর হলদে ছায়া পড়েছে খালের কালো জলে। শান-বাঁধানো পাড়ে জলের ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ। খালের ধার ঘেঁষে বহু দূরে শহরের পশ্চিম প্রান্ত দেখা যায়। বাড়িগুলো আলোয় ঝলমল করছে। খালের এপারে-ওপারে পুল। তার উপর দিয়ে মোটরকার, বাস, ইলেকট্রিক ট্রেনের অশ্রান্ত গতি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় বিচিত্র রঙের জলজ্বলে সাপ কালো জলের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে ভেসে যাচ্ছে।

অল্প একটু এগিয়ে কোষ্টর বলল, 'গাড়িটা এখানটায় রেখে বাকি পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাক। লোকের চোখে যতটা কম পড়া যায় ততই ভালো।'

একটা রেস্তোরাঁর সামনে কার্লকে রেখে আমরা হেঁটে চললুম। এক জায়গায় কয়েকজন বেশ্যা রমণী দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আমরা কাছে আসতেই চুপ করে গেল। রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিনে এক বুড়ি হাতড়ে-হাতড়ে কি খুঁজছে।

খানিক দূর এগোতেই সামনে এক বিরাট বাড়ি। বাড়িটা অত্যন্ত পুরানো, তাতে অসংখ্য আলাদা-আলাদা ব্লক, সামনে-পিছনে উঠোন। নিচেরতলায় দোকানঘর, একটা পাঁউরুটির কারখানা। বাড়িটার সামনেই রাস্তায় দুটো পুলিস লরি দাঁড়িয়ে আছে।

উঠোনের এক কোণে একটা কাঠের মাচা মতো। তার গায়ে কতকগুলো নক্সা ঝুলছে, তাতে আকাশের নক্ষত্র আঁকা। পাগড়ি মাথায় একটা লোক চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে আছে। লোকটার মাথার উপরে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—জ্যোতির্বিদ্যার আপিস - ভাগ্য গণনা, হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী বিচার। বেশ কিছু লোক জ্যোতিষীমশায়কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। লোকটা হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করছে—শ্রোতারা নীরবে হাঁ করে শুনছে। আগের মিটিংগুলোতে লোকের মুখে যে ভাবটা দেখছি, এদের মুখেও ঠিক তাই—কি যেন এক অসম্ভবের প্রত্যাশায় জ্যোতিষীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কোষ্টার আগে-আগে হেঁটে যাচ্ছিল। ওকে ডেকে বললুম, 'অটো, এতক্ষণে আমি বুঝেছি এ সব লোক কি চায়। এরা রাজনীতি-টিতি বোঝে না। এরা চায় নতুন গোছের একটা ধর্ম।'

কোষ্টার পিছন ফিরে বলল, 'ঠিক বলেছ। এরা বিশ্বাস করবার মতো একটা কিছু নতুন জিনিস চায়। একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে স্বস্তি পায় না।'

প্রথম উঠোনটা পার হয়ে আমরা ভিতরের একটা উঠোনে গিয়ে ঢুকলুম। এর সামনের হল্‌টাতেই মিটিং। আমরা গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই হল্‌-এর ভিতরে একটা হৈচৈ বেধে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন যুবক উঠোন পার হয়ে হল্‌-ঘরের দোরে ছুটে এল। ভাব দেখে মনে হল এরা অন্ধকারে কোথাও তৈরি হয়েই ছিল। দমাদ্দম ঘা মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলে হুড়মুড় করে একসঙ্গে হল্‌-এ ঢুকে পড়ল।

কোষ্টার বলল, 'আরে এ যে দেখছি স্টর্মট্রুপ্‌।' দেয়ালের ধারে কতগুলো বিয়ারের পিপে পড়ে ছিল, তারই পিছনে গিয়ে দুজনে লুকোলুম।

হল্‌-এর ভিতরে ততক্ষণ মহামারী কাণ্ড বেধেছে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে যে যেমন পারছে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেরুচ্ছে। একজন আর একজনের ঘাড়ে এসে পড়ছে। মেয়েরা চেঁচাচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় একদল বার হল সশস্ত্র মূর্তিতে—করো হাতে ভাঙা চেয়ারের পা, কারো হাতে বিয়ারের গ্লাশ—একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। একটা জোয়ান মতো লোক, বোধকরি ছুতোর মিস্ত্রী হবে, একপাশে দাঁড়িয়ে বিপক্ষদলের লোক দেখবামাত্র নির্বিচারে মাথায় এক-এক ঘা বসিয়ে দিচ্ছে। এমন নির্বিকারভাবে কাজটি করে যাচ্ছে যেন অভ্যাস মতো কাঠ কাটছে।

ওদিকে হুড়মুড় করে আর একদল লোক হল্‌ থেকে বেরিয়ে এল। চেয়ে দেখি ঠিক আমাদের সুমুখে গট্‌ফ্রিড্‌। একটা লোক তার হলদে চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কোষ্টার ধাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমুহূর্তে দেখি সেই লোকটা চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। কোষ্টার ততক্ষণে লেন্‌ত্‌সকে টানতে-টানতে ভিড়ের ভিতর থেকে বের করে এনেছে। লেন্‌ত্‌স ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বলছে, 'ছেড়ে দাও অটো, এই এক মিনিট, আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কোষ্টার ধমকে বলল, 'পাগল নাকি! এক্ষুনি পুলিস এসে পড়বে। শিগগির এস, এই পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

সবে ছুটে অন্ধকার উঠোনটা পার হয়ে গেটের কাছে গিয়েছি এমন সময় তীক্ষ একটা হুইসলের আওয়াজ হল। পুলিস এসে গেছে। কালো হেলমেট চক্‌চক্‌ করছে। ওরা চারদিক ঘেরাও করে ফেলেছে। পাশে একটা সিঁড়ি পেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম। উপরে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি নিচে কি হচ্ছে না হচ্ছে। পুলিস বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে একধার থেকে লোক গেপ্তার করে চালান দিতে লাগল। সর্বাগ্রে ধরা পড়ল সেই ছুতোর মিস্ত্রী। বেচারা পুলিসের কথা ভাবেইনি। থতমত খেয়ে গিয়ে কি সব বোঝাতে গেল। পুলিস তার কথায় কর্ণপাতই করল না।

ক্রমে নিচে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। পুলিসের দল চলে গেছে, উঠোন খালি। তবু আবো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। উঠোন পার হয়ে আসবার সময় দেখি জ্যোতিষীমশায়ের দোকানটি খালি, একলা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, 'মশাইরা আসুন না এদিকে, হাত দেখে ভাগ্য বলে দিচ্ছি।'

গট্‌ফ্রিড্‌ তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ, বলে যাও, শুনি।'

জ্যোতিষী হাত নিয়ে রেখা বিচার করতে লাগল। 'হুঁ, আপনার মনটি বেশ উদার। বিত্তেস্থান তেমন ভালো নয়, কিন্তু সঙ্গীতে অধিকার আছে। বিবাহিত জীবন খুব সুখের হবে বলে মনে হয় না। তিনটি সন্তান দেখা যাচ্ছে। আপনি কথাবার্তা কম বলেন, চুপচাপ থাকতে ভালোবাসেন। দীর্ঘ জীবন আপনার। আশি বছর বেঁচে থাকবেন।'

গট্‌ফ্রিড হেসে বলল, 'যা বলেছ, বদ লোকেরাই বেশিদিন বেঁচে থাকে।' একটু থেমে বলল, 'মৃত্যুটা মানুষের বানানো কথা, নইলে জীবনের মধ্যে মৃত্যুর স্থান কোথায়?'

জ্যোতিষীর দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলুম। রাস্তা জনশূন্য। আমাদের সুমুখ দিয়ে একটা কালো বেড়াল ছুটে গেল। লেন্‌ত্‌স ওটাকে দেখিয়ে বলল, 'এখান দিয়ে না যাওয়াই ভালো হে, এটা অমঙ্গলে।' আমি বললুম, 'কি আর হবে! একটু আগে আমরা একটা শাদা বেড়াল দেখেছি। অমঙ্গল কেটে যাবে।'

একটু এগোতেই দেখি জন-চারেক ছোকরা অপর দিক থেকে আমাদের দিকে আসছে। একজনের হাঁটু অবধি হলদে রঙের চামড়ার পট্টি পরা, অপরদের পায়ে মিলিটারি বুট। কাছে এসে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের বেশ করে

দেখে নিল। হঠাৎ পট্টিপরা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ তো সেই লোক!' বলেই আমাদের দিকে ছুটে এল। পর মুহূর্তেই দুটো গুলির আওয়াজ। তার পরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট। চোখের পলকে কোষ্টারকে দেখলুম বাঘের মতো লাফিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তেই অস্ফুট চীৎকার করে হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ও ধরতে চাইল। ততক্ষণে গট্‌ফ্রিড্ ধপ্ করে ফুটপাথের উপর পড়ে গেছে। প্রথমটায় মনে হল ও অমনি পড়েছে, তারপরেই দেখি রক্ত। কোষ্টার কোটটা টেনে খুলে ফেলল, সার্টটা ছিঁড়ে ফেলল। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে। আমার রুমালটা দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলুম। 'তুমি এখানটায় থাক, আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি,' বলে কোষ্টার ছুটে চলে গেল।

আমি তখন ঝুঁকে পড়ে ডাকছি, 'গট্‌ফ্রিড্ শুনছ, ও গট্‌ফ্রিড্—'

মুখের রঙ ছাইয়ের মতো, চোখ আধ-বোজা। চোখের পলক পড়ছে না। এক হাতে ওর মাথাটি উঁচু করে ধরেছি, আর এক হাতে রুমাল চাপা দিয়ে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করছি। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করছি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কিনা কিম্বা গলার একটু ঘড়ঘড় শব্দ। কিচ্ছু না—কোনো শব্দ নেই—শুধু জনহীন রাস্তা, শব্দহীন গৃহ, আর অন্তহীন রাত্রি—টপটপ করে রক্তের ফোঁটা ফুটপাতের উপর পড়ছে, তবু মনে হচ্ছে এ সত্য নয়, স্বপ্ন। কোষ্টার গাড়ি নিয়ে ছুটে এল। দুজনে সাবধানে ধরাধরি করে ওকে গাড়িতে শুইয়ে দিলুম। কোষ্টার গাড়ি ছুটিয়ে দিল তীরবেগে। সব চেয়ে কাছে আমরা যে হাসপাতাল পেলুম সেখানেই থেমে গেলুম। আর্দালিকে চেঁচিয়ে বললুম, 'স্ট্রেচার নিয়ে এস।' নিজেরাই স্ট্রেচারে করে গট্‌ফ্রিড্‌কে ভিতরে নিয়ে গেলুম। ডাক্তার একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাখুন এখানে।' স্ট্রেচার সুদ্ধ্ গট্‌ফ্রিড্‌কে টেবিলের উপরে শুইয়ে দিলুম। ডাক্তার জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'রিভলভারের গুলি লেগেছে।'

ডাক্তার খানিকটা তুলো নিয়ে রক্তটা মুছে নিলেন, নাড়ী টিপে দেখলেন, বুকের কাছে কান পেতে শুনলেন। নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিচ্ছু করবার নেই।'

কোষ্টার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। 'এ্যাঁ, গুলিটা এক ধার ঘেঁষে লেগেছে। তাতে তো—'

ডাক্তার বললেন, 'দুটো গুলি লেগেছে।'

তুলো দিয়ে রক্তটা আবার মুছে নিলেন। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলুম ঠিক হার্টের উপরটাতে কালো মতো একটি ছিদ্র। ডাক্তার বললেন, 'অনেকক্ষণ আগেই মারা গিয়েছে, গুলি লাগবামাত্রই।'

কোষ্টার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গট্‌ফ্রিড্-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার স্টিকিং-প্লাস্টার দিয়ে ক্ষতচিহ্ন দুটো বুজিয়ে দিলেন।

গট্‌ফ্রিড্-এর হলদে মুখ এলিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি আধবোজা। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, একদৃষ্টে আমাদের দিকে।

ডাক্তার বললেন, 'কেমন করে হল?'

কারো মুখ থেকেই জবাব বেরুল না। গট্‌ফ্রিড্ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের পলকটি ফেলছে না, শুধু আমাদের দেখছে।

ডাক্তার বললেন, 'মৃতদেহ এখানেই থাকুক।'

কোষ্টার এতক্ষণে একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল, 'না, আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।'

ডাক্তার বললেন, 'তা তো হতে পারে না। পুলিসকে খবর দিতে হবে। যে খুন করেছে তাকে তো খুঁজে বের করা দরকার।'

'খুন?' কোষ্টার এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন সব কথা বুঝতে পারছে না। একটু পরে বলল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে যাচ্ছি। পুলিস নিয়ে আসি।'

'টেলিফোন করে দিলেই হয়, এক্ষুনি এসে যাবে।'

কোষ্টার মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি।'

পর মুহূর্তেই শুনলুম কার্ল গর্জন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার আমার দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বলল, 'বসুন না।'

'না দরকার নেই,' বলে দাঁড়িয়েই রইলুম।

গট্‌ফ্রিড্-এর রক্তমাখা বুকে আলো এসে পড়েছে। ডাক্তার আলোটা একটু দূরে ঠেলে দিলেন। আবার জিগগেস করলেন, 'কেমন করে হল?'

'কি জানি, ঠিক বলতে পারিনে। বোধ করি আর কাউকে ভুল করে—'

'উনি বুঝি লড়াইতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'গায়ের সব দাগ দেখলেই বোঝা যায় আর হাতটা একটু শুকনো মতো। নিশ্চয় অনেকবার আহত হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, চারবার।'

আর্দালি পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'যত সব বদমায়েসের কাণ্ড। আরে

ব্যাটারা, তোরা এঁদের মর্ম বুঝবি কি, তোরা তো তখন মায়ের দুধ খাচ্ছিস।'
কোনো জবাব দিলুম না। গট্‌ফ্রিড্‌ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে কোষ্টার ফিরে এল। সঙ্গে কেউ নেই, একলা। ডাক্তার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজ রেখে দিয়ে বললেন, 'পুলিস এসেছে?'
কোষ্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারের কথা বোধ হয় শুনতেই পায়নি। ডাক্তার আবার জিগগেস করলেন, 'পুলিস এল?'
কোষ্টার বলল, 'পুলিস? ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, পুলিসকে তো ফোন করতে হবে।'
ডাক্তার খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে কিছু না বলে নিজেই গিয়ে ফোন করে দিলেন।
ক'মিনিটের মধ্যেই দুজন অফিসার এসে গেল। টেবিলের কাছে বসে গট্‌ফ্রিড্‌-এর চেহারার বর্ণনা লিখে নিল। ওর নাম, ধাম, কবে জন্ম, কবে মৃত্যু, এসব প্রশ্ন জিগগেস করছে। কেন জানিনে এ সমস্তই আমার কাছে একেবারে নিরর্থক মনে হচ্ছে। কি হবে এসব দিয়ে? অফিসারটি পেনসিলের সীসটা মাঝে-মাঝে ঠোঁট লাগিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছে। আমি শুধু তাই দেখছি আর কলে-টেপা যন্ত্রের মতো কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছি! অন্য অফিসারটি কোষ্টারকে জিগগেস করে ঘটনাটার একটা বিবরণ লিখে নিচ্ছে। 'আচ্ছা, যে লোকটা গুলি করল তার চেহারাটা কেমন বলতে পারেন?'
কোষ্টার বলল, 'না, অতটা লক্ষ্য করতে পারিনি।'
কোষ্টার-এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। আমি তখন ঐ লোকটার হলদে রঙের পট্টি আর ইউনিফর্মের কথা ভাবছি।
'লোকটা কোন দলের হতে পারে বুঝতে পারেননি? কোনো রকম ব্যাজ্‌ বা ইউনিফর্ম ছিল না?'
'না। গুলির শব্দ শুনবার আগে আমি ওদের দিকে ভালো করে তাকাইনি। আর তারপরে—' একটু থেমে বলল—'তারপরে আমি শুধু আমার কমরেডের কথাই ভেবেছি।'
'আপনারা কোনো পার্টির লোক নাকি?'
'পার্টি? না তো।'
'না, ঐ বললেন কিনা উনি আপনার কমরেড্‌।'
কোষ্টার বলল, 'ও আমার লড়াইয়ের সময় থেকে কমরেড্‌, আমার সাথী।'

অফিসার আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি সেই লোকটার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন ?' কোষ্টার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। বললুম, 'না, আমিও কিচ্ছু লক্ষ্য করিনি।'

অফিসার বলল, 'আশ্চর্য তো।'

'আমরা কথা বলতে-বলতে যাচ্ছিলুম কিনা। কোনো দিকে লক্ষ্য করিনি আর ব্যাপারটা এক নিমেষে ঘটে গেল।'

অফিসার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে আর কি হবে ? লোকটাকে ধরবার উপায় নেই।'

কোষ্টার জিগগেস করল, 'ওকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ?'

অফিসার ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন, মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আপনার তো কোনো সন্দেহ নেই ?'

ডাক্তার বলল, 'না, আমি সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছি।'

'বুলেটগুলো কোথায় ? আমাকে তো বুলেট নিয়ে যেতে হবে।'

'বুলেট বের করা হয়নি।' ডাক্তার ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে তো আবার—'

অফিসার বলল, না, বুলেট আমাকে নিতেই হবে। দেখতে হবে দুটো বুলেটই এক রিভলভারের কিনা।'

ডাক্তার এক নজর কোষ্টার-এর দিকে তাকাল। কোষ্টার বলল, 'আচ্ছা, তাই করুন।'

আর্দালি ঝোলানো আলোটা টেনে একটু নামিয়ে দিল। ডাক্তার যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে ক্ষত-স্থান দুটোতে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দেখতে লাগলেন। একটা বুলেট সহজেই পাওয়া গেল। আর একটা অনেকখানি ভিতরে ঢুকে গেছে, কেটে বের করতে হবে। ডাক্তার রবারের দস্তানা পরে নিয়ে ছুরি আর ফর্সেপের জন্য হাত বাড়ালেন। কোষ্টার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গট্‌ফ্রিড-এর আধ বোজা চোখ ভালো করে বুজিয়ে দিল। আমি ইচ্ছে করেই একটু সরে দাঁড়ালুম, ছুরির ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে কিনা। আর একটু হলেই ছুটে গিয়ে ডাক্তারকে ঠেলে সরিয়ে দিতুম। আমার মনে হচ্ছিল গট্‌ফ্রিড্ শুধু অজ্ঞান হয়ে আছে, এখন ডাক্তারই কেটে-কুটে ওকে মারছে। পরমুহূর্তেই মাথাটা ঠাণ্ডা হল। হুঁ, জীবনে এত মৃত্যু দেখলুম, মরা মানুষ আর চিনতে বাকি ?

ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠল, 'এই যে পেয়েছি।' বুলেটটি বের করে মুছে অফিসারের হাতে দিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, একই, দুটোই এক রিভলভারের, কি বলেন ?'
কোষ্টার ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে চক্চকে গোল জিনিস দুটো দেখতে লাগল। অফিসার বুলেট দুটো কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে দিল। তারপরে বলল, 'দেখুন, এ রকম তো নিয়ম নেই—তা আপনারা যদি বাড়ি নিয়ে যেতে চান—'ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলেন, এ তো পরিষ্কার কেস। তবু দেখুন ভেবে, কালকে আবার একটা তদন্ত হতে পারে।'
কোষ্টার বলল, 'হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। আমরা ঠিক যেমন আছে তেমনি রেখে দেব।'
অফিসার দুজন চলে গেল। ডাক্তার আবার ক্ষতস্থান দুটো বেঁধে-ছেঁদে দিলেন। জিগগেস করলেন, 'কেমন করে নেবেন ? এক কাজ করুন, স্ট্রেচার সমেত নিয়ে যান, কালকে মনে করে পাঠিয়ে দেবেন।'
'ধন্যবাদ, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। এস বব্।'
আর্দালি এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে আমি ধরছি।'
আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না দরকার নেই। আমরা দুজনেই পারব।'
সিট-এর পিঠের দিকগুলো নামিয়ে দিয়ে স্ট্রেচার সুদ্ধু গাড়ির ভিতরে দিয়ে দিলুম। ডাক্তার এবং আর্দালি দুজনেই পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। গট্‌ফ্রিড্-এর কোটটা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলুম। কোষ্টার আমার দিকে ফিরে বলল. 'ঐ রাস্তা দিয়েই আবার যাব। আমি একবার ঘুরে দেখে এসেছি, অবিশ্যি অত শিগগির-শিগগির বেরোবার কথা নয়; কিন্তু মনে হচ্ছে এখন ওদের রাস্তায় পাওয়া যাবে।' একটু-একটু বরফ পড়ছে। কোষ্টার নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে চলেছে, মাঝে-মাঝে এঞ্জিন বন্ধ করে দিচ্ছে। ও আগে থেকে কিচ্ছু জানান দিতে চায় না। যে চারজন লোককে আমরা খুঁজছি তারা অবশ্য জানে না যে আমাদের সঙ্গে গাড়ি ছিল। আমি হাতিয়ারের বাক্সটা খুলে একটা হাতুড়ি বের করে পাশে রাখলুম, দরকার হলে যেন লাফিয়ে পড়েই বেমালুম হাত চালাতে পারি।
যে রাস্তায় ঘটনাটা ঘটেছে সেই রাস্তাটা দিয়েই যাচ্ছি। লাইট-পোস্টটায় তখনো একটু কালো রক্তের দাগ রয়েছে। কোষ্টার গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল। রাস্তায় একটি লোকও দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা রেস্তোরাঁ থেকে লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মোড়ের কাছে এসে কোষ্টার গাড়ি দাঁড় করল। বলল, 'তুমি একটু বস, আমি রেস্তোরাঁটায় একবার উঁকি মেরে দেখে আসি।'

বললুম, 'দাঁড়াও, আমিও সঙ্গে আসছি।'
ও আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওর এই চাউনিটা আমি চিনি। এর উপরে আর কথা চলে না। বলল, 'আমি রেস্তোরাঁয় কিছু করছি না। শুধু দেখতে চাই লোকটা ওখানে আছে কিনা। যদি থাকে তো এদিকটায় এসে অপেক্ষা করব—তুমি ততক্ষণ গট্ফ্রিড্-এর কাছে থাক।'
'আচ্ছা।'
তুষার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কণা-কণা তুষার আমার মুখে এসে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। গট্ফ্রিড্-এর মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে, মোটেই ভালো লাগছে না। ও যেন আর আমাদের দলের নয়। কোটটা ওর মাথার দিকে সরিয়ে দিলুম তুষার কণা এখন ওর মুখেও এসে পড়ছে, কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে না তো। রুমাল বের করে মুখখানা মুছে দিলুম, তারপরে আগের মতো আবার কোট দিয়ে ঢেকে রাখলুম।
কোষ্টার ফিরে এল। জিগগেস করলুম, 'কেমন, দেখলে কিছু?'
'না, ওখানে নেই।' গাড়িতে উঠে বসে বলল, 'এবার অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাক। আমার কেবলই মনে হচ্ছে রাস্তায় ওদের পেয়ে যাব।'
শাদা তুষারের আবরণ ভেদ করে গাড়িটা তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে চলেছে। মোড় ঘুরবার সময় আমি গট্ফ্রিড্কে শক্ত করে ধরে রাখছি, পাছে পড়ে যায়। রাস্তায় কোথাও রেস্তোরাঁ দেখলেই কোষ্টার এক ধারে গাড়ি থামিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে একবার গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসছে। ওর মনের মধ্যে একটা দারুণ প্রতিহিংসা জেগে উঠেছে। গট্ফ্রিড্কে আগে গিয়ে বাড়িতে রেখে আসবার দিকেও ওর মন নেই। দুবার-দুবার বাড়ির কাছ অবধি গিয়েও ফিরে এসেছে। ভাবছে, কে জানে হয়তো এক্ষুনি ঐ চারটে লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।
হঠাৎ দেখা গেল একটা জনবিরল রাস্তার একধারে জনকয়েক লোক গোল পাকিয়ে কি যেন করছে। কোষ্টার তক্ষুনি গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল। লোকগুলো কিছুই টের পায়নি। আমি ফিসফিস করে বললুম, 'চারজনই তো দেখছি।'
গাড়িটা মুহূর্তে গর্জন করে উঠল, দারুণ জোরে গিয়ে লোকগুলো যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক এক গজের মধ্যে থেমে গেল। কোষ্টার-এর অর্ধেকটা শরীর গাড়ির বাইরে ঝুঁকে আছে। চোখ-মুখের ভাব যমদূতের মতো।

'নাঃ, এরা নয়।' চারজন বুড়ো মতো লোক। একজন মদ খেয়ে একটু টলছে। আমাদের রকম দেখে ওরা চটে গিয়ে কি সব বলল। আমরা কিছু জবাব দিলুম না। কোষ্টার আবার গাড়ি হাঁকিয়ে চলল।

আমি বললুম, 'অটো আজকে পাবে না, আজকে রাত্তিরে অন্তত ও সাহস করে রাস্তায় বেরোবে না।'

'বোধহয় তাই.' বলে এতক্ষণে কোষ্টার বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরাল। ওর বাড়ি এসে পৌছলুম। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে জিগগেস করলুম, 'আচ্ছা অটো, পুলিস যখন লোকটার চেহারার কথা জিগগেস করল তখন কিছু বললে না কেন? পুলিস তো ওকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করত। আর লোকটাকে তো আমরা বেশ ভালো করেই দেখেছিলুম।'

কোষ্টার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলিনি এইজন্যে যে এর প্রতিশোধ আমরা নিজেরাই নেব, পুলিসের সাহায্য চাইনে। তুমি কি মনে করেছ—' ও আস্তে আস্তে কথা বলছে কিন্তু কি ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে কি বলব, 'তুমি মনে করেছ ওকে আমি পুলিসের হাতে ছেড়ে দেব? ক'বছর জেল খেটেই সেরে যাবে? এ সব মামলার ফল কি হয় তা তো দেখেছ। উহুঁ, ও সব হবে না। এমন কি পুলিস যদি ওকে ধরেও, আমি গিয়ে হলপ করে বলব ও নয়। পরে আমি নিজে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব। গট্‌ফ্রিড্ মরবে আর ও বেঁচে থাকবে সে আমি হতে দিচ্ছিনে।'

যেমন তুষার বৃষ্টি তেমনি দমকা হাওয়া, তার মধ্যেই স্ট্রেচারে করে গট্‌ফ্রিড্‌কে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলুম। ফ্ল্যাণ্ডার্সের কথা মনে পড়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেন মৃত কমরেডের দেহ দূরে কোথাও বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

একটি শবাধার কেনা হল। গির্জার কবরখানায় গিয়ে একটি কবর ঠিক করে এলুম। গট্‌ফ্রিড্ প্রায়ই বলত ক্রিমেটোরিয়মে দেহভস্ম রক্ষা করা সৈনিকদের মানায় না। যে পৃথিবীর মাটিতে এতকাল বাস করলুম সেই মাটিতেই শেষ শয্যা গ্রহণ করব। কবর দেবার আগে ওর পুরোনো মিলিটারি ইউনিফর্ম পরিয়ে দিলুম। হাতার দিকটা গোলার টুকরো লেগে উড়ে গিয়েছিল। এখনো রক্তের দাগ লেগে আছে। কবরখানায় আমরা অল্প ক'জন মাত্র উপস্থিত—ফার্ডিনাণ্ড, ভ্যালেন্‌টিন্, আলফন্‌স, বার-এর ওয়েটার ফ্রেড্, জর্জ, জাপ্, ফ্রাউ ষ্টস্, গুস্তাভ, ষ্টিফান্ গ্রিগোলিট্ আর রোজা।

শবাধারটি গাড়ি থেকে তুলে নিজেরাই দড়ি দিয়ে কবরে নামিয়ে দিলুম। একজন পাদ্রিসাহেব সঙ্গে এনেছিলুম। জানি না গট্‌ফ্রিড্ শুনলে কি বলত। কিন্তু ভ্যালেন্‌টিন কিছুতেই ছাড়বে না। অবিশ্যি পাদ্রিসাহেবকে বলে নিয়েছিলুম যে তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে না। তিনি শুধু বাইবেল থেকে ক'লাইন পড়ে দেবেন। পাদ্রি লোকটি বৃদ্ধ, চোখে কম দেখেন। কবরের কাছে এসে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে আর একটু হলেই গর্তের ভিতরে পড়ে যেতেন। কোষ্টার আর ভ্যালেন্‌টিন্ ধরে ফেলেছিল তাই রক্ষে। ভদ্রলোক সবে চশমাটা পরতে যাচ্ছিলেন। হোঁচট খেয়ে চশমা পড়ে গেল। সেটাকে সামলাতে গিয়ে হাত থেকে বাইবেলও গেল ফস্কে—দুটোই গড়িয়ে একেবারে কবরের গর্তে। বৃদ্ধের সে কি অবস্থা!

ভ্যালেন্‌টিন্ বলল, 'পাদ্রিসাহেব আপনি ভাববেন না, আমরা এর দাম দিয়ে দেব।'

বুড়ো বলল, 'বইয়ের জন্য তো ভাবছি না, কিন্তু চশমা না হলে যে চলে না।'

ভ্যালেন্‌টিন্ কবরখানার বেড়া থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ে অনেক কসরত করে ফুল, মালার মাঝখান থেকে চশমাটাকে কোনো রকমে উদ্ধার করল। বাইবেলটি এমনভাবে পড়েছে যে তার খানিকটা শবাধারের তলায় ঢুকে গেছে। কাজেই বইটি উদ্ধার করতে হলে কফিনটাকে আবার তুলতে হয়। পাদ্রিসাহেবের নিজেরও সে রকম ইচ্ছে নয়, আমাদের তো নয়ই। বুড়ো ভদ্রলোক কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বললেন, 'পড়া যখন হল না তখন দুকথা আমি নিজেই বলব?'

ফার্ডিনাণ্ড বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ধর্মগ্রন্থটি পুরোপুরিই যখন ওর কাছে রইল তখন আর বৃথা বাক্যব্যয়ে দরকার কি?'

মাটি দিয়ে গর্ত ভর্তি করে দিচ্ছি। মাটির বেশ একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। এক তাল মাটির মধ্যে একটা মেটে পোকা নড়ছে-চড়ছে। গর্ত ভর্তি করে দিলেও ও ওখানটায় বেঁচে থাকবে। মাটি ফুঁড়ে একদিন আবার পৃথিবীর আলোতে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু গট্‌ফ্রিড্ লেন্‌ত্‌স আর ফিরে আসবে না। তার আলোটি নিভে গেছে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। জানি ওর দেহ, ওর চুল, ওর চোখ সবই ঐখানে রয়েছে। হয়তো একটু বদলেছে। তবু আছে তো। কিন্তু থাকলে কি হবে? থেকেও নেই, ও আর ফিরে আসবে না। কি আশ্চর্য, কেমন করে এ কথা বিশ্বাস করব? এই তো আমরা রয়েছি। আমাদের দেহে উত্তাপ আছে, শরীরের শিরায়-শিরায় রক্ত বইছে, কথা কইছি, ভাবছি! কাল যেমন ছিলুম আজও

তেমনি আছি। দেহের সবগুলো অঙ্গ ঠিক আছে, অন্ধ হইনি, খঞ্জ হইনি, বোবা হইনি। সব যেমনকার তেমনি। একটু বাদে এখান থেকে হেঁটে চলে যাব, আর গট্‌ফ্রিড্ লেন্‌ত্‌স এখানেই থেকে যাবে, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসবে না! এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করব, কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

ধপধপ করে এক-একটি মাটির তাল কফিনের উপর পড়ছে। ভ্যালেন্‌টিন্, কোষ্টার, আলফন্‌স আর আমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি ফেলছি। এর আগেও বহু কমরেড্‌কে নিজহাতে কবর দিয়েছি। বহুদিন আগে শোনা সৈনিকদের একটা গান মনে পড়ে গেল: 'শান্ত কবরখানা তুমি আজ।'

আলফন্‌স কালো রঙের ছোট্ট একটি কাঠের ক্রস্ নিয়ে এসেছিল। এমন কত লক্ষ-লক্ষ ক্রস্ ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আজও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রস্‌টি কবরের পাশে পুঁতে দেওয়া হল আর তার উপরে গট্‌ফ্রিড্-এর পুরোনো স্টীল হেলমেটটি ঝুলিয়ে দিলুম।

ভ্যালেন্‌টিন্ ভাঙা গলায় বলল, 'চল, যাওয়া যাক্।'

কোষ্টার বলল, 'হ্যাঁ, চল।' বলে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল। আমরাও দাঁড়িয়ে আছি।

ভ্যালেন্‌টিন্ একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'কী হবে দাঁড়িয়ে? কিসের জন্য?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। ভ্যালেন্‌টিন্ আর একবার বলে উঠল, 'কী করছ, চলে এস।'

খোয়া-বাঁধানো পথ বেয়ে একে-একে সকলে বেরিয়ে এলুম। গেট্-এর কাছে ফ্রেড, জর্জ, আর অন্য সবাই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টিফান গ্রিগোলিট্ বলল, 'লোকটা কি হাসিই না হাসত, এমন প্রাণখোলা হাসি—' গ্রিগোলিট্-এর চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কি জানি কেন, আমি একবার পিছনে ফিরে তাকালুম।

কই, কেউ তো আমাদের পিছন-পিছন আসছে না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন কোষ্টার আর আমি কারখানায় বসে আছি। আজকেই আমাদের কারখানার শেষ দিন। কারণ কারখানাটা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। নীলামওয়ালাকে খবর দেওয়া হয়েছে। কারখানার জিনিসপত্র আর ট্যাক্সি ক্যাবটা নীলামে বিক্রি করা হবে।

একটা মোটর কোম্পানিতে কোষ্টার চাকরির আশা পেয়েছে, দু-এক মাসের মধ্যে হয়ে যেতে পারে। আমি 'ইন্‌টারন্যাশনাল' হোটেলে রাত্তিরের কাজটা রাখব ঠিক করেছি। দিনের বেলায় এটা-ওটা করে আর কিছু উপরি রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে।

নীলামওয়ালা এসে গেল। কিছু-কিছু লোকও এসে উঠোনে জমা হয়েছে। অটোকে বললুম, 'চল, বাইরে যাওয়া যাক্।'

'কি হবে গিয়ে, যা করবার নীলামওয়ালাই করবে।'

কোষ্টারকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওকে দেখলে অমনিতে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু যারা ওকে ভালো করে জানে তারা ঠিক ধরতে পারবে। ওর মুখের চেহারা দিনে-দিনে রুক্ষ, কঠোর হয়ে উঠছে। আমি জানি প্রতি রাত্রে ও বেরিয়ে যায়, শহরের ঐ অঞ্চলটাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। গট্‌ফ্রিড্‌কে যে লোকটা গুলি করেছিল তার নাম সে অনেকদিন আগেই বের করেছে, কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। নিশ্চয় পুলিশের ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে।

খোঁজ-খবরটা আলফন্‌সই বের করেছে, সেও ওত পেতে আছে। এমনও হতে পারে লোকটা এই শহর ছেড়ে চলে গেছে। তবে কোষ্টার আর আলফন্‌স যে ওর পিছনে লেগেছে সে খবর ও জানে না। ও যখন নিজেকে নিরাপদ ভেবে এখানে ফিরে আসবে তখন ওরা দেখে নেবে।

আমি বললুম, 'অটো, আমি একবার বাইরে গিয়ে দেখি।'

'আচ্ছা।'

উঠোনে নেমে এলুম। মাঝখানটাতে আমাদের টুল বেঞ্চি যাবতীয় জিনিস গাদা করা। ডানদিকে দেয়ালের কাছটাতে ট্যাক্সিটা রাখা হয়েছে। ওটাকে আমরা ধুয়ে মুছে সাফ করে রেখেছি। টায়ার আর সিট্গুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে লাগলুম। গট্‌ফ্রিড্ প্রায়ই বলত এটা আমাদের দুধেল গাই। ওকে ছাড়তে সহজে মন সরছে না।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কাঁধে এক চাপড় মারল। অবাক হয়ে ফিরে দেখি ওভারকোট গায়ে ফিটফাট ফুলবাবু মতো একটি লোক। চোখ দুটো নাচিয়ে হাতের ছড়িটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, 'এই যে মশায়, চিনতে পারছেন ?'

আবছা মতো হঠাৎ মনে এসে গেল, 'গুইডো থিস্ না ?'

'মনে আছে দেখছি। এই ট্যাক্সির ব্যাপারেই দেখা হয়েছিল। সেবার আপনারা কি কাণ্ডই করলেন, মশায়। যাক—' দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে বলল, 'যা হবার হয়ে গেছে, পুরোনো কথা আমি মনে রাখি না। তবে ঐ বুড়ো থুথ্‌ড়ে গাড়ির জন্য কি অসম্ভব দাম আপনারা দিলেন। কিছু লাভ করতে পেরেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, গাড়িটা ভালো কিনা।'

থিস্ মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার কথা শুনলে ঢের বেশি লাভ হত—আপনাদেরও, আমারও। যাক্ পুরোনো কথা চুকে-বুকে গেছে। এখন আসুন আজকে আধাআধি বখরা হোক। আমরা পাঁচশো মার্ক পর্যন্ত ডাকব। দেখবেন আর কেউ ডাকবেই না। কেমন রাজী তো ?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ও ভেবেছে আমরা তখন গাড়িটা নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। কারখানাটা যে আমাদেরই ও তা বুঝতে পারেনি। ভাবছে আমরা আবার গাড়িটা কিনতে এসেছি।

আমি বললুম, 'ও গাড়ির দাম এখনো পনেরোশো মার্ক।'

গুইডো বলল, 'সে তো বটেই, কিন্তু আমরা ঐ পাঁচশো অবধি ডাকব। যদি পেয়ে যাই তো আমি তক্ষুনি সাড়ে তিনশো নগদ-নগদ দিয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'ও হয় না। আমার হাতে একজন খদ্দের আছে।'

'বেশ-বেশ তাহলে—' ও আবার নতুন দর হাঁকতে চাইল।

'নাঃ, ওসব হবে না' বলে উঠোনের অন্য দিকে হেঁটে চলে গেলুম।

নীলামওয়ালা জিনিসপত্র সাজাচ্ছে। প্রথমটায় টুল বেঞ্চি আপিসের সাজ-সরঞ্জাম,

তাতে বিশেষ কিছুই এল না। যন্ত্রপাতিতেও তেমন কিছু নয়। এবার ট্যাক্সির পালা। প্রথম ডাক হল সাড়ে তিনশো মার্ক।

গুইডো বলল, 'চারশো।'

ওভারঅল-পরা একটা লোক অনেক ভেবেচিন্তে ডাকল, 'সাড়ে-চারশো।'

গুইডো পাঁচশোতে উঠল। নীলামওয়ালা চারদিকে তাকাচ্ছে। ওভারঅল-পরা লোকটা আর কিছু বলছে না। গুইডো আমাকে চোখে ইশারা করছে, হাতের চার-চারটা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে অর্থাৎ চারশো মার্ক বখরা দিতে রাজী।

আমি ডাকলুম, 'ছশো।'

গুইডো মাথা নেড়ে বলল, 'সাতশো।' আমি আর একটু চড়িয়ে দিলুম। গুইডো মরিয়া হয়ে উঠেছে, সেও ডাক চড়াচ্ছে। দাম যখন হাজারে উঠেছে তখন ও অত্যন্ত করুণভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আঙুল তুলে ইশারা করছে, এখনো ইচ্ছে করলে আমি একশো মার্ক বখরা নিতে পারি; ও ডাকল, 'এক হাজার দশ।'

আমি যখন এগারোশো ডেকেছি ওর মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাকতে ছাড়ছে না—'এগারোশো দশ।'

আমি হাঁকলুম, 'এগারোশো নব্বুই।' ভাবলুম ও বারোশো ডাকুক, তারপর আমি চুপ করে যাব।

কিন্তু গুইডোর তখন খুন চেপে গেছে। এক লাফে ডেকে বলল, 'তেরোশো।'

আমি ব্যাপারটা মুহূর্তে বুঝে নিলুম। ওর এখন কিনবার মতলব নেই। আমার উপরে শোধ তুলবার জন্যে ইচ্ছে করে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে গোড়ায় যে কথা হয়েছে তাই থেকে ও ধরে নিয়েছে আমি পনরোশো অবধি যাব।

আমি বললুম, 'তেরোশো দশ।'

'চোদ্দশো।'

ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'চদ্দোশো দশ—' কি জানি ও যদি ডাক ছেড়ে দেয়।

গুইডো খুব উল্লাসের ভাব দেখিয়ে ডাকল, 'চোদ্দশো নব্বুই।' ভাবটা যেন, কেমন জব্দ।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে চুপকরে দাঁড়িয়ে রইলুম। ব্যাস্—নীলামওয়ালা চারদিক তাকিয়ে বলল, 'এক, দুই,'—তারপরে হাতুড়ি তুলল। গুইডোর হাসিমুখ মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। বোকার মতো মুখ করে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি না বলেছিলেন—'

আমি বললুম, 'কই না তো—'

গুইডো অপ্রস্তুত ভাবটা কোনো রকমে কাটিয়ে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বলল, 'তাই তো, আমার ফার্মকে ব্যাপারটা বোঝানো একটু শক্ত হবে। আমি ভেবেছিলুম আপনি পনেরোশো অবধি যাবেন। যাকগে, এবার আর আপনাকে নিতে দিইনি, দেখলেন তো?'

আমি বললুম, 'আপনাকে দিয়ে কেনাবার জন্যেই তো—'

গুইডো তখনো কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কোষ্টারকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ব্যাপারটা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

সে বলল, 'ও গাড়িটা তাহলে আপনাদেরই, আপনারাই বিক্রি করলেন। ছি-ছি! আমি কত বড় গাধা! কি ঠকাটাই ঠকলুম। গুইডোর কপালে এই ছিল। হায়রে, এমনি হয়—অতি চালাকের গলায় দড়ি। আচ্ছা, আপনাদের চালাকির কথা মনে থাকবে।'

আর কালক্ষেপ না করে গাড়িটাতে চেপে হুড়হুড় করে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছেড়ে চলে গেল।

বিকেলের দিকে এল ম্যাটিল্ডা ষ্টস্। ওর মাইনে চুকিয়ে দিতে হবে। কোষ্টার টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নতুন মালিককে বল না? তোমার চাকরি যেমন ছিল তেমনি থাকবে। জাপ্-এরও সেই রকম ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ম্যাটিল্ডা মাথা নেড়ে বলল, 'না, হের্ কোষ্টার, চাকরি আর নয়। বুড়ো হাড়ে আর কত!'

জিগগেস করলুম, 'তা হলে কি করবে ঠিক করেছ?'

'মেয়ের কাছে গিয়ে থাকব। ওরা থাকে বান্ৎসলাউতে। জামাই ওখানে কেরানির কাজ করে। আচ্ছা, জায়গাটা কোথায় বলতে পারেন?'

'বান্ৎসলাউ? জানিনে তো।'

'হের্ কোষ্টার নিশ্চয় জানেন?'

'না ফ্রাউ ষ্টস্, আমি ও জায়গার নাম কখনো শুনিনি। তা আছেই কোথাও।'

'আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, মেয়ের কাছে আজ পর্যন্ত যাইনি। নাতি-নাতনি হয়েছে, একবার গিয়ে দেখতে হবে।'

'এতদিন যাওনি কেন?'

'হ্যাঁ—তা একটা কারণ ছিল বৈকি—বুঝলেন কিনা—আমার জামাই—এই মদটদ একেবারে পছন্দ করে না।'

কোষ্টার বলল, 'ওঃ. এতক্ষণে বোঝা গেল।' উঠে গিয়ে শূন্য শেল্‌ফ্‌ থেকে আমাদের সবে ধন শেষ বোতলটি নামিয়ে নিয়ে এল। 'এস ফ্রাউ ষ্টস্‌, আজকে শেষ দিনে এক সঙ্গে বসে একটু পান করা যাক্‌।'

ম্যাটিল্‌ডা বলল, 'হেঁ-হেঁ, তাতে আর আপত্তি কি?'

কোষ্টার গ্লাশ ক'টি এনে টেবিলে রাখল। ম্যাটিল্‌ডা আস্তে-আস্তে গ্লাশে রাম্‌ ঢালছে আর জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।

বুড়িকে বললুম, 'আর এক গ্লাশ চাই?'

'না বলব না।'

বুড়ি চলে গেলে পর খানিকক্ষণ আমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলুম। তারপরে কোষ্টার বলল, 'চল, আমরাও বেরিয়ে পড়ি, এখানে আর কেন?'

বললুম, 'হ্যাঁ, এখানে আর কি দরকার?'

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাছেই একটা গ্যারাজে কার্লকে রাখা হয়েছে। ওকে আমরা বিক্রি করিনি। কার্লকে নিয়ে প্রথমে আমরা গেলুম ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে। ওখানকার কাজ সেরে কোষ্টার বলল, 'আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। তুমি কখন অবসর হবে?'

'আমি আজ রাত্তিরটা ছুটি নিয়েছি।'

'বেশ, তাহলে আটটায় আমি তোমার ওখানে আসছি।'

শহরের বাইরে গিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় দুজনে খেয়ে নিলুম। তারপরে আবার শহরে ফিরে এলুম। শহরে ঢুকতেই রাস্তার মাঝখানে সামনের একটা টায়ার ফেঁসে গেল। চাকাটা বদলাতে হল। অনেকদিন গাড়িটা ধোয়া-মোছা হয়নি। টায়ার বদলাতে গিয়ে কালি-ঝুলি ঢের লেগে গেল। অটোকে বললুম, 'আমার একবার হাত-পা না ধুয়ে নিলে চলছে না।'

কাছেই বেশ একটা বড় গোছের কাফে, ওখানে ঢুকে দরজার কাছেই একটা টেবিলে আমরা বসলুম। ঘরভর্তি লোক, মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ব্যাণ্ড বাজছে, ফুর্তি হুল্লোড় চলছে।

কোষ্টার জিগগেস করল, 'এখানে কি হচ্ছে?'

পাশের টেবিল থেকে সুন্দর মতো একটি মেয়ে বলল, 'কোথা থেকে আসছেন মশাই ? জানেন না আজ একটা পর্বদিন ?'
আমি বললুম, 'হ্যাঁ, তাই তো, আচ্ছা, আমি একটু মুখ-হাতটা ধুয়ে আসছি।'
হলটা পার হয়ে বাথরুমের দিকে যেতে হবে। পথে আটকে গেলুম : একদল লোক মাতাল অবস্থায় রীতিমতো টলছে, একটি স্ত্রীলোককে উঁচকে ধরে জোর করে টেবিলে বসাবে, তাকে গান করতে হবে। স্ত্রীলোকটি রাজী নয়, চেঁচাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। হুড়োহুড়িতে টেবিলটাই গেল উল্টে, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দলটিই হুড়মুড় করে একজন আর একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। লোকগুলো রাস্তা ছাড়লে তবেই আমি যেতে পারি, এক পাশে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। গান বাজনা কলরব কিছুই আর কানে ঢুকছে না, লোকজন সব ছায়ামূর্তির মতো অস্পষ্ট। শুধু একটা টেবিল স্পষ্ট দেখছি আর সব আমার চোখ থেকে মুছে গেছে। মাথায় সাধার টুপি পরা এক ছোকরা ঐ টেবিলটাতে বসে। ঢুলু-ঢুলু চোখ অর্ধমাতাল একটি মেয়েকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। টেবিলের তলায় তার হলদে রঙের চামড়ার পটি চকচক করছে।
এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়েছিলুম ! হোটেলের একটা ওয়েটার চলতে গিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ল। চমকে উঠে মাতালের মতো টলতে-টলতে দু-পা এগুচ্ছি আবার থমকে দাঁড়াচ্ছি। সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে অথচ শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। হাত দুটো ঘামে ভিজে উঠেছে। ও টেবিলটাতে আরো লোক আছে। সবাই মিলে গান ধরেছে আর বিয়ার গ্লাশ ঠুকে ঠুকে টেবিলের উপর তাল দিচ্ছে। আর একটা লোকের সঙ্গে আবার ধাক্কা লেগে গেল। লোকটা চটে-মটে বলে উঠল, 'পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন কেন মশাই ?'
যন্ত্রচালিতের মতো আবার টলতে-টলতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম। মুখ হাত ধুচ্ছি তো ধুচ্ছিই। ঘষে-ঘষে যখন চামড়া প্রায় তুলে ফেলবার যোগাড় তখন খেয়াল হল। ফিরে এসে টেবিলে বসতেই কোষ্টার বলল, 'তোমার কি হয়েছে ? শরীর খারাপ করেছে নাকি ?'
আমার মুখ থেকে জবাবই বেরুচ্ছে না। শুধু চোখ ফিরিয়ে একবার ঐ টেবিলটার দিকে তাকালুম। কোষ্টারের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখ দুটি ছোট করে সামনের দিকে ঝুঁকে জিগগেস করল, 'এ্যাঁ, তাই, না ?'
'হ্যাঁ।'

'কোথায় দেখি।'

আমি আবার ঐ টেবিলের দিকটাতে তাকালুম। কোষ্টার আস্তে উঠে দাঁড়াল, সাপের মতো ও ফণা বাগিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন এক্ষুনি ছোবল মারবে। আমি চাপা গলায় বললুম, 'সাবধান অটো, এখানে নয়।'

আমাকে হাতের ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করে ও কয়েক পা এগিয়ে গেল। আমিও তৈরি হয়েই রইলুম, দরকার হলেই এগিয়ে যাব। একটি মেয়ে ফুর্তির ঝোঁকে ছুটে এসে একটা লাল সবুজ রঙের কাগজের টুপি কোষ্টার-এর মাথায় পরিয়ে দিয়ে একটু ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়েছিল। কোষ্টার একবার ফিরেও তাকাল না এক ঝটকায় মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটা থ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। আস্তে-আস্তে এপাশ-ওপাশ দিয়ে সমস্ত হলটা ঘুরে কোষ্টার ফিরে এল। বলল, 'কই, এখন আর নেই তো।'

দাঁড়িয়ে উঠে সমস্ত ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। কোষ্টার ঠিকই বলছে। বললুম, 'লোকটা তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছিল? এ্যা?'

কোষ্টার বলল, 'কে জানে?' এতক্ষণে ওর খেয়াল হয়েছে যে মাথায় একটা টুপি রয়েছে। টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বললুম, 'কি জানি, বুঝতেই পারছি না। বাথরুম থেকে তো আমি দু-মিনিটে বেরিয়ে এলুম। এর মধ্যে—'

'তুমি কমসেকম্ পনেরো মিনিট ওখানে ছিলে।'

'বলছ কি?' আর একবার ঐ টেবিলটার দিকে তাকালুম। 'এ্যা, সবাই তো চলে গেছে। ওদের সঙ্গে একটি মেয়েও ছিল। মেয়েটাও তো নেই। ও যদি আমাকে চিনেই থাকে তবে সবাই মিলে পালাবে কেন? ও একলাই চুপি-চুপি সরে পড়ত।'

কোষ্টার ওয়েটারকে ইশারা করে ডাকল। 'তোমাদের পিছন দিক দিয়ে একটা বেরোবার রাস্তা আছে নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যা, ঐ ওদিকটাতে, ওখান দিয়ে গেলেই হার্ডেনবুর্গস্ট্রাসে গিয়ে পড়বেন।'

কোষ্টার পকেট থেকে কিছু পয়সা বের করে ওয়াটারকে বকশিশ দিয়ে দিল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'এস বেরিয়ে পড়ি।'

পাশের টেবিলে যে সুন্দরী মেয়েটি বসেছিল সে আমাদের রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমাদের বেরিয়ে যেতে দেখে বলে উঠল, 'আশ্চর্য, এমন গোমড়ামুখো লোক তো কখনো দেখিনি।'

বাইরে বিষম ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বিশেষ করে কাফের ঐ গরম আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে হাওয়াটা হঠাৎ যেন বরফের মতো শরীরের মধ্যে বিঁধতে লাগল। কোষ্টার আমাকে বলল, 'তুমি বাড়ি চলে যাও।'

ওর কথায় কান না দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলুম। বললুম, 'ও একলা নয়, সঙ্গে লোক আছে।'

গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল, রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে সমস্ত অঞ্চলটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম। লোকটার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। গাড়ি থামিয়ে কোষ্টার বলল, 'বিলকুল হাওয়া হয়ে গেছে। যাক কিচ্ছু এসে যায় না। যাবে কোথায়? দুদিন আগে আর পরে ধরা পড়বেই।'

আমি বললুম, 'অটো, এ চেষ্টা তুমি ছেড়ে দাও।'

ও চমকে আমার দিকে তাকাল।

বললুম, 'গট্‌ফ্রিড্ তো গেছেই। এতে তো আর ও ফিরে আসবে না।' নিজের কথায় আমি নিজেই একটু অবাক হচ্ছি।

কোষ্টার খুব আস্তে বলতে লাগল, 'বব্, জীবনে কত যে লোক মেরেছি তার হিসেব-কিতেব নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে একবার এক ইংরেজ ছোকরাকে হাওয়াই জাহাজ থেকে মেরেছিলুম। একেবারে ছেলেমানুষ, বয়স বোধ করি আঠারোর বেশি হবে না। পরে শুনেছিলুম সেই তার প্রথম আকাশে ওড়া। বেচারার এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে নিরুপায়। এখনো মনে পড়ে কি ভয়ার্ত ওর চেহারা। শিশুর মতো সরল মুখ। তবু তো ছাড়িনি। নির্দয় হাতে মেশিনগান্ চালিয়েছি। চোখের সামনে মাথার খুলিটা মুরগির ডিমের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সেই ছেলেটাকে চিনতুম জানতুম না। সে তো কখনো আমার অনিষ্ট করেনি। এই ঘটনাটা অনেকদিন কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধেছিল। লোকে বলেছে—লড়াই তো লড়াই—ওর মধ্যে দয়ামায়ার প্রশ্ন ওঠে না। তবু ঐ ছেলেটার মুখ ভুলতে পারিনি। আজ গট্‌ফ্রিড্‌কে যে খুন করেছে তাকে যদি অমনি ছেড়ে দিই, কুকুরের মতো তাকে যদি হত্যা না করি, তবে সেই ইংরেজ ছেলের হত্যা দ্বিগুণ হয়ে আমার মনকে বিঁধতে থাকবে। কি বল, ঠিক বলিনি?'

বললুম, 'ঠিকই বলেছ।'

কোষ্টার বলল, 'আচ্ছা, এবার তুমি বাড়ি যাও। আমি এর এস্পার-ওস্পার না করে ছাড়ছিনে; এটা একটা দেয়ালের মতো আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'না অটো, আমি বাড়ি যাচ্ছিনে। তুমি যা বলছ তাই যদি হয় তবে আমিই বা ছাড়ব কেন?'
ও রেগে উঠে বলল, 'বাজে কথা রাখ। তোমার সাহায্যের দরকার হবে না।'
আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। ও দলেবলে থাকলে আমি ধরব না, একলা পেলে তবেই ধরব, তুমি কিচ্ছু ভেব না।'
আমাকে এক রকম জোর করেই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে ও ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেল।
বুঝলুম ওকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাবে না। আর আমাকে কেন সঙ্গে নিল না তাও বুঝলুম। নিশ্চয় প্যাট্‌-এর কথা ভেবে।

ওখান থেকে সোজা আলফন্‌স-এর কাছে গেলুম। একমাত্র ওর সঙ্গেই এসব বিষয়ে পরামর্শ করা চলে। কিন্তু গিয়ে দেখি আলফন্‌স ওখানে নেই। একটি মেয়ে বসে-বসে ঝিমুচ্ছিল। বলল, 'ঘণ্টাখানেক আগে আলফন্‌স কোথায় এক মিটিং-এ গেছে।' একটা টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম।
আর কোনো লোকজন নেই। সেই মেয়েটি আগের মতোই বসে-বসে ঝিমোচ্ছে। আমিও বসে আছি অটো আর গট্‌ফ্রিড্‌-এর কথা ভাবছি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি ছাতের উপর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ সবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি কবর, পাশে কালো ক্রসের মাথায় একটি স্টীল হেলমেট ঝুলছে। নিজেই জানতে পারিনি কখন আমার দু চোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললুম।
আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর মনে হল কে যেন দ্রুতপদে বাড়ি ঢুকছে। সামনের দরজা খুলে আলফন্‌স ঘরে ঢুকল। মুখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম চকচক করছে।
'এই যে আলফন্‌স, কি খবর?'
'শিগ্‌গির এদিকে এস।'
ওর পিছন-পিছন ডানদিকের ছোট ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলুম। আলফন্‌স সোজা গিয়ে একটা আলমারি থেকে দুটো প্রাথমিক শুশ্রূষার প্যাকেট বের করল। একটানে ট্রাউজারটা খুলে ফেলে বলল, 'এস তো ব্যাণ্ডেজ কর।'
ঊরুতের কাছটাতে রক্ত। দেখে বললুম, 'গুলির আঘাত বলে মনে হচ্ছে?'

'তাই বৈকি। আগে ব্যাণ্ডেজ কর, পরে কথা হবে।'

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বললুম, 'আলফন্‌স, অটো কোথায় বল তো?'

ক্ষতটাকে চেপে ধরে আলফন্‌স বলল, 'অটো কোথায় আমি কেমন করে বলব?'

'তোমরা দুজন একসঙ্গে ছিলে না?'

'না তো।'

'ওকে তুমি দেখইনি?'

'উঁহু। নাও, ও প্যাকেটটাও খোল। এই উপরের দিকটাতে লাগিয়ে দাও, ওখানটা সামান্য একটু ছড়ে গেছে।'

ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেলে বললুম, 'আলফন্‌স জানো—আজকে ওকে আমরা—বুঝতে পারছ তো গট্‌ফ্রিড্‌-এর সেই ওকে—একবার দেখেছি—অটো ওর পিছন নিয়েছে।'

'এঁ্যা!' আলফন্‌স তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। 'কোথায় গেছে অটো? এক্ষুনি ভেগে আসতে বল। ওখানে যাবার মানে হয় না।' কাঁচিটা হাতে ছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও। কোথায় গেছে জানো তো? ওকে বোলো গট্‌ফ্রিড্‌-এর প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। তোমাদের আগেই আমি টের পেয়েছিলুম। দেখতেই তো পাচ্ছ। ও ঠিক গুলি চালিয়েছিল। প্রথমটায় ওর হাত সই করে মেরে তারপরে একবারে শেষ করে দিয়েছি। কিন্তু অটো কোন দিকটায় গেছে বল তো?'

'যদ্দুর মনে হচ্ছে মঙ্কস্ট্রাসের দিকে কোথাও।'

'যাক, তবু বাঁচোয়া। ও হতভাগা অনেকদিন আগে ও পাড়া ছেড়ে এসেছে। যাক, তবু অটোকে ওদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে এস।'

উঠে গিয়ে টেলিফোনে গুস্তাভ্‌কে ডাকলুম। এ সময়টাতে ও সাধারণত যে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে থাকে সেখানে ডাকতেই ওকে পাওয়া গেল। 'গুস্তাভ্‌, এক কাজ করতে পার ভাই, এক্ষুনি একবার ওয়াইজেনস্ট্রাস্ আর বেলাভিয়্প্লাৎস্-এর মোড়টাতে আসতে পার? খুব জলদি। আমি তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছি।' রিসিভার রেখে দিয়ে আলফন্‌স-এর কাছে ফিরে এলুম। ও তখন ট্রাউজার বদলে নতুন একটা পরছে। চিন্তিত মুখে বলল, 'তোমাদের এখন অন্য কোনো জায়গায় থাকা প্রয়োজন ছিল। তোমরা যে ব্যাপারের মধ্যে নেই সেটা প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষীসাবুদ প্রয়োজন হতে পারে। ধর পুলিস যদি খুন সম্পর্কে তোমাদের খোঁজ-খবর করে। বলা তো যায় না—'

বললুম, 'তোমার বেলায় কি হবে?'

'হুঁ, তুমিও যেমন। মেরেছি একেবারে ওর ঘরে গিয়ে। ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণীটি ছিল না, পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত না। তাছাড়া, আমার গায়ে বুলেটের আঘাত রয়েছে। বলতে পারব আত্মরক্ষার জন্য মেরেছি। আর সাক্ষীসাবুদের কথা যদি বল, কত চাই, অন্তত ডজনখানেক সাক্ষী হাজির করতে পারব। দেখ না কেন, ব্যাটা ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই গুলি চালিয়ে দিল।' আলফন্‌স চেয়ারে বসে আছে, মাথার চুলগুলো তখনো ঘামে ভেজা। একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মুখে কি অপরিসীম ক্লান্তি, চোখে সে কি দৃষ্টি—ওর চোখের দিকে চাওয়া যায় না। আজ এক মুহূর্তে বুঝতে পারলুম—ও এতদিন মনের মধ্যে কি যাতনা, কি হতাশা চেপে রেখেছিল। আস্তে-আস্তে ভাঙা গলায় বলল, 'যাক্, এবার গট্‌ফ্রিড্ শান্তি পাবে। এতদিন কেবলই মনে হত ও মরেও শান্তি পাচ্ছে না।' চুপচাপ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ও বলল, 'নাও দেরি কোরো না, এখন যাও।'

বার্-এর ভিতর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম। সেই মেয়েটি তখনো ঘুমোচ্ছে, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। বাইরে চমৎকার চাঁদের আলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেলভিয়ুপ্লাৎস-এ পৌঁছে গেলুম। হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

আমি পৌঁছতে না পৌঁছতে গুস্তাভ্‌ও এসে গেল। 'কি রবার্ট, ব্যাপার কী?'

'আর বোলো না, সন্ধ্যেবেলায় আমাদের গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে। এইমাত্র শুনলাম মঙ্কস্ট্রাসের দিকটাতে কে নাকি গাড়িটা দেখেছে। আমাকে একবার ওখানটাতে পৌঁছে দিতে পার?'

'আরে নিশ্চয়, নিশ্চয়। আর বল কেন, যা চুরি জুচ্চোরি শুরু হয়েছে। গাড়ি তো রোজই দু-চারটে চুরি হচ্ছে। তবে শুনছি নাকি ও সব ছ্যাঁচড়া চোর। যতক্ষণ পেট্রোলে কুলোয় এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে, তারপরে কোথাও গাড়ি ফেলে রেখে চলে যায়।'

'হ্যাঁ, বোধকরি আমাদেরটাও তাই করেছে।'

যেতে-যেতে গুস্তাভ্ বলল ও নাকি শিগগিরই বিয়ে করছে। বাচ্চা হবার সম্ভাবনা, কাজেই বিয়ে না করে আর উপায় নেই। মঙ্কষ্ট্রাসের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করলুম। তারপরে পাশের রাস্তাগুলোতেও খানিকক্ষণ খোঁজা-খুঁজি চলল। হঠাৎ গুস্তাভ্‌ই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ঐ তো তোমাদের গাড়ি।'

পাশের একটা অন্ধকার গলির মধ্যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থেকে নেমে আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা ভাই গুস্তাভ্, অনেক ধন্যবাদ।'

গুস্তাভ্ বলল, 'কোথাও বসে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিলে হত না?'

'না ভাই, আজ নয়, কালকে হবে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হচ্ছে।'

ওকে ভাড়াটা দেবার জন্য পকেট থেকে পয়সা বের করতে যাচ্ছিলুম। গুস্তাভ্ বলল. 'পাগল হয়েছ?'

'আচ্ছা তবে ধন্যবাদ। তুমি আর দেরি কোরো না ভাই। কাল দেখা হবে।'

গুস্তাভ্ নড়ছে না। বলল, 'একটু খুঁজে দেখলে হত না? যে ব্যাটা চুরি করেছে তাকে ধরতে পারলে কিছু উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করা যেত।'

'আরে সে কি আর এতক্ষণ এখানে আছে? কখন ভেগে গেছে।' যতই দেরি হচ্ছে আমি ততই অধৈর্য হয়ে উঠছি।

গুস্তাভ্ আবার জিগগেস করল, 'গাড়িতে পেট্রল আছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যথেষ্ট। ও আমি আগেই দেখে নিয়েছি। গুড্‌নাইট গুস্তাভ্।'

গুস্তাভ্ চলে গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমিও গাড়ি নিয়ে রওনা হলুম; খুব আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে মঙ্কস্ট্রাস-এর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি গেলুম। ঘুরে ফিরে আবার যখন এদিকটাতে এসেছি তখন দেখি মোড়ের কাছে কোষ্টার দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে অবাক, 'এ কি ব্যাপার?'

বললুম, 'জলদি গাড়িতে উঠে পড়। এখানে তোমাকে আর ঘুরতে হবে না। আমি এই আলফন্‌স-এর কাছ থেকে আসছি। সে তার দেখা পেয়ে গেছে।'

'এ্যাঁ? তাহলে—'

'হ্যাঁ, কাজ সমাধা হয়ে গেছে।'

কোষ্টার আর কথাটি না বলে গাড়িতে উঠে বসল। আমিই গাড়ি চালাচ্ছি, কোষ্টার হাত-পা গুটিয়ে পাশে বসে। বললুম, চল আমার ওখানেই যাওয়া যাক।'

ও মাথা নেড়ে বলল, 'তাই চল।'

খালের পাশের রাস্তা ধরে যাচ্ছি। খালের জলটা একটা রুপোর পাতের মতো দেখাচ্ছে। ওপারের বাড়িগুলো অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো অস্পষ্ট। বাড়ির ছাত ছাড়িয়ে ক্যাথিড্রালের চুড়োগুলো চাঁদের আলোয় রুপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। আমি বললুম, 'যাক্, ব্যাপারটা যে এই ভাবে চুকেছে তাতে আমি খুশিই হয়েছি অটো।'

অটো বলল, 'কিন্তু আমি খুশি হইনি। আমি ভেবেছিলুম নিজের হাতে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব।'

ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলার শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, 'আপনার একটা টেলিগ্রাম আছে।'

'টেলিগ্রাম?' আমি তখনো আজকের ঘটনাটার কথাই ভাবছিলুম। টেলিগ্রামের কথা শুনবামাত্র চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলুম। টেলিগ্রামটা টেবিলের উপরেই পড়ে আছে। একটানে খামটা ছিঁড়ে ফেললুম। বুক দুরদুর করছে। লেখাগুলো ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছি না। মাথা ঠিক করে পড়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। টেলিগ্রামটা কোষ্টার-এর হাতে দিয়ে বললুম, 'বাবাঃ, বাঁচা গেল, আমি ভেবেছিলুম—'

টেলিগ্রামে চারটি মাত্র কথা লেখা : 'রব্বি শিগগির চলে এস।'

কাগজটা আর একবার হাতে নিয়ে পড়লুম। প্রথমটায় যেমন আশ্বস্ত বোধ করে-ছিলুম, এখন আবার তেমনি ভয় হতে লাগল, 'কী হতে পারে বল তো, অটো? আর একটু খুলে লিখল না কেন? নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে।'

কোষ্টার টেলিগ্রামটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে জিগগেস করল, 'ওর চিঠি কদিন আগে পেয়েছ?'

'ঠিক এক সপ্তাহ আগে।'

'এক কাজ কর, টেলিফোন করে ব্যাপারটা জেনে নাও। সত্যি কিছু হয়ে থাকলে আমরা এক্ষুনি মোটর নিয়ে রওনা হয়ে যাব। আচ্ছা, তোমার কাছে টাইমটেব্‌ল্‌ আছে?'

তক্ষুনি গিয়ে ট্রাঙ্ক কল্‌ করে দিলুম। ফ্রাউ জালেওয়াস্কির ঘর থেকে টাইমটেব্‌ল্‌ চেয়ে নিয়ে এলুম। কোষ্টার বসে-বসে তাই দেখছে আর আমি স্যানাটোরিয়ম থেকে জবাবের অপেক্ষায় বসে আছি। কোষ্টার বলল, 'নাঃ, কালকে দুপুরের আগে সুবিধে মতো গাড়ি দেখছিনে। মোটরে বেরিয়ে পড়াই উচিত হবে। রাস্তায় ট্রেন পেয়ে গেলে উঠে পড়লেই হল। মোটরে গেলে কিছু সময় তো নিশ্চয় বাঁচবে, কি বল?'

বললুম, 'তা তো বটেই।'

টেলিফোন বেজে উঠল। স্যানাটোরিয়ম থেকে কথা বলছে। প্যাট্‌-এর খোঁজ করলুম। মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই মেট্রন ফোন ধরে বলল, 'প্যাট্‌-এর এখন কথা কওয়া নিষেধ।'

'কেন, কি হয়েছে বলুন তো।'
'এই ক'দিন হল মুখ দিয়ে একটু রক্ত উঠেছে। সঙ্গে জ্বরও রয়েছে।'
'আচ্ছা, ওকে বলুন আমি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে কোষ্টার আর কার্ল আসছে। আমরা এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। বুঝলেন তো ?'
'কি বললেন—কোষ্টার আর কার্ল ?'
'হ্যাঁ, ওকে বলুন আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি।'
'আচ্ছা, আমি এক্ষুনি বলছি।'
টেলিফোন ছেড়ে ঘরে গিয়ে দেখি কোষ্টার যত সব ট্রেনের সময় নোট করে নিচ্ছে। আমাকে বলল, তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও, আমি বাড়ি গিয়ে আমার জিনিসপত্তর নিয়ে আসছি। আধঘণ্টার মধ্যেই চলে আসব।'
আমার ট্রাঙ্কটি নামিয়ে নিলুম। এটা সেই লেন্‌ত্‌স-এর ট্রাঙ্ক—নানা রঙের লেবেল আঁটা। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে 'ইন্‌টারন্যাশনাল'-এর মালিকের কাছে ছুটির ব্যবস্থা করে নিলুম। এদিককার সব চুকিয়ে কোষ্টারের অপেক্ষায় জানালার ধারে বসে রইলুম। ছাইভস্ম কত কি মনে হতে লাগল, কিন্তু যেই না ভাবা কালকে সন্ধ্যেবেলায় ওখানে পৌঁছে যাব, এতক্ষণে প্যাট্-এর কাছে থাকব, অমনি এক-মুহূর্তে সব ভয়-ভাবনা উদ্বেগ-আশঙ্কা কোথায় মিলিয়ে গেল। কালকে সন্ধ্যায় প্যাট্ আর আমি—সে কি অভাবনীয় সুখ, কখনো যে তা সম্ভব হবে এ কথা এতদিন ভাবতেই পারিনি। এই অল্প দিনের মধ্যে কত কি ঘটে গেল—সুখের কথা আর ভাবাই যায় না।
ব্যাগ নিয়ে নিচে এলুম। একমুহূর্তে সব কিছুর মূর্তি বদলে গেছে—এতদিনের পুরোনো জীর্ণ সিঁড়িটা তাও নতুন লাগছে, বাড়ির পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধটাও নাকে অন্য রকম ঠেকছে। আর পিচ-বাঁধানো রাস্তাটা চাঁদের আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঐ তো কার্ল এসে গেল। কোষ্টার বলল, 'কয়েকটা কম্বল নিয়ে এলুম। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বেশ করে জড়িয়ে বস।'
আমি বললুম, 'কিন্তু দুজনে মিলেই হাত বদল করে ড্রাইভ করব, কেমন তো ?'
'বেশ। তা গোড়ার দিকটায় আমিই ড্রাইভ করি। বিকেলের দিকে আমি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি কিনা।'
আধঘণ্টার মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গেলুম। চারদিক নিস্তব্ধ, ফুটফুটে জ্যোৎস্না। যতদূর দেখা যায় রাস্তাটা একটা শাদা রেখার মতো চলে গেছে। এত পরিষ্কার রাস্তা, সার্চলাইটের দরকার হয় না। এঞ্জিনের শব্দটা একটানা

অর্গানের আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে। কোষ্টার বলল, 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও না।'

'না অটো, ঘুম পাবে না।'

'ঘুম নাই বা হল। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে শরীরের গ্লানি কাটে। অল্প-স্বল্প রাস্তা তো নয়—জার্মানির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।'

'নাঃ, এমনি বসে থাকলেই আমার বিশ্রাম হবে।'

কোষ্টার-এর পাশেই বসে রইলুম। পূর্ণিমার চাঁদ আস্তে-আস্তে আকাশ পাড়ি দিয়ে চলেছে। মাঠ-ঘাঠ জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে। মাঝে-মাঝে এক একটা গ্রাম যেন পাশ দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, কোথাও বা ছোট্ট কোনো ঘুমন্ত শহরের বুকের উপর দিয়ে আমরা ছুটে যাচ্ছি, রাস্তার দুধারে বাড়িগুলো চলচ্চিত্রের ছায়ামূর্তির মতো দ্রুত সরে-সরে যাচ্ছে।

সকালের দিকটাতে বেশ শীত করতে লাগল। বনে হাওয়া দিয়েছে। আকাশের রঙ ঈষৎ ধূসর, মাঠ শিশিরে ছাওয়া, আর এখানে-ওখানে চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। এবার আমি গিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ বসলুম। বেলা আন্দাজ দশটা নাগাদ একটা সরাইখানার কাছে গাড়ি থামিয়ে দুজনে কিছু খেয়ে নিলুম। বারোটা অবধি আমিই ড্রাইভ করলুম। তারপরে আবার কোষ্টার ষ্টিয়ারিং-এ বসল। ও আমার চাইতে ঢের বেশি স্পীডে যায়।

বিকেলের দিকে সবে যখন অন্ধকার হতে শুরু করেছে, তখন আমরা পাহাড়ী অঞ্চলে এসে পৌঁছেচি। সঙ্গে শেকল আর শাবল আনতে ভুলিনি। রাস্তায় অটোমবিল ক্লাবের সেক্রেটারিকে জিগগেস করলুম, 'মোটরে কদ্দুর অবধি যাওয়া যাবে?'

সেক্রেটারি বলল, 'সঙ্গে যখন হাতিয়ার রয়েছে তখন শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না। এ বছর বরফ খুব কম পড়েছে। তবে একেবারে শেষ কয়েক মাইলের অবস্থা কি দাঁড়াবে বলতে পারিনে। ওদিকটাতে হয়তো আটকে যেতে পারেন।'

আমরা ট্রেনের অনেক আগে চলে এসেছি। ভাবলুম, একবার চেষ্টা করেই দেখি, যতদূর যাওয়া যায়। শীতটা যখন বেশ পড়েছে তখন অন্তত কুশায়ার ভয় নেই। গাড়িটা এঁকেবেঁকে ঠিক উঠে যাচ্ছে। আধাআধি রাস্তা উঠে গাড়ির চাকায় শেকল লাগাতে হল। রাস্তা আগে থেকেই শাবল দিয়ে পরিষ্কার করা ছিল, কিন্তু তার উপরেও আবার বরফের এক আস্তরণ পড়েছে, কাজেই গাড়িটা দুলে-দুলে

ঠোক্কর খেতে-খেতে চলেছে। মাঝে-মাঝে নেমে গাড়ি ঠেলতে হচ্ছে। দুবার তো চাকা একেবারে বসে গিয়েছিল। বরফ খুঁড়ে তবে কার্লকে বের করতে হল। শেষ গ্রামটা পার হবার আগে একজন লোকের কাছ থেকে চেয়ে দু-বালতি বালি নিলুম। এ গ্রামটা খুব উঁচুতে। এখান থেকে আমাদের নিচুতে নামতে হবে। ঢালু পথটাও যদি বরফে ঢাকা থাকে তবে মুশকিল হবে। এইজন্যই সাবধান হতে হল। রীতিমতো অন্ধকার, রাস্তাটা ক্রমেই সরু হয়ে নিচে নেমে গেছে। গাড়ি খুব আস্তে-আস্তে এঁকেবেঁকে নামছে। দূরে আর এক সারি উঁচু পাহাড় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নামতে-নামতে হঠাৎ ফাঁকা জায়গায় নেমে এলুম। অদূরে একে-একে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রামের আলো দেখা দিতে লাগল।

গাড়ি এখন গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দোকানপাট। হঠাৎ গাড়ির শব্দে চমকে উঠে পথ চলতি মানুষ ত্রস্ত একধারে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলো মোটর দেখতে তেমন অভ্যস্ত নয়। ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। দু-চারটে মোড় ঘুরেই কার্ল একেবারে স্যানাটোরিয়মের আঙিনায় এসে ঢুকল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। চারদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কোনোদিকে দৃকপাত না করে ছুটে গিয়ে লিফ্‌টে উঠলুম। এক ছুটে করিডর পার হয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললুম। দেখি সুমুখেই প্যাট্—ঠিক যেমনটি ওকে সহস্রবার দেখেছি মনে-মনে স্বপ্নে সাধে জড়িয়ে। প্যাট্ও ছুটে এগিয়ে এল। দু-হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। বুকের মধ্যে নতুন জীবনের সাড়া পেলুম।

বুকের তোলপাড়টা বন্ধ হলে আস্তে-আস্তে বললুম, 'বাঁচালে, আমি ভেবেছিলুম এসে দেখব তুমি শয্যাশায়ী।'

ও আমার কাঁধে মাথাটি রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে আমার মুখ তুলে ধরল, 'আশ্চর্য! তুমি সত্যি-সত্যি আসবে ভাবতেই পারিনি।' তারপরে আস্তে খুব সাবধানে একটু যেন ভয়ে-ভয়ে আমার মুখে চুমু খেল। আমার মনটা তখনো থিতোয়নি। মনে হচ্ছে এখনো রাস্তায় আছি, এঞ্জিনের গর্জন শুনছি। ওর চুম্বনের স্পর্শে হঠাৎ যেন শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'যা জোরে এসেছি কি বলব।'

প্যাট্ কোনো জবাব দিল না। ও শুধু একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মুখে-চোখে ও যেন কি খুঁজছে। ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ওর কাঁধে হাত রেখে চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলুম।

প্যাট্ জিগগেস করল, 'তুমি এখন থাকছ তো ?'

ঘাড় হেলিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

'স্পষ্ট করে বল, আবার চলে যাবে নাকি ?'

একবার ভাবলুম বলি, এখনো বলতে পারছিনে। একবার হয়তো যেতে হবে কারণ থাকবার মতো টাকা সঙ্গে নেই। কিন্তু ও যেভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কিছুতেই ও কথা বলতে পারলুম না। বললুম, 'হ্যাঁ, থাকব বৈকি। দুজনে একসঙ্গে ফিরে যাব।'

ওর মুখ ক্ষণিকের জন্য একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভারি করুণ সুরে বলল, 'তুমি চলে গেলে সত্যি আমি আর থাকতে পারব না।'

ও যেখানটায় দাঁড়িয়েছে ঠিক তার পিছনেই টেম্পারেচার চার্ট টাঙানো রয়েছে। আমি ওর কাঁধের উপর দিয়ে চার্টটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম। ও কেমন করে তাই টের পেয়ে একটানে ফ্রেম থেকে কাগজটা বের করে নিল। সেটাকে মুচড়ে দুমড়ে খাটের তলায় ফেলে দিল। বলল, 'ও সব দিয়ে কি হবে ?'

কাগজটা কোথায় গিয়ে পড়েছে দেখে রাখলুম। ও দেখতে না পায় এমনিভাবে এক সময়ে ওটা কুড়িয়ে নেব। জিগগেস করলুম, 'তোমার অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল ?'

'না এই সামান্য। তাও সেরে গেছে।'

'ডাক্তার কি বলছেন ?'

ও হেসে বলল, 'এখন ডাক্তারের কথা জিগগেস কোরো না, কোনো কথাই জিগগেস কোরো না। তুমি এসেছ, সে-ই আসল কথা।'

কেবল মনে হচ্ছে ও যেন আর আগের মতো নেই, অনেকটা বদলে গেছে। জানি না অনেকদিন পরে দেখছি বলেই এরকম মনে হচ্ছে কিনা। ও যেন আগের চাইতে আরো সুন্দর হয়েছে, দেহের সান্নিধ্যটি আগের চাইতে উষ্ণতর। চলন বলন সব বদলে গেছে। এমন কি ও আমাকে ভালোবাসে কিনা সে কথাটাই আগে স্পষ্ট বোঝা যেত না। কিন্তু আজকে সেটা আর অস্পষ্ট নয়, যেন ও কিছুই আর আমার কাছে লুকোতে চায় না। আগে ছিল ও দূরের মানুষ, আজকে একেবারে কাছে এসে ধরা দিয়েছে। এত সুন্দর, এত রমণীয়, এত জীবন্ত, ওকে আগে কখনো দেখিনি। অথচ সেজন্যই আরো যেন বেশি অস্বস্তি লাগছে।

বললুম, 'প্যাট্, আমি একবার নিচে যাচ্ছি। কোষ্টার অপেক্ষা করছে। তাছাড়া, কোথায় থাকা যায় সেটারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কোষ্টার ? লেন্‌ত্‌স আসেনি ?'
'লেন্‌ত্‌স ? না—লেন্‌ত্‌স ওখানেই রয়েছে।'
যাক, ও কিছু বুঝতে পারেনি। জিগগেস করলুম, 'তুমি কি নিচে নামতে পারবে, না একটু পরে আমরাই উপরে আসব ?'
'পারব না কেন ? এখন আমি সব পারব। নিচে গিয়ে সবাই একসঙ্গে বসে কিছু না হয় পান করা যাবে। তোমরা খাবে, আমি দেখব।'
'বেশ, তাহলে তোমার জন্য আমরা হল্‌-এ অপেক্ষা করব।'
কাপড়-জামা বের করবার জন্য ও আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। আমি সেই সুযোগে দুমড়ানো টেম্পারেচার চার্টটি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেললুম। বললুম, 'আচ্ছা প্যাট্, দু-মিনিট পরেই আবার দেখা হবে।'
'রব্বি,' বলে ও আবার ফিরে এসে দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। 'তোমাকে কত কথা বলব বলে ভেবে রেখেছি।'
'আমারও তো কত কথা বলবার আছে, প্যাট্। কিন্তু ব্যস্ত কি ? এখন তো আর আমাদের সময়ের অভাব নেই। সারাদিন বসে-বসে দুজনে কথা বলব। সে সব কালকে হবে। প্রথমটাতে কেমন যেন সব কথা মনে আসছে না।'
ও মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দুজনে দুজনের মনের কথা সব খুলে বলব। আমার কোনো কথা তোমার কাছে অজানা থাকবে না আর তোমার কথা আমার কাছে। মনে হবে দুজনে যেন চিরকাল একসঙ্গে ছিলুম।'
আমি বললুম, 'যাই বল, আমরা তো একসঙ্গে আছি।'
প্যাট্ মৃদু হেসে বলল, 'না, রব্বি, আমার মনে অত জোর নেই। একলা থাকলে আমি মনে কোনো সান্ত্বনা পাই না। যদি ভালো না বাসতুম তবে হয়তো একলা থাকা সম্ভব হত। যে একবার ভালোবেসেছে সে-ই বুঝবে একলা থাকা কি কষ্ট।'
ওর মুখে তখনো হাসিটি লেগে আছে, কিন্তু সে হাসি কান্নার চাইতেও করুণ। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'প্যাট্, আমি জানি তোমার মনে খুব জোর আছে।'
প্যাট্ মুখে কিছু বলল না, কিন্তু ততক্ষণে ওর চোখের পাতা ভিজে উঠেছে।
নিচে কোষ্টার-এর কাছে ফিরে গেলুম। গাড়ি থেকে আমাদের মালপত্র নামানো হয়ে গেছে। হাসপাতালের লাগোয়া বাড়িটাতে পাশাপাশি দুটি ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছে। টেম্পারেচার চার্টটা ওর হাতে দিয়ে বললুম, 'এটা একবার দেখ তো, জ্বরটার কি অবস্থা।'

স্মুখের চাতালে পায়চারি করতে-করতে কোষ্টার বলল, 'কালকে ডাক্তারকে জিগগেস করলেই হবে। টেম্পারেচার দেখে কিছু বোঝা যায় না।'
আমি বললুম, 'খুব বোঝা যায়।' কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিলুম।
মুখ হাত ধুয়ে কোষ্টার তৈরি হয়ে এল। আমাকে বলল, 'কই, জামা-কাপড় বদলে নাও।'
'ওঃ, হ্যাঁ,' বলে আমি যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠলুম। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে দুজনে স্যানাটোরিয়মে ফিরে এলুম। কার্ল তখনো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। কোষ্টার রেডিয়েটরের উপরে একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। জিগগেস করলুম, 'আমরা কবে ফিরছি, অটো।'
চলতে-চলতে একটু থমকে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'আমি তো কালকে রাত্তিরে কিম্বা পরশু সকালে ফিরছি। তোমাকে এখন থাকতে হবে—'
আমি বললুম, 'সে কেমন করে হবে? যা টাকা আছে তাতে বড় জোর দশদিন চলতে পারে। তাছাড়া স্যানাটোরিয়মেও এই পনেরো তারিখ অবধি মাত্র প্যাট্-এর টাকা জমা দেওয়া আছে। তারপরে কেমন করে চলবে? আর কিছু না হোক টাকা রোজগারের জন্যই আমার যাওয়া দরকার। আমার মতো পিয়ানো বাজিয়ের এখানে কোনো চাকরি জুটবার লক্ষণ তো দেখছিনে।'
কোষ্টার কম্বলের ঢাকনাটা তুলে রেডিয়েটারটা একবার দেখে নিল। তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এখন তো থেকে যাও, টাকার ব্যবস্থা আমি দেখছি, তোমাকে তাই নিয়ে ভাবতে হবে না।'
বললুম, 'অটো, সব বেচে দিয়ে তোমার হাতে কী আছে তা আমি জানি। বোধ করি তিনশো মার্কও হবে না।'
'সে টাকার কথা বলছিনে। টাকা আমি যোগাড় করব। তুমি কিচ্ছু ভেবোই না, আটদিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবে।'
একটু ঠাট্টার স্বরে বললুম, 'কোথাও সম্পত্তি-টম্পত্তি পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে?'
'যাই পাই না কেন, সে সব আমি বুঝব। আসল কথা, তোমার এখন যাওয়া হবে না।'
'তাই তো দেখছি। যাওয়ার কথা ওর কাছে তুলতেই পারব না।'
রেডিয়েটার আবার কম্বল চাপা দিয়ে রেখে আমরা হল্-এ গিয়ে বসলুম।
'কটা বাজে বল তো?'

কোষ্টার ঘড়ি দেখে বলল, 'সাড়ে-ছটা।'

'আশ্চর্য ! আমি ভেবেছিলুম বেশ রাত হয়ে গেছে।'

প্যাট্ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। দ্রুতপদে হল্ পার হয়ে কোষ্টারকে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল। ফার-এর জ্যাকেট গায়ে। এই প্রথম লক্ষ্য করে দেখলুম ওর গায়ের রঙে একটু বাদামী পোঁচ লেগেছে—লালচে ব্রোঞ্জ-এর রঙ। ঠিক একটি রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখখানা আগের চেয়ে শীর্ণ আর চোখ দুটি অতিরিক্ত জলজলে। জিগগেস করলুম 'তোমার জ্বর-টর হয়নি তো ?'

প্যাট্ কথাটাকে তেমন আমল না দিয়ে বলল, 'ও কিছু নয়। রাত্তিরের দিকে এখানে সবারই এক-আধটু টেম্পারেচার হয়। তাছাড়া তোমরা এসেছ বলেই হয়তো—যাকগে, তোমরা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ?'

'না তো, কেন ?'

'তাহলে চল, বার্-এ গিয়ে বসি।'

'এঁ্যা এখানে আবার বার্ আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, আছে ছোট একটি বার্—অন্তত বার্-এর মতো দেখতে। জানো, এটাও এখানকার চিকিৎসার একটা অঙ্গ। হাসপাতালটাকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাসপাতাল বলে মনে না হয়। অবশ্যি ডাক্তারের হুকুম ছাড়া রোগীরা কিছু খেতে পায় না।'

বার্ তখন ভর্তি। কয়েকজনের সঙ্গে প্যাট্-এর নমস্কার আদান-প্রদান হল। বিশেষ করে একজন ইটালিয়ানকে লক্ষ্য করলুম। যাক্, তক্ষুনি একটা টেবিল খালি হওয়াতে তবু বসবার একটু জায়গা পাওয়া গেল।

প্যাট্কে জিগগেস করলুম, 'কী খাবে ?'

'ওখানকার বার-এ প্রায়ই যা খেতাম। রাম্ মেশানো কক্‌টেল্।'

যে মেয়েটি টেবিলে পরিবেশন করছিল, তাকে বললুম, 'আর্ধেক পোর্ট আর আর্ধেক জামাইকা রাম মিশিয়ে দাও।'

প্যাট্ ডেকে বলল, 'দুটো আর একটা স্পেশাল।'

মেয়েটি দু-গ্লাশ পোর্টো রঙ্কো এনে দিল আর এক গ্লাশে চমকা রঙের লাল মতো একটা পানীয়। সেটা তুলে নিয়ে প্যাট্ বলল, 'এটা আমার।'

এদিকে মেয়েটি যেই না একটু সরে গেছে প্যাট্ তক্ষুনি আমার গ্লাশটি টেনে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল, 'আঃ, কি চমৎকার !' আমি ওর গ্লাশটা তুলে নিয়ে বললুম, 'তোমার এটা কি পদার্থ, দেখি।' মুখে দিয়ে দেখলুম, ওটা র‍্যাস্পবেরি

আর লেবু মেশানো সরবত। এক ফোঁটাও মাদকদ্রব্য নেই। বললুম, 'কিন্তু বেশ তো খেতে।'

প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, তেষ্টা মেটাবার পক্ষে মন্দ নয়।' হাসতে-হাসতে বলল, 'আর এক গ্লাশ পোর্টো-রঙ্কো দিতে বল। তোমার জন্যে বোলো, আমাকে দেবে না।'

মেয়েটিকে ডেকে বললুম, 'একটা পোর্টো-রঙ্কো, আর একটা স্পেশ্যাল।'

তাকিয়ে দেখলুম টেবিলে-টেবিলে স্পেশাল জিনিসটা খুব চলছে।

দ্বিতীয়বার পানীয় এল। প্যাট্ ছেলেমানুষের মতো বায়না করে বলতে লাগল, 'রব্বি, শুধু আজকের দিনটা, আমাকে নিষেধ কোরো না। কেমন কোষ্টার, আপত্তি নেই তো?' বলে আমার গ্লাশ নিল ও, আর ওর স্পেশাল নিলুম আমি।

বললুম, 'তোমার স্পেশাল খেতে কিন্তু বেশ।'

প্যাট্ বলল, 'আমি ও জিনিসটা দু-চক্ষে দেখতে পারি না। রাত্তিরে খাবারের সঙ্গে অবিশ্যি আমাদের একটু আসল মদ দেওয়া হয়। লাল টকটকে মদ।'

পর-পর আরো কয়েকবার পোর্টো-রঙ্কোর ফরমাস হল। তারপরে সেখান থেকে উঠে আমরা খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলুম। প্যাট্কে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখখানা খুশিতে ঝলমল করছে। জানালার ধারে একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে আমরা বসেছি। দূরে বরফে-ঢাকা গ্রামের আলো দেখা যাচ্ছে।

প্যাট্কে জিগগেস করলুম, 'হেল্‌গা গুট্‌ম্যানকে দেখছিনে, সে কোথায়?'

প্যাট্ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে! এরই মধ্যে?'

আবার একটু চুপ করে থেকে প্যাট্ বলল, 'হ্যাঁ, এরই মধ্যে।' এবার ওর বলার ধরন দেখে আসল কথা বুঝে নিলুম।

পরিবেশনকারিণী মেয়েটি লাল টকটকে মদ নিয়ে এল। কোষ্টার গ্লাশে-গ্লাশে ঢেলে দিল। সবগুলো টেবিল ভর্তি। খুব হাসি গল্প চলছে। কখন এক সময় প্যাট্ আমার হাতটি নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে। খুব আস্তে কানে-কানে বলার মতো করে বলল, 'লক্ষ্মীটি, একলা একলা আমি আর পারছিলুম না।'

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বড় ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। অটো হল্-এ আমার অপেক্ষায় বসেছিল। তাকে নিয়ে বাইরে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলুম, বললুম, 'খুব খারাপ, অটো। যা ভেবেছিলুম তার চাইতেও খারাপ।'

কোষ্টার বলল, 'বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছ তো?'

'হ্যাঁ, উনি অনেক কথা বললেন। যথেষ্ট রেখে-ঢেকে চেপে-চুপেই বলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু করলে কি হবে বেশ বোঝা গেল অবস্থাটা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। অথচ উনি বলতে চান আগের চাইতে ভালো আছে।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

'অর্থাৎ ডাক্তার বলছেন এখানে না এসে যদি ওখানেই থাকত তবে এতদিনে কোনো আশাই থাকত না। এখানে আসাতে রোগটা তেমন দ্রুত বাড়তে পারেনি। সেটাকেই তিনি ভালো বলছেন।'

কোষ্টার জুতোর গোড়ালি দিয়ে বরফের উপর দাগ কাটতে লাগল। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে উনি আশা দিচ্ছেন?'

'ডাক্তারেরা তো সব সময়েই আশা দেন। নইলে ওদের ব্যবসা চলে না। যাই বল আমার একটুও ভরসা নেই। ডাক্তারকে জিগগেস করেছিলুম নিউমো-থোরাক্স করে দেখলে কেমন হয়। উনি বললেন এখন তাতে কিচ্ছু ফল হবে না। কয়েক বছর আগে ওর সে চিকিৎসা একবার হয়ে গেছে। এখন দুটো ফুসফুসেই ধরে গেছে। কাজেই বুঝতেই তো পারছ।'

'ডাক্তার আর কী বললেন?'

'কী আর বলবেন? কেমন করে এই রোগ হল সেই সব কথা বলছিলেন। প্যাট্-এর বয়েসী অনেক রোগী নাকি উনি পেয়েছেন। বললেন এসব হচ্ছে লড়াইয়ের ফল। ঠিক উঠতি বয়েসটাতে উপযুক্ত খোরাক পায়নি। যাকগে, ও যদি সেরেই

না উঠল, তবে এসব বক্তৃতা শুনে আমার কি লাভ হবে?' একটু থেমে বললুম, 'অবশ্য উনি বলছিলেন কখনো-কখনো অসম্ভবও সম্ভব হতে দেখেছেন। যে রোগীর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেও সেরে উঠেছে। বিশেষ করে এই রোগেই সেটা হয়। নিতান্ত মুমূর্ষু অবস্থা থেকে কোনো-কোনো রোগী আপনি ভালো হয়ে গেছে। জাফেও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। তবে আমি ঐসব অসম্ভবে বিশ্বাস করি না।'

কোষ্টার কোনো জবাব দিল না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইলুম। কিই বা বলবার আছে? জীবনে আমরা এত কিছু ঘটতে দেখেছি যে একজন আর একজনকে সান্ত্বনা দেবার মতো আর কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পরে কোষ্টার বলল, 'কিন্তু বব্, প্যাট্ যেন কিছু জানতে না পারে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে তো বটেই।'

আরো কিছুক্ষণ অমনি বসে রইলুম। প্যাট্-এর এখানে আসবার কথা।

আমি এখন কিছুই ভাবছি না। এমন কি মনের মধ্যে দুঃখ হতাশার ভাবও নেই। ভাবনা চিন্তা বুদ্ধিসুদ্ধি সব গোল পাকিয়ে গেছে।

কোষ্টার বলল. 'ঐ যে প্যাট্ আসছে।'

প্যাট্ দূর থেকেই 'হ্যালো' বলে চেঁচিয়ে উঠল। হাসতে-হাসতে টলতে-টলতে ও আসছে। বলল, 'জানো, আমি নেশা করে এসেছি। আমাকে রোদের নেশায় পেয়েছে। অনেকক্ষণ রোদে শুয়ে থাকবার পরে আমার কেমন যেন মাতালের মতো পা টলতে থাকে।'

প্যাট্ কাছে এসে দাঁড়াবামাত্র সব যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। সমস্ত চিন্তা ভাবনা ডাক্তারের কথাবার্তা সব ভুলে গেলুম। যে অসম্ভবটাকে একটু আগে উড়িয়েই দিয়েছিলুম সেটাই এখন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এই তো প্যাট্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসছে, কথা বলছে। ব্যস্ এই ঢের, আর কিছু চাইনে। আমাদের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে প্যাট্ বলে উঠল, 'ওকি, তোমরা অমন গোমড়া মুখ করে বসে আছ কেন?'

কোষ্টার বলল, 'শহুরে মানুষ কিনা, এখানে আমরা ঠিক খাপ খাচ্ছি না। রোদ আমাদের ধাতে সয় না।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'আজকের দিনটা আমার ভালো যাবে মনে হচ্ছে, টেম্পারেচার হয়নি। একটু বেড়িয়ে এলে হত। চল না হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামের দিকে যাওয়া যাক।'

'খুব ভালো কথা, চল।'

কোষ্টার বলল, 'একটা স্লেজ্-গাড়ি নিলে হত।'

প্যাট্ বলল, 'না, আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

কোষ্টার বলল, 'সেজন্য বলছি না, আমি কোনোকালে ও গাড়িতে চড়িনি কিনা, একবার চড়ে দেখবার ইচ্ছে।'

একটা গাড়ি ডেকে এনে গ্রামের দিকে রওনা হলুম। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি কাফে, সামনে সুন্দর লন্। সেখানটাতে নেমে পড়লুম। লোকের বেশ ভিড়। স্যানাটোরিয়মের অনেক চেনা মুখ চোখে পড়ল। কালকে বার্-এ যে ইটালিয়ানটিকে দেখেছিলুম সেও ওখানে। ওর নাম এ্যাণ্টনিও। প্যাট্কে নমস্কার করে আমাদের টেবিলেই এসে বসল। লোকটি হাসি খুশি আমুদে প্রকৃতির মানুষ। বলল, 'কালকে রাত্তিরে কজনে মিলে এক মজা করেছে—আমাদের এক রোগীকে ঘুমের মধ্যে বিছানা-পত্তর খাট-ফাট সমেত টেনে নিয়ে একেবারে মান্ধাতার আমলের এক ইস্কুল মিস্ট্রেসের ঘরে রেখে এসেছে।'

আমি জিগগেস করলুম, 'এ রকম করবার কারণ?'

এ্যাণ্টনিও বলল, 'ওর অসুখ সেরে গেছে কিনা, শিগগিরই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে। এ রকম ব্যাপার এখানে হামেসাই হয়।'

প্যাট্ বলল. 'বুঝতে পারছ না। এটা হল এখানকার একটা মর্মান্তিক ঠাট্টা। যারা পড়ে থাকে এই রকম ঠাট্টা-তামাশা করেই তারা মনকে ফুর্তিতে রাখে।'

এ্যাণ্টনিও লজ্জিত হয়ে বলল, 'এখানে এলে সবাই একটু ছেলেমানুষ মতো হয়ে যায়।'

অনেকক্ষণ ধরে এই কথাটাই মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল—তাহলে কেউ-কেউ সত্যি-সত্যি আরোগ্য হয়, আবার বাড়ি ফিরে যায়! প্যাট্কে জিগগেস করলুম, 'কী খাবে বল?'

প্যাট্ বলল, 'ভালো দেখে মার্টিনি দিতে বল।'

রেডিওতে ভিয়েনিজ্ ওয়াল্‌স্ বাজছে। ওয়েটার তিন গ্লাশ মার্টিনি দিয়ে গেল। সদ্য-ঢালা পানীয়ের গ্লাশে ছোট-ছোট বুদ্বুদের কৌটা চোখ মেলছে আর বুজছে। তাতে আবার সূর্যের আলো পড়ে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করছে।

প্যাট্ বলল, 'বেশ লাগে এমনি বসে থাকতে।'

বললুম. 'হ্যাঁ, চমৎকার।'

প্যাট্ বলল, 'কিন্তু তবু এক-এক সময়ে যেন অসহ্য বোধ হয়।'

প্যাট্-এর ইচ্ছে লাঞ্চ পর্যন্ত আমরা ওখানেই থেকে যাই। তাই থাকলুম। ইদানীং ও স্যানাটোরিয়ম থেকে মোটেই বেরোতে পারেনি। অনেকদিন পরে আজকেই প্রথম বেরলো। এখানটায় লাঞ্চ খেতে ও খুব ভালোবাসে। বলে শরীর মন দুই-ই ভালো হয়ে যায়। এ্যাণ্টনিও আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খেল। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা গাড়ি করে আবার স্যানাটোরিয়মে ফিরে গেলুম। প্যাট্কে এখন ঘণ্টা দুই শুয়ে থাকতে হবে। কোষ্টার আর আমি ততক্ষণ কার্লকে গ্যারাজ থেকে বের করে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলুম। দুটো স্প্রিং ভেঙে গিয়েছিল, সেগুলো বদলাতে হল। গ্যারাজের মিস্ত্রির কাছে যন্ত্রপাতি ছিল, তাই দিয়েই কাজ সারলুম। তারপরে তেল ভর্তি করে, গ্রিজ মাখিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে বের করলুম। চাকায় কাদামাটি লেগে গিয়েছিল। আমি বললুম, 'একটু ধুয়ে-মুছে নিলে হত না?'

কোষ্টার বলল, 'না, রাস্তায়-ঘাটে ধোয়া-মোছা ও বরদাস্ত করে না।'

বিশ্রাম করে প্যাট্ আমাদের কাছে ফিরে এল। বিশ্রামের পর ওকে বেশ ফুটফুটে দেখাচ্ছে। সঙ্গে কুকুরটা লাফাতে-লাফাতে এসেছে। বিলি বলে ডাকলুম। কুকুরটা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকাল কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করল না। ও আমাকে চিনতেই পারেনি। আমি বললুম, 'এরই মধ্যে ভুলে গেল। তবু যাহোক, মানুষের স্মরণশক্তি দেখছি এদের চাইতে ভালো। কিন্তু কালকে ও কোথায় ছিল, দেখিনি তো?'

প্যাট্ হেসে বলল, 'সারাদিন খাটের তলায় শুয়ে ছিল। আমার কাছে লোকজন আসা পছন্দ করে না। বোধকরি ওর হিংসে হয়।'

প্যাট্কে বললুম, 'তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে।'

প্যাট্ খুশি হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপরে কার্ল-এর কাছটাতে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এতে চেপে একটু ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।'

বললুম, 'বেশ তো। কি বল অটো?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার গায়ে তো গরম কোট রয়েছেই আর এই নাও কম্বল। বেশ করে জড়িয়ে বসতে হবে।'

উইণ্ড-স্ক্রিনের পিছনে প্যাট্ কোষ্টার-এর পাশে বসল। কার্ল গর্জন করে উঠল। এঞ্জিন গরম হতে সময় লাগছে। আস্তে-আস্তে স্নো-চেইন-এ বরফ কেটে-কেটে কার্ল অগ্রসর হচ্ছে। ঢালু পথে নেমে গ্রামের বড় রাস্তা দিয়ে একটা নেকড়ে বাঘের মতো, হামাগুড়ি দিয়ে ও চলেছে।

দেখতে-দেখতে আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে চলে এলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শাদা বরফের প্রান্তর পড়ন্ত সূর্যের আলোতে রক্তাভ হয়ে উঠছে, আর সূর্যটাকে একটা বিরাট অগ্নিগোলকের মতো দেখাচ্ছে।

প্যাট্ জিগগেস করল, 'কালকে তোমরা এই পথ দিয়েই এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

প্রথম পাহাড়টার চূড়ায় এসে পৌঁচেছি। কোষ্টার গাড়ি থামিয়ে দিল। চারদিকের দৃশ্য অত্যাশ্চর্য। কালকে যখন এ-পথ দিয়ে গিয়েছি তখন কিছুই লক্ষ্যই করিনি। তখন চোখ ছিল শুধু রাস্তার দিকে, আর কোনো দিকে তাকাবার অবসর ছিল না।

পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি আর মাঝখানে উন্মুক্ত উপত্যকা। পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় কে যেন মুঠো-মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। তলার দিকে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে নীল হয়ে। আর উপত্যকায় তুষার ক্ষেত্রের রঙ মুহূর্তে-মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। লালে-শাদায় মেশানো রঙের কি অপূর্ব সমারোহ। এ যেন এক বিরাট নির্বাক নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। ভায়োলেট রঙের একটি ফিতের মতন রাস্তাটা পাহাড়ের গা জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠে গেছে। কোথাও হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার বহুদূরে অন্য পাহাড়ের গায়ে দেখা দিচ্ছে, তারপরে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে সরল রেখায় বহুদূরে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।

প্যাট্ বলল, 'গ্রাম ছাড়িয়ে এত দূরে আমি কোনোদিন আসিনি। আচ্ছা, এই বুঝি আমাদের বাড়ি যাবার রাস্তা?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ ধরে ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে গাড়ি থেকে নেমে হাত দিয়ে চোখটাকে একটু আড়াল করে সুমুখে বহুদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। মনে হচ্ছে যেন ও এখান থেকেই বার্লিনের সৌধচূড়া দেখতে পাচ্ছে। জিগগেস করল, 'এখান থেকে কতদূর হবে?'

'প্রায় হাজার কিলোমিটার। চিন্তা কি, এই মে মাসেই আমরা ওখানে চলে যাব। অটো এসে আমাদের নিয়ে যাবে।'

প্যাট্ অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'মে মাস! বাবাঃ, মে মাস কি ধারে কাছে।'

আস্তে-আস্তে সূর্য ডুবে গেল। যে ছায়াগুলো এতক্ষণ পাহাড়ের তলায় গুড়ি মেরে বসেছিল সেগুলো এখন ধীরে-ধীরে উপরের দিকে উঠছে ঠিক যেন এক-একটা

বিরাট মাকড়শা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। হঠাৎ শীত করতে লাগল। প্যাটকে বললুম, 'চল ফেরা যাক্।'
ও যখন মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল তখন ওর মুখ দেখেই বুঝলুম ও সব জানে, সব বোঝে। ও জানে এই পাহাড়ের কারাগার ভেদ করে বেরোনো আর ওর হবে না। এখানেই দিন শেষ হবে। শুধু আমরা যেমন ওর কাছে লুকোচ্ছি ও তেমনি আমাদের কাছে লুকোচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য বোধ করি ওর মনের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। বিশ্বের বেদনা চোখ দুটিতে টলটল করছে। বলল, 'চল না আর একটু এগিয়ে যাই, আর অল্প একটু।'
কোষ্টার-এর দিকে এক নজর তাকিয়ে ওকে বললুম, 'এস তবে।' ও এবার পিছনের সিটে আমার পাশে এসে বসল। হাত বাড়িয়ে ওকে কোলের কাছে টেনে এনে এক কম্বল দিয়েই দুজনে ঢেকে-ঢুকে বসলুম। গাড়িটা আস্তে-আস্তে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে উপত্যকার ছায়ায় মিশে গেল।
প্যাট্ আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'রব্বি, আমার কি মনে হচ্ছে জানো, যেন আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আবার আমাদের সেই জীবন—'
'হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম,' বলে কম্বলটা তুলে ওর চুল অবধি ঢেকে দিলুম।
যত নিচে নেমে আসছি তত বেশি অন্ধকার। প্যাটকে সর্বাঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে রেখেছি। ও আমার শার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতটি আমার বুকে রাখল। একবার চুমু খেল, বুকে ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস পাচ্ছি—তারপর উষ্ণ অশ্রুধারা।
পরের গ্রামটাতে এসে কোষ্টার সাবধানে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল, প্যাট্ যাতে টের না পায় এমনি সন্তর্পণে। তারপরে আস্তে-আস্তে স্যানাটোরিয়মে ফিরে চলল।
সেই প্রথম পাহাড়টার চূড়ায় যখন ফিরে এসেছি তখন সূর্য একেবারে ডুবে গেছে। পূর্ব দিকে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ সবে দেখা দিয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। আমি স্থির হয়ে বসে আছি। প্যাট্-এর চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার বুকে একটা ক্ষত। সেই ক্ষতের মুখ থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে।
ঘণ্টাখানেক পরে আমি হল্-এ বসে আছি। প্যাট্ তার ঘরে। আর কোষ্টার গেছে আবহাওয়া আপিসে—এক-আধদিনের মধ্যে বরফ পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সেই খোঁজ নিতে। বাইরে খুব কুয়াশা হয়েছে, আর চাঁদের চারদিকে একটা চক্রের মতো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে এ্যান্টনিও এসে আমার পাশে বসল। কয়েকটা টেবিল ছাড়িয়ে একটু দূরে মোটাসোটা, গোলগাল জাঁদরেল চেহারার একটা লোক বসে আছে। ছেলেমানুষের মতো মুখ, ঠোঁট দুটো পুরু আর মাথায়

প্রকাণ্ড টাক। ওর পাশে একটি রুগ্ন স্ত্রীলোক, চোখের তলায় কালির রেখা, মুখ-খানি অতিশয় বিষণ্ন। নাড়ুগোপালটির কিন্তু খুব ফুর্তি দেখা যাচ্ছে। হাত-পা-মাথা সব নেড়ে কথা বলছে—'যাই বল, খাসা জায়গা। যেমন দৃশ্য তেমনি আবহাওয়া—তার উপরে কি আদর-যত্ন।'

স্ত্রী বেচারী অত্যন্ত করুণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'এমন সেবা-শুশ্রূষা আদর-যত্ন পেলে আমি তো বর্তে যেতুম।' লোকটা তরল হাসির ফোয়ারা তুলেছে। স্ত্রীটি তেমনি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

নাড়ুগোপাল স্বামী হাত নেড়ে বলছে, 'এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না। এ তো স্বর্গে আছ বলতে হবে। আমাদের কথা একবার ভেবে দেখ। সকালে উঠেই যাও বাজে কাজে—ছাইপাঁশ ঘাঁটতে। যাক্, তুমি এখানটায় বেশ আছ দেখেই আনন্দ।'

স্ত্রীটি বলল, 'বার্নার্ড, আমি সত্যিই ভালো নেই।'

'কি যে বল। এখানে থেকেও তোমাদের মুখে এই কথা! ওকথা বরং আমরা বললে মানায়। সবাই দেউলে, এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি, হাতে পয়সা নেই—তার উপরে ট্যাক্স। তবু যে তোমার জন্য এতদূর করছি সেই তো ঢের।'

স্ত্রী চুপ করে গেল।

আমি এ্যান্টনিওকে বললুম, 'এ তো আচ্ছা লোক দেখছি।'

এ্যান্টনিও বলল, 'আচ্ছা লোক বৈকি। পর্শু দিন থেকে এসে অবধি ওর স্ত্রীকে কথা বলতেই দিচ্ছে না। কিছু বলতে গেলেই বলে, চমৎকার আছ, খাশা আছ। লোকটা দেখেও দেখতে চায় না—স্ত্রী বেচারা কতখানি অসুস্থ, ওর মনে কত ভয়, ও কি বিষম একলা। নিজে বার্লিনে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, কাউকে হয়তো বা জুটিয়েছে। আর ছ-মাস বাদে-বাদে একবার এসে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সমাপন করে যাচ্ছে। নিজের সুখ-সুবিধেটুকু নিয়েই ব্যস্ত। অপরের কথা আমলেই আনে না। এ সব ব্যাপার এখানে হামেশাই দেখবেন।'

'ওর স্ত্রী কদ্দিন এখানে আছে?'

'প্রায় দু-বছর হতে চলল।'

একদল ছোকরা হাসতে-হাসতে একসঙ্গে এসে হল্-এ ঢুকল। ওদের দেখে এ্যান্টনিও-ও হেসে উঠল। বলল, 'এরা সব পোস্ট আপিস থেকে আসছে। রথ্-এর কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে।'

'রথ্ কে?'

'এখানকার রোগী। শিগগিরই চলে যাবার কথা। ওকে এরা টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে যে, দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক লেগেছে, এখন যেন না আসে। এ সব হচ্ছে এখানকার বাঁধা তামাশা। এরা নিজেরা যেতে পাচ্ছে না কিনা, তাই।'

জানালার বাইরে আবছা ধূসর পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। এদের কথাই ভাবছিলুম। এরা মনে করে কি? হাসপাতালটা বুঝি একটা থিয়েটারের স্টেজ্—এরা এখানে মরার অভিনয় করছে। আরে বাপু, মরা কি এতই সহজ? ইচ্ছে করছে এই ছেলেগুলোকে আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দিয়ে জিগগেস করি—তোমরা ভেবেছ কি? এ কি শখের যাত্রা পার্টি যে মরার অভিনয় করছ! একটু জ্বরে ভুগে, শ্বাস কষ্ট হয়ে মরবে তাকে মরা বলে না। মৃত্যু কাকে বলে আমি জানি, ঢের লোককে আমি মরতে দেখেছি। মরতে হলে কামান লাগে, গোলাগুলি লাগে, বুলেট লাগে—জ্বরে ভুগে নয়—

এ্যান্টনিওকে জিগগেস করলুম, 'তুমিও রোগী নাকি?'

ও হেসে বলল, 'রোগী বৈকি।'

ওধার থেকে নাড়ুগোপালের গলা শোনা গেল, 'আঃ, খাশা কফি করেছে তো! আমাদের ভাগ্যে এমনটি কক্ষনো জোটে না। এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ গো।'

কোষ্টার আবহাওয়া আপিস থেকে ফিরে এল। এসেই বলল, 'বব্, আমাকে যেতে হচ্ছে। টেম্পারেচার অনেক নেমে গেছে, আজকে রাত্তিরেই বরফ পড়বার সম্ভাবনা আছে। তাহলে কালকে আর যাওয়াই যাবে না। আজকে রাতারাতি হয়তো বা পার হয়ে যেতে পারি।'

'বেশ তাই কর। খেয়ে যাবার সময় আছে তো?'

'হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'

'চল আমিও যাচ্ছি।' দুজনে মিলে জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে গ্যারাজে রেখে এলুম। তারপরে গেলুম প্যাট্কে ডাকতে। অটো বলল, 'বব্, কোনো কিচ্ছু হলে তক্ষুনি আমাকে খবর দিয়ো।'

বললুম, 'নিশ্চয়।'

'টাকা আমি ক'দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখো, কোনো ত্রুটি না হয়।'

'দেখব বৈকি, অটো।' একটু ইতস্তত করে বললুম, 'আমার বাড়িতে কয়েক শিশি মরফিয়া ছিল। সেগুলো পাঠিয়ে দিতে পারবে?'

অটো ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা দিয়ে কি হবে?'

'বলা তো যায় না, অটো। ওর খুব যদি যন্ত্রণা হয় আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর যন্ত্রণা দেখতে পারব না। অবিশ্যি হয়তো এঁরাই মরফিয়ার ব্যবস্থা করবেন। তবু আমার নিজের কাছে থাকলে মনে একটু সান্ত্বনা পাব। ওর যন্ত্রণা একটুও যদি কমাতে পারি—'

'শুধু সেই জন্যে বলছ?'

'হ্যাঁ অটো, নইলে তোমাকে বলতুম না।'

অটো খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে আস্তে-আস্তে বলল, 'বব্, সব গিয়ে আমরা এখন দুজন মাত্র, মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে বৈকি।'

'আচ্ছা তাহলে—'

আমি গিয়ে প্যাট্‌কে নিয়ে এলুম। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলুম। বাইরে ক্রমেই কুয়াশায় ঢেকে আসছে। কোষ্টার গিয়ে গ্যারাজ থেকে কার্লকে নিয়ে এল। তৈরি হয়ে বলল, 'গুড লাক্, বব্।'

'গুড্ লাক্, অটো।'

প্যাট্-এর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে প্যাট্। শীত পার হয়ে গেলে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

প্যাট্ ওর হাত মুঠোর মধ্যে ধরে আছে। বলল, 'গুড্‌বাই, কোষ্টার। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগল। লেন্‌ত্‌সকে আমার নমস্কার জানিয়ো।'

কোষ্টার বলল, 'হ্যাঁ, জানাব।'

ও তখনো ওর হাত ছাড়ছে না। ঠোঁট দুটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। হঠাৎ এক-পা এগিয়ে এসে কোষ্টারকে চুমু খেল। ধরা গলায় কোনোরকমে বলল, 'গুড্‌বাই।'

মুহূর্তের জন্য কোষ্টার-এর মুখ আগুনের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু না বলেই ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। পর মুহূর্তেই সাঁ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল। বাঁক ঘুরে-ঘুরে ঢালু পথ বেয়ে নেমে যেতে লাগল। কোষ্টার একবারও ফিরে তাকাল না। আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি। গ্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়িটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। দূর থেকে একটি জোনাকির মতো দেখাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গাড়ি থামল। কোষ্টার হাত নাড়ছে। অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকারে কালো রেখায় আঁকা তার মূর্তিটি দেখা গেল। তারপরেই এঞ্জিনের ধ্বনি ক্রমে মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

প্যাট্ সামনের দিকে ঝুঁকে এখনো কান পেতে শুনবার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ

শোনা গেল ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল, 'রব্বি, এই শেষ তরীটি কূল ছেড়ে গেল।'

আমি বললুম, 'শেষের আগেরটি, বল। আমি শেষ। যাকগে, জানো, আমি কি করব স্থির করেছি? নতুন একটা আস্তানা খুঁজতে হবে। ও বাড়ির ঐ ঘরটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমরা দুজন একসঙ্গে থাকতে আপত্তি কী? আমি তোমার কাছাকাছি একটা ঘর নেবার চেষ্টা করব।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'অসম্ভব। সে কেমন করে হবে?'

'যেমন করেই হোক। পেলে তুমি খুশি হবে?'

'শোনো কথা, খুশি হব না তো কি? আঃ, তাহলে একেবারে ফ্রাউ জালেওয়াস্কির বাড়ির মতো হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, তাহলে আধঘণ্টার ছুটি দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখিগে।'

'বেশ যাও। আমি ততক্ষণ এ্যাণ্টনিওর সঙ্গে বসে দাবা খেলছি। এখানে এসে এই জিনিসটা নতুন শিখেছি।'

আপিসে গিয়ে ওদের বললুম যে এখন কিছুদিন আমি এখানেই থাকব, কাজেই প্যাট্-এর কাছাকাছি উপরতলায় একটা ঘর পেলে সুবিধা হত। একজন বয়স্কা মতো মেট্রন ভয়ানক উষ্মা প্রকাশ করে বললে, 'উহুঁ, ওসব হবে-টবে না। ও রকম থাকবার নিয়ম নেই।' জিগগেস করলুম, 'নিয়ম কে করেছেন?'

মেট্রন প্রথমটায় খুব তিরিক্ষি ভাবে জবাব দিল, 'কর্তৃপক্ষ করেছেন।' তারপরে কী ভেবে স্বর একটু নরম করে বলল, 'অবিশ্যি ডাক্তার ইচ্ছে করলে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মটা বদলাতে পারেন। কিন্তু উনি এখন চলে গেছেন। রাত্তিরে উনি বাড়ি চলে যান। খুব জরুরি কিছু না হলে রাত্তিরে উনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না।'

বললুম, 'বেশ, তাহলে আমাকে দেখা করতেই হবে। নিয়ম-কানুনের ব্যাপার যখন, তখন জরুরিই বলতে হবে।'

ডাক্তার স্যানেটোরিয়মের কাছেই একটি ছোট বাড়িতে থাকেন। যাওয়ামাত্রই দেখা পেলুম, অনুমতি পেতেও বিলম্ব হল না। নিজেই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। ডাক্তারকে বললুম, 'বাবাঃ, শুরুতেই যা অবস্থা দেখছিলুম তাতে ভাবিনি যে এত সহজে হয়ে যাবে।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'ওঃ, বুঝেছি, আপনি বুঝি প্রথমেই বুড়ি রেক্সরথ্-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

ওখান থেকে আপিসে ফিরে এলুম। রেক্সরথ্ দূর থেকে আমাকে দেখেই সরে পড়ল। সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে ফেললুম। চাকরকে বললুম আমার জিনিসপত্র যথাস্থানে সরিয়ে দিতে। প্যাট্ হল্-এ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই বলল, 'কেমন, ব্যবস্থা হল?'

'না, এখনো হয়নি, তবে দু-চারদিনের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করছি।'

প্যাট্ ভারি নিরাশ হল। দাবার ঘুঁটিগুলো উল্টে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'এখন কী করবে তাহলে? চল না হয় বার্-এ গিয়ে বসা যাক্।'

এ্যাণ্টনিও বলল, 'তাশ খেললে হত। বরফ পড়বে মনে হচ্ছে। এমন দিনে তাশ যেমন জমে তেমন আর কিছু নয়।'

আমি বললুম, 'কিন্তু প্যাট্ খেলবে কি! ও কি তাশ খেলতে জানে?'

'জানি বৈকি, বব্।'

হেসে বললুম. 'ওঃ পেশেন্স খেলা বুঝি?'

'না গো না, পোকার।'

এ্যাণ্টনিও বলল, 'হ্যাঁ, উনি পোকার খেলেন। অবিশ্যি একটু এলোপাথাড়ি চাল দেন।'

আমি বললুম, 'তা আমিও দিয়ে থাকি। আচ্ছা তবে এক হাত হোক।'

এক কোণে বসে আমরা খেলা শুরু করে দিলুম। প্যাট্ মন্দ খেলে না দেখছি। দিব্যি চাল দিতে শিখেছে। ঘণ্টাখানেক খেলার পরে এ্যাণ্টনিও জানালার দিকে নজর করে ইঙ্গিত করল—তাই তো, বরফপড়া শুরু হয়েছে। এ্যাণ্টনিও বলল, 'দেখছেন, একটুও বাতাস নেই। তার মানে প্রচুর বরফ পড়বে।'

প্যাট্ জিগগেস করল, 'কোষ্টার কতদূর এগুলো কে জানে?'

আমি বললুম, 'ও এতক্ষণে পাহাড়ী রাস্তা পার করে এনেছে।'

নিমেষের জন্য মনে হল কার্লকে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কোষ্টারকে নিয়ে বরফঢাকা পথ ভেদ করে চলেছে। হঠাৎ সব কিছু এমন অবাস্তব মনে হতে লাগল—কোথায় কোষ্টার পথের মাঝখানে, আমি এখানে আর প্যাট্ হাসপাতালে। প্যাট্ হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল।

নাড়ুগোপালটি কখন এসে আমাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে শুরু করেছে। ওর স্ত্রী নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। উনি এখন বেরিয়েছেন একটু ফূর্তির খোঁজে। আমি হাতের তাশ টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে এমন কটমট করে লোকটার দিকে তাকালুম, লোকটা পালিয়ে বাঁচল।

প্যাট্ মনে-মনে খুশি। হেসে বলল, 'ওকে যা ভয় দেখিয়ে দিলে।'
বললুম, 'ইচ্ছে করেই ভয় দেখিয়েছি।'
খেলা বন্ধ করে আমরা বার্-এ কয়েক গ্লাশ 'স্পেশাল' পান করলুম। প্যাট্কে এখন গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হল্-এ বসে রইলুম। প্যাট্ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বারবার ফিরে তাকাতে লাগল। আরো খানিকক্ষণ বসলুম। তারপরে আপিসে গিয়ে নতুন ঘরের চাবিটি চেয়ে নিলুম। সেক্রেটারি হেসে বলল, 'আটাত্তর নম্বরের ঘর।'
ঠিক প্যাট্-এর পাশের ঘরটি। খুশি হয়ে তন্মুহূর্তে উপরে চলে গেলুম। বিছানা-পত্তর চাকর আগেই পেতে রেখে গেছে। তাড়াতাড়ি বাকিটুকু গোছগাছ করে নিলুম। আধঘণ্টাটাক বাদে দু-ঘরের মাঝের দরজাটিতে খুব আস্তে টোকা মারলুম। 'কে?' বলে প্যাট্ সাড়া দিল।
জবাব দিলুম, 'পুলিসের লোক।'
ওধারে চাবির শব্দ হল। পরমুহূর্তে দরজা খুলে গেল।
'এঁ্যা, তুমি, বব্, কি কাণ্ড!' ও বিষম অবাক হয়ে গেছে।
বললুম, 'হ্যাঁ, আমি বৈকি। আমাকে তুমি কম পাত্র ভেবেছ! তোমাদের ফ্রাউলিন রেক্সরথ্কেও আমার কাছে হার মানতে হয়েছে। আর তুমি ভাবছ খালি হাতে এসেছি? না গো না, এই দেখ না,' বলে ড্রেসিং-গাউনের পকেট থেকে কনিয়াক্ আর পোর্টো-রঙ্কোর বোতল বের করলুম। প্যাট্ খুশি আর চেপে রাখতে পারছে না। বলল, 'জানো রব্বি, মনে হচ্ছে আমাদের পুরোনো দিনগুলি যেন আবার ফিরে এসেছে।'

আমার কাঁধে মাথা রেখে প্যাট্ ঘুমোচ্ছে। আমি অনেক রাত অবধি জেগে রইলুম। ঘরের কোণে একটি ছোট্ট ল্যাম্প জ্বলছে। জানালার কাঁচে তুষারপাতের মৃদু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঘরের ভিতরটায় বেশ গরম। প্যাট্ ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরে শুল। গায়ের চাদরখানা সরে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। আঃ, ঠিক যেন ব্রোঞ্জের তৈরি দেহটি। কি সুন্দর পা দুখানা, কি নরম বুক! ওর চুল এলিয়ে পড়েছে আমার কাঁধে। চুমু খেয়ে মনে-মনে বললুম, 'তুমি মরে যাবে, কে বললে? অসম্ভব, তুমি মরতেই পার না। তুমি গেলে জীবনে কী সুখ?'
সাবধানে চাদরটি তুলে গায়ে জড়িয়ে দিলুম। প্যাট্ ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে কি যেন বলল, তারপরে হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল।

ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড ড

সেই থেকে কদিন যাবত অনবরত তুষারবৃষ্টি হচ্ছে। প্যাট্-এর রোজ একটু-একটু জ্বর হচ্ছে, সারাক্ষণ বিছানাতেই থাকতে হয়। বেশির ভাগ রোগীরই টেম্পারেচার দেখা দিয়েছে।

এ্যান্টনিও বলে, 'সব এই আবহাওয়ার দরুন। এটা ঠিক জ্বরের আবহাওয়া! বরফ পড়বে তো দেখা দেবে।'

প্যাট্ বলল, 'লক্ষ্মীটি, বাইরে একটু বেড়িয়ে এস। তুমি স্কি করতে জানো?'

'না, কেমন করে জানব? আমি এর আগে কোনো দিন পাহাড়ে আসিনি।'

'তাতে কি? এ্যান্টনিও তোমাকে শিখিয়ে দেবে। ও নিজেও আমোদ পাবে তুমিও পাবে। তাছাড়া ও তোমাকে খুব পছন্দ করেছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।'

প্যাট্ বিছানায় উঠে বসল। ঢলঢলে নাইট-গাউন কাঁধ থেকে খসে পড়ল। ওকে ভয়ানক শীর্ণ দেখাচ্ছে। কাঁধ আর ঘাড়ের দিকটা সরু হয়ে গেছে। বলল, 'যাও রব্বি, কথা শোনো। সারাদিন রোগীর বিছানার পাশে বসে থাক, এ আমার ভালো লাগে না। পরশু সারাদিন, কাল সারাদিন বসে ছিলে, ঢের হয়েছে! এবার একটু ঘুরে এস।'

'কিন্তু বসে থাকতে যে আমার ভালো লাগে। বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার ইচ্ছেই হয় না।'

প্যাট্ জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, গলার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আওয়াজ। কনুইতে ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বলল, 'এ সব বিষয়ে তোমার চাইতে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। এতে আমাদের দুজনেরই ভালো হবে, পরে বুঝতে পারবে।' মুখে একটু হাসি টেনে এনে বলল, 'বিকেলে আর রাত্তিরে তুমি যতক্ষণ খুশি বসে থাক। কিন্তু সকাল বেলাটায় আমার ভালো লাগে না। রাত্তিরে জ্বর থাকলে

সকাল বেলায় চেহারাটা বড় বিচ্ছিরি দেখায়। রাত্তিরে কিছু বোঝা যায় না—বুঝতে পারছি খুব ছেলেমানুষের মতো কথা হচ্ছে—কিন্তু সত্যি বলছি বব্, সকাল বেলায় আমার বিচ্ছিরি চেহারা দেখে তুমি ভড়কে যাবে, এ আমি সইতে পারব না।'

'কি যে বল প্যাট্!' দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'বেশ, তুমি যখন বলছ তখন এ্যাণ্টনিওর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। দুপুর বেলায় আবার ফিরে আসব। তবে, স্কি করতে গিয়ে হাড়গোড়গুলো আস্ত থাকলে হয়।'

'দেখো, দুদিনে শিখে ফেলবে।' হাসিমুখে বলল, 'একবার শুরু করলেই দেখবে তুমি চমৎকার করতে পারবে।'

ওর মুখে চুমু খেয়ে বললুম, 'বুঝেছি, তোমার আসল মতলবটি হচ্ছে আমাকে তোমার ঘর থেকে তাড়ানো।' ওর হাত দুটি ঘামে ভিজে-ভিজে, কিন্তু ঠোঁট দুটি শুকনো।

এ্যাণ্টনিও থাকে তেতলায়। ওর কাছ থেকে বুট ধার করে নিলুম। পায়ের মাপ দেখেই মনে হয়েছিল ওর জুতো আমার পায়ে ঠিক লাগবে। পথে যেতে-যেতে এ্যাণ্টনিও আমাকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ বলল, 'এখানে জ্বর হলে বড় অস্থির-অস্থির লাগে। সব চেয়ে খারাপ হল আপনার কিছু করবার নেই, যখন জ্বর থামবার আপনিই থামবে। মন একেবারে দমে যায়, মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়।' আমি বললুম, 'যারা সুস্থ তাদেরও অস্বস্তির অন্ত নেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে, কিচ্ছু করবার নেই।'

ও মাথা হেলিয়ে বলল, 'আমাদের কজনের তবু এক নেশা আছে! পড়ে লাইব্রেরিকে লাইব্রেরি শেষ করে দিই। কিন্তু বেশির ভাগকেই দেখবেন নেহাত ইস্কুলের ছেলেদের মতো ছেলেমানুষি করে বেড়াচ্ছে। ছেলেরা যেমন ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে পালায়, এরা তেমনি বিশ্রাম-চিকিৎসা থেকে পালায়। হঠাৎ কখনো রাস্তায় ডাক্তারের সুমুখে পড়ে গেলে ছুটে গিয়ে কোনো দোকান কিম্বা কাফেতে ঢুকে পড়ে। লুকিয়ে-লুকিয়ে সিগারেট খায়, মদ খায়, রাত জাগা নিষেধ—তবু দুপুর রাত অবধি হল্লা করে। হাসি গল্প তামাশা—যত রকম ছেলেমানুষি নিয়ে আছে। কি বা করবে বলুন—এই সব করে কোনো রকমে মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চায়। এই এক রকমের মন ভোলানোর খেলা।'

মনে-মনে বললুম, তাই তো, আমাদের কারই বা কি করবার আছে?

স্কি পায়ে বেঁধে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এ্যাণ্টনিও বলল, 'আসুন এবার

চেষ্টা করা যাক।' কেমন করে স্কি বাঁধতে হবে, কেমন করে ব্যালেন্স রাখতে হবে সংক্ষেপে আমাকে বুঝিয়ে দিল। ব্যাপারটা আসলে শক্ত নয়। প্রথমটায় বারবার পড়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত খানিকটা নিজে-নিজে করতে পারলুম। ঘণ্টাখানেক পরে দুজনেই থামলুম। এ্যাণ্টনিও বলল, 'হ্যাঁ, আজকের মতো ঢের হয়েছে। এতেই রাত্তিরে গায়ের হাড়ে মাংসে একটু টের পাবেন—সারা গায়ে ব্যথা হবে।'

শরীরটা বেশ গরম হয়েছে। এ্যাণ্টনিওকে বললুম, 'এসে ভালোই করেছি, বেশ লাগল।'

ও বলল, 'চান তো রোজ সকালে আমরা আসতে পারি। মনটা একটু চাঙ্গা হয়, ভাবনা-চিন্তা ভুলে থাকা যায় তো।'

ওকে বললুম, 'কোথাও একটু পানীয়ের সন্ধানে গেলে হত।'

'চলুন, ফরস্টার কাফেতে যাওয়া যাক।'

কাফে থেকে স্যানাটোরিয়মে ফিরে এলুম। আপিসে সেক্রেটারি বলল, পোস্ট আপিসের পিওন এসে আমার খোঁজ করে গেছে। বলে গেছে আমি যেন পোস্ট আপিসে গিয়ে একবার খোঁজ করি। আমার নামে কিছু টাকা এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম তখনো সময় আছে। তক্ষুনি রওনা হলুম। গিয়ে দেখি আমার নামে দু-হাজার মার্কের মনিঅর্ডার এসেছে। সঙ্গে কোষ্টার-এর চিঠি। লিখেছে আমি যেন কোনো চিন্তা না করি। দরকার হলে আরো পাঠাতে পারবে। আমি যেন লিখে জানাই।

নোটগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। অত টাকা ও কোথায় পেল? তাও এত শিগগির? আমাদের তহবিল, সঙ্গতি কতটুকু তা তো আমার জানা আছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বল্‌উইজ্‌-এর কথা মনে পড়ল, সেই যেদিন ও মোটর রেস্‌-এ বাজি হেরে গেল সেদিন বারবার কার্লকে নেড়েচেড়ে দেখছিল আর বলছিল, 'কোনোদিন যদি ওকে বিক্রি কর তবে আমি এর খদ্দের আছি বলে রাখলুম।'

ঠিক ধরেছি, কোষ্টার কার্লকে বিক্রি করে দিয়েছে। নইলে এত তাড়াতাড়ি টাকা পাবে কোথায়? হায়রে, কোষ্টার বলেছিল নিজের হাত কেটে দিতে পারি তবু কার্লকে নয়—সেই কার্লকে ও বিক্রি করে দিয়েছে! কার্ল এখন বল্‌উইজ্‌-এর সম্পত্তি। শহরের রাস্তায়-রাস্তায় নেড়ি কুত্তার মতো ঘুরে বেড়াবে, আর অটো

কান খাড়া করে ঘরে বসে তাই শুনবে—ও যে কত মাইল দূর থেকে ওর শব্দটা চিনতে পারে।

কোষ্টার-এর চিঠি আর মরফিয়ার পার্শেলটি পকেটে রাখলুম। তখনো দাঁড়িয়েই আছি, কি করব ভেবে উঠতে পারছি না। টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই, টাকা যে আমাদের দরকার। আস্তে-আস্তে নোটগুলো ভাঁজ করে পকেটে পুরলুম। পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এলুম। খুব হল, আজ থেকে মোটর গাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। কারো গাড়ি দেখলে এখন দশ হাত দূর দিয়ে হাঁটব। লোকে মোটরকে বলে বন্ধু, কিন্তু কার্ল যে আমাদের কাছে তার চাইতেও বেশি। ও আমাদের কমরেড্। কার্ল আমাদের পথের সাথী আমাদের জীবনের সাথী। ওকে কখনো আলাদা করে দেখিনি। কার্ল আর কোষ্টার, কার্ল আর লেন্‌ত্‌স, কার্ল আর প্যাট্। নিজের উপরেই অক্ষম রোষে অনাবশ্যক জোরে জুতো ঠুকছি বরফ ঝাড়বার জন্য। লেন্‌ত্‌স গিয়েছে, কার্ল গেল। আর প্যাট্? চোখের দৃষ্টি আপনি ঝাপসা হয়ে এল। ঝাপসা চোখে ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। ঐ সীমাহীন আকাশে কোথায় যেন একটা ক্ষ্যাপাটে দেবতা বসে-বসে জীবন মৃত্যুর এই নিষ্ঠুর রঙ্গ দেখছে।

সেদিনই বিকেলের দিকে হাওয়া উঠে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। পরদিন থেকেই প্যাট্ অনেকটা স্বস্থ বোধ করতে লাগল। বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। কদিন বাদে রথ্ বলে যে ছেলেটি আরোগ্য হয়ে চলে যাচ্ছিল তাকে তুলে দেবার জন্য সেও আর সবার সঙ্গে স্টেশন অবধি গেল।

রথ্-এর সঙ্গে দল বেঁধে সবাই স্টেশনে এসেছে। এটাই এখানকার নিয়ম। কেউ চলে যাবার সময় সবাই এসে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যায়। রথ্ নিজে দেখলুম খুব খুশি নয়। বেচারার বরাত খারাপ। দু-বছর আগে ও এক স্পেসেলিস্টকে দেখিয়েছিল। ওঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল সে আর কদ্দিন বাঁচবে। তিনি বলেছিলেন খুব সাবধানে থাকলে পরে বড় জোর আর দু-বছর সে বাঁচতে পারে। পরে ও আর একজন ডাক্তারকে দেখায়। তিনি ওকে দু-বছরেরও ভরসা দেননি। রথ্ তখন ওর যেখানে যা কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গতি ছিল সব জড়ো করে দু-বছরের মতো বাজেট করে নেয়। টাকা পয়সা দেদার ওড়াতে লাগল, রোগের চিন্তাও করে না, চিকিৎসার জন্যও মাথা ঘামায় না। শেষটায় একবার খুব রক্ত বমি হয়ে বাধ্য হয়ে এই স্যানাটোরিয়মে এসে আশ্রয় নিতে হয়। এখানে এসে কোথায় মরবে, না দিন-দিন ভালো হয়ে উঠতে লাগল। যখন এসেছিল তখন

ওজন ছিল নব্বুই পাউণ্ড। এখন বাড়তে-বাড়তে ওজন হয়েছে দেড়শো পাউণ্ড। বিলকুল সেরে গেছে, কাজেই এখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে তো দিল, কিন্তু এদিকে টাকা যে ফুরিয়ে গেছে।

মাথা চুলকোতে-চুলকোতে আমাকে বলল, 'কী করি বলুন তো? আপনি তো অল্পদিন এসেছেন, না? ওখানকার অবস্থা কেমন দেখে এলেন? গিয়ে তো একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। কিছু আশা-ভরসা আছে?'

হাত নেড়ে বললুম, 'কে জানে?' আশা যে বড় একটা নেই, সে কথা ওকে বলে কি লাভ? ওখানে গিয়ে ও দুদিনেই বুঝতে পারবে। জিগগেস করলুম, 'জানা-শোনা আত্মীয় বন্ধু কেউ আছে?'

ও একটু তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'বন্ধু! বন্ধুদের কথা তো জানেনই—হাতের টাকা ফুরোলে বন্ধুদের আর ধারে কাছে পাওয়া যায় না।'

'তাহলে তো বড় মুশকিলের কথা।'

রথ্ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী যে করব ভেবে উঠতে পারছি না। কয়েক শো মার্ক মাত্র হাতে আছে। তাছাড়া টাকা খরচ করতেই শিখেছি, কামাতে শিখিনি। এখন মনে হচ্ছে আমার সেই হাতুড়ে ডাক্তার যে বলেছিল দু-বছরের মধ্যে মরব সে কথাই আসলে ফলবে—অবিশ্যি অন্য উপায়ে, বোধ হয় বুলেটের আঘাতে মরতে হবে।'

কেন জানি না এই মূর্খটার কথা শুনে হঠাৎ আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। জীবনটা যে কী এসব মূর্খ কি কোনোকালে বুঝবে না? মরতে বসেও জীবনের মূল্য বোঝেনি! এ্যাণ্টনিও আর প্যাট্ পায়চারি করছে। ঐ তো ভুগে-ভুগে প্যাট্-এর দেহ শীর্ণ—কিন্তু আমি জানি বাঁচবার জন্য ওর কি আকুল আগ্রহ। এই রথ্ ছোকরার প্রাণের বিনিময়ে প্যাট্ যদি সুস্থ হয়ে উঠতে পারত তবে এই মুহূর্তে ওকে খুন করতে আমি এতটুকু ইতস্তত করতুম না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। রথ্ টুপি নাড়ছে। আর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাকি সবাই কত কি বলছে, হাসছে। একটি মেয়ে গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা দূর ছুটে গেল, ভাঙা গলায় বারবার বলতে লাগল, 'বিদায়, আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে।' আমাদের কাছে ফিরে এসে বেচারী কেঁদেই ফেলল। বাকিদেরও মুখ বেজার হয়ে গেল। শুধু এ্যাণ্টনিও বলে উঠল, 'উহুঁ, স্টেশনে যে কাঁদবে তাকে জরিমানা দিতে হবে ওটা আমাদের পুরোনো নিয়ম। আমাদের পার্টির তহবিলে জরিমানার

টাকা জমা হবে।' বলেই টাকার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। অন্য সবাই হেসে উঠল। মেয়েটির চোখে তখনো জল গড়াচ্ছে, সেও মলিন মুখে একটু হেসে কোটের পকেট থেকে একটা পুরোনো পার্স বের করল।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এই যে এরা সবাই হাসছে—এ তো হাসি নয়, মুখের এক রকম বিকৃতি। প্যাট্-এর হাত জোর করে টেনে নিয়ে বললুম, 'চল যাওয়া যাক্।'

গ্রামের ভিতর দিয়ে নীরবে হেঁটে চললুম। কাছের একটা দোকান থেকে এক প্যাকেট খাবার কিনে নিলুম।

প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে বললুম, 'ভাজা বাদাম, তুমি তো খুব ভালোবাস, না?'

প্যাট্-এর ঠোঁট দুটি কেঁপে-কেঁপে উঠল। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, 'রব্বি—'

বলবার অবসর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'দাঁড়াও এক মিনিট—' তাড়াতাড়ি পাশের একটা ফুলের দোকানে ঢুকে পড়লুম। দিব্যি গম্ভীর মুখে একটা গোলাপের তোড়া এনে ওর হাতে দিলুম।

প্যাট্ আবার বলল, 'রব্বি—'

মুখে হাসি টেনে এনে আবার ওর কথাটা চাপা দিলুম। 'বুড়ো বয়সে একটু প্রেমের অভিনয় করা যাচ্ছে, কি বল, প্যাট্।'

প্যাট্ কিছু বলল না। দূর ছাই, হঠাৎ মনটাকে এমন করে দমিয়ে দিলে কে? ঐ ট্রেনটাই যত অনর্থের মূল। হঠাৎ একটা কন্‌কনে শীতের হাওয়ার মতো এসে ও সবার মনকে একেবারে কুঁচকে দিয়ে গেছে। আমরা দুজন যেন বনের মধ্যে পথ হারিয়ে যাওয়া শিশু। মনের মধ্যে উদ্বেগ, কিন্তু বাইরে সেটা দেখাতে চাইনে। কাছেই একটা কাফে। বললুম, 'ভালো কথা, এস কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

প্যাট্ আপত্তি করল না। একটা খালি টেবিল দেখে গিয়ে বসলুম। বললুম, 'কী খাবে, বল?'

'রাম্,' বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'ঠিক বলেছ, রাম্।' টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে ওর হাতটি টেনে নিলুম। ওয়েটার রাম্ দিয়ে গেল—নেবুর গন্ধ মাখা। প্যাট্ গ্লাশ তুলে নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।'

বললুম, 'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে হয় বৈকি। তবে বেশিক্ষণ থাকে না।'

আরো খানিকক্ষণ ওখানটায় বসে বেরিয়ে পড়লুম। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে

চলেছি। দু-একটা স্লেজ্-গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। দু-একজন লোক স্কি করে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে। লাল-শাদা সোয়েটার পরা একদল হকি খেলোয়াড় হল্লা করতে-করতে চলেছে। এরা বরফের উপরে হকি খেলে।

প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'কেমন লাগছে, প্যাট্ ?'

'বেশ ভালো বব্,' আমার হাত টেনে নিয়ে আরো কাছে ঘেঁষে চলতে লাগল। রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে। সন্ধ্যার আভা বরফের উপরে একটি যেন লাল শালুর কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে।

বললুম, 'প্যাট্, তোমাকে আগে বলিনি, এখন আমাদের আর টাকার অভাব নেই। কোষ্টার টাকা পাঠিয়েছে।'

প্যাট্ রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'সত্যি নাকি ? আঃ, তবে তো চমৎকার ; এবার তাহলে একদিন আমরা বেড়াতে যাব।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। একদিন কেন ? যতদিন তোমার ইচ্ছে।'

'তাহলে শনিবার দিন চল কুরসালে যাই। ঐ দিন ওখানে বল্ নাচের ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কিন্তু রাত্তিরবেলায় তো আমাদের বাইরে যাওয়া নিয়ম নয়।'

'নিয়ম নেই বটে, কিন্তু সবাই যায়।'

আমি জবাব দিলুম না, মুখ গম্ভীর করে রইলুম।

প্যাট্ বলল, 'রব্বি, তুমি যখন ছিলে না তখন ওরা যা বলেছে আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। প্রতিদিনের জীবনটাই একটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল তো কিছু হয়নি। বরং আরো খারাপের দিকেই গেছে। না, তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে। তুমি কী বলবে তা আমার জানা আছে। উঁহুঁ, যে কটা দিন বাকি আছে, তুমি যতদিন কাছে আছ ততদিন আমার খুশি-মতো আমাকে চলতে দাও।'

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, শান্ত গম্ভীর মুখখানি কি কোমলতায় ভরা। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ আমরা কী বলছি, কী ভাবছি ? যা কখনো বলবার নয়, ভাববার নয়। আর প্যাট্-এর মুখে কিনা এসব কথা ! তাও কি পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, যেন মনে আর কোনো খেদ নেই, সমস্ত আশা-ভরসা চুকিয়ে দিয়েছে, ললাটের লিখনকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে।

আশ্চর্য, ঐ তো প্যাট্—এক রত্তি মেয়ে। ভেবেছিলুম আমার পক্ষপুটে ঢেকে

রেখে ওকে রক্ষা করব। এখন দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে এরই মধ্যে ও অনেক দূরে চলে গেছে—জীবনের কোন পরপারে এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে ওর মন জানাজানি হয়ে গেছে।

ওকে বললুম, 'ছিঃ, প্যাট্, ওসব কথা বলতে নেই। আমি শুধু ভাবছিলুম যাবার আগে ডাক্তারকে একবার জিগগেস করা উচিত।'

প্যাট্ ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে বড়-বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উঁহু'. আমি কারো কাছে কিচ্ছু জিগগেস করতে চাই না, কিছু জানতেও চাই না। যে কটা দিন বাকি আছে আমি ফূর্তিতে থাকতে চাই।'

সন্ধ্যের দিকে দেখি স্যানাটোরিয়মের করিডরে খুব ফিসফিসানি কানাকানি চলছে, সবাই ত্রস্তব্যস্ত। এ্যান্টনিও এক নেমন্তন্ন এনে হাজির। একজন রাশিয়ানের ঘরে পার্টি আছে, সেখানে যেতে হবে।

আমি বললুম, 'আমি ওখানে এমনিভাবে কী করে যাব?'

এ্যান্টনিও হেসে বলল, 'এখানে অনেক কিছু করা চলে যা অন্যত্র পারা যায় না।'

রাশিয়ান ভদ্রলোক একটু বয়স্ক মতো। দুটি ঘর নিয়ে আছেন, ঘরে বেশ দামী কার্পেট পাতা। একধারে একটা সিন্দুকের উপরে জিন্-এর বোতল সাজানো। ঘরটা আধো-অন্ধকার—শুধু কটি মোমবাতি জ্বলছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একটি সুন্দরী স্পেন-দেশীয় মেয়ে। আজকে ওর জন্মদিন—সে উপলক্ষেই উৎসব। আবছা অন্ধকারে ঘরের আবহাওয়াটা ভারি অদ্ভুত, অনেকটা যেন অন্ধকার ট্রেঞ্চের মতো। সৈন্যদের মধ্যে যেমন এক ধরনের একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, এই রোগীদের মধ্যেও দেখছি তেমনিই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

রাশিয়ান ভদ্রলোক খুব খাতির করে জিগগেস করল, 'কী খাবেন, বলুন?'

বললুম, 'যা আছে তাই খাব।'

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে কনিয়াক্ আর ভড্কার বোতল নিয়ে এল। আমাকে জিগগেস করল, 'আপনার শরীর সুস্থ তো?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ।'

আমার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানের সব কিছুই বোধ করি আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।'

বললুম, 'না, তেমন নয়। কারণ আমিও একটু সৃষ্টিছাড়া ভাবেই দিন কাটাই।'

লোকটি মেয়েটির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল, 'এখানকার জীবনটাই আলাদা। এখানে এলে সব লোকই একটু বদলে যায়। আর এই রোগও বড় অদ্ভুত। এতে মানুষের প্রাণশক্তি বেড়ে যায়। খারাপ লোক ভালো হয়ে যায়। কোথাও একটা রহস্য আছে। মনের কালিমা সব ধুয়ে-মুছে যায়।' ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে উঠে মেয়েটির পাশে গিয়ে বসল। আমার পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, 'দেখলেন তো মশাই কেমন থিয়েটারী ঢঙ।'

ফিরে দেখি একটা লোক—মুখে ব্রণের দাগ, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে, নিশ্চয়ই গায়ে জ্বর আছে। বললুম, 'আমি এখানে নতুন। ওসব বুঝি-টুঝিনে।'

লোকটা বলল, 'ও মশাই মেয়ে পাকড়াতে ওস্তাদ। ঐ যে দেখছেন, ঐটিকেও পাকড়েছে।'

ওর কথার কোনো জবাব দিলুম না। প্যাট্‌কে জিগগেস করলুম, 'লোকটা কে বল তো?'

প্যাট্‌ বলল, 'ও একজন বাজিয়ে, বেহালা বাজায়। আসল কথা ও ঐ মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। এখানে প্রায়ই যেমনটা হয়—একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটি ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। ও ওই রাশিয়ান ভদ্রলোককেই ভালোবাসে।'

বললুম, 'আমি হলেও তো তাই করতুম। আমার তো মনে হয় তোমারও ওর সঙ্গে প্রেমে পড়া উচিত ছিল, কি বল?'

প্যাট্‌ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না।'

'কেন, এখানে এসে তুমি একবারও প্রেমে পড়নি?'

'কই মনে তো পড়ছে না।'

বললুম, 'পড়লেও আমি কিছুই মনে করতুম না।'

প্যাট্‌ নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বলল, 'কিন্তু মনে করা উচিত।'

'না আমি ঠিক সে কথা বলছি না। তুমি আমার মধ্যে যে কী খুঁজে পেয়েছ তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

'সে তোমাকে বুঝতে হবে না, আমিই বুঝব।'

'তুমি তাহলে বুঝেছ?'

প্যাট্‌ হেসে বলল, 'না, বুঝিনি, বুঝলে আর ভালোবাসতুম না।'

রাশিয়ান ভদ্রলোক বোতলগুলো রেখে গেছে, আমি ঢেলে-ঢেলে খেতে লাগলুম। ঘরের আবহাওয়াটা মোটেই ভালো লাগছে না। এই সব রোগীর মেলার মধ্যে

প্যাট্ বসে থাকে সেটা আমার পছন্দ নয়। প্যাট্ জিগগেস করল, 'তোমার বুঝি ভালো লাগছে না ?'

'বিশেষ না। আমি এ সবে অভ্যস্ত নই কিনা। তবে তুমি কাছে থাকলে কোনো জায়গাই খারাপ লাগে না।'

প্যাট্ বলল, 'যাই বল, রিটা মেয়েটি দেখতে বড় সুন্দর।'

বললুম, 'কই না তো। তুমি তার চেয়ে ঢের সুন্দরী।'

রিটা কোলে একটি গীটার নিয়ে বসে আছে। তারে একটু ঝঙ্কার তুলে সে গান শুরু করে দিল। হঠাৎ মনে হল অন্ধকার ঘরটার মধ্যে একটা পাখি যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু চাপা গলায় ওর দিশি ভাষায় গান গাইছে। ভাঙা-ভাঙা ক্ষীণ কণ্ঠের গান। চারিদিকে রোগীর দল অন্ধকারে আর্ম-চেয়ারে বসে আছে। আমার মনে হচ্ছে এ তো গান নয়—এ যেন ওর চাপা কান্না—বোধ করি ঐ জানালার বাইরে কোনো ক্রুর অদৃষ্ট-দেবতা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর গান শুনছে আর এই ভীতিবিহ্বল মেয়েটা তারই পায়ে গানে কান্না নিবেদন করে দিচ্ছে।

পরদিন সকাল থেকেই প্যাট্-এর খুব ফুর্তি। এ-পোশাক ও-পোশাক নিয়ে বাছা-বাছি করছে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কেবলই বলছে, 'বড্ড ঢলঢলে লাগছে, বড় দেখাচ্ছে।' আমার দিকে ফিরে জিগগেস করল, 'তুমি সঙ্গে ডিনার স্যুট এনেছ তো ?'

বললুম, 'না তো, এখানে যে ডিনার স্যুট দরকার হতে পারে সে কথা ভাবতেই পারিনি।'

'তাহলে যাও, এ্যাণ্টনিওর কাছ থেকে ধার করে নাও। ওর স্যুট তোমার গায়ে ঠিক লেগে যাবে।'

'সেটা তো ওর নিজেরই দরকার হবে।'

জামায় পিন লাগাতে-লাগাতে প্যাট্ বলল, 'ও টেইল-কোট পরবে, আমি জানি। হ্যাঁ, তারপরে ওর সঙ্গে একটু স্কি করে এসগে। আমার এখন অনেক কাজ। তুমি কাছে থাকলে আমার কোনো কাজ হয় না।'

আমি বললুম, 'তোমার ঐ এ্যাণ্টনিওর উপরে আমি বড্ড অত্যাচার করছি। ও না থাকলে কী হত বল তো ?'

'যাই বল, ও চমৎকার ছেলে। একলা যখন ছিলুম তখন ও না থাকলে কী যে করতুম বলতে পারিনে।'

বললুম, 'থাক ও কথা এখন আর বোলো না, সে সব অনেককাল আগের কথা।'
প্যাট্ আমাকে চুমু খেয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। আচ্ছা যাও, এখন বেরিয়ে পড়।'
এ্যাণ্টনিও আমার অপেক্ষায়ই বসে ছিল। দেখেই বলল, 'আপনি বোধ হয় ডিনার স্যুট সঙ্গে আনেননি। দেখুন তো, এই কোটটা লাগে কিনা।' কোটটা আমার গায়ে একটু আঁট হয়। তা ওতেই চলে যাবে। কোটটা টাঙিয়ে রেখে শিস দিতে-দিতে বলল, 'কালকে বেশ মজাই হবে। আমাদের ভাগ্যি ভালো, কালকে নাইট্ ডিউটিতে থাকবে আমাদের ছোট্টখাট্ট সেই সেক্রেটারিটি। বুড়ি রেক্সরথ থাকলে আর যেতে হত না। এখানকার আইন মতে ওটা নিষিদ্ধ কিনা।'
দুজনে স্কি করবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে দেখা, ব্রিচেস পরা, হাতে হীরের আংটি আর গলায় খুব রঙচঙে টাই। বললুম, 'এখানে তো বেশ মজার-মজার লোক দেখতে পাওয়া যায়।'
এ্যাণ্টনিও হেসে বলল, 'এ লোকটি এখানকার একজন মাতব্বর ব্যক্তি।'
'তাই নাকি ? লোকটা কে শুনি ?'
এ্যাণ্টনিও বলল, 'এর কাজ হচ্ছে—কোনো রোগীর মৃত্যু হলে মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। দেখছেন তো, এখানে পৃথিবীর সব দেশ থেকেই রোগী আসে—বিশেষ করে সাউথ আমেরিকা থেকে। আর রোগীদের আত্মীয়েরা সব সময়েই চায় মৃতদেহ দেশে নিয়ে কবর দিতে। কাজেই মৃতদেহ পৌঁছে দেবার জন্য লোকের দরকার হয়। এই করে ওরা বেশ মোটা রকমের পয়সা রোজগার করে। মরা মানুষের দৌলতেই এই লোকটি দিব্যি বাবুগিরি করে বেড়াচ্ছে।'
সেদিন বেশ একটু উঁচুতে উঠে আমরা স্কি বেঁধে নিলুম। তারপর ছুটলুম নিচের দিকে। বিলি আমাদের সঙ্গে এসেছে। আর আমাদের দেখা-দেখি সেও পিছন-পিছন ছুটছে আর ঘেউ-ঘেউ করছে। মাঝে-মাঝে ওর বুক অবধি বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ও আস্তে-আস্তে আবার আমার ন্যাওটা হয়ে উঠছে। অবিশ্যি এখনো যখন-তখন মাঝরাস্তায় থেমে যায়। তারপরে কান খাড়া করে একছুটে স্যানাটোরিয়মে ফিরে চলে যায়।
আমি এখন নতুন-নতুন কায়দা শিখবার চেষ্টা করছি। বড় বড় ঢালুতে ঝাঁকুনি খেয়ে এক লাফে অনেক তলায় নেমে যাবার চেষ্টা করি। ঝাঁকুনিটা খাবার আগে হাত-পা ছেড়ে শরীরটাকে শিথিল করে দিই আর ভাবি এবার যদি ছিটকে না পড়ে ঠিক মতো নামতে পারি তবে প্যাট্ ঠিক ভালো হয়ে উঠবে। বেশ কঠিন ব্যাপার। কনকনে হাওয়াটা মুখে এসে বেঁধে, বরফটাও ক্রমে শক্ত আর আঠা-

আঠা হয়ে উঠছে তবু চেষ্টা করতে ছাড়ি না। বরং বেছে-বেছে আরো শক্ত, আরো খাড়া জায়গা দেখে চেষ্টা করি। আর একবার যখন পড়ে না গিয়ে ঠিক মতো এসে নামি তখন ভাবি, যাক বাঁচা গেল, প্যাট্-এর আর ভয় নেই। জানি এসব চিন্তা অর্থহীন, নিতান্তই মূর্খের মতো ভাবছি তবু মনটা সত্যি-সত্যি খুশি হয়ে ওঠে।

শনিবার দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিরাট এক দল চুপি-চুপি স্যানাটোরিয়ম থেকে বেরিয়ে পড়ল। এ্যান্টনিও আগে থেকেই কয়েকটি স্লেজ্-গাড়ি ভাড়া করে রেখেছে। স্যানাটোরিয়ম থেকে একটু দূরে সেগুলো অপেক্ষা করছিল। এ্যান্টনিও নিজে কিন্তু গাড়িতে না উঠে একটা স্কি-স্লাইডে চড়ে দিব্যি সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে বরফের উপর দিয়ে এক রকম স্কি করতে-করতেই রওয়ানা হয়ে গেল। গায়ে শীতবস্ত্র তেমন কিছু জড়ায়নি। একটা বুক-খোলা কোট, তার ভিতর দিয়ে ড্রেস স্যুটের ওয়েস্টকোট দেখা যাচ্ছে।

আমি বললুম, 'লোকটা আচ্ছা পাগল তো।'

প্যাট্ বলল, 'ও হামেসাই অমনি করছে, কোনো কিছুর পরোয়া করে না। ঐ করেই তো বেশ আছে। নইলে কি আর সব সময় অত ফুর্তিতে থাকতে পারত?'

'যাক্, ওর দৃষ্টান্ত না দেখাই ভালো। তার চাইতে এস তোমাকে আর একটু ভালো করে জড়িয়ে দিই।' সঙ্গে যতগুলো শাল আর কম্বল ছিল সবগুলো ওর গায়ে জড়িয়ে দিলুম। স্লেজ্-গাড়িগুলি একটার পিছনে একটা পাহাড় বেয়ে নামছে। রীতিমতো লম্বা এক মিছিলের মতো। লোকের সংখ্যাও কম নয়, যে পালাতে পেরেছে সেই এসেছে। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, হাসাহাসি—এ-গাড়ির লোক ও-গাড়ির লোকের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে। মহা ফুর্তি। কেউ দেখলে ভাবত, এটা বিয়ের মিছিল।

কুরসালে পৌঁছে দেখি বাড়িটা খুব জমকালো রকম সাজানো হয়েছে। নাচ আগেই শুরু হয়ে গেছে। হল্-এর একটা দিক স্যানাটোরিয়মের অতিথিদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওদিকটাতে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটাটা লাগে না। ঘরের ভিতরটা বেশ গরম—ফুলের গন্ধ, সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধ একসঙ্গে মিশে গেছে। আমাদের টেবিলে এক ঝাঁক লোক এসে বসল—সেই রাশিয়ান ভদ্রলোক, রিটা আর বেহালা-বাজিয়ে। খুব জমকালো পোষাক-পরা এক বুড়ি, এ্যান্টনিও তো আছেই, তাছাড়াও আরো কজন।

প্যাট্ বলল, 'রবি, এস না, দেখি আমরাও নাচতে পারি কিনা।'

নাচের দলে গিয়ে জুটলুম। হল্‌-ঘরের মেঝেটা আমাদের চারিদিকে পাক খেয়ে ঘুরছে। অর্কেস্ট্রা বাজছে খুব আস্তে, সবার উপরে বেহালার সুরটা শোনা যাচ্ছে। প্যাট্ খুব অবাক হয়ে বলে উঠল, 'এ কি রবি, তুমি যে চমৎকার নাচছ!'

'চমৎকার আর কোথায়?'

'সত্যি খুব সুন্দর হচ্ছে। কোথায় শিখলে বল তো?'

'কাফে 'ইন্‌টারন্যাশনাল'-এ। ওখানে মেয়েরা তো প্রায়ই আসত। বলতে গেলে রোজা, ম্যারিয়ন, ওয়ালি—ওদের কাছ থেকেই শিখেছি। তবে আমার এ নাচ বোধ হয় ভদ্রসমাজে চলবার যোগ্য নয়।'

'নয় কেন?' প্যাট্ খুব খুশি। বলল, 'তোমার সঙ্গে এই আমার প্রথম নাচ, রবি।'

রাশিয়ান ভদ্রলোক স্প্যানিশ্‌ মেয়েটির সঙ্গে নাচছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। মেয়েটির মুখ বিষম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কালো চকচকে চুল কপাল ঘিরে বেঁধে নিয়েছে। নাচছে অথচ মুখ গম্ভীর। ওর বয়স আঠারোর বেশি হবে না। আমাদের সেই বেহালা-বাজিয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কি লালসাপূর্ণ দৃষ্টি! খানিকক্ষণ নাচের পরে আমরা টেবিলে ফিরে এলুম। প্যাট্ বলল, 'এবার একটু সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে।'

আমি বললুম, 'সিগারেট তোমার না খাওয়াই ভালো।'

'লক্ষ্মী রবি, এই কয়েক টান মাত্র দেব। কতকাল সিগারেট খাইনি।'

একটা সিগারেট নিয়ে দু-এক টান দিয়েই ও রেখে দিল। বলল, 'ভালো লাগছে না তো, কোনোই স্বাদ পাচ্ছিনে।'

আমি হেসে বললুম, 'কোনো জিনিসের সম্পর্ক অনেক দিন ছেড়ে দিলে শেষে এমনিই হয়।'

প্যাট্ বলল, 'আমার সঙ্গেও তো অনেক দিন তোমার সম্পর্ক ছিল না।'

আমি বললুম, 'সে হল বিষ-টিষের বেলায়—ধর তামাক, মদ—এই সব।'

প্যাট্ বলল, 'মানুষ তো এই সবের চাইতে কম সাংঘাতিক নয়।'

আমি হেসে বললুম, 'কথাটা বেশ ভালোই বলেছ।'

টেবিলে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, তুমি বোধ হয় কোনোদিন আমাকে তেমন মূল্য দাওনি।'

বললুম, 'আমি নিজেকেই মূল্য দিইনি।'

'ঐ তো তুমি কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। সত্যি করে কথার জবাব দাও তো।'
'অতশত বুঝিনে প্যাট্। তবে এইটুকু জানি যে তুমি আর আমি মিলে যে ব্যাপারটা, সেটাকে আমি যথেষ্ট মূল্য দিয়েছি। জীবনে এর চাইতে বড় বলে আর কিছু জানিনে।'
প্যাট্-এর মুখে হাসি দেখা দিল। এ্যান্টনিও তক্ষুনি এসে ওকে নাচে ডেকে নিল। দুজনে নাচছে, আমি দেখছি। প্রত্যেকবার আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় প্যাট্ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। চমৎকার নাচছে ও। পা যেন মেঝেতে লাগছেই না, বনহরিণীর মতো ক্ষিপ্র গতি।
রাশিয়ান ভদ্রলোক রিটাকে নিয়ে আর এক দফা নাচতে শুরু করেছে। বেহালা-বাজিয়ের ইচ্ছা ছিল মেয়েটির সঙ্গে নাচে, একবার বলেও ছিল। রিটা আমলই দিল না। ঘাড় নেড়ে রাশিয়ানের হাত ধরে নাচতে চলে গেল। বেহালা-বাজিয়ে মুখের সিগারেটটা নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বেচারীর জন্য আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'এই নিন।'
ও বলল, 'নাঃ, দরকার নেই।' রাশিয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ লোকটা রোজ এক টিন করে সিগারেট ওড়ায়।'
আমি বললুম, 'এমনিই হয়। এক-একজনের এক-এক নেশা।'
'দেখুন না কেন, আজকে ও আমার সঙ্গে নাচল না। কিন্তু যাবে কোথায়? একদিন আমার কাছে আসবেই।'
'কার কথা বলছেন?'
'রিটার কথা বলছিলুম।' তারপরে আর একটু কাছ ঘেঁষে এসে বলল, 'দেখুন, ওর সঙ্গে আমার দিব্যি ভাব ছিল। এক সঙ্গে গল্প করতুম খেলতুম। কোত্থেকে রাশিয়ান ব্যাটা এসে বাজে বকুনির জোরেই বাগিয়ে নিল। তা আসবে, আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে।'
বললুম, 'ওকে ফিরে পাওয়া বড় সহজ হবে না।'
'বলছেন কি, মশাই। না এসে পারে? দুদিন সবুর করলে ও আপনিই এসে যাবে।'
'বেশ, তবে সবুর করুন।' লোকটার কথাবার্তা মোটেই ভালো লাগছিল না। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'দিনে পঞ্চাশটি করে সিগারেট, বুঝলেন তো কি ব্যাপার। কালকে ওর এক্সরে প্লেট দেখলুম—গর্তের পর গর্ত। ব্যস্ আর বেশি দিন নয়।' একটু হেসে বলল, 'প্রথমটায় আমাদের

দুজনের অবস্থা ঠিক এক রকম ছিল। এখন দুজনের এক্সরে মিলিয়ে দেখবেন তফাতটা। আমার তো এরই মধ্যে ওজন বেড়ে গেছে দু-পাউণ্ড। হুঁহুঁ, সেই জন্যেই তো বলছি দুটি দিন সবুর। এর পরে যে এক্সরে নেওয়া হবে তাতেই বোঝা যাবে। নার্সের কাছ থেকে নিয়ে আমি বরাবর ওর এক্সরে প্লেট দেখে নিই। দেখা যাক কি হয়। পথের এই কণ্টকটি দূর হলেই আমার পালা।'

'ও, তাহলে ঐ কণ্টক দূর না হলে আর আপনার আশা নেই।'

'নিশ্চয়, ঐ আশার উপরেই ভর করে আছি। এখন যদি ওর সঙ্গে রেষারেষি করতে যাই, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের আশাটুকুও নষ্ট হবে। কাজেই ভালো-মানুষের মতো চুপটি করে বসে আছি।'

বাতাসটা ক্রমেই বাড়ছে আর প্যাট্ একটু-একটু কাশছে। ও ভয়ে-ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি, ভাবটা যেন ওর কাশি শুনতে পাইনি। রাশিয়ান ভদ্রলোক একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। বেহালা-বাজিয়ে নিজ হাতে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে। একটি মেয়ে হঠাৎ খক্-খক্ কাশতে-কাশতে রুমালটা মুখে চেপে ধরল, তারপর রুমালটার দিকে এক নজর তাকাতেই সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে একবার দেখলুম। এক টেবিলে বসে আছে খেলোয়াড়ের দল, অন্য টেবিলগুলোতে বহু সুস্থ সবল শহুরে লোক—তারা কেউবা ফরাসী, কেউবা ইংরেজ, কেউবা ওলন্দাজ। এত সব লোকের মাঝখানে এই অল্প সংখ্যক রুগ্ন অর্ধমৃতের দলকে অদ্ভুত লাগছে।

প্যাট্-এর দিকে তাকালুম। আহা কি শীর্ণ ওর মূর্তি—ওর মুখখানি, ওর হাত দুটি কত আমার আদরের ধন। কিন্তু আমি অক্ষম, আমি শুধু ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেই পারি, ওর প্রাণ রক্ষা করতে পারিনে।

উঠে বাইরে চলে এলুম। নিজের অক্ষমতায় নিজের উপরেই রাগ ধরছে। একলা একলাই পথে পায়চারি করতে লাগলুম। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে বিঁধছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে। মাঝে-মাঝে অক্ষম রোষে আমার দুই হাত আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠছে।

ওদিক থেকে একটা স্লেজ্-গাড়ি ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেল। আমি আবার হল্-এর দিকে ফিরছি। পথে দেখি প্যাট্ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। জিগগেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'এই একটু বাইরে বেড়াচ্ছিলুম।'

'তোমার বুঝি বিরক্তি ধরে গেছে ?'

'না, না, তা নয়।'

'একটু ফুর্তি কর, লক্ষ্মীটি, অন্তত আজকের দিনটা। আবার কবে বল্-নাচে আসব কে জানে ?'

'কেন, এখন থেকে প্রায়ই আসবে।'

প্যাট্ আমার কাঁধে মাথাটি রেখে বলল, 'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, কথা সত্যি হয় যেন। এস তবে, আর একবার দুজনে নাচি। তোমার সঙ্গে আগে কখনো নাচিনি।'

দুজনে আবার খানিকক্ষণ নাচলুম। ঘরের মধ্যে আলোটা অত্যন্ত আবছা। অবিশ্যি একদিক থেকে সেটা ভালোই বলতে হবে। কারণ প্রত্যেকের মুখে রাত্রি জাগরণের যে ক্লান্তি ফুটে উঠেছিল সেটা সহজে চোখে পড়ছিল না। জিগগেস করলুম, 'কেমন লাগছে, প্যাট্ ?'

'খুব ভালো, বব্।'

'তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

প্যাট্-এর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, 'তোমার মুখে ও কথা শুনতে আরো ভালো লাগছে।' বলেই আমার মুখে একবার চুমু খেল।

স্যানাটোরিয়মে যখন আমরা ফিরে এলুম তখন অনেক রাত। বেহালা-বাজিয়ে রাশিয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'একবার চেয়ে দেখুন ওর চেহারা কেমন হয়েছে।' আমি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলুম, 'তা আপনাকেও ঠিক ও রকমই দেখাচ্ছে।'

লোকটা চমকে উঠে বলল, 'এ্যাঁ, এ্যাঁ, কি বললেন ? নিজে সুস্থ, কাজেই তা বলবেনই তো—'

রাশিয়ান ভদ্রলোক হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিল। রিটাকে ধরে-ধরে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

এ্যাণ্টনিও চলে গেল নিজের ঘরে, একে-একে আর সকলে। সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে, পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে হাঁটছে। মনে হচ্ছে যেন এক ভুতুড়ে কাণ্ড। ঘরে এসে প্যাট্ তার পোশাক খুলছিল। মাথার উপর দিয়ে টেনে খুলবার সময় ফট্ করে শব্দ হয়ে পোশাকটার একটা জায়গা ছিঁড়ে গেল। প্যাট্ ছেঁড়া জায়গাটা দেখছে।

আমি বললুম, 'ওটা বোধহয় আগেই ছেঁড়া ছিল।'

প্যাট্ বলল, 'থাকগে, ওতে কিছু এসে যায় না। বোধকরি আর কোনোদিন এটা পরা হবে না, এই শেষ।'

আস্তে-আস্তে পোশাকটি ভাঁজ করে ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিল। এতক্ষণে চেয়ে দেখলুম, ওকে বিষম ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বললুম, 'এই দেখ, তোমার জন্য কি এনেছি।' বলে কোটের পকেট থেকে একটি শ্যাম্পেনের বোতল বের করলুম।

'এস, এবার শুধু আমাতে আর তোমাতে মিলে উৎসব।'

গ্লাশ এনে দুটি গ্লাশ ভর্তি করলুম। হাসিমুখে প্যাট্ গ্লাশটি তুলে নিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'রব্বি, এই পানপাত্রের মতো পূর্ণ হোক আমাদের জীবন।'

আমিও বললুম, 'হ্যাঁ প্যাট্, পূর্ণ হোক আমাদের জীবন।'

কিন্তু তবু অদ্ভুত লাগছে। এই ঘর, এই নিস্তব্ধতা, আর মনের মধ্যে কেমন একটা চাপা বেদনা। অথচ এই ঘরের বাইরেই অফুরন্ত জীবনের বিস্তার—নদী, গিরি, বনে, আকাশে, বাতাসে,—কি বিরাট প্রাণলীলার স্পন্দন। ঐ তো ঐ পাহাড়ের ওপারে এতদিনে মার্চ মাস এসে গেছে—বসন্তের নিঃশ্বাস-পরিমল ধরার বুকে এসে লাগছে।

প্যাট্ বলল, 'রব্বি, আজ রাত্রিটা তুমি আমার কাছে থাকবে?'

'নিশ্চয়, প্যাট্, নিশ্চয়। চল শুয়ে পড়া যাক্, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে।'

ওর বাদামী রঙের দেহটি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে। চোখে ঘুম নেই, জেগে আছি। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে প্যাট্-এর মৃদু বক্ষ স্পন্দনটি অনুভব করছি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ কতদিন যাবত একটা গরম হাওয়া দিয়েছে। এতদিনের জমা বরফ গলতে শুরু করেছে। বাড়ির ছাতে ছাতে যে বরফ জমে ছিল এখন তাই গলে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত উপত্যকায় একটা ভ্যাপসা গরম। প্যাট্-এর আবার টেম্পারেচার দেখা দিয়েছে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। কয়েক ঘণ্টা বাদে বাদেই ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছেন। বেশ লক্ষ্য করছি ডাক্তারের মুখ গম্ভীর।

একদিন লাঞ্চ খেতে বসেছি, এ্যাণ্টনিও এসে আমার পাশে বসল ; বলল, 'রিটা মারা গেছে।'

'রিটা ? না সেই রাশিয়ান ভদ্রলোক ?'

'না রিটা—সেই স্প্যানিস মেয়েটি।'

'বলছেন কি, এ যে অসম্ভব ঠেকছে।'

ভয়ে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। প্যাট্-এর তুলনায় রিটাকে তো ঢের বেশি সুস্থ দেখাত।

এ্যাণ্টনিও গম্ভীর মুখে বলল, 'এখানে এর চাইতেও অসম্ভব ব্যাপার সব সময়েই ঘটছে। আজ সকালেই মারা গেল। সঙ্গে আবার নিউমোনিয়াও হয়েছিল।'

যাক্, আশ্বস্ত হয়ে বললুম, 'ও, নিউমোনিয়া। তাহলে তো আলাদা কথা।'

'মোটে আঠারো বছর বয়সে। কি সাংঘাতিক, বলুন তো। আর বড্ড কষ্ট পেয়ে মারা গেছে।'

'রাশিয়ান ভদ্রলোকের কি অবস্থা ?'

'আর বলবেন না। ও যে মারা গেছে ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বলছে কি, মরেনি, অমনি মড়ার মতো দেখাচ্ছে। ওর বিছানার পাশে বসে আছে, কেউ তাকে ওখান থেকে ওঠাতে পারছে না।'

এ্যাণ্টনিও চলে গেল। আমি ওখানটাতেই বসে আছি। বসে-বসে ঐ কথাই ভাবছি—রিটা মারা গেছে। ভাগ্যিস প্যাট্ নয়, প্যাট্ বেঁচে আছে।

হঠাৎ দেখি করিডর দিয়ে সেই বেহালা-বাজিয়ে লোকটি আসছে। ঘরে এসে ঢুকল। উঃ, কি চেহারাই হয়েছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। কী যে বলব ভেবে না পেয়ে জিগগেস করলুম, 'ও কি, আপনি সিগারেট খাচ্ছেন যে ?'

লোকটি পাগলের মতো উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, 'খাব বৈকি, খাব না কেন ? এখন খাওয়া না-খাওয়া সবই সমান।' টেবিলের উপর ঝুঁকে কথা বলছে, মুখে কনিয়াক্-এর গন্ধ পাচ্ছি। লোকটা একদম পাগলের মতো বকে যাচ্ছে। বিশ্বসুদ্ধ লোককে শালা, শুয়ারকা বাচ্চা বলে গাল দিচ্ছে। কোথায় ওর প্রতি একটু সহানুভূতি হবে, না ওর কথা শুনে বিষম রাগ ধরে যাচ্ছিল। নেহাত অসুস্থ বলেই, নইলে লোকটাকে ধরে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম। লোকটা টলতে-টলতে দু-পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন না মশাই, বসে এক গ্লাশ পান করি। একজন সঙ্গী না হলে আর চলছে না। কিছুতেই একলা থাকতে পারছি না।'

বললুম, 'না মশাই, আমার সময় নেই। আর কাউকে পান কিনা দেখুন।'

প্যাট্-এর কাছে ফিরে এলুম। ও তখন পিঠের দিকে কতগুলো বালিশ জড়ো করে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। আমাকে জিগগেস করল, 'আজকে স্কি করতে যাবে না ?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'না, বরফ গলতে শুরু করেছে। এখন স্কি করার সুবিধে নেই।'

'তাহলে বরং এ্যাণ্টনিওর সঙ্গে গিয়ে একটু দাবা খেলে এস।'

বললুম, 'না, আমি এখানেই তোমার কাছে বসে থাকব।'

অতি কষ্টে একটু নড়ে-চড়ে শুয়ে বলল, 'লক্ষ্মী রবি, একটা কিছু কর, না হয় এক গ্লাশ কিছু আনিয়ে খাও।'

'হ্যাঁ, সেটা করা যায় বৈকি।'

আমার ঘরে গিয়ে এক বোতল কনিয়াক আর একটা গ্লাশ নিয়ে এলুম। ওকে জিগগেস করলুম, 'তোমাকে একটু দেব ? জানো তো তোমার খেতে মানা নেই।' একটুখানি ঢেলে দিলুম। আস্তে আস্তে খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। গ্লাশটি নিজের জন্য ভর্তি করে নিয়ে বসলুম।

প্যাট্ বলল, 'দেখ, আমার চুমুক-দেওয়া গ্লাশে তোমার খাওয়া উচিত নয়।'

'কি যে বল,' বলে আর এক গ্লাশ ভরতি করে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে নিলুম। ও বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না রব্বি, ওসব করতে নেই। সব সময়ে আমার কাছে থাকাও তোমার উচিত নয়। আর জানো, এখন থেকে আর তুমি আমাকে চুমু খেতে পারবে না।'

'আলবৎ খাব, একশোবার চুমু খাব।'

'না, কক্ষনো না। আর এখন থেকে আমার বিছানায় শুতেও পারবে না।'

'বেশ তাহলে তুমিই এসে আমার বিছানায় শোবে।'

'না, রব্বি, এসব তোমাকে বন্ধ করতে হবে। আমি চাইনে তুমি একটা অসুখ-টসুখ বাধাও। তোমাকে সুস্থ শরীরে থাকতে হবে। বে-থা করে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে তুমি সংসারী হও, এই আমি চাই।'

'আমি স্ত্রীও চাইনে, ছেলেপিলেও চাইনে। তুমিই আমার স্ত্রী, তুমিই আমার সন্তান।'

প্যাট্ আর কথার জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তারপরে উঠে বসে আমার কাঁধে মাথাটি রেখে বলল, 'রব্বি, মাঝে-মাঝে এখন আমার মনে হয় কি জানো ? তোমার দেওয়া একটি সন্তান থাকলে বেশ হত। আগে কখনো মনে হয়নি, এমন কি আগে এসব কথা ভাবতেই পারতুম না। এখন কিন্তু ঘুরে-ঘুরে কেবলই ঐ কথা মনে হয়। আমি মরে গেলেও কিছু আমার থেকে যাবে, এই কথা ভাবতে বেশ লাগে। সেই সন্তানের দিকে যখনই তাকাতে তখনই আমার কথা মনে পড়ে যেত। মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার মনের মধ্যে আমি আবার বেঁচে উঠতুম।'

বললুম, 'বেশ তো। তুমি আগে সেরে ওঠ। তখন আমাদের ছেলে হবে বৈকি। তুমি যেমন চাও, তেমনি আমিও একটি সন্তান চাই। কিন্তু সেটি হবে মেয়ে, আমি তার নাম রাখব প্যাট্।'

আমার হাত থেকে গ্লাশটি নিয়ে আবার এক চুমুক খেল। ধীরে-ধীরে বলতে লাগল, 'ভালোই হয়েছে, রব্বি, ছেলেপিলে হয়নি। তুমি সহজে আমাকে ভুলে যেতে পারবে। যদি ক্বচিৎ কখনো মনে পড়ে যায়, তবে শুধু এই ভেবো যে কটা দিন দুজনে বেশ কেটেছে। ব্যস্, সেইটুকুই ঢের, তার বেশি আর চাইনে। মিছিমিছি আমার কথা ভেবে তুমি কখনো মন খারাপ কোরো না।'

'তুমি এসব কথা বল বলেই মন খারাপ হয়।'

ও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'এমনি করে সারাদিন

বিছানায় শুয়ে থাকলে কত কথা যে মনে হয়। আগে এসব কথা মনের ধারেও আসত না। এখন মাথামাণ্ডু কত কি ভাবি। জানো, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। দুজন মানুষ একে অন্যকে এত ভালোবাসছে, অথচ একজনকে কিনা মরে যেতে হবে!'

'ধৈর্য ধর, প্যাট্। সংসারে একজনকে আগে মরতেই হয়। কিন্তু সে কথা আজ কেন? আমরা দুজন তো কেউ মরতে বসিনি, আমাদের এখনো ঢের দেরি।'

'মানুষ যখন নিঃসঙ্গ, একাকী, তখন না হয় মরতে পারে। কিন্তু একবার যখন সে ভালোবেসেছে তখন তার পক্ষে মরা বড় কঠিন।'

ওর উত্তপ্ত হাত দুটি মুঠোর মধ্যে টেনে এনে হাল্কা স্বরে বললুম, 'ঠিক বলেছ, প্যাট্। সৃষ্টি বিধানের ভারটা যদি আমাদের দুজনের হাতে থাকত তাহলে দুনিয়ার বিধিব্যবস্থাটা এর চাইতে একটু ভালো হত।'

ও মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, রব্বি, তাহলে এ রকম কিছু নিশ্চয় ঘটতে দিতুম না। কিন্তু এই জীবন মৃত্যুর পিছনে কি আছে কে জানে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? মৃত্যুর পরেও কি কিছু আছে?'

বললুম, 'আছে বৈকি। জীবনটা এমনি এলোমেলো করে তৈরি করা হয়েছে, ও কেবলি পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, থামতে জানে না।'

প্যাট্ হেসে বলল, 'কথাটা এক রকম মন্দ বলনি।' ওর বিছানার পাশে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া। সেইটে দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু সত্যি কি মনে কর, ও জিনিসটা এতই কাঁচা হাতের তৈরি?'

বললুম, 'কাঁচা নয়তো কি? ছোটখাট খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিস চমৎকার কিন্তু সবটা মিলিয়ে কেমন যেন অর্থহীন। মনে হয় এ যেন কোন ক্ষ্যাপা কারিগরের পাগলামি। এমন বিচিত্র সৃষ্টি গড়ে তুলছে আবার নিজ হাতে ভেঙে দিচ্ছে।'

প্যাট্ বলল, 'বোধকরি আবার নতুন গড়বার জন্যই ভাঙছে।'

'তাতেই বা কী লাভ? এ পর্যন্ত তো লাভের কিছু দেখলুম না।'

প্যাট্ বলল, 'যাই বল রব্বি, বিধাতা আমাদের প্রতি এমন কিছু অবিচার করেননি। এর চাইতে আর ভালো কী হত? সুখ আমাদের বেশি দিন টিকল না এই যা। দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে গেল, তবু যা পেয়েছি তাই ঢের।'

এর কয়েকদিন পরে একদিন ঘরে বসে আছি। বুকের ভিতরটায় কেমন কচ্ কচ্ করে বিঁধতে লাগল, কবার কাশলুমও। ঘরের সুমুখ দিয়ে ডাক্তার যাচ্ছিলেন। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দয়া করে একবার আসুন তো আমার ঘরে।'

বললুম, 'ও কিছু নয় ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'না, সে জন্য বলছিনে। বলছিলাম কি, ঐ কাশি নিয়ে ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান-এর কাছে আপনার যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, একবার অস্থন আমার সঙ্গে।'

ডাক্তারের কন্‌সালটিং-রুমে এসে যখন গায়ের জামাটা খুলে ফেললুম তখন কেন জানিনে মনে বেশ একটু ফুর্তি হল। স্যানাটোরিয়ম এমনি জায়গা, এখানে শরীর ভালো থাকলে কেমন যেন অপরাধী-অপরাধী মনে হয়। মনে হয় যেন চোরাই মালের ব্যবসা করছি।

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখে বোধ হচ্ছে আপনি মনে মনে বেশ খুশি হয়েছেন।'

ডাক্তার খুব ভালো করে বুক পিঠ পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি ওঁর কথা মতো একবার জোরে নিঃশ্বাস টানছি, একবার আস্তে; একবার ঘন-ঘন, একবার টেনে-টেনে, যখন যেমন বলছেন। বুকের ভিতরটা আবার একটু কচ্‌কচ্‌ করে উঠল। মনে-মনে সত্যি খুশি হচ্ছি, কারণ তাহলে প্যাট্‌-এর সঙ্গে আমার ব্যবধানটা ঘুচে যায়।

দেখে-শুনে ডাক্তার বললেন, 'আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে। দুটো দিন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন; অন্তত ঘরেই থাকবেন, বাইরে বেরোবেন না। আর ফ্রাউলিন হোল্‌ম্যান-এর ঘরে যাবেন না। আপনার জন্য বলছি না; ওঁর জন্যেই বলছি।'

জিগগেস করলুম, 'দু-ঘরের মাঝখানে যে দরজা আছে তাই দিয়ে কথা বলতে পারব তো, কিম্বা বারাণ্ডার দিক থেকে?'

'হ্যাঁ, তা পারবেন বৈকি। তবে গলাটা বেশ করে গার্গল করে সাফ করে নেবেন আর বেশিক্ষণ ধরে কথা বলবেন না যেন। আপনার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে এই যা—কাশিটা আর কিছু নয়, অতিরিক্ত ধূমপানের ফল।'

'ফুসফুসের অবস্থাটা কেমন দেখলেন? খুব আশা করেছিলুম কোথাও একটু-না-একটু গোলমাল বেরোবেই।'

কিন্তু ডাক্তার হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। বহুদিন আপনার মতো সুস্থ ব্যক্তি দেখিনি। শুধু লিভারটা বড্ড শক্ত দেখলুম, আপনি বোধকরি মদটা একটু বেশি খান।' ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন। তাই নিয়ে চলে এলুম।

ও ঘর থেকে প্যাট্‌ ডেকে বলল, 'ডাক্তার কী বললেন, বব্‌?'

'এখন কদিন তোমার কাছে যেতে বারণ করলেন। ছোঁয়াচ লেগে যেতে পারে।'
প্যাট্ ভয়ে-ভয়ে বলল, 'কেমন বলছিলুম না, আমার ঘরে তুমি এস না।'
'উহুঁ, ঠিক বুঝতে পারছ না। পাছে আমার ছোঁয়াচ তোমাকে লেগে যায়, এই ভয়। নইলে আমার কিছু হবে না।'
প্যাট্ বলল, 'কি সব বাজে বকছ? ঠিক করে বল তো কী হয়েছে?'
'ঠিক কথাই তো বললুম।' নার্স আমার জন্য ওষুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওকে চোখে ইশারা করে বললুম, 'এই যে বেশ আপনিই বলুন না, আমাদের দুজনের মধ্যে কার অসুখটা সাংঘাতিক।'
নার্স মুখ খুব গম্ভীর করে প্যাট্কে বলল, 'হের্ লোকাম্প-এর অসুখটা ভালো নয়। ডাক্তার বারবার বলে দিলেন উনি যেন এ ঘরে না আসেন, আপনার তাতে ক্ষতি হতে পারে।'
প্যাট্ বেচারী অবাক হয়ে একবার আমার দিকে একবার নার্সের দিকে তাকাচ্ছে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে ওষুধের শিশিটা দেখিয়ে দিলুম। ওষুধ দেখে ভাবল তাহলে কথাটা সত্যি হবে বা। হঠাৎ হাসতে শুরু করে দিল। হাসতে-হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। তারপর শুরু হল কাশি। আজকাল কাশির ধাক্কায় ওর বিষম কষ্ট হয়। নার্স ছুটে গিয়ে ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।
একটু সামলে নিয়ে প্যাট্ ফিসফিস করে বলল, 'এ বেশ মজাই হয়েছে। অসুখ বাধিয়ে তোমার কি ফুর্তি! যেন মস্ত একটা কাজ করে বসেছ।'
সন্ধ্যেটা ও বেশ আনন্দেই কাটাল। বলা বাহুল্য ওকে আমি একলা থাকতে দিইনি। গায়ে একটি মোটা কোট চাপিয়ে, গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে দুপুর রাত অবধি ব্যালকনিতে বসেছিলুম। এক হাতে চুরুট আর এক হাতে গ্লাশ, আর পায়ের কাছে কনিয়াক্-এর বোতলটি রেখে আমার জীবনের কাহিনী ওকে শোনাচ্ছি। ও শুনে খুব হাসছে। ওকে বেশি করে হাসবার জন্য আমি প্রাণপণে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছি। ইচ্ছে করেই একটু বেশি-বেশি কাশছি। ওদিকে এক চুমুক এক চুমুক করে খেয়ে বোতলটি ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু সকাল বেলায় উঠে দেখি কাশি বিলকুল সেরে গেছে।
আবার সেই গরম হাওয়া দিতে শুরু করেছে। হাওয়ার ঝাপটায় সারাক্ষণ দরজা জানালায় খটাখট্ শব্দ লেগে আছে। আকাশে মেঘ, বরফ গলে ঢল নামছে. বরফের চাক ভেঙে-ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে—রাতভর তার শব্দ। রোগীদের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। রাত্রে ঘুম হয় না, বারবার জেগে গিয়ে অন্ধকারে

কান পেতে ঐ শব্দ শোনে। পাহাড়ের তলায় এখানে-সেখানে ক্রোকাস্ ফুল দেখা দিয়েছে। আর এতদিন যে-রাস্তায় শুধু স্লেজ্-গাড়ি দেখা যেত সেখানে চাকা-ওয়ালা অন্য গাড়িও এক-আধটা করে চলতে শুরু করেছে।

প্যাট্ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে, এখন আর বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। রাত্রে এক-এক সময় এমন বিষম কাশি আরম্ভ হয়, ভয় হয় এক্ষুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। ও নিজেও বিষম ভয় পেয়ে যায়, মৃত্যু-ভয় মুখে-চোখে ফুটে ওঠে। আমি ওর ঘামে-ভেজা শীর্ণ হাত দুটি ধরে পাশে বসে থাকি। কাশতে-কাশতে ফিসফিস করে বলে, 'রব্বি, এই সময়টা যদি কোনো রকমে পার করে দিতে পারি তাহলেই বাঁচি—বেশির ভাগ রোগী এই সময়টাতেই মারা যায়—'

শেষ রাত্রির দিকটাকে ওর বড় ভয়। ওর বিশ্বাস রাত্রি যখন শেষ হয়ে আসে রোগীদের জীবনীশক্তিও তখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে। এজন্যে ঐ সময়টাকে ওর বিষম ভয়, তখন কিছুতেই একলা থাকতে চায় না। এ ছাড়া অন্য সময় অসহ্য যন্ত্রণাও ও হাসি মুখে সহ্য করে।

আমার বিছানা ওর ঘরেই নিয়ে এসেছি। কাশির ধাক্কায় ও যখন জেগে ওঠে তখন ওর পাশে এসে বসি। ওর যন্ত্রণাকাতর মুখে যখন সেই মৃত্যুভয় দেখা দেয় তখন আর সইতে পারিনে। অনেক সময় আমার মরফিয়ার শিশিটার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু দিই-দিই করেও দিতে পারিনি, কারণ দেখেছি প্রতিটি নতুন দিনের আগমনে ওর মুখে কি অধীর আনন্দ ফুটে উঠেছে।

ওর পাশে বসে মাথামুণ্ডু যা আমার মনে আসে পাগলের মতো বকে যাই। ওর এখন বেশি কথা বলা বারণ কাজেই আমি বলি, ও শোনে। আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে ছোটখাটো খুঁটিনাটি সব কিছু শুনতে ওর আগ্রহ। বিশেষ করে আমার ছেলেবেলাকার ইস্কুলের গল্প শুনে ও হেসে কুটিকুটি। কাশির ধাক্কা কেটে গিয়ে ও যখন শীর্ণ দেহটি স্তূপীকৃত বালিশে এলিয়ে দিয়ে বসে তখন ওর ফরমাস মতো আমার কোনো পুরোনো মাস্টারমশায়ের অঙ্গভঙ্গি নকল করে দেখাই। কাল্পনিক দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে আমি ঘরময় পায়চারি করছি আর হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে অত্যন্ত সব জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা জুড়ে দিয়েছি। এমনি প্রায়ই হত। অবিশ্যি কাজটা বড় সহজ ছিল না, রোজ-রোজ আমাকে নতুন-নতুন গল্প বানিয়ে তৈরি করতে হত। ফলে প্যাট্ এখন আমাদের ক্লাশের যত সব দুরন্ত বদমায়েস প্রকৃতির ছেলেদের নাম-ধাম ইতিবৃত্ত জেনে গেছে। এরা মাস্টারমশায়দের জ্বালাতন করবার জন্য নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির

বের করত। একদিন হয়েছে কি, রাত্তির বেলায় আমাদের বুড়ো হেডমাস্টারের নকল করে আমি গুরুগম্ভীর গলায় বক্তৃতা করছি। আমাদের ক্লাশের কার্ল ওসেজ বলে একটা দুষ্টু ছেলে ছোট্ট করাত দিয়ে চুপি-চুপি ডেস্কের পায়া কাটছিল। হঠাৎ তাই টের পেয়ে হেডমাস্টারমশায় তাকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি প্যাট্-এর একটা ঢোলা জামা গায়ে দিয়ে মাথায় টুপি চড়িয়ে ঘরময় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছি আর বক্তৃতা দিচ্ছি। ঠিক সেই সময় নার্স এসে হাজির। আমার কাণ্ড দেখে বেচারী একেবারে হকচকিয়ে গেছে। ও ভেবেছে আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ওকে যত বোঝাতে চাই ও তত ভয় পেয়ে যায়। ওদিক প্যাট্ তো হেসে খুন। অনেক কষ্টে নার্সকে বোঝানো গেল যে ওটা কিচ্ছু নয়, এমনি একটু ফুর্তি হচ্ছিল।

আস্তে-আস্তে দিনের আলো ঘরে এসে প্রবেশ করে। অন্ধকারের আবরণ খসিয়ে দিয়ে পাহাড়গুলো একে-একে মাথা তুলে দেখা দেয়। টেবিলের উপরে ল্যাম্প-এর আলোটি হলদে হয়ে জ্বলতে থাকে। প্যাট্ আমার হাতের মুঠোতে মুখটি রেখে বলে, 'বাঁচা গেল রবি, কালরাত্রি কাটল। আর একটি দিনের আয়ু পাওয়া গেল।'

এ্যান্টনিও তার রেডিওটি এ ঘরে এনে দিয়েছে। তার-টার জুড়ে ঠিক করে নিলুম। রাত্তির বেলায় প্যাট্‌কে রেডিও শোনাতে বসেছি। প্রথমটায় খানিকক্ষণ ক্যাঁচম্যাচ ঘড়ঘড় শব্দ তারপরে এরই ভিতর থেকে আচমকা অতি মিষ্টি গানের সুর ভেসে এল।

প্যাট্ জিগগেস করল, 'ওটা কি?'

একটা বেতার পত্রিকার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললুম, 'খুব সম্ভবত রোম।' বলতে না বলতেই শোনা গেল : 'রেডিও রোমা।' চাবিটা ঘুরিয়ে দিলুম। সুরটা শুনেই বললুম, 'এ তো আমার জানা সুর—এটা হচ্ছে বিটোফেনের সোনাটা। এককালে এটা আমি নিজেই বাজাতে পারতুম। অবিশ্যি সে অনেকদিন আগের কথা—তখন ভাবতুম একদিন সঙ্গীত শিক্ষক হব, এমনকি সঙ্গীত রচয়িতা হবার কথাও ভেবেছি। সে সব দুরাশা এখন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে—সুরটা এখন বাজাতেও পারব না। এসব কথা ভাবলে মন দমে যায়।' চাবিটা আবার ঘুরিয়ে দিলুম। খুব উঁচু পর্দায় মেয়েলি কণ্ঠের মিষ্টি গান শোনা গেল। বললুম, 'প্যাট্, এটা প্যারিস্।'

অন্যমনস্কভাবে ক্রমাগত চাবি ঘুরিয়ে চললুম। কোথাও বক্তৃতা, কোথাও ব্যবসা

বাণিজ্যের খবর, কোথাও বিজ্ঞাপন। হঠাৎ আবার গান। প্যাট্ কান খাড়া করে বলল, 'এটা কি ?'

আমি পত্রিকার পাতা উল্টে বললুম, 'প্রাগ্ থেকে তারের যন্ত্রে বিটোফেনের সোনাটা হচ্ছে।' জিনিসটা শেষ অবধি শুনলুম। তারপরে চাবি ঘোরাতেই চমৎকার বেহালার বাজনা। বললুম, 'এটা কি জানো ? এ হচ্ছে বুদাপেস্ত্!' জিপ্‌সি সুর বাজছে। সব ছাপিয়ে বেহালার আওয়াজটি খুব সুন্দর আসছে। বললুম, 'ভারি মিষ্টি, না প্যাট্ ?'

ওর দিক থেকে কোনো সাড়া পেলুম না। ফিরে দেখি ও কাঁদছে। তৎক্ষণাৎ রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বললুম, 'ও কি প্যাট্ ?' কাছে এসে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসলুম।

ও বলল, 'কিচ্ছু না, রব্বি। ও আমার ছেলেমানুষি। হায়রে! তুমি প্যারিস, রোম, বুদাপেস্ত্-এর নাম করছ—সে সব দূরের কথা, ঐ গ্রামটিতে একবার নেমে যেতে পারলে বর্তে যেতুম।'

বললুম, 'ছিঃ প্যাট্!' ওর মনটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য আবোলতাবোল অনেক কথা বকে গেলুম।

ও আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না রব্বি, আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। আমার কান্না দেখে তুমি ভেব না যে আমার মন খারাপ হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ আমার চোখে অমনিতেই জল এসে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না—অন্য কথায় আবার ভুলে যাই।'

ওর মাথায় চুমু খেয়ে বললুম, 'অত কথা কি ভাব বল তো ?'

'কি আর ভাবব ? জীবন আর মৃত্যুর কথা ছাড়া এখন আমার ভাববার আর কিছু নেই। ভেবে-ভেবে যখন আর কিছু কূলকিনারা পাই না তখন মনে করি বাঁচবার স্পৃহা থাকতে-থাকতে মরাই ভালো, যখন জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে, বাঁচবার স্পৃহা নষ্ট হবে তখন মরার মতো দুর্দৈব আর নেই। তুমি কী বল ?'

'জানি না, প্যাট্।'

'খুব জানো।' আমার কাঁধে মাথা রেখে প্যাট্ বলল, 'বাঁচবার স্পৃহা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জানবে ভালোবাসবারও কিছু আছে। অবশ্যি ভালো যে বেসেছে তার পক্ষে মরা বড় শক্ত। আবার একদিক থেকে সোজাও। এই দেখ না মরতে তো আমাকে হতই। কিন্তু এই যে তোমাকে পেয়েছি যাবার বেলায় এই তৃপ্তি-টুকু নিয়ে তো গেলুম। নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় যদি থাকতুম তাহলে মনে হত

মরলেই বাঁচি। এখন মরা বড় শক্ত। তবু সান্ত্বনা আছে—মৌমাছি যেমন মধু সংগ্রহ করে সন্ধ্যাবেলায় মৌচাকে ফিরে আসে, তেমনি আমি বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। প্রেমহীন নিঃসঙ্গ জীবনের চাইতে এই মৃত্যু ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'প্যাট্, তুমি শুধু দুটো সম্ভাবনার কথাই ভাবছ, এছাড়া আর একটা সম্ভাবনাও আছে। এই আবহাওয়াটা বদলালেই তুমি ধীরে-ধীরে সেরে উঠবে। দুজনে মিলে আবার সেই আমাদের পুরোনো জীবনে ফিরে যাব।'

প্যাট্ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, 'রব্বি, তোমার জন্যেই আমার ভয়। আমার চাইতে তোমারই কষ্ট হবে বেশি।'

বললুম, 'প্যাট্, এসব কথা এখন থাক্।'

ও বলল, 'পাছে তুমি ভাব আমি মনে-মনে কষ্ট পাচ্ছি সে জন্যই ওসব কথা বললুম।'

'আমি জানি তোমার মনে কোনো দুঃখ নেই।'

'ঠিক বলেছ,' আমার হাতে হাতটি রেখে বলল, 'কই, সেই জিপ্‌সিদের গানটা শোনা হল না তো?'

'শুনবে তাহলে?' রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে দিলুম। বেহালা আর বাঁশির সুর ঘরের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। প্যাট্ বলল, 'চমৎকার, দক্ষিণ হাওয়ায় মন যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

বুদাপেস্ত্-এর কোনো রেস্তোরাঁয় কনসার্ট হবে। বাজনার ফাঁকে-ফাঁকে লোকজনের কথাবার্তা ভেসে আসছে, কখনো বা এক-আধজনের উল্লাসধ্বনি। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওখানে বসন্ত লেগেছে, গাছে-গাছে কচিপাতায় বাতাসের মৃদু শিহরণ আর চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। ওখানে নিশ্চয় এতদিনে শীত চলে গেছে, সকলে বাইরের বাগানে চাঁদের আলোয় বসেছে, সুমুখে হাঙ্গেরিয়ান মদের পাত্র, ওয়েটারের দল শাদা জ্যাকেট গায়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে আর ওদিকে জিপ্‌সিদের বাজনা চলছে। রাতভর ফুর্তি করে ভোরের দিকে সবাই বাড়ি ফিরবে। কি অফুরন্ত আনন্দ। আর এই তো প্যাট্ এইখানে শুয়ে, মুখে হাসিটি লেগে আছে। কিন্তু এই ঘর ছেড়ে আর কি ও বেরোতে পারবে এই বিছানা ছেড়ে কোনোদিন কি আর উঠবে?

দেখতে-দেখতে কী যে হয়ে গেল। কদিনের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন। এমন সুন্দর মুখ শুকিয়ে কী হয়ে গেছে! এতটুকু মাংস নেই। গালের হাড় বেরিয়ে আছে।

কপালের দুদিকেও হাড় দেখা দিয়েছে। হাত দুটি শিশুর হাতের মতো শীর্ণ। জ্বরের বিরাম নেই, জ্বরের উপর জ্বর আসছে। নার্স অক্সিজেনের সরঞ্জাম এনে রেখেছে। ডাক্তার ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এসে দেখে যাচ্ছেন।

একদিন বিকেলের দিকে জ্বরের তাপটা হঠাৎ নেমে এল, কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। প্যাট্ ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠল। অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে একটা আয়না দাও না।'

বললুম, 'আয়না দিয়ে কী হবে ? চুপ করে শুয়ে থাক, প্যাট্। এবার তুমি ভালো হয়ে উঠবে। জ্বর এক রকম নেই বললেই হয়।'

প্যাট্ তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠেই বলল, 'না, আয়নাটা একটু দাও।'

খাটের ওদিকটাতে গিয়ে আয়নাটা তুলে নিয়ে ইচ্ছে করেই হাত থেকে ফেলে দিলুম। আয়নাটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। বলে উঠলুম, 'এই যা ! কি কাণ্ডই করলুম। হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।'

ও বলল, 'আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে আর একটা আয়না আছে, রব্বি।'

ছোট্ট ক্রোমিয়ামের একটি আয়না। ব্যাগ থেকে বের করে হাতটা একবার কাঁচের উপরে বুলিয়ে নিলুম আয়নাটা যাতে একটু ঝাপসা দেখায়। প্যাট্ হাতে নিয়ে কাঁচটি বেশ করে ঘষে-ঘষে মুছে নিল, তারপর অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে আয়নাতে তাকিয়ে রইল। ফিসফিস করে বলল, 'রব্বি, তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

'কেন ? আমাকে আর তোমার দরকার নেই ?'

'আমাকে তুমি আর দেখো না, এ তো আমি নই।'

আয়নাটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললুম, 'এ অত্যন্ত বাজে আয়না। এই দেখ না, এতে আমাকেই দেখাচ্ছে রোগা, শুকনো। অথচ এই তো আমি দিব্যি জোয়ান মানুষটা। কাঁচটা কেমন একটু ঢেউ-খেলানো মতো, এতে ঠিক দেখা যায় না।'

প্যাট্ তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাকে আগে যে-মূর্তিতে দেখেছ, সেই পুরোনো রূপের স্মৃতিটুকুই মনে রেখো। সত্যি বলছি রব্বি, তুমি এখান থেকে যাও। বাকি সময়টুকু আমি একলাই কাটিয়ে দেব।'

অনেক করে ওকে শান্ত করলুম। আবার আমার কাছে আয়না আর ব্যাগ চেয়ে নিল। আস্তে-আস্তে শীর্ণ মুখে ঠোঁটে, চোখের কোটরে পাউডার মাখাতে লাগল। মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'তবু যেটুকু হল। সত্যি তোমাকে আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখাতে ইচ্ছে করছিল না।'

বললুম, 'তুমি যাই ভাব না, তোমার চেহারা আমার চোখে কখনো বদলাবে না। আমার কাছে তুমি জগতের সেরা সুন্দরী।'

আয়না আর পাউডারের বাক্সটি নিয়ে সরিয়ে রেখে দিলুম। তারপরে দু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে পাশে এসে বসলুম। খানিক পরেই ও কেমন ছটফট করতে লাগল।

বললুম, 'কি হয়েছে, প্যাট্?'

ও ফিসফিস করে বলল, 'ঐ টিক্‌টিক্ শব্দটা সইতে পারছিনে।'

'কিসের—এই ঘড়ির?'

মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওটা শুনলে আমার ভয় করে।'

কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে ফেললুম। প্যাট্ বলল, 'এটা সরিয়ে রেখে দাও।'

ঘড়িটা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারলুম। বললুম, 'ঐ দেখ, টিক্‌টিক্ বন্ধ হয়ে গেছে। সময়ের গতি স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কেবল আমরা দুজন, তুমি আর আমি, আর কেউ নেই।'

বড়-বড় দুই চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'রব্বি আমার—'

ওর চোখের ঐ চাউনি সইতে পারছিনে। যেন কত দূর থেকে ও আমাকে চেয়ে দেখছে আর আমাকে ছাড়িয়ে কোন দূর-দূরান্তে ওর দৃষ্টি চলে গেছে। ওকে জড়িয়ে ধরে বারবার শুধু বলতে লাগলুম, 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।'

শেষ রাত্রের দিকে ভোর হবার আগে ও মারা গেল। মরবার আগে খুব যন্ত্রণা পাচ্ছিল, কিন্তু যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কিছুই করা গেল না। আমার একটি হাত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে।

তখন ওর জ্ঞান নেই, আমি যে পাশে বসে তা ও জানেই না।

কে যেন বলল, 'মরে গেছে—'

আমি বললুম, 'না, মরেনি। এখনো আমার হাত শক্ত করে ধরে আছে।'

ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে! লোকে ঘর ভরতি। ডাক্তারের ব্যস্ত সমস্ত ভাব। আস্তে আমার হাতটি সরিয়ে নিলুম, প্যাট-এর হাতখানা নেতিয়ে পড়ল। রক্ত—মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। চোখে পলক পড়ছে না। বাদামী রঙের সিল্কের চুল।

ডেকে উঠলুম, 'প্যাট্, ও প্যাট্!'

এই প্রথম আমার ডাকে ও সাড়া দিল না।

বললুম, 'আপনারা যান। আমি একলা থাকব।'

কে একজন বলল, 'কিন্তু—'

'না, আপনারা যান, ওকে এখন ধরবেন না।'

নিজ হাতে মুখের রক্তটুকু ধুয়ে ফেললুম। চুল আঁচড়ে দিলুম। হীম শীতল দেহ। ধরে তুলে আমার বিছানায় নিয়ে চাদর ঢেকে দিলুম। আমার শরীর যেন কাঠ হয়ে গেছে। পাশের চেয়ারটিতে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, কিছুই ভাবতে পারছি না। কুকুরটাও এসে পাশে বসেছে। ওর মুখের চেহারা আস্তে-আস্তে বদলাচ্ছে। কিছুই করবার নেই, চুপটি করে তাকিয়ে বসে আছি। রাত্রি ভোর হল, দিনের আলো দেখা দিল—এ তো আর আমার সেই প্যাট্ নয়।

সমাপ্ত